স্বস্তিকা

দাম : ৭০ টাকা

পূজা সংখ্যা - ১৪২৫
১ অক্টোবর - ২০১৮

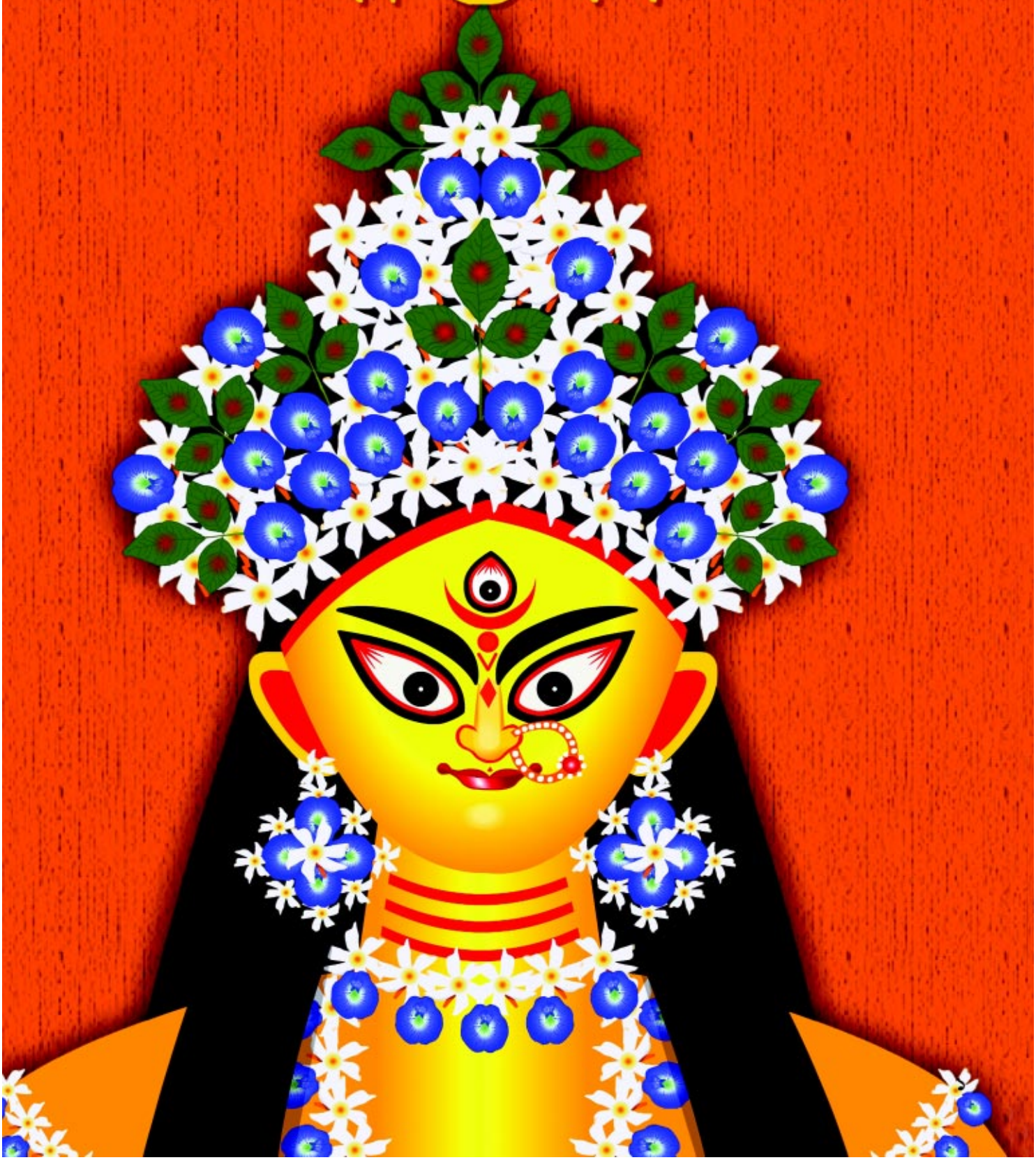

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৫ সংখ্যা,
১৪ আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১ অক্টোবর - ২০১৮,
যুগাব্দ - ৫১২০,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ : সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর (সার্কুলেশন)
৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪,
৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর (অফিস)
৮৬৯৭৭৩৫২১৬

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

দেবী প্রসঙ্গ
'নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু'
স্বামী যুক্তানন্দ — ১৯

উপন্যাস

অবেক্ষণ

শেখর সেনগুপ্ত ১৩৩

কুসুম কুমারী
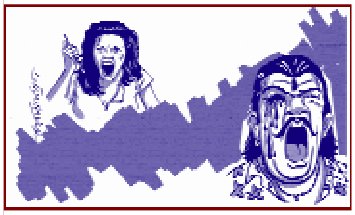
সুমিত্রা ঘোষ ২১৩

হাতি ঘোড়া পাল কী

জিষ্ণু বসু ২৬৫

উপন্যাসোপম কাহিনী
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

প্রবাল চক্রবর্তী ৬৮

গল্প

সে এক মেয়ে
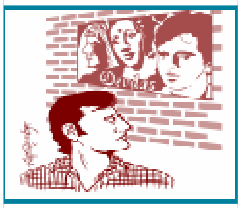
রমানাথ রায় ৪১

জয়-পরাজয়
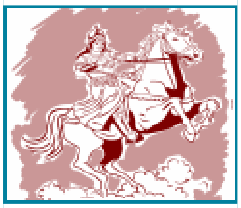
এষা দে ৫৯

অন্ধকারের গল্প

গোপাল চক্রবর্তী ১২৩

প্রথম বিদুর
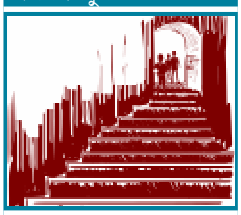
সন্দীপ চক্রবর্তী ১৭৯

ছোঁয়াছুঁয়ি

সিদ্ধার্থ সিংহ ২৯৯

দুষ্টু-মিষ্টি প্রাণী লিমার

তাপস অধিকারী ৩০৭

প্রবন্ধ

শরৎ ঋতুতেই পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের সমন্বয়

অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী ২৩

খোসা ও শাঁস
হেস্টি-বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিতর্ক ও ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস ৩১

বৃটিশ সংবাদপত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সারদা সরকার ৪৭

তোমার সৃষ্টির পথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত ১১৫

গীতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ড. সুদীপ বসু ১৯৫

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান-গবেষণা-বিস্তৃতির প্রয়াসে নিবেদিতার ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ রায় ১৯৯

আরব সভ্যতায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার অবদান

সৌমেন নিয়োগী ২০৫

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

অধ্যাপক জয় সেন ২০৯

একপর্দা প্রেক্ষাগৃহের মায়া

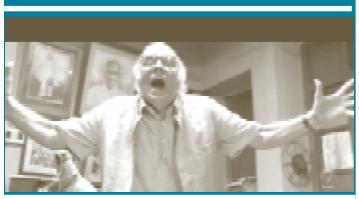

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৩

রাজনীতিতে ভক্তি, ভীতি ও ভ্রষ্টাচার : গণতন্ত্রের অন্তরায়

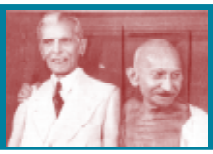

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় ২৫৯

ভ্রমণ

রেনেসাঁর ভূমিতে

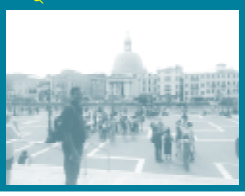

কুণাল চট্টোপাধ্যায় ১৫৩

ফিরে দেখা

ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

ডা. অমূল্যরতন ঘোষ ২৭

জীবন-কথা

মশাল হাতে সিংহপুরুষ

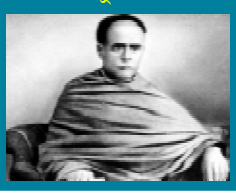

জহর মুখোপাধ্যায় ২৪৯

মজার খেলা

অঙ্কের ধাঁধা

হিতোরি : জাপানি সংখ্যার খেলা

হিতোরি ধাঁধা

৩	৫	০	৪	০	৮	০	১
০	৪	১	৮	৭	২	৩	৫
১	৬	২	০	৮	০	৪	০
৪	৭	০	৩	২	৪	০	৬
৫	০	৪	০	৩	৬	৭	২
০	৩	৭	১	৪	০	২	০
৪	৮	৩	০	৫	১	০	৭

শৌনক রায়চৌধুরী ৩০৯

SURYA

Energising Lifestyles

Innovative **DESIGN** » World-Class Quality **PRODUCTS** » Just One Name **SURYA**

lighting

fans

appliances

pipes

SURYA ROSHNI LIMITED

E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in

Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96

Toll Free No.: 1800 102 5657

/suryalighting I /surya_roshni

‘নাশায় চাশুভ ভয়স্য মতিং করোতু’

স্বামী যুক্তানন্দ

শ্রীভগবান শ্রীমদভগবদ্গীতায় নিজমুখে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—

‘যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।’ (৪।৭-৮)

শ্রীশ্রীচণ্ডীতেও দেবী ভগবতী সকল দেবতা তথা জগদ্বাসীকে আশ্বস্ত করে বলেছেন—

‘‘ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষময়ম্।।” (১১।৫৫)

অর্থাৎ, এরূপে যখন যখনই জগতে দানবগণ হতে উপদ্রব উপস্থিত হবে, তখন তখনই আমি অবতীর্ণা হয়ে দেশশত্রু অসুরগণকে বিনাশ করব।

দেবী ভগবতীও আপন প্রতিশ্রুতি পালনে শ্রীভগবানের মতোই যুগে যুগে অবতীর্ণা হয়ে অশুভ শক্তি, অসুর শক্তিকে দমন করে শুভশক্তি দেবশক্তিকে পুনরায় তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এভাবে দেবী কতবার জগতে অবতীর্ণা হয়েছেন বা হবেন, সেকথারও উল্লেখ রয়েছে শ্রীশ্রীচণ্ডীতেই। সেখানে একাদশ অধ্যায়ে দেবী দেবগণকে লক্ষ্য করে বলছেন—

‘‘বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাব্যুৎপৎস্যেতে মহাসুরৌ।।
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।।” (১১।৪১-৪২)

অর্থাৎ, বৈবস্বত মন্বন্তরে (সপ্তম মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম —২৮তম) চতুর্যুগে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অন্য দুই মহাসুর উৎপন্ন হবে। তখন আমি নন্দগোপ -গৃহে যশোদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বিন্ধ্যাচলে অবস্থান পূর্বক সেই দুই অসুরকে বিনাশ করব।

‘‘পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলে।
অবতীর্য হনিষ্যামি বৈপ্রচিত্তাংস্তু দানবান্।।
ভক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুগ্রান্ বৈপ্রচিত্তান্ মহাসুরান্।
রক্তদন্তা ভবিষ্যন্তি দাড়িমী-কুসুমোপমাঃ।।
ততো মাং দেবতাঃ স্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ।
স্তবন্তো ব্যাহরিষ্যন্তি সততং রক্তদন্তিকাম্।।” (ঐ, ১১।৪৩-৪৫)

অর্থাৎ, পুনরায় আমি অতিভয়ঙ্করী মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হয়ে বিপ্রচিত্তি-বংশীয় দানবগণকে বধ করব। সেই উগ্রস্বভাব বিপ্রচিত্তি-বংশীয় মহাসুরগণকে ভক্ষণ করতে করতে আমার দাঁতগুলি দাড়িম্বফুলের মতো রক্তবর্ণ হবে। সেজন্য স্বর্গে দেবগণ এবং মর্ত্যে মানবগণ আমাকে স্তব করতে করতে সবসময় ‘রক্তদন্তিকা’ নামে অভিহিত করবে।

‘‘ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যা মনম্ভসি।
মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ
সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা।।
ততঃ শতেন নেত্রাণাং
নিরীক্ষিষ্যামিযন্মুনীন্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতক্ষীমিতি মাং
ততঃ।।” (ঐ, ১১।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ, পুনরায় শতবছর ব্যাপী অনাবৃষ্টির কারণে পৃথিবী জলশূন্যা হলে মুনিগণ কর্তৃক সংস্তুতা হয়ে আমি জলশূন্য পৃথিবীতে অযোনিসম্ভবারূপে আবির্ভূতা হব। তখন স্তবকারী মুনিগণকে আমি শতনয়ন দ্বারা নিরীক্ষণ করব। সেজন্য মানুষরা আমাকে ‘শতাক্ষী’ নামে অভিহিতা করবে।

ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহ-সমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ! শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যাম্যহংভুবি।।” (ঐ, ১১।৪৮-৪৯)

অর্থাৎ, হে দেবগণ, তারপর আমি নিজ

‘‘যস্যাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি বক্তুমলংবলঞ্চ।
সা চণ্ডিকাখিল-জগৎপরিপালনায়
নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং কারাতু।।”
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।৪)

দেহজাত জীবনধারক শাক, পাতা দিয়ে যতদিন সুবৃষ্টি না হয়, ততদিন পর্যন্ত সকল জীবগণকে পালন করব। আর তখন আমি পৃথিবীতে 'শাকম্ভরী' নামে বিখ্যাত হব।

'তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাধ্যং মহাসুরম্।

দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মেনাম ভবিষ্যতি।। (ঐ, ১১।৫০)

আর তখন আমি দুর্গম নামক মহাসুরকে বধ করব। সেজন্য আমার নাম 'দুর্গাদেবী' নামে বিখ্যাত হবে।

দেবী তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কথাপ্রসঙ্গে দেবগণকে আরও বলছেন— 'পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।

রক্ষাংসি ক্ষয়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।।

তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।।' (ঐ, ১১।৫১-৫২)

অর্থাৎ, পুনরায় আমি যখন হিমালয়ে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে মুনিগণের পরিত্রাণের জন্য রাক্ষসদের বিনাশ করব, তখন সকল মুনিগণ প্রণতদেহে আমাকে স্তব করবেন। সেজন্য আমি 'ভীমাদেবী' নামে বিখ্যাত হব।

'যদারুণাখ্যস্ত্রৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি।

তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্।।

ত্রৈলোক্যস্য হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাসুরম্।

ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তিসর্বতঃ।। (ঐ, ১১।৫৩-৫৪) অর্থাৎ, যখন অরুণ নামে অসুর ত্রিভুবনে মহাবিঘ্ন উৎপাদন করবে, তখন আমি অসংখ্য ভ্রমরবিশিষ্ট ভ্রামরী মূর্তি ধারণ করে ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য সেই মহাসুরকে বধ করব। সেজন্য সকলে সর্বত্র আমাকে 'ভ্রামরী' নামে স্তব করবে।

দেবী নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুগে যুগে বারেবারে অবতীর্ণা হয়েছেন, হচ্ছেন এবং হবেন শিষ্টের পালনে ও দুষ্টের দমনে, দেবধর্ম-সনাতন ধর্ম-হিন্দুধর্মের সুরক্ষায় এবং দানবের ধর্ম, অসুরের ধর্ম, অত্যাচারীর ধর্ম বিনাশের জন্য।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জগত্তারিণী দেবী মহাশক্তি মহামায়ার তিনবার অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। প্রথমবার তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল সৃষ্টি তখনও শুরু হয়নি। সৃষ্টি যিনি করবেন, সেই সৃষ্টিকর্তা বিধাতা ব্রহ্মার জীবনরক্ষা করার প্রয়োজনে। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কর্ণমল থেকে উৎপন্ন দুই অসুর মধু ও কৈটভ যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, তখন তিনি প্রাণপণে ডেকেছেন শ্রীবিষ্ণুকে— নিজ জীবনরক্ষার প্রয়োজনে। কিন্তু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত শ্রীবিষ্ণুর কানে তাঁর সেই ডাক পৌঁছায়নি। কারণ তিনি যে তখন অতুলা তামসীশক্তি বিশ্বেশ্বরীর প্রভাবে নিদ্রামগ্ন। তাই শুরু করলেন সেই মহাদেবী জগদ্ধাত্রীর স্তুতি করতে। ব্রহ্মার স্তবে প্রসন্না দেবী হলেন আবির্ভূতা। জাগ্রত হলেন শ্রীভগবান বিষ্ণুও। ব্রহ্মাকে হত্যায় উদ্যত মধু ও কৈটভের সঙ্গে তাঁর শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ। পাঁচ হাজার বছর ধরে সে যুদ্ধ চললেও শ্রীবিষ্ণু তাদের পরাজিত করতে পারলেন না। তখন দেবী মহামায়া দুই অসুরকে করলেন বিমোহিত 'মহামায়া বিমোহিতৌ'। মোহিত হয়ে বিবেচনা হারিয়ে তখন সেই দুই অসুর শ্রীবিষ্ণুকে বর প্রার্থনা করতে বলে। বিষ্ণুও তাদের মৃত্যুবর চাইলেন ও তাঁর সুদর্শনের আঘাতে শিরচ্ছেদ করলেন।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, ভগবান বিষ্ণু দুই অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের হত্যা করলেও সেখানে দেবীই দুই দৈত্যের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ। কারণ, প্রথমত, দেবী মহামায়া শ্রীবিষ্ণুকে নিদ্রা থেকে জাগরণের যেমন কারণ, তেমনি দুই দৈত্যকে বিমোহিত করে নিজেদের মৃত্যুকে নিজ হাতে তুলে নেওয়ার যে কাজটি তারা করেছে, তা তো দেবী মহামায়ার মায়ারই কারণে। তা না হলে তাদের হত্যা করতে ভগবান বিষ্ণুর যে আরও কতদিন সময় লাগত বা কবে সম্ভব হতো তা বলা কঠিন। তাই প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে মধু-কৈটভের মৃত্যুর কারণ দেবী ভগবতীই।

দেবী মহাশক্তি মহামায়ার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথাটিও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত। সেখানে দেখা যায়, দেবগণ দীর্ঘদিন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত ও স্বর্গরাজ্য থেকে বিতাড়িত। তাঁরা তখন বাস্তুহারা। সর্বহারার ন্যায় যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেই সময় তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে সব কথা বলেন। তাঁর সহযোগিতা নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হন বিষ্ণু ও শিবের নিকট। তাঁদের কাছে সব কথাই সবিস্তারে বলেন। তারপর তিন প্রধান দেবতা ও অন্যান্য দেবগণের মহাতেজ ও সুবিপুল তেজোরাশির সম্মিলনে আবির্ভূতা হলেন। সকল তেজের আধার, সকল শক্তির আধার মহাশক্তি শ্রীশ্রীমহিষাসুরমর্দিনী। দেবগণই তাঁকে সর্বতভাবে সমরসাজে সজ্জিতা করে দিলেন। সেই মহাশক্তি মহামায়ার নিকট প্রবল পরাক্রমসহ যুদ্ধ করেও নিহত হল ত্রিভুবনের অধীশ্বর অসুরসম্রাট মহিষাসুর। দেবগণ দেবীর কৃপায় আবার নিজ বাসভূমি ফিরে পেলেন। জগতে শুভশক্তি আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। বিনাশ ঘটল অশুভ শক্তি, দুষ্ট শক্তি। সনাতন ধর্ম আবার হলো সুস্থিত।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত এরপরের ঘটনা মহাবীর ও মহাযোদ্ধা শুম্ভ ও নিশুম্ভের নেতৃত্বে অসুর শক্তি প্রবল হয়ে ওঠে। তাদের স্বর্গরাজ্য অধিকার করার সংকল্প। সেই সংকল্প নিয়ে তারা স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে। দেবগণের পরাজয় ঘটে। আবারও তাঁরা হন স্বর্গহারা। একই সঙ্গে সব ক্ষমতাও চলে গিয়ে তাঁরা দীনহীনভাবে দিন কাটাতে থাকেন। এভাবেই দিনযাপন করতে করতে একসময় তাঁদের মনে হয়, দেবী মহাদেবী সর্বেশ্বরী তো তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, যখন যখনই অশুভ শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে, শুভশক্তি হবে ক্ষীণ, দুর্বল; তখন তখনই তিনি আবির্ভূতা হয়ে দেবশক্তি, শুভশক্তি, সনাতন ধর্মকে রক্ষা করবেন। সেই ভাবনা ভেবেই দেবগণ দেবী মহাদেবীর শরণাপন্ন হলেন। স্তব স্তুতি প্রার্থনা জানালেন দেবীর নিকট।

শুভশক্তির প্রতীক দেবগণের প্রার্থনায় পরিতুষ্টা হয়ে দেবী হলেন আবির্ভূতা। তিনি ও তাঁর সৃষ্ট মাতৃশক্তিকে নিয়ে প্রবল যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন দুই মহাসুরসহ সমগ্র অসুরকুলকেই। দেবীর করুণাতেই আবার দেবগণ ফিরে পেলেন নিজ স্বর্গরাজ্য ও হারিয়ে যাওয়া অধিকার। জগতে শান্তির সুবাতাস আবার আপন ছন্দে প্রবাহিত হতে থাকল। সত্যধর্ম, সনাতন ধর্ম, হিন্দুধর্ম আবার হলো সুস্থিত।

মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধের সময় যেমন জগদীশ্বরী দেবী মহাশক্তি যুদ্ধে একাই অসুরদলকে পরাভূত করেন কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি ও তাঁর সৃষ্ট মাতৃশক্তিকে নিয়ে যুদ্ধ করে দৈত্যকুলকে বিনষ্ট করেন। যদিও তাঁর কথাই সঠিক— 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াঃ কমমাপরা' (১০।৫)। এই জগতে দেবী একাই আছেন, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে আছে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপরোক্ত যে তিনটি ঘটনার কথা আমরা পড়ে থাকি বা শুনে থাকি, যা দেবী জগদ্ধাত্রীর জগৎ-কল্যাণ লীলারূপে অনুষ্ঠিত, সেগুলিকে কাহিনি, গল্প বা আখ্যান-উপন্যাস যাই বলা হোক না কেন, প্রতিটিই ইতিহাস। প্রতিটিই বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে।

আমাদের রামায়ণ, মহাভারত যেমন ইতিহাস, তেমনি বিভিন্ন পুরাণসমূহে বর্ণিত আখ্যান উপখ্যানগুলিও ইতিহাস। তবে এসবই অত্যন্ত প্রাচীন। এত প্রাচীন যে সেগুলির পাথুরে প্রমাণ রক্ষা করা অসম্ভব। নাসার সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে যদি আমাদের ধারণা হয়, রামচন্দ্র রামসেতু তৈরি করেছিলেন আজ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে, তাহলে সে ঘটনা আজ থেকে কতদিন আগের? এবং এখন যে কলিযুগ চলছে, এই কলিযুগ বৈবস্বত মনুর অধীন। এর বয়সের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বছর। যার মধ্যে মাত্র ৫০০০ বছর কী তার কিছু বেশি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। এর আগে ছিল দ্বাপর যুগ, ত্রেতা যুগ ও সত্য যুগ। তাদের বয়স যথাক্রমে ৮,৬৪,০০০; ১২, ৯৬০০০ ও ১৭,২৮০০০ বছর।

এর আগে আছে চাক্ষুস, রৈবত, তামস, উত্তম, স্বারোচিষ ও স্বায়ম্ভুব মনুর যুগ এবং তাদের বয়স যদি বর্তমান মনুর সমান বয়স হয়ে থাকে, তবে সেই অঙ্ক কী সুবিশাল হয়ে যায়, তাকি ধারণা করা সম্ভব? আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে যে সুরথ রাজার কথা পড়ি বা শুনি, তিনি ছিলেন স্বরোচিত নামে দ্বিতীয় মনুর অধিকার সময়ের— 'স্বারোচিষেহন্তরে পূর্বং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ। সুরথো নাম রাজাহভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৪)। আর তাঁকে মহামুনি মেধস যে মধুকৈটভব বধ, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের কথা শুনিয়েছেন, তারও বয়স বিচার করলে তো কম নয়। সুতরাং সেসবের পাথুরে প্রমাণ রক্ষা করা কীভাবে সম্ভব? হয়তো যে যে সময় এইসব ঘটনা ঘটেছে, সেই সময় যে এসবের প্রমাণ ছিল না তা নয়। কিন্তু কালে কালে সবই হয় নষ্ট হয়ে গেছে, অথবা হারিয়ে গেছে। আজ আমরা যে সকল বস্তুর মধ্যে বর্তমানের ঘটনাপ্রবাহকে ধরে রাখতে চাইছি, সেগুলিই বা সেভাবে কতদিন স্থায়ী হবে? মহাকালের অতলগর্ভে সবই একদিন বিলীন হবেই হবে। মহাকালের অতলগর্ভে আমরা যদি যেতে পারি, তবে হয়তো আমাদের সেই হারিয়ে যাওয়া অনেক কিছুরই প্রমাণ পাওয়া যাবে। এখনও তো মাঝেমধ্যেই শোনা যায়, মাটির গভীরে কত প্রাচীন যুগের প্রাণীর বা অন্যান্য বস্তুর নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং কোনওদিন হয়তো সেগুলিও পাওয়া গেলে আশ্চর্য কী? তবে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া না গেলেও যুগ যুগ ধরে যে কথা লোকমুখে, শাস্ত্রমুখে প্রচারিত হয়ে আসছে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় কি? বরং সেগুলিকে স্বীকার করেই এগিয়ে যেতে হয়, সেগুলি থেকে শিক্ষা নিতে হয়। পণ্ডিতগণ, বিজ্ঞজন তাই করেন। মহাজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ব্যাসদেব সেই চিন্তা-ভাবনা করেই সেই দূরদৃষ্টি নিয়েই ওই সকল ইতিহাস মার্কণ্ডেয় পুরাণের এই দেবী মাহাত্ম্যে উল্লেখ করেছেন জগতকল্যাণ লোক কল্যাণের উদ্দেশেই।

হিন্দু শাস্ত্রকার ও পণ্ডিতগণের তত্ত্বের প্রতি ঝোঁক বেশি। তাঁরা চান, যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরা যেন সবসময়ই তত্ত্বচিন্তা মনের মধ্যে করেন। তার মধ্য দিয়েই তাঁরা সত্য বস্তু লাভ করতে পারবেন। তত্ত্বের মধ্যেই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের অনেক গভীর কথা, গোপন কথা লুকিয়ে আছে। যা জানতে পারলে, বুঝতে পারলে ত্রিবিধসমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায়। সে কাজ অবশ্যই সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। যাঁদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা অবশ্যই সেটি করবেন। কিন্তু তাই বলে শাস্ত্রের মধ্য সব কথার তত্ত্ব অযোগ্যকে বাছতে যাওয়া যেমন সঠিক নয়, তেমনি সবকিছুকেই সর্বদা তাত্ত্বিকভাবে দেখাও ঠিক নয়। যা আমাদের পণ্ডিতগণ, আমাদের অধ্যাত্মজগতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ কেউই করেননি, করতে চাননি। তাঁরা জানেন এবং মানেন, শাস্ত্রকথায় যেমন তত্ত্ব আছে, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তার উপযোগিতা আছে। যেমন সেখানে মুক্তির কথা বলা আছে, তেমনি আছে ভুক্তির কথাও। যার পক্ষে যেটি আয়ত্ত করা সম্ভব সে সেটিই নেবে এবং তার কাছে সেটিই উপযোগী হয়ে উঠবে। তাই বলে আমরা সকল মানুষকে এমনভাবে বুঝানোর চেষ্টা করতে পারি না বা করব না, 'মা কালীর হাতে যে রক্তাক্ত খড়্গ, সে খড়্গ কাউকে হত্যা করার জন্য নয়, সে খড়্গ জ্ঞান-খড়্গ। মা ওই খড়্গ দিয়ে অজ্ঞানীর মনের অন্ধকার ছেদন করবেন বলেই তো তিনি খড়্গধারী। বা যদি মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, রাম বলেও কেউ ছিলেন না, রাবণ বলেও কেউ ছিলেন না। রাম হলেন মানুষের অন্তরস্থিত শুভবুদ্ধি আর রাবণ হলেন অশুভ বা তামসিক বুদ্ধি। এই শুভবুদ্ধির অশুভবুদ্ধির বিপক্ষে যে সংগ্রাম, তাই রামায়ণে এঁকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে গল্প আকারে। তাহলে সে ক্ষেত্রে যা দাঁড়ায় তা হল শ্রীশ্রীচণ্ডী ও রামায়ণ উভয়ই

কল্পিত। এর মধ্যে কোনও সত্য নেই, ইতিহাসও নেই। তাই সেগুলি পড়ার বা অনুসরণ ও অনুকরণ করারও প্রয়োজন নেই।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখানো হয়েছে— দেবী চণ্ডিকা জগতে অশান্তি সৃষ্টিকারী দুষ্টদের দমন করার জন্য হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অসুরকে তাঁর খড়্গাঘাতে হত্যা করেছেন। আবার রামায়ণে দেখা যায়, সুস্থ শান্তিময় পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনে দুষ্টদের বিনাশে শ্রীরামচন্দ্র আজীবন সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ। দু'ক্ষেত্রেই আমরা অনুপ্রাণিত ও নিশ্চিত। উভয়ের নিকট থেকেই আর্ত মানুষ বিপদ থেকে মুক্তির অভয় আশ্বাস লাভ করে। ঈশ্বর বিশ্বাসী বিশেষত হিন্দুদের অধিকাংশই যেসকল দেবতার পূজা করে তাঁরা মূলত শস্ত্রধারী — শিব, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, গণেশ ব্রহ্মাদ প্রমুখ। ব্রহ্মাদি তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেও ব্রহ্মার পূজা খুব বেশি চোখে পড়ে না। তাঁর বড় অধিষ্ঠানক্ষেত্র হলো পুষ্করতীর্থ। তাছাড়া আর কোথায় কোথায় তাঁর পূজা হয় সে সংবাদ খুব কম লোকই জানেন। কিন্তু ওই সকল দেবগণের পূজা যত্রতত্রই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, একথা ঠিক, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মতো কোনও কোনও দেবতার হাতে অস্ত্র নেই। কিন্তু হিন্দু তাঁদেরও ব্যাপকভাবে পূজা করে। তার কারণ, মা লক্ষ্মীর কৃপা না থাকলে অন্নাভাবে জীবন যাবে। আর মা সরস্বতীর করুণা না পেলে মূর্খ হয়েই থাকতে হবে। অন্নহীন হয়ে থাকার মতো প্রশ্নই নেই, মূর্খ হয়েই বা কে থাকতে চায়?

সুতরাং শ্রীশ্রীচণ্ডীর ভুক্তি বা জাগতিক দিক আত্মরক্ষা ও শত্রুদমনের দিক, মায়ের দেবস্বভাব সন্তানদের রক্ষা করার প্রচেষ্টার দিকটি নিয়ে আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে। সেখান থেকে শিখতেও হবে। আর মায়ের কাছ থেকে আমরা যে রূপ চাই, জয় চাই, যশ চাই, চাই শত্রুর বিনাশ— রূপং দেহি জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি।' তাছাড়া মায়ের নিকট সৌভাগ্য, আরোগ্য, বিদ্বান, লক্ষ্মীবান, শক্তিমান হওয়ার মতো কত কিছু প্রার্থনা তো আছেই। যেগুলি সবই মা পরমেশ্বরীকেই পূরণ করতে হবে— এই জগদ্বাসীর কল্যাণে। তাঁর আর্ত, শরণাগত, ভক্ত সন্তানদের কল্যাণে।

তবে শ্রীশ্রীচণ্ডী তো সেই শাস্ত্র, যেখানে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়েই পাওয়ার কথা বলা আছে। রাজা সুরথ হলেন ভুক্তি বা ভোগের প্রতীক। তিনি রাজ্য চান, রাজা হতে চান, ঐশ্বর্য চান, শত্রু বধ করতে চান, পরন্তু মন্বন্তরের অধিপতি হতে চান। জগতজননী মা তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। আবার সমাধি বৈশ্য সে পথে না গিয়ে বিবেকী, প্রজ্ঞাবান, বৈরাগ্যবান হয়ে স্ত্রী-পুত্র ধনাদি আমার এবং দেহাদি আমি— এ রকমের সংসারাশক্তি বিনাশক তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করেন। জগজ্জননী মা তাঁকে মুক্তিলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। অতএব শ্রীশ্রীচণ্ডীতে জাগতিক দুঃখ দূর করার উপায়, সম্পদ লাভের ও সমৃদ্ধির পথ যেমন প্রশস্ত হয়ে আছে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির পথও প্রশস্ত হয়ে আছে। যিনি যেমন চান, তিনি তেমন সম্পদই পাবেন। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীকে শুধুমাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখার প্রবণতা কমিয়ে বা দেখেও তার ব্যবহারিক উপযোগিতা নিয়েও ভাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পরন্তু সেই ভাব ও ভাবনাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা যায় না।

স্বামী প্রণবানন্দজী কালীর হাতে রক্তাক্ত খড়্গ, দুর্গার হাতে দশপ্রহরণ দেখে হিন্দুকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বলেছেন। আত্মরক্ষায় ওইসব অস্ত্রশস্ত্র ধারণের শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনের জন্য শক্তি-সাধনা করতে বলেছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী হলো নারীশক্তি মাতৃশক্তি জাগরণের শাস্ত্র। এই শাস্ত্র থেকে শেখা যায়, যখন পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে পুরুষশক্তি দুর্বল বা অকর্মণ্য হয়ে যায়, তখন যদি নারীশক্তি মাতৃশক্তি সেখানে জেগে ওঠে, পুরুষের পাশে দাঁড়ায়, তবে পুরুষ শক্তিলাভ করে এবং কর্মক্ষেত্রে জয়ী হয়। আবার পুরুষ ছাড়াও মাতৃশক্তিকে যদি উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কর্মভূমি বা যুদ্ধভূমিতে পাঠানো যায়, তবে সে অবশ্যই বিজয় নিয়ে আসবেই। বৃহত্তর যুদ্ধক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্ত্রীশক্তিকেই না পাঠিয়ে পুরুষেরাও যদি অনুগমন করে, তবে বিপক্ষ যত প্রবলই হোক না কেন, যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত। এই সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধতা ও বিজয় লাভের যে সংকল্প নিয়ে দেবগণ দেবী মহাদেবী মা জগদ্ধাত্রীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তা থেকেও আমাদের শিখতে হবে। বুঝতে হবে, তাকে অনুসরণ, অনুকরণ করতে হবে। হিন্দুজাতি বিশাল, কিন্তু তার সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব তাকে হীন, দুর্বল, পরপদানত করে রেখেছে। যদি হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে, এক সঙ্কল্প নিয়ে চলতে পারে, তবে তাকে কে পদানত করবে? কে তার উপর অত্যাচার নির্যাতন করবে?

আজ দেবস্বভাব, সত্যধর্মনিষ্ঠ শান্তিকামী হিন্দু চারদিকে দৈত্য দানব অসুরদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত। যদিও সে আত্মরক্ষায়, স্বধর্ম ও স্বীয় সংস্কৃতি রক্ষায় যত্নশীল, কিন্তু প্রতিপক্ষের নিকট সে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই হিন্দুর এই দুর্বলতার জন্য একদল হিন্দুও দায়ী। এই অবস্থায় যেমন হিন্দু সমাজের নারীশক্তি মাতৃশক্তির জাগরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি একান্তভাবেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সেই মহাশক্তি মহামায়া মা দুর্গা যিনি মধু-কৈটভ বিনাশিনী, মহিষাসুরমর্দিনী, শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী— তাঁর পুনরায় আগমনের। এসে আবার তিনি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করুন। তাই তাঁর শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা জানিয়ে বলি—

ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব যাঁর অতুলনীয় প্রভাব ও শক্তি বর্ণনা করতে অসমর্থ, সেই দেবী চণ্ডিকা সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালন এবং আমাদের অমঙ্গলজনক ভয় বিনাশের জন্য ইচ্ছা করুন। ■

শরৎ ঋতুতেই পিতৃপক্ষ ও মাতৃপক্ষের সমন্বয়

অধ্যাপক জয়ন্ত কুশারী

পূব আকাশে নিত্যদিন বিরাজ করেন জ্যোতির্ময় সূর্যদেব। তাঁরই নিত্যলীলায় আসে দিন। আসে রাত্রি। আলো-আঁধারির আবর্তনে জীবকুলের জীবনযাত্রাতেও আসে বৈচিত্র্যের স্বাদ। দিবাভাগের কর্মক্লান্ত ব্যস্ততার পরে বিশ্রামের বিরতি নিয়ে আসে রাত্রি। এইভাবেই কেটে যায় দিন। দিনের পর মাস। মাসের পর বছর। এ তো গেল সাধারণ মানুষের জীবনধারা।

কিন্তু ক্রান্তদর্শী প্রাজ্ঞ ঋষিকুল এর মধ্যেই দেখতে পেলেন তিথি-নক্ষত্র, বার, পক্ষ ও অয়নকে। এল পূর্ণিমা-অমাবস্যা- প্রতিপদ প্রভৃতি ষোলোটা তিথি। এল কৃত্তিকা প্রমুখ সাতাশটি নক্ষত্র। রবি ইত্যাদি সাতটি বার। হলো পক্ষের পরিবর্তন। অয়নের অতিক্রম। এলো শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ। একে একে উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন এসে পড়ে। ধরিত্রীর বুকে যেমন উত্তরায়ণ পর্বের পরবর্তী অধ্যায়ে আবির্ভূত হয় দক্ষিণায়ন। ঠিক তেমনই সূর্যদেবের জীবনের দুটি পর্বের অবস্থা ও অবস্থানগত পরিবর্তনের প্রতীক এই অয়নদ্বয়ের পরিবর্তন।

যিনি এই ধরণীর দিন ও রাত্রির নিয়ামক, যাঁর কিরণে প্রতিভাত হয় দিনের আলো। আর অস্তগমনের পরে দিনান্তে নেমে আসে রাতের আঁধার, সেই ভাস্করদেবের জীবনপথও পরিবর্তন হলো দুটি ভিন্ন পথে। বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধানকে শিরোধার্য করেই। মাঘ থেকে আষাঢ়— এই ছয়মাস উত্তরায়ণ। উত্তরায়ণ হলো দেবতাদের দিনের বেলা। সেই উত্তরায়ণের দিনগুলিতে উত্তরাভিমুখী হলেন সূর্যদেব। সূর্যদেবের এইসময়ের দিনগুলি কাটে তাঁর প্রথমা স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর সঙ্গে। শ্রাবণ থেকে পৌষ এই ছয়মাস দক্ষিণায়ন। দক্ষিণায়ন দেবতাদের রাত্রিবেলা। দক্ষিণায়নের আগমনে দেব দিবাকর তাঁর তেজোদীপ্ত বীর্যবত্তাকে পরিতৃপ্ত করতে ছায়াদেবীকে করলেন জীবনসঙ্গিনী। তপন তেজের উগ্র প্রখর প্রশমিত হলো শান্ত স্নিগ্ধ ছায়ার আচ্ছাদনে। রাতের আঁধারের ঘন ছায়ায় গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন দেবকুল।

এলো ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি দক্ষিণায়নের এই বিশেষ অন্তিম তিথিটি স্বাভাবিক নিয়মে অমাবস্যা হলেও এটি 'মহালয়া' নামে বেশি পরিচিত। শাস্ত্রে বিশেষ এই পক্ষটিকে 'অশ্বযুক কৃষ্ণপক্ষ' বলা হয়েছে। সপ্তাশ্ববাহিত রথেই সূর্যের গমনাগমন। এই পক্ষের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কটি যে নিবিড়, তা 'অশ্বযুক' শব্দটির ব্যবহারে স্পষ্ট হয়। অশ্ব কথাটি এখানে সূর্যেরই দ্যোতক। মহালয়া শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়। মহান আলয়ঃ যত্র ইতি মহালয়ঃ (স্ত্রীয়াম টাপ্) স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগে মহালায়া। উক্ত পুরাণের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, মহান শব্দে ঋষিগণ বা পিতৃগণ, আলয় শব্দে রৌদ্রতীর্থ। সূর্যের তেজ ও আলোয় বিশ্ববাসী পান প্রাণের স্পর্শ। সেই প্রাণের স্পন্দন পেতে পিতৃগণ বা ঋষিগণ এসময় হন রৌদ্রতীর্থগামী। দক্ষিণাভিমুখী। যা সূর্যের এ সময়ের গতিপথ।

আবার মহালয়া শব্দটির ব্যুৎপত্তি অন্যভাবেও করা যায়। মহতো পিতৃপক্ষ লয়ঃ যত্র ইতি মহালয়ঃ (স্ত্রীয়াম্ টাপ্)। স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগ করলে মহালয়া শব্দটি পাই। অর্থাৎ অশ্বযুক পক্ষের বা পিতৃপক্ষের অবসান যেখানে বা যে তিথিতে। এই কথার প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্নও কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে। যার (যে তিথির) অবসান আছে তার (সেই তিথির বা পক্ষের) উদয়ও নিশ্চয় আছে! উত্তরে শাস্ত্র বলছে, ভাদ্র কৃষ্ণা প্রতিপদ হলো উক্তপক্ষের উদয় তিথি। দেবীপক্ষে (আশ্বিনের শুল্ক প্রতিপদ থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত) যেমন দেবীপূজন, পিতৃপক্ষেও তেমন পিতৃপূজনের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে।

শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী পক্ষযুগল ও তাদের পুজো পদ্ধতির প্রয়োগগত দিকগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফারাক আছে। ফারাক আছে উভয়ের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যেও। পিতৃ পক্ষটি কৃষ্ণপক্ষবিহিত। তাই একে অশ্বযুক্ কৃষ্ণ বলা হয়। দেবীপক্ষটি শুক্লপক্ষীয় হওয়ায় সংকল্পবাক্যে শুক্লপক্ষ কথাটি উল্লেখ হয়। বাবা বেঁচে থাকলে পিতৃপক্ষের যে (কৃত্য) পিতৃপূজন অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ করা যাবে না। দেবীপুজোর ক্ষেত্রে সে বাধ্যবাধকতা নেই। রীতি অনুসারে পিতৃপূজন বা শ্রাদ্ধ-তর্পণের ক্ষেত্রে দক্ষিণদিকটি বেছে নেওয়া হয়েছে। দেবী পুজোর জন্য শাস্ত্র উত্তর অথবা পূর্বদিকটি নির্দিষ্ট করেছে। এরকম অনেক অমিল থাকলেও মিলও রয়েছে বহুক্ষেত্রে। যেমন পিতৃ ও দেবীপূজনই তিথি মেনে হয়। তাই এদের তিথিকৃত্য বলা হয়। দেবীদুর্গার শারদকৃত্যের ক্ষেত্রে সাতটি কল্পের কথা বলা হয়েছে দুর্গোৎসব তত্ত্বে। সামর্থ্য ও অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনও একটি কল্প অবলম্বনে এই কাজ করা যায়। পিতৃপূজনের ক্ষেত্রে এই পক্ষেও ছয়টি কল্পের একটি ধরে করা যায়।

শাস্ত্রে বলছে, 'অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষে তু শ্রাদ্ধং কুর্য্যাদ্ দিনে দিনে অশ্বযুক্ কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ পিতৃপক্ষে প্রতিদিন পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। অসমর্থ হলে 'ত্রিভাগহীনং' অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। তা না হলে 'সার্দ্ধংবা' অর্থাৎ অষ্টমী থেকে 'মহালয়া' পর্যন্ত। নইলে 'ত্রিভাগং' অর্থাৎ একাদশী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। না পারলে 'সার্দ্ধসেবা' অর্থাৎ ত্রয়োদশী থেকে মহালয়া পর্যন্ত। তাও না পরলে মহালয়ার দিন মহালয়া নিমিত্তক শ্রাদ্ধ, আর প্রত্যেকক্ষেত্রেই অবশ্যই তর্পণ। 'দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্।' পিতৃপিতামহাদি এবং ত্রিভুবনের সকল প্রাণী আমার দেওয়া জলে তৃপ্ত হোন। এই আবেদন পৌঁছে দেওয়া হয় বিশ্ববাসীর কাছে। পক্ষকাল ধরে কোটি কোটি কণ্ঠে। প্রার্থনা সমবেত হলে তা ব্যর্থ হয় না। বিশ্বকল্যাণ কামনায় দেবী দুর্গার কাছে আমরা সমবেতই হই দেবীপক্ষে। পথ ভিন্ন হলেও লক্ষ্য একটাই এই পক্ষযুগলের।

লক্ষ্য এক রেখে পথ দুটির সংমিশ্রণ করেছিলেন ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র। যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস বলা যায়। কোটি লক্ষ বানরসেনা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে লঙ্কায় উপস্থিত হলেন।

'কোটি লক্ষৈর্মহাবাহুর্লক্ষ্মণেন সমন্বিতঃ।' লঙ্কার জল, স্থল, বৃক্ষ, প্রাকার বানররা ঘিরে থাকল। শ্রীরামচন্দ্র সুদৃঢ়া লঙ্কাপুরী দেখে ভাবতে লাগলেন, দুর্গাদেবীর আরাধনা ছাড়া শত্রুকে জয় করতে পারব না— 'ন বিনারাধনং দেব্যাঃ শত্রু জেতংক্ষমো ভবেৎ।' তাঁর কৃপা ছাড়া ত্রিলোকবিজয়ী বীরও তৃণবৎ শক্তিহীন। কিন্তু এই দক্ষিণায়নে দেবী নিদ্রিতা। অকালে দেবীকে কী প্রকারে পুজো করি? এরূপ চিন্তা করে শ্রীরামচন্দ্র পিতৃরূপিণী দেবীকে অর্চনা করতে সঙ্কল্প করলেন, আজ অপর (পিতৃ-পক্ষের) প্রতিপদ তিথি। আজ থেকে অমাবস্যা (মহালয়া) পর্যন্ত 'পার্বং নৈব বিধিনা' পার্বণ বিধিক্রমে পিতৃরূপিণী জয়দায়িনী দেবীর অর্চনা করব। 'প্রবৃত্তোহপরপক্ষশ্চ প্রতিপত্তিথিরদ্য তু।' এটা স্থির করে লক্ষ্মণকে বললেন, 'আজ পার্বণশ্রাদ্ধ করব।' লক্ষ্মণ! 'করিষ্যেপার্বণ শ্রদ্ধামপরাহ্নেহত্য ভক্তিতঃ।' একথা সকলেই মেনে নিলেন। শ্রীরামচন্দ্র দেবীকে চিন্তা করে পার্বণ শ্রাদ্ধ করলেন।

এই পিতৃপক্ষেই অবশ্য আরম্ভ হয় দেবীর মহাপুজোর প্রথম কল্প অর্থাৎ কৃষ্ণনবম্যাদি কল্প। ভাদ্রী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের নবমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত যে পুজো তাই প্রথম কল্প কৃষ্ণনবম্যাদিকল্প। 'আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্ দেবীম্।' অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে দেবীর বোধন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই মহাপুজোতে সাতটি কল্প— (১) কৃষ্ণনবম্যাদি (২) প্রতিপদাদি, শুক্ল প্রতিপদ থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৩) ষষ্ঠ্যাদি, শুক্লা ষষ্ঠী থেকে মহনবমী পর্যন্ত (৪) সপ্তম্যাদি। সপ্তমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৫) মহাষ্টম্যাদি। মহাষ্টমী থেকে মহানবমী পর্যন্ত (৬) কেবল মহাষ্টমী (৭) কেবল মহানবমী।

শারদীয়া দুর্গা পূজা বাঙালির প্রধান উৎসব। মা দুর্গার আগমন বার্তায় বঙ্গজীবন যেভাবে আহ্লাদিত হয় তার বাস্তব রূপ আমরা দেখেছি। আমরা এও দেখেছি মা'র আগমনে বঙ্গসমাজ কীভাবে তাদের দৈনন্দিন সমস্যার কথা ভুলে ভুমানন্দে মেতে ওঠে। এই আনন্দের ঢেউ জাতীয় স্তর ছুঁয়ে আছড়ে পড়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের বঙ্গজদের মনের বেলাভূমিতে।

শারদোৎসব যে শারদীয়া দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়, তা বুঝি বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে দুর্গাপুজো মুখ্য। দুর্গোৎসব তারই অঙ্গমাত্র। পুজো ও উৎসব দুটিরই প্রয়োজন দুর্গোৎসবে বা দুর্গামহোৎসবে। কিন্তু কখনোই অঙ্গ প্রধানকে গৌণ করতে পারে না। অথচ বাস্তব উৎসবের বাহ্যিক আড়ম্বর আজ গ্রাস করেছে পুজোর মূল অনুষ্ঠানকে। মুখ্য সচেতকের ভূমিকা পালন করছে সর্বভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা আকাডেমি এই সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১৯৯১ সাল থেকে দুর্গাপুজো বিষয়ক শিবিরের আয়োজন প্রতিবছর নিয়মিত করে আসছে উক্ত সংস্থা। জাতি, বর্ণ, ভাষা, ধর্ম, ভৌগোলিক দূরত্ব ব্যতিরেকে সকল পেশায় নিযুক্ত মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদমাধ্যম যার সাক্ষ্য বহন করছে।

দেবীপুজোর প্রথমদিন থেকে শেষদিন পর্যন্ত রয়েছে যথেষ্ট

আকর্ষণ। এই পুজোর বিধিব্যবস্থা অর্থাৎ সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে নিবন্ধকারগণ। এই বিধিব্যবস্থা সংবলিত সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে বলার অধিকার বেদের। শাস্ত্র বলছে 'তত্র বেদ প্রমাণম্।' বেদ যেখানে স্মৃতিশাস্ত্র অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্র সেখানে বলার সুযোগ পাবে। এইভাবে তন্ত্র, কুলাচার, দেশাচারকে যথাক্রমে (বলার ক্ষেত্রে) প্রাধান্য দেওয়া হয়।

দুর্গাপুজো পৌরাণিক পুজো। এই পুজো বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, কালিকা দেবীপুরাণ মতে হয়। স্বাভাবিকভাবে পুজোর বিধিনিষেধের সংবিধান রচনায় বেদের একচেটিয়া প্রাধান্য এখানে কিছুটা খর্ব হয়েছে। তুলনায় প্রামাণ্যতা স্বীকার করা হয়েছে পুরাণকারের অভিমতকে। অখণ্ড বঙ্গদেশের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি ভট্টাচার্য রঘুনন্দন প্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অন্তর্গত। এই পুজোর ক্ষেত্রেও নন্দনের দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও দুর্গাপূজাতত্ত্বের প্রামাণ্যতা স্বীকার করা হয়েছে। নন্দন কোনও একখানি পুরাণ অবলম্বন করে তার প্রয়োগ রচনা করেন নানা পুরাণ ও নিবন্ধ থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে রচনা করে গিয়েছেন। আলোচনায় প্রামাণ্য সমস্ত গ্রন্থই আজ দুর্লভ। বলাবাহুল্য, সেইসব পুরনো দিনের হারানো বচনগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক দিকগুলির কথা ভেবেই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ গ্রহণের উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

আদ্যা প্রকৃতির নামই দুর্গা। শক্তি নিরাকার। কর্ম দ্বারা শক্তি অভিব্যক্ত হয়। আমাদের জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কর্ম। অতএব দুর্গা বিশ্বরূপা। জড় ও শক্তি একই পদার্থ। এটা আধুনিক ভূত বিদ্যাবেত্তাগণ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেছেন। কল্পনার দ্বারা অগ্নি ও এর দাহিকা শক্তি পৃথক ভাবতে পারি। কিন্তু পৃথক করতে পারি না।

আধ্যাত্মিক অর্থে দুর্গা বিশ্বরূপা মহাশক্তি। আধিভৌতিক অর্থে পঞ্চভূতের মধ্যে দুর্গা অগ্নিরূপা। আধিদৈবিক অর্থে দুর্গা রুদ্রদেবের শক্তি। রুদ্র যজ্ঞিয়াগ্নি। যে অগ্নি নানারূপে খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ হতে পূজিত হয়ে আসছে।

মহেশের রূপ কল্পনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তিনি বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিলভয়হর প্রসন্ন। দুর্গাও বিশ্বের আদি, বিশ্ব প্রকৃতি ও নিখিল ভয়হারিণী, ভক্তের প্রতি প্রসন্না।

বস্তুত আমরা ভাবের পুজো করি। মূর্তির পুজো করি না। দুর্গার মূর্তি থাকতে পারে না। তিনি বিশ্বাত্মা, শক্তিরূপিণী, চিন্ময়ী। অথবা বিশ্বই তাঁর অবয়ব। তিনি সকল অবয়বে বর্তমান। সে অবয়ব তাঁর প্রতীক। আমরা দুর্গামূর্তি বলি না। বলি দুর্গার প্রতিমা। গুণ ও কর্মের প্রতিমা। 'তস্য পুরুষস্য প্রতিমা শমুপমানম্ কিঞ্চিদ্বস্তু নাস্তি।' অর্থাৎ পুরুষের প্রতিমা নেই। প্রকৃতির আছে। প্রতিমা জড়ময়ী না হয়ে বাঙ্ময়ী হতে পারে। কিন্তু কে বা তাঁর গুণ ও কর্মের ইয়ত্তা করতে পারে? প্রতিমা ভাবস্ফুরণের আশ্রয় মাত্র। মহিষাসুরমর্দিনী প্রতিমা দেখলে ভক্তের মনে হয়, তিনি বিপন্ন দেবগণকে নির্ভয় করেছিলেন। প্রসন্না হলে তিনি ভক্তকেও স্বস্তি ও অভয় দিয়ে রক্ষা করেন। তাঁর প্রত্যেকটি রূপ রূপক বা ভাবরূপাত্মক প্রতীক। আমাদের মানসিক শক্তি অতি সীমিত। তাই 'সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।' সেই ভগবতী সংসার অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কর্ত্রী ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুতরাং প্রথমেই তাঁর স্মরণ।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্যোদয়ে যথা।।

যে প্রভাতে প্রত্যহ দুর্গা এই অক্ষরদ্বয় বিশিষ্ট দুর্গানাম স্মরণ করে, সুর্যোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার ন্যায় তার বিপদসকল নষ্ট হয়। শাস্ত্রে দুর্গানাম স্মরণের কথা বলা হয়েছে। তাঁর রূপ তো দেখবার বা ভাববার শক্তি নাই। নাম করতে করতে এই একান্ত ভক্তি উদয় হলে তিনিই তাঁর রূপ দেখান।

কলিযুগে অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি যজ্ঞ করতে নিষেধ করেছেন শাস্ত্রকাররা। এখন প্রশ্ন হলো, কোনও ধনাঢ্য বা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির উক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে সাধ হলো। তাহলে সেই ব্যক্তির এই ইচ্ছে কি কোনওভাবেই সাকার হবে না? দেবীপুরাণ এবিষয়ে উদার মনোভাব দেখালেন। উক্ত পুরাণকার আবিষ্কার করলেন দুর্গোৎসব যথাযথভাবে ভক্তিসহকারে পালন করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ করা যায়। দেবীপুরাণের পুজো প্রকরণে এপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম।
মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্বকাম প্রদায়িকা।।

সব বর্ণের ও সকল জাতের মানুষ এমনকী দস্যুকেও দুর্গাপুজো করার সম্মতি দিল ভবিষ্যোত্তরীয় পুরাণ। উক্ত পুরাণে বলা হল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমনকী দস্যু বা ম্লেচ্ছজাতির কোনও ব্যক্তিও দুর্গাপুজো করতে পারবেন।

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণঃ পূজ্যতে সর্ব্বদাস্যুভিঃ।।

দেবীপুরাণ বলছে— নিজে পুজো করবে। অসমর্থ হলে অন্যের দ্বারা পুজো করাবে। 'স্বয়ং বাপান্যতোবাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।' দুর্গাপুজো মহাপুজো। এক্ষেত্রে সাধ বা সাধ্যের একটা ব্যাপার থেকে যায়। অর্থ এবং সামর্থ্য দুটিই প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধান করেছে ভবিষ্যপুরাণ। শুধু তাই নয়, পুণ্যার্জনের স্তর বিভাগ করা হয়েছে উক্ত পুজোয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এখানে বলা হয়েছে, দুর্গাদেবী (প্রতিমা)র দর্শনমাত্রই পুণ্যজনক। দর্শন থেকে অভিবন্দন অর্থাৎ বন্দনা নমস্কার শ্রেষ্ঠ। বন্দনা থেকে স্পর্শ আর স্পর্শ অপেক্ষা পুজো করা শ্রেষ্ঠ।

দুর্গায়াধর্শনংপুণ্যং দর্শনাদভিবন্দনম্।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং স্পর্শনাদভিপূজনম্।।

দুর্গাপুজোতে উপাচারের ক্ষেত্রে প্রথমে বলা হয়েছে, চতুঃষষ্ঠি (চৌষট্টি) উপাচার। এরপর ষোড়শোপচার (ষোলো)। তারপর

দশোপচার (দশ)। অসমর্থ হলে পঞ্চোপচার (পাঁচ)। তাও না পারলে গন্ধপুষ্প দিয়ে পুজো করতে হবে। এটুকুও যোগাড় করতে না পারলে 'কেবলং জলেন বা' অর্থাৎ শুধুমাত্র জল। তবে এই জল যেন ভক্তি মেশানো থাকে অবশ্যই। তাই বলা হল 'অথবা ভক্তিতোয়াভ্যাম্'। এককথায় যথাশক্তি উপাচার দিয়ে মায়ের পুজো করবে। কিন্তু পুজো কোনওভাবেই বন্ধ করা যাবে না। কেননা, দুর্গাপুজোর নিত্যত্ব ও কাম্যত্বরূপ উভয়ত্বগুণ থাকায় এই পুজো না করলে পাপ হয়। আর করলে পুণ্য হয়। এবিষয়ে দেবীপুরাণ বলছে, প্রত্যেক বছর দ্ব্যত্বব ও চরলগ্নে আর রবিলগ্ন গত হলে দুর্গার পত্রী (কলাবৌ) প্রবেশ ও বিসর্জন করবে।

দ্বিশরীরে চরে চৈবলগ্নে কেন্দ্রগতে রবৌ।
বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জনম্।।

এখানে 'বর্ষে বর্ষে' 'প্রতিবর্ষম্' এরূপ বীপ্সার্থে দ্বিবচন দুর্গাপুজোর নিত্যত্বসাধক দেবীপুরাণের এই শ্লোকের শেষে বলা হয়েছে এভাবে মনুষ্যগণও ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভ ও অতুল ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য দেবীর পুজো করবে।

এবমন্যৈরপি সদা দেব্যাঃ কার্যং প্রপূজনম্।
বিভূতিমতুলাংলব্ধং চতুর্বর্গপ্রদায়িকাম্।।

শারদীয়া দুর্গাপুজো যে একটি ব্রত। তা দেবীপুরাণের এই বচনে ধরা পড়েছে, হে সুর রাজেন্দ্র, দেবীভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদের পক্ষে, শঙ্করাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত এই মহাপুণ্য মহাব্রত অবশ্য কর্তব্য।

মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতং।
কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ।।

এবিষয়ে ভবিষ্যপুরাণে বলা হয়েছে, ব্রত গ্রহণ পূর্বক সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী— এই তিনদিন দেবীর পুজো করবে। 'ব্রতী প্রপূজয়েদেবীং সপ্তস্যাদিদিনত্রয়ে।' ভবিষ্যপুরাণে এই বচনেও দুর্গাপুজোর ব্রতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শারদীয়া দুর্গাপুজোর প্রকার তিনটি— সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী। রঘুনন্দন তাঁর দুর্গোৎসব তত্ত্বে স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণ থেকে এই তিন প্রকার পুজো সম্বন্ধে উদ্ধৃ করেছেন—

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিরিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চৈতি তাং শৃণু।
সাত্ত্বিকা জপ যজ্ঞাদৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতম্।।

সাত্ত্বিকী হলো, জপ-যজ্ঞ-নিরামিষ নৈবেদ্য দেবী মাহাত্ম্য (চণ্ডী) পাঠ ইত্যাদি। রাজসী হলো, সামিষ নৈবেদ্য — মাছ, মাংস যুক্ত ভোগ প্রভৃতি উপহার জপ যজ্ঞ ছাড়া। তামসী হলো, মন্ত্র ছাড়া মদ্য-মাংস সহযোগে কিরাত (ব্যাধ) সম্মতভাবে পুজো।

শারদীয়া দুর্গাপুজোকে মহাপুজো বা দুর্গামহোৎসব বলা হয়। গ্রাম্যজনেরা বলে থাকেন দুগ্গা মোচ্ছব। আর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিকে মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী বলা হয়। শুধু তাই নয়, দুর্গাপুজোর সঙ্কল্পবাক্যে বলা হয় 'শারদীয়া দুর্গামহোৎসবে' অথবা 'শারদীয়া দুর্গামহাপূজায়াং' উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এই 'মহা' শব্দের প্রয়োগ? এই প্রশ্ন অনেকের। এটা কি পুজোর ব্যাপ্তিরাজি দিয়ে নাকি পুজোর বাজেটের দিক দিয়ে নাকি জনসমাগম অথবা আড়ম্বরের আধিক্যের জন্য এই মহা শব্দের প্রয়োগ?

তাই যদি হয় তাহলে তো কোনও বিশেষ অঞ্চলের কালী কিংবা একটি বিশেষ অঞ্চলের জগদ্ধাত্রী পুজো কোনও কোনও ক্ষেত্রের শারদোৎসবের ব্যাপ্তি জনসমাগম অথবা আড়ম্বরকে হার মানিয়ে দেয়। তাহলে তো কালীপুজো কিংবা সেই জগদ্ধাত্রী পুজোর ক্ষেত্রে মহোৎসব, মহাপুজো উক্ত পুজোগুলির তিথির আগে 'মহা' শব্দ বসানো যেতে পারে। কিন্তু তা হয় না। কারণটা কী?

এ বিষয়গুলির সুষ্ঠু সমাধান করেছে লিঙ্গপুরাণ আর দেবীপুরাণ। লিঙ্গপুরাণ বলছে, শরৎকালের মহাপুজোতে চারটি কর্ম আছে এবং ওই মহাপুজো মঙ্গলকারিণী। ভক্তিপূর্বক সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে সেই মহাপুজো করা উচিত। আর এই চারটি কর্ম হল, মহাস্নান, পূজন, বলিদান, হোমযজ্ঞ। একই সঙ্গে চারটি কাজ শারদীয়া দুর্গাপুজোয় হয়ে থাকে। কালীপুজো বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় বড়জোর একসঙ্গে তিনটি কাজ হয়। তাই উক্ত পুজোগুলির বেলায় 'মহা' শব্দ বসানো যাবে না।

শারদীয়া মহাপুজো চতুঃকর্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।।
তচ্চ স্নপন পূজন বলিদান হোমরূপা।

চতুঃকর্মময়ী অর্থাৎ স্নপন (অর্থাৎ মহাস্নান)-পূজন-বলিদান -হোম। এছাড়াও মার্কণ্ডেয় পুরাণে (চণ্ডীতে) বলা হয়েছে, 'শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।' দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, বর্ষাকালে আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষের অষ্টমী ও নবমী তিথিতে মহাশব্দ লোকের মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। এককথায় দুর্গাদেবীর (শারদীয়া) পুজোতে অষ্টমী ও নবমী যথাক্রমে মহাষ্টমী ও মহানবমী বলে খ্যাতি লাভ করবে। আর যেহেতু উক্ত পুজোর সপ্তমী তিথির পুজোয় মহাস্নান, পূজন, বলিদান, হোম এই চারটি কাজ একসঙ্গে হয়ে থাকে তাই সপ্তমীর বেলায়ও মহাসপ্তমী বলা হবে।

প্রাবৃটকালে বিশেষণে আশ্বিনে হ্যষ্টমীবুচ।
মহাশব্দো নবম্যান্তু লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।।

দেবীর 'শারদা' নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কালিকাপুরাণ বলছে, 'যেহেতু পুরাকালে শরৎকালীন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে দেবগণ দেবীর বোধন করেছিলেন, তাই তিনি পীঠস্থানে এবং ত্রিলোকে (স্বর্গ, মর্ত, পাতালে) 'শারদ' নামে বিখ্যাত হয়েছেন।'

শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতে সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ।। ■

ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার

ডা. অমূল্যরতন ঘোষ

প্রায় ত্রিশ বছর আগে (প্রবন্ধটির প্রকাশকাল মার্চ, ১৯৪১ খ্রি.— অনুবাদক) ডা. হেডগেওয়ারের ঘনিষ্ঠতা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বাংলায় স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তখন জোরকদমে চলছে। তৎকালীন দেশনেতারা 'দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' নামে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল যে সমস্ত ছাত্র জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের কারণে সরকার বা সরকার পোষিত বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন, অথবা যাঁরা সরকারি প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করতে ইচ্ছুক তাঁদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা। যে ছাত্ররা এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ নিয়েছিলেন তাঁদের জন্য সরকারি চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের দ্বার অবারিত ছিল না। এঁদের চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য প্রয়াত ডা. সুবোধ কুমার মল্লিক, এম ডি, এম এস (এডিনবরা); প্রয়াত মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ দেশনেতারা একটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি অভিহিত হয়েছিল 'দ্য ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ অব ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য কলেজ অব্ ফিজিশিয়নস অ্যান্ড সার্জেনস' নামে। আমি ১৯১০ সালে হেডগেওয়ার, অ্যানে সাভারকার ও অন্যান্য মারাঠি ছাত্রদের সঙ্গে এই মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের একটি সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল। ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রান্ত, এমনকী ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ছাত্ররাও এখানে পড়তে এসে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় নিজেদের দীক্ষিত করতেন। সেইসময় এই মহাবিদ্যালয়টিকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সাক্ষ্য দেবেন যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সার্থক-নামা এবং তার 'ন্যাশনাল' অভিধার সঙ্গে সুসংগত।

কলেজ জীবনে মারাঠি ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য আমি উপভোগ করেছিলাম। কলকাতায় তাঁদের আস্তানা ছিল কলেজের কাছে কানাই ধর লেনের একটি দোতলা বাড়ি। প্রায়শই আমি সেখানে যেতাম এবং তাদের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক বিতর্ক, এমনকী শারীরিক কসরতেও অংশ নিতাম। আবার তাঁরাও আমার বাসায় আসতেন। আমি সেদিনের একটি ঘটনা আজও স্পষ্টভাবে মনে করতে পারি। একদিন শ্রেণীকক্ষে অধ্যাপকের অনুপস্থিতির সুযোগে আমি হেডগেওয়ারকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান জানালাম যে তিনি তাঁর শরীরের সমস্ত বল দিয়ে আমার বাহুতে ঘুঁষি মারুন, আমি অচল থাকবো। তিনি আমার এই চ্যালেঞ্জ আমাকেই ফিরিয়ে দিলেন এবং হাতের পেশি শক্ত করলেন। আমি আমার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে তাঁর পেশিবহুল বাহুতে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগলাম। গোটা শ্রেণীকক্ষ এই প্রতিযোগিতার ফলাফলের দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে রইল। হেডগেওয়ারকে এক ইঞ্চিও নড়ানো গেল না। আমি ঘুঁষি মেরে তাঁকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলাম। হেডগেওয়ারের সহন-ক্ষমতা ও নিরুত্তাপ পরাক্রম আমাকে মুগ্ধ করল। আমার মারাঠি বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে হেডগেওয়ারই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন। একবার একটি বিবাদে বহু অবাঙালি ছাত্র কলেজ ছেড়ে চলে যান। কিন্তু হেডগেওয়ার ও অন্যান্য মারাঠা বন্ধুরা কলেজ ত্যাগ করেননি শুধুমাত্র আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে। রাজনৈতিক বৈঠক ও সমাবেশ কলকাতায় সেইসময় প্রায়শই হতো এবং মারাঠা ছাত্ররা নিয়মিত এই ধরনের অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন। এঁদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবি লিয়াকত হোসেন এবং তৎকালীন অন্যান্য নেতাদের প্রতি। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন তাঁরা। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই 'বন্দে মাতরম্' ভালো গাইতে পারতেন এবং অন্যান্যদের রচিত স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সংগীত শুনতেও পছন্দ করতেন। মহাবিদ্যালয়-জীবনের চারটি বছর কাটিয়ে, চিকিৎসা-বিদ্যার পাঠক্রম শেষ করে তাঁরা নিজ নিজ প্রদেশে ফিরে যান।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯২৬ সালে ডা. হেডগেওয়ার একবার কলকাতায় এসেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন এক যুবক, যদি খুব ভুল না করি তবে তাঁকে ডা. মুঞ্জের পুত্র বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এর আগের বছর কলকাতায় আয়োজিত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সম্মান সম্মেলনে যোগদানরত ডা. অ্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি আমায় ডা. হেডগেওয়ার ও অন্যান্য মারাঠা বন্ধু দের হাল-হকিকত জানিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমি জেনেছিলাম যে ডা. হেডগেওয়ার তখনও অবিবাহিত, ডাক্তারি অনুশীলনও করেন না; একজন প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও কর্মযোগীর মতো নিজের জীবনকে সমর্পণ করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে তোলার কাজে এবং তাঁর এই মহান আত্মত্যাগ তাঁকে একজন সর্বভারতীয় দেশনেতার সম্মান এনে দিয়েছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বরে ডা. হেডগেওয়ার, ডা. অ্যানে, ডা. সাভারকর প্রমুখ বীর সাভারকরের সঙ্গে কলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় অধিবেশনে যোগদান করতে আসেন। এবং মহাসভার অধিবেশন স্থলে তাঁরা আমায় দেখা করতে বলেন দূরভাষ মারফত। সেইমতো অধিবেশন প্রাঙ্গণে গিয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করি। তখনও জানতাম না যে ডা. হেডগেওয়ারের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা। আমি ডা. হেডগেওয়ারকে আমার বাড়ি আসার জন্য আমন্ত্রণ করি, তিনিও কথা দেন যে দু'মাস পরে তিনি আমার গৃহে আসবেন। বাংলায় আর এস এসের সংগঠন গড়ে তোলার জন্য তাঁর কলকাতায় আসার পরিকল্পনা ছিল। কলকাতায় হিন্দু মহাসভার সর্বভারতীয় অধিবেশন সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি অসুস্থ বোধ করেন এবং স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য রাজগির চলে যান। শরীর পুরোপুরি সেরে উঠবার আগেই কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে পুণে যেতে হয়। তিনি মনে করেছিলেন যে পুনায় আর এস এসের কেন্দ্রীয় শিবিরে তাঁর উপস্থিত থাকাটা অনেক বেশি জরুরি। এখানে তিনি প্রায় মাসাধিক কাল শারীরিক দুরবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করার পরে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় এবং শেষে অসুস্থতায় শয্যা নেন। পার্থিব দেহে এই মহাত্মাকে দেখে ধন্য হওয়ার সৌভাগ্য আর আমার হয়নি। একটি সদাহাস্যময় মুখাবয়ব, দেশপ্রেমপূর্ণ আত্মা ও বীর-হৃদয় এই জগত থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল। এই প্রয়াণ জাতীয় বিপর্যয়, সমগ্র হিন্দু সমাজের দুর্ভাগ্য।

১৮৮৯ সালে ডা. হেডগেওয়ার নাগপুরে রাজা'র (ভোঁসলে'র) 'কোঠি'র নিকটবর্তী একটি গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রয়াণও হয় এই বাড়িটিতে। তিনি জন্মেছিলেন একটি সু-সংস্কৃতিবান ব্রাহ্মণ পরিবারে, বেদের ভাষ্যের সঙ্গে যাঁরা সুপরিচিত ছিলেন। মাত্র ছ'বছর বয়সে একইদিনে তিনি তাঁর বাবা-মাকে হারিয়েছিলেন। তাঁরা প্লেগের শিকার হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অগ্রজ মাধেও হেডগেওয়ারের কাছে মানুষ হন। মাধেও হেডগেওয়ারও তাঁর বাবা-মায়ের মতো একই ব্যাধিতে প্রয়াত হন। তাঁরা ছিলেন তিন ভাই। এঁদের মধ্যে একজন এখনও রয়েছেন ও তিনি বৈদিক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

হেডগেওয়ার নাগপুরের নীলসিটি হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন ১৯০৭ সাল পর্যন্ত। ওই সময় বিদ্যালয়গুলিতে 'রিস্‌লে সার্কুলার' অনুযায়ী জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তিনি এই বিষয়টি সহ্য করতে পারেননি এবং এজন্য বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তিনি কলকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে আসার মনস্থ করেন। এই সময় তিনি লোকনায়ক এম এস অ্যানের অভিভাবকত্বে যবতমালে ওয়াই এস অ্যানের সঙ্গে থাকতেন। পরে তিনি কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি প্রবল দেশপ্রেমিক, দৃঢ়মনস্ক, সাহসী ও কর্মঠ। প্রাত্যহিক জীবনে তিনি অপরের প্রতি দয়াবান ও সহানুভূতিসম্পন্ন। ১৯১১ সালে একদিন যবতমালে তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে সিভিল লাইনের নিকটবর্তী লোকালয়ে ঘুরতে বেরিয়েছেন। একজন ইউরোপীয় ডেপুটি কমিশনারের একটি বদভ্যাস ছিল যে, তিনি প্রত্যেক ভারতীয় যাঁরা তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, তাদের থেকে তিনি নতমস্তক নমস্কার (সালাম) আদায় করতেন। সেইসময় ওই ডেপুটি কমিশনার, একজন ইউরোপীয় অসামরিক শল্যবিদ ও পুলিশের এক সার্কেল ইন্সপেক্টর ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হেডগেওয়ারকে তাঁর বন্ধুরা সতর্ক করলেন যে ওই 'সালামাতঙ্কে' (সালামফোবিয়া) ভোগা সাহেবটি আসছে এবং পথ বদলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। ডা. হেডগেওয়ার তাঁর বন্ধুদের এহেন পরামর্শে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলেন না এবং রাস্তার মাঝ বরাবর অলস চরণে পদচারণা করতে লাগলেন। রাস্তার মাঝপথেই ডেপুটি কমিশনার তাঁকে থামালেন, জেরা চলল কোথায় থাকা হয়, নাম কী ইত্যাদি। এবং শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তিনি কি জানেন না যে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কোনও ইউরোপীয়ের সঙ্গে দেখা হলে আনতমস্তকে নমস্কার করে সসম্ভ্রমে রাস্তা ছেড়ে দিতে হয়? হেডগেওয়ার জবাব দিলেন, তিনি রাজ্যের রাজধানী শহরের (নাগপুর— অনুবাদক) বাসিন্দা যেখানে এই ধরনের প্রণামের বিষয়টি তাঁর অজানা। আরও বললেন যে, প্রতিটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকের উচিত এই প্রথাকে ঘৃণা করা। এবং তাঁর কৃষ্টি ও শিক্ষা তাঁকে সবাইকে সমদৃষ্টিতে দেখতে শিখিয়েছে, কাউকে নীচু করতে নয়। হেডগেওয়ারের এই সাহসী বক্তব্য ও দৃঢ় সংকল্প ডেপুটি কমিশনারকে হতভম্ব করে দেয়। যদিও সেই অসামরিক শল্যবিদ ও পুলিশের ইন্সপেক্টর এই ঘটনার পরিণতি ভালো হবে না বলে তাঁকে ভয় দেখান ও ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার উপদেশ দেন। কিন্তু এঁদের সতর্কবাণীতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে হেডগেওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করে চলে যান। তিনি লোকমান্য তিলকের যথার্থ শিষ্য ছিলেন। হেডগেওয়ার তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিলকের প্রতিটি পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি 'শক্তি'র প্রকৃত উপাসক ছিলেন এবং এই 'শক্তি'র আরাধানায় তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। যা ক্রমশ সর্বপ্রধান হিন্দু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত হয়েছে, যাঁরা সেনা-প্রশিক্ষণ ও নিয়মানুবর্তীতা শিক্ষা দেন।

ডা. হেডগেওয়ার প্রেরণা লাভ করেছিলেন এই বাংলা থেকেই, বঙ্গভঙ্গের সেই উত্তাল দিনগুলিতে। ১৯২০ সালে লোকমান্য তিলকের প্রয়াণ এবং ওইবছরই নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের পর

আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ার কারণে ১৯২১ সালে ডা. হেডগেওয়ারকে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল হিন্দু জাতির ঐক্য ও হিন্দু রাষ্ট্র। এর জন্য তিনি স্বয়ং অক্লেশ পরিশ্রম করেন। পনেরো বছরের এই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সঙ্ঘের সাফল্য অসামান্য— বর্তমানে সারা ভারতে তাদের শাখা রয়েছে ৭৫০টি এবং স্বয়ংসেবকের সংখ্যা এক লক্ষ পঁচিশ হাজার।

১৯০৯ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যখন তিনি কলকাতায় কানাই ধর লেনে 'শান্তিনিকেতন লজ'-এ বাস করতেন, তখন প্রয়াত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রয়াত বিপিনচন্দ্র পালের মতো অন্যান্য প্রখ্যাত বিপ্লবী-ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সমসময়ে বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ মুসলমান দেশপ্রেমিক প্রয়াত মৌলবি লিয়াকত হোসেনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল তাঁর। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গেও তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। দামোদরের ভয়ঙ্কর বন্যার ত্রাণকার্যে ও গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রার সময় তিনি মিশনের স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছেন। তিনি বাংলার যুবকদের সাহচর্য পেয়েছিলেন এবং এই যুবকদের আদর্শবাদে তিনি উদ্বুদ্ধও হয়েছিলেন।

মাত্র একান্ন বছর বয়সে উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে নাগপুরে প্রয়াত হন ডা. হেডগেওয়ার। প্রয়াত হওয়ার ঠিক আগের দিন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। দাবানলের মতো তাঁর প্রয়াণ সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রবল বর্ষণ ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অবস্থা সত্ত্বেও জনগণের এক বিশাল শোভাযাত্রা তাঁর মরদেহ নিয়ে বিকেল পাঁচটায় শেষকৃত্যের জন্য রওনা দেয়। রেশিমবাগ প্রাঙ্গণে বিশেষ অনুমতি নিয়ে তাঁর অন্তিমকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর পার্থিব দেহ অগ্নিতে সমর্পিত হলো, দেশবাসীর জন্য তিনি রেখে গেলেন অনুকরণীয় কিছু গৌরবোজ্জ্বল উদাহরণ। যেমন— তাঁর অমূল্য সংগঠন, হিন্দুত্বের প্রতি তাঁর উপহার— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

হেডগেওয়ারের প্রয়াণে নাগপুরের 'মারাঠা' পত্রিকা 'শোকস্তব্ধ মহারাষ্ট্র' শিরোনামে লিখেছিল—

''আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কে বি হেডগেওয়ার গত শুক্রবার ২১ তারিখ নাগপুরে প্রয়াত হয়েছেন। এই দুঃসংবাদটি দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক এর আগের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কিন্তু শারীরিক অবস্থা গুরুতর থাকায় তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। ডা. হেডগেওয়ারের অন্তিমযাত্রা, নাগপুর এতদিন যা প্রত্যক্ষ করেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী। প্রবল বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর মরদেহ নিয়ে বিপুল মানুষের যাত্রা শুরু হয় বিকেল পাঁচটা নাগাদ এবং নাগপুরের সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিক এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ... বিশেষ অনুমতি নিয়ে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় রেশিমবাগ প্রাঙ্গণে। ব্যারিস্টার সাভারকর, ডা. মুঞ্জে, বিধানসভার সদস্য লোকনায়ক অ্যানে, ডা. বরদরাজলু নাইডু, সঞ্জীব কামাথ, শ্রী এ এস ভিদে, ডা. অ্যানে ও অন্যান্য বিশিষ্ট মানুষেরা ডা. হেডগেওয়ারের আত্মীয়দের কাছে শোকবার্তা পাঠান। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে জন-শোকসভা আয়োজিত হয়েছে।'

সমগ্র হিন্দু জাতির ভাগ্যে আজ দুর্যোগ ঘনিয়ে এল তাঁর অকাল প্রয়াণে, যিনি সংগঠনের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করেছিলেন আর তারই ফলে সৃষ্টি করেছিলেন আর এস এস— ডা. হেডগেওয়ার তাঁর অসমাপ্ত কাজকে ফেলে রেখে বড় তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। শোকের প্রাথমিক আঘাত কাটিয়ে বীর সাভারকর চমৎকৃত হয়ে বলেছিলেন, 'প্রায় এক যুগ আগে হিন্দু মহাসভা হিন্দু রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল, হিন্দু নেশনও এর সমোচ্চারিত শব্দ যে আদর্শকে আর এস এস গ্রহণ করেছে। হিন্দুস্থান ও হিন্দুত্বের মধ্যে যে সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে, তাকে প্রতিষ্ঠা করতে ডা. হেডগেওয়ার হিন্দুদের জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। হিন্দু যুব প্রজন্মকে অন্তরঙ্গ বাঁধনে বেঁধে রাখতে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ডা. হেডগেওয়ার প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাদের মননে দীর্ঘজীবী হন। আর এস এস দীর্ঘজীবী হোক।'

প্রসঙ্গ কথা ঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক পত্র, জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন 'দ্য মডার্ন রিভিউ' পত্রিকার মার্চ, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সংখ্যায় (পৃ. ৩৫০-৩৫২) প্রকাশিত হয় এই রচনাটি। রচনার শিরোনাম : 'Dr. K. B. Hedgewar' । রচনাকার ডা. অমূল্যরতন ঘোষ। যদিও মুদ্রণ প্রমাদে অমূল্যরতন, অমূল্যরত্ন-এ পরিণত হয়েছেন। লেখকের দৌহিত্র-জায়া অপর্ণা ঘোষ 'অমূল্যরতন' নামটি সম্পর্কে আমাদের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। লেখাটির সঙ্গে প্রকাশিত হয় দণ্ড-হস্তে আর এস এসের তৎকালীন 'ইউনিফর্ম' বা 'গণবেশ' পরিহিত ডা. হেডগেওয়ারের একমাত্র ছবিটি। রচনার ভাব বজায় রেখে যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা হয়েছে।

এই রচনাটিকে সরাসরি 'শোকনিবন্ধ' (আবিচুয়ারি)-এর গোত্রে পর্যবসিত করতে বাধা রয়েছে। কারণ ডা. হেডগেওয়ারের প্রয়াণের প্রায় একবছর পর রচনাটি প্রকাশিত হয়। তবে এই লেখাটিকে 'স্মৃতিচারণ'-এর পর্যায়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা নেই। ডা. অমূল্যরতন ঘোষ ছিলেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে ডা. হেডগেওয়ারের সহপাঠী। ১৯০৯ সালের শেষে ডা. হেডগেওয়ার কলকাতায় ৩০১/৩ আপার সার্কুলার রোডস্থ ক্যালকাটা মেডিক্যাল ইন্সটিটিউটে (বর্তমানে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোডের ওপর এখানে ই এস আই হাসপাতাল হয়েছে) পড়তে আসেন। ১৯১৬ সালের গোড়ায় তিনি নাগপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর এই সওয়া ছ'বছরের কলকাতার ছাত্রজীবন সম্পর্কে জানবার প্রত্যক্ষ সূত্রের অভাব ছিল। ডা. অমূল্যরতন ঘোষের এই রচনাটি এখনও পর্যন্ত অব্যবহৃত, ডা. হেডগেওয়ারের ছাত্রজীবন সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে হলে এটি অপরিহার্য আকর সূত্রের কাজ করবে। সেই সঙ্গে ন্যূনতম হদিশ পাওয়া যেতে পারে তাঁর বিপ্লবী জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পর্কেও।

কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। নারায়ণ হরি পালকর লিখিত ডা. হেডগেওয়ারের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ 'ডা. হেডগেওয়ার : জীবন চরিত' (প্রকাশ : ১৯৬০ খ্রি., আমরা দেখছি মূল ইংরেজি বইয়ের জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বঙ্গানুবাদ, ২০০১ খ্রি., প্রকাশক - ডা. হেডগেওয়ার স্মারক সমিতি, কলকাতা)-এ তাঁর কলকাতায় ছাত্রজীবনে বাসস্থানের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ডা. মুঞ্জের পরিচয়পত্র

সঙ্গে নিয়ে হেডগেওয়ার ১৯১০ সালের মাঝামাঝি কলকাতায় আসেন এবং প্রথমে ৭০, বউবাজার স্ট্রিটে 'মহারাষ্ট্র লজ'-এ থাকবার প্রয়াস পান। কিন্তু স্থান অকুলান হওয়ায় কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে তিনি ১৮/২, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের একটি বাড়ির দোতলায় ছ'খানা ঘর ভাড়া করে 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়ে সেখানে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন (পৃ. ৪৬-৪৭)।

এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটির অসারত্বের পরিচয় অমূল্যরতন ঘোষের প্রবন্ধে নিহিত রয়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন, কানাই ধর লেনের 'শান্তিনিকেতন' মেসে ডা. হেডগেওয়ারের ছাত্রজীবন কাটে। সমকালীন কলকাতার পথ-পঞ্জিতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। পি এম বাকচির ১৯১৫ সালের কলকাতার পথপঞ্জি (দ্র. 'কলিকাতা স্ট্রীট ডাইরেক্টরী, ১৯১৫'; আমরা দেখছি সটীক পুনর্মুদ্রিত সং., পি এম বাকচি, কলকাতা, ২০১৫)-তে কানাইলাল ধর লেনের ২৩/৪ নম্বর বাড়িতে 'শান্তিনিকেতন', মেডিকেল ক্লাবের হদিশ পাওয়া যায় (পৃ. ১২১)। অন্যদিকে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের ১৮/২, নম্বর বাড়ির কোনও উল্লেখই নেই তাতে। আছে ১৮ ও ১৮/১ বাড়ির ঠিকানা। যেখানকার বাসিন্দাদের পরিচয় বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায়, মসলার দোকান ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মেস। (পৃ. ৩৫৪)

আর এই আপাত নিরীহ তথ্যের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ডা. হেডগেওয়ারের সঙ্গে বিপ্লবী যোগাযোগের কিছু অপ্রত্যক্ষ পরিচয়। তাঁর সঙ্গে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান অনুশীলন সমিতির যোগাযোগের কথা সর্বজনবিদিত। ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অনেক মারাঠি ছাত্রের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির ওতপ্রোত যোগ ছিল। যেমন মহারাষ্ট্রের সাতারা থেকে ডা. ভি ভি এথলে কলকাতায় পড়তে এসে অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য হন। তিনি তাঁর রাজ্যে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির সূচনা করেছিলেন এবং ১৯১০ সালে সাতারা ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর কঠিন সাজাও হয়। ডা. হেডগেওয়ারও ভি ভি এথলের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। (সূত্র : ইন সার্চ অব ফ্রিডম : যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ফার্মা কে এল এম, কলকাতা, ১৯৫৮ খ্রি., পৃ. ১৬)। তিনিও ডাক্তারি ছাত্রজীবনের গোড়াতেই অনুশীলন সমিতির বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছেন।

এবিষয়ে বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ)-এর সাক্ষ্যটিও সর্বজনশ্রুত : 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আর এস এস) অধিনায়ক শ্রীকেশব হেডগেওয়ার আমাদের অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি যখন ১৯১০ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পড়িতেন, তখন তিনি বীর সাভারকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকার, ডা. এথলে (সাতারা) এবং আরও কিছু মহারাষ্ট্রদেশীয় যুবক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আমাদের বিপ্লব দলে যোগ দিয়েছিলেন। 'বাংলায় বিপ্লববাদ' পুস্তকের লেখক শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ঐ সময় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পড়িতেন, তিনি তাঁহাদিগকে দলে টানিয়া আনেন। আমার পলাতক অবস্থায় আমি দু-একবার তাঁহাদের ছাত্রাবাসে ছিলাম। ১৯৪০ সালে আমি হঠাৎ তাঁহার নাগপুরের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হই এবং জিজ্ঞাসা করি, 'কালীচরণ দা'র কথা মনে আছে কি?' তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন।' (সূত্র : 'জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ত্রৈলোকনোথ চক্রবর্তী। অগ্নিযুগ গ্রন্থমালা-৮। প্রথম র‍্যাডিক্যাল সং, জানুয়ারি, ২০১৫, পৃ. ১৩৬)।

ডা. হেডগেওয়ারের ২৩/৪, কানাই ধর লেনের বাসস্থানের সূত্রেও তাঁর বিপ্লব সংশ্রবকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ মহারাজের উপরোক্ত লেখনীসূত্রে আমরা দেখেছি তিনি পলাতক অবস্থায় ডা. হেডগেওয়ারের মেসে দু-একবার আশ্রয় নিয়েছেন। আরও মারাত্মক তথ্য যে, কানাই ধর লেনের তেইশ নম্বর দাগের বাকি তিনটি (২৩/১, ২৩/২ ও ২৩/৩) বাড়িও মেস হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং সেগুলি ছিল বিপ্লবীদের গোপন ডেরা। যেমন সমসময়ে ১৯১০ সালের প্রথম থেকেই বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি থাকতেন ২৩/১, কানাই ধর লেনের মেসের একতলায়। মাসিক ভাড়া ছিল দু-টাকা বারো আনা। খাওয়ার খরচ পৃথক। অনুপস্থিতিতে ভাড়াও কমতো। তাঁর সহাশ্রয়ী ছিলেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের একটি ছাত্র। পুলিশের কাছে খোদ নরেন্দ্রনাথ এহেন বিবৃতি পেশ করেছিলেন। কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সুপারিনটেনডেন্ট পদে থাকবার সময় তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন, ২৩/২, কানাই ধর লেনের মেসে মুসলমান পাড়ার বোমা মামলায় অভিযুক্ত সত্যেন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুল ঘোষ প্রমুখ এই বাড়িতে থাকতেন। (বিষদ আলোচনার জন্য দ্র : 'কলিকাতায় অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা' : তুহিন শুভ্র ভট্টাচার্য, পত্রলেখা, ২০১৫, পৃ. ১২৩-১২৪ ও ২২৪)।

সুতরাং ডা. হেডগেওয়ারের বিপ্লবী যোগাযোগের সূত্র হিসেবেও অমূল্যরতন ঘোষের রচনাটি নতুন আঙ্গিকে বিবেচিত হতে পারে। প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের প্রকাশনা বিভাগের (পাবলিকেশন ডিভিশন) 'Builders of Modern India' সিরিজের অন্তর্গত 'ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার' পুস্তিকায় (প্রকাশ : ২০১৫ খ্রি.) লেখক রাকেশ সিন্‌হা ডা. হেডগেওয়ারের বিপ্লবী জীবন নিয়ে অধিকতর আলোকপাত করেছেন (পৃ. ১৫-২০)। কিন্তু অমূল্যরতন ঘোষের রচনাটি তাঁরও অধরা থাকায় এবিষয়ে অনেক তথ্যই অগোচরে থেকে গিয়েছে।

এই প্রসঙ্গে রচনাকার ডা. অমূল্যরতন ঘোষ সম্বন্ধেও আমাদের অনুসন্ধিৎসা রয়েছে। তবে সময়াভাবে তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান করে ওঠা যায়নি। জানা গিয়েছে, হাওড়া জেলার পিলখানায় পৈতৃক বনেদি বাড়িতে তিনি আজীবন বাস করেছেন। হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্যও ছিলেন। ডা. হেডগেওয়ারের হাতে ঘুঁষি মারার গল্পটি বৃদ্ধ বয়সে তিনি নাতি-নাতনিদের কাছে গল্প করে বলতেন। তাঁর দৌহিত্র (অমূল্যরতন ঘোষের জ্যেষ্ঠা কন্যা ঊষারানির পুত্র) শারীরবিদ্যার কৃতী অধ্যাপক গোপালচন্দ্র ঘোষ তাঁর ঘনিষ্ঠজনদের কাছে তাঁর দাদামশায়ের এই কীর্তিটি বলতে গর্ব অনুভব করতেন। গোপালবাবু এই মুহূর্তে শয্যাশায়ী, তাঁর স্ত্রী অপর্ণাদেবী আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি : *অর্ণব নাগ*

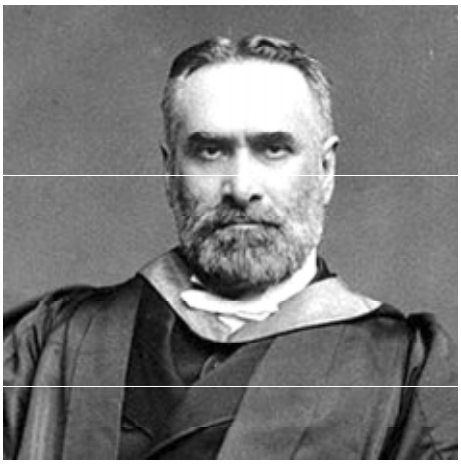

খোসা ও শাঁস
হেস্টি-বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম বিতর্ক ও ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধ

অচিন্ত্য বিশ্বাস

১৮৮২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের স্ত্রী, রাজা কালীকৃষ্ণ দেবের মা, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের পিতামহীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের বিবরণ মুদ্রিত হয় The Statesman দৈনিকে। রুপোর সিংহাসনে গৃহদেবতা গোপীনাথের উপস্থিতিতে তখনকার কলকাতার বহু গণ্যমান্য নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। আমন্ত্রিত ছিলেন চার হাজার অধ্যাপক-পণ্ডিত। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৬.৫.১৮৩১-১০.১.১৯০৮), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৫.২.১৮২৪ -২৬.৭.১৮৯১), কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪)-এর মতো দিকপাল ব্যক্তি সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। স্টেটসম্যান পত্রিকার বিবরণ ছাপা হয় ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২— সেখানে ছিল একটু তির্যকতা।

'In the evening some ten to twelve thousand begars received charity in the shape of small coin. On the second day 2,000 Brahmins were feasted; on the third day the kaysts had a feast; while 350 ladies partook of a banquet on the forth day. The fifth and last day, the tenants and domestics were entertained'।

খবরটিতে সামান্য গোলমাল আছে। ২০ সেপ্টেম্বর খবরটিতে প্রথম দুদিনের বিষয় বলার কথা; পরের তিনদিনের খবর এল কীভাবে? ধারণা হয় সাংবাদিক আগাম সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। এমনও হতে পারে, অনুষ্ঠানসূচী পত্রিকা কর্তৃপক্ষ দেখেছিলেন।

এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উইলিয়াম হেস্টি (১৮৪২-১৯০৩) তীব্র আপত্তি জানিয়ে, কলকাতার প্রগতিশীল নাগরিকদের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন স্ববিরোধী বলে অভিহিত করে সমালোচনা করেন। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তাঁর চিঠি প্রকাশিত হয়। পরপর দুইখানি চিঠি লেখেন হেস্টি। এইগুলির তারিখ আর শিরোনাম যথাক্রমে :

১.১. ২৩. ৯. ১৮৮২ : 'The Supposed Necessity of Idolatry'

১.২. ২৬.৯. ১৮৮২ : The Ultimate Philosophy of Brahmanism;'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (২৬.৬.১৮৩৮ - ৮.৪.১৮৯৪) তখন কটক জেলার জাজপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উইলিয়াম হেস্টি ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র। তিনি স্কটল্যান্ডের তরুণ। স্কটিশ চার্চের প্রতিনিধি হয়ে আসেন কলকাতায়। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইন্সটিটিউশান-এর প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১৮৬৮ নাগাদ। ভালো শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ তথা নরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৩.১.১৮৬৩-২.৭.১৯০২) শিক্ষক। তাছাড়া আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)-এর শিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতা পড়ানোর অবসরে হেস্টি 'trance' শব্দটি বোঝাবার জন্য নাকি নরেন্দ্রনাথ দত্তকে বলেছিলেন, এই মরমি মানসিক স্থিতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেতে হলে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (২০.২.১৮৩৫-১৬.৮.১৮৮৬)-এর 'সমাধি'অবস্থা দেখে আসতে পারে। হেস্টির এই চিঠিদুটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামচন্দ্র ছদ্মনামে লেখেন একটি চিঠি; তা প্রকাশিত হয়।

২.১. : ৬.১০. ১৮৮২ : 'The Modern St. Paul'।

পরদিনই হেস্টি এই চিঠির উত্তর লেখেন। তার আগেই তাঁর আরেকটি চিঠি ওই দৈনিকে প্রকাশ পায়।

১.৩. : ২৯.৯. ১৮৮২ : 'The Ultimate Philosophy of Brahmanism?'।

বঙ্কিমচন্দ্র এই চিঠি দেখে তাঁর উক্ত পত্র (২.১.) লিখেছেন, মনে হয় না। হেস্টি এর জবাবে লেখেন :

১. ৪. : ৭.১০.১৮৮২ : 'The Modern Ram Chandra'। বঙ্কিম লেখেন;

২.২. : ১৬.১০.১৮৮২ : 'European Versions of Hindoo Doctrines'।

হেস্টি এই চিঠি দেখার আগে লিখেছিলেন,

১.৫. : ১৪.১০.১৮৮২ : 'The Challenge Renewed'।

বঙ্কিমের চিঠি পড়ামাত্র হেস্টি আবার একটি পত্র লেখেন :

১.৬. : ১৭.১০.১৮৮২ : 'Ram Chandra Redivivus'।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রাঘাতের উত্তর দিয়েছিলেন;

২.৩. : ২৮.১০. ১৮৮২ : 'Intellectual Supiriority of Europe?'

শেষ চিঠিটি ছিল দীর্ঘ। রামচন্দ্র ছদ্মনামে হেস্টিকে অত্যন্ত সুচারু বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে নৈয়ায়িক যুক্তির স্থাপত্য ধর্ম বিন্যাসে বঙ্গিমচন্দ্র প্রায় ভূমিসাৎ করে ছেড়েছেন। এবার বিতর্কটিতে সমাপ্তি টানার জন্য কলম ধরেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (২৪.৫.১৮১৩-১১.৫.১৮৮৫)। তিনি লিখলেন একটি দীর্ঘ চিঠি। ১৪.১১.১৮৮২ স্টেটসম্যান এই চিঠিটি প্রকাশ করে। শিরোনাম ছিল 'The Recent Controversy'। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, তিনি বর্ষীয়ান শ্রদ্ধাভাজন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিতর্ক আর এগিয়ে নিতে চান না। তাঁর পত্র প্রকাশ পায় :

২.৪. : ২২.১১.১৮৮২ : 'The Recent Controversy'।

হেস্টি রণে ভঙ্গ দিলেন। প্রকাশ করলেন তাঁর ছটি পত্র। সেই পুস্তিকার শিরোনাম ছিল : 'Hindu Idolarty and English Eilighenment : Six Letters address to educated Hindus containing a practical discussion of Hinduism' (1882)। বোঝা যায়, হেস্টি ছিলেন বেশ উন্নাসিক, খ্রিস্টিয়ান ধর্ম-শিষ্ঠ, হিন্দুধর্মকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন একান্ত স্ববিরোধী বলে শেষপর্যন্ত বিশ্বাসী। এই মন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বৌদ্ধিক আক্রমণের তীব্রতাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন কিনা বলা কঠিন। তবে তিনি আর চিঠি লেখেননি। ফলে ধরে নিতে বাধা নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের মাধ্যমে সেই সাম্রাজ্যভুক্ত শিক্ষিত বাঙ্গালির আত্মশ্লাঘা আর শানিত বুদ্ধির জয় হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই পত্রগুচ্ছে তাঁর স্বাদেশিকতাকে এক তুঙ্গ উচ্চতায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিধারা উপস্থিত করতে চাই। তার আগে দেখাই, উইলিয়াম হেস্টির পত্রগুলিতে তিনি কী বলছেন।

।। ২।।

প্রথম চিঠিতে হেস্টি তাঁর আশাভঙ্গের কথা লিখেছেন। তাঁর ধারণা ছিল, তখনকার কলকাতা শহরে চিরাচরিত ধর্ম-সংস্কার সম্পর্কে আপত্তি-সমালোচনা-সংস্কারের আন্দোলন যারা করছেন, সেই শিক্ষিত নবচেতনার তরুণদল 'দানসাগর' শ্রাদ্ধের মতো অবান্তর আড়ম্বরের বিরুদ্ধে তাঁরই মতো অর্থহীন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়বেন। তাঁদের মধ্যে হেস্টির চাহিদা ছিল 'Hope of a higher faith'। তা তিনি পূরণ হতে দেখলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, খ্রিস্টিয়ান সদাপ্রভুর মঙ্গলময়তার প্রতি বিশ্বস্ত। তরুণদের উদ্দেশ্যে তিনি 'with all earnestness and out of the deepest sympathy with their common desire for what is good' — তাতে নজর ফেলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এর আড়াল উদ্দেশ্য, বলা বাহুল্য, হিন্দু সমাজকে চঞ্চল করা। হেস্টি লিখলেন, হিন্দুধর্ম আসলে অপ্রতিভ, অযোগ্য (ingenious), চতুর (Clever), আর অবজ্ঞাপূর্ণ (seonful)। বলতে হচ্ছে, এখানে তিনটি মাত্রা সন্নিবেশ করেছেন হেস্টি। তাঁর প্রথম বিশেষণ ইউরোপীয় আধিপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। দ্বিতীয়

বিশেষণটি হিন্দুধর্মের শত সহস্র অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত বিশ্বাসীদের উপর পুরোহিতদের ব্যবহারকে নির্দেশ করতে চাইছে। তৃতীয় ভাবনাটিও তেমনি। অর্থাৎ তিনি নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে হিন্দু সমাজের দুটি বর্গের বিভাজন করতে— মনস্তাত্ত্বিকভাবে মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাইছেন। এই তো খ্রিস্টিয়ান মিশনের সাধারণ লক্ষণ।

সেই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে চার হাজার ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র তাঁর কাছে 'noisy passages of ancient rhetoric' আর তার দ্বারা কুসংস্কারকে সমর্থন করা ছাড়া অন্য কিছু হয়নি। এ ছিল নিছক 'practical evils of the popular superstition'। তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখছেন, শিক্ষিত, তথাকথিত যুক্তিবাদী দেশীয় বিদ্বজ্জন এই পৌত্তলিকতার সমর্থনে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া (phychological justification) খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

একদা তিনি রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (১৭৯৩-১৮৬৭)-এর সঙ্গে পৌত্তলিকতা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। রাধাকান্ত দেব তাঁকে বলেছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজ যে যুক্তিতে শিশুদের হাতে পুতুল খেলতে দেয়, ভারতীয়রা ধর্মক্ষেত্রে যখন মানসিক বা তাত্ত্বিকভাবে অবিকশিত থাকে তখনই মূর্তিপূজা করে। হিন্দু দর্শনের গভীরে প্রবেশ করলে এই সাকার পূজার প্রয়োজন আর থাকে না। এই কথা মনে করে হেস্টি বলেছেন, শিবালয়গুলিতে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক মনের মানুষ (delicate mind) বিচিত্র বীভৎস কম্পন (shudder) ছাড়া কিছু পাবে বলে মনে হয় না। কালীকে তাঁর মনে হয়েছে ভয়ঙ্করী রক্তলোলুপ (the horrid and bloody Kali)। গণেশ তো elephant headed huge-panuched Gajapati- ছাড়া কিছু নয়। এই জনপ্রিয় হিন্দুধর্মে (popular Hinduism)-এর মধ্যে পবিত্র নৈতিকতা (moral pureness) দেখতে পাননি।

এসব থেকে কলকাতাবাসীদের উদ্দেশ্যে তার কথা— এসবই পৌত্তলিকতা ছাড়া কিছু নয়। 'Ye men of Calcutta, I perceive that is all things ye are to superstitions'। তার প্রশ্ন তোমরা পূজাভক্তি করো অজানা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। ('to the unknown god whom therefe ye ignorantly worship)।

হেস্টির ধারণা ছিল বেদ আদিতে প্রকৃতি পূজা ('Nature worship) হলেও ক্রমে পশুবলি আর বহুদেবতাবাদ (my riothestic idolatry)-এ পরিণত হয়েছে। এর ফলে ভারতে অবনতি হয়েছে চূড়ান্ত (all the demoralisation and degradation of India')। তিনি মনে করে 'only Christianity' এই অবস্থার বদল ঘটাতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি পড়ে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় হেস্টির। তিনি বঙ্কিমের ছদ্ম নামটিকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। তাঁর ভাষা 'modern Brahman, Ramchandra Redivivus' এই আধুনিক ব্রাহ্মণ আসলে রামচন্দ্রের অবতার ছাড়া আর কিছু নয়। বেদান্ত আর হিন্দুত্বকে তিনি ভিন্ন ধারার ধর্মবিশ্বাস বলে মনে করেন। শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূক্ত (এই গ্রন্থটির নাম হেস্টি ভুল জানতেন, এটি হবে 'ভক্তিসূত্র'! বঙ্কিম তাঁর চিঠিতে এই ভুল সংশোধন করে দেন) হেস্টির মতে 'pearl of Sanskrit literature'। তাঁর আরও দাবি, সংস্কৃতচর্চা ইউরোপ-আমেরিকায় যতটা হয়, ভারতে তার কণামাত্র হয় না। আসলে ভারত সেই সংস্কৃতি থেকে অধঃপতিত ভ্রষ্ট। 'native Pundits, like Ramchandra are quite helpless against the logical inferenss deducible from this knowledge of them'। বঙ্কিমচন্দ্র এই অহঙ্কৃত মতামত, অন্ধত্ব আর ভারতীয়দের তদানীন্তন জ্ঞানকাণ্ডের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞ হেস্টির বিপক্ষে কলম ধরেছিলেন। তাঁর চিঠি ক'টি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শুধু বঙ্কিম জীবনেই বা বলি কেন, নতুন ভারতের মূর্তি তাঁর কলমে সেদিন অপূর্ব উজ্জ্বল হয়েছে— প্রাচীন ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক রচনা করার ক্ষেত্রে এই অভাবিতপূর্ব বিচক্ষণতার তুলনা নেই। এই প্রবন্ধের পরের অংশে সেকথা উপস্থিত করছি

।। ৩।।

নিপুণ নৈয়ায়িকের মতো বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে উইলিয়াম হেস্টির দুর্বলতাকে নির্দিষ্ট করে তাঁকে এবিষয়ে আলোচনার অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। প্রথমদিকে রামচন্দ্র ছদ্মনামে বঙ্কিম যে তিরগুলি ছুঁড়েছেন তাতে ব্যঙ্গের কশাঘাত আর তাঁর অপ্রস্তুতির দিকগুলি আহত হয়েছে। সামান্য পরেই হেস্টি বুঝেছেন, তিনি এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী কুশলী ধানুকির সামনে পড়েছেন। 'লোকরহস্য' পড়া থাকলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনটি বোঝা সম্ভব। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী এইসব পশ্চিমা শিক্ষিতরা যা ভাবেন, তাতে আত্মস্ফীতি আছে, তাদের ধারণা ইউরোপ যা জানে তাই শ্রেষ্ঠ, যা মানে তাই জ্ঞান। বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টিকে তাই লিখলেন, তিনি হিন্দু ধর্মাচার সম্পর্কে ভালো মতো প্রস্তুত হলে ভালো করতেন, 'it is fit that he should render himself better aquainted with the doctrines of the Hindoo religion'। হিন্দুধর্মকে না জেনেই তার সৌধ ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা বঙ্কিমের অপছন্দ।

বেদান্ত আর হিন্দুধর্ম এক নয়। ভাগবতগীতা, ভক্তিসূত্র ইত্যাদি ইউরোপীয়দের কাছে পড়ে উনি হিন্দুধর্ম বুঝতে চেয়েছেন। এ একেবারেই হাস্যকর। কারণ ইউরোপীয়রা নিজেরাই এসব বিষয়ে কিছু জানেন না। 'they cannot teach what they do not

understand'। এরপর বঙ্কিমের তীব্র কশাঘাত — 'The blind cannot lead the blind' (২:১), বঙ্কিমচন্দ্র হেস্টিকে একথাও বললেন যে, তিনি তাঁকে তাঁর শিক্ষালয়ের দুর্বল ছাত্র বলে ভাবলে ভুল করবেন, তিনি তাঁর 'unpromising students in the general Assemblys Institution' বলে ভাবছেন— এমন হচ্ছে না তো!

বিতর্কের এই পর্যায়ে বঙ্কিম তাঁর আস্তিনের আসল রুমালগুলি বের করেননি। দেশীয় সমাজ সম্পর্কে আত্মমর্যাদা বোধ স্টেটসম্যানের পাঠকদের কাছে উত্থাপন করতে চেয়েছেন তিনি। হেস্টি এই চিঠি লিখে ভারতের মানুষকে অপমান করেছেন। এ একান্তই অহেতুক, অসহিষ্ণু, অন্যায়, অবাঞ্ছিত আক্রমণ। বঙ্কিমের ভাষা :

'Mr. Hastie attacks, without any provocation, the proceedings in a solemn mourning ceremony held in the private dwelling-house of all the most respectable Hindu families in the country, attacks all the most respected members of native society; attacks their religion; attacks the religion of the nation' (২:২)। ধর্ম-জাতি সম্পর্কে এই গৌরববোধ বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মমর্যাদাবোধ বলে মনে করি। তিনি হেস্টির চেষ্টাকে উপেক্ষা করছেন, কারণ তাঁর মতে, 'Hinduism has nothing to fear from his labours'- হেস্টির আক্রমণে হিন্দু ধর্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না।

এরপর ধীরে ধীরে বঙ্কিম ঢুকছেন তাঁর যুক্তিজাল ছড়িয়ে— নিজের সীমায় এনে ফেলছেন হেস্টিকে। তাঁর মতে, ভারতীয় সংস্কৃত পাশ্চাত্য ভাষায় যথাযথ অনুবাদ অসম্ভব। অনুবাদ করতে হলে ভারতের সংস্কৃতির ধারাবাহিকতাকে যথাযথ জানতে হয়। সেই অনুশীলন শ্রদ্ধা যোগ্যতা ইংরেজ-জার্মান পণ্ডিতদের নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র ভাষা ভারতীয় ধর্ম-সভ্যতা-সংস্কৃতি 'Tentonic brain'-এ ঢুকবে না। এর কারণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য মন পৃথক, ইংরেজ-জার্মানদের জ্ঞানকাণ্ডও 'utterly foreign to the Hindu' (২:২; হিন্দু বানান আগের পত্রে ছিল Hindoo)। বঙ্কিমচন্দ্র সোজাসাপটা নিজের কথা জানিয়েছেন : তাঁর আত্মবিশ্বাসী ভাষা আমাদের বিস্মিত করে। বুদ্ধিজীবীতার এমন উচ্চারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর অগ্রসর ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে বঙ্কিম লিখেছেন : 'These which form the spirit and the matter of religious and philosophical treatises, are entirely distorted, ...mis represented in every translation - even in the best' (২:২)।

তাহলে বিদেশিরা কি ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু পড়বেন না, জানতে চাইবেন না? বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, যদি সত্যি জানার আগ্রহ থাকে, তাহলে ভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে আসতে হবে। যাঁদের স্বধর্মনিষ্ঠা আছে, তারাই এব্যাপারে যথার্থ শিক্ষকতা করতে পারবেন। অন্যথায় যে কোনও অর্ধমনস্ক চেষ্টাই থাকবে অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর। বঙ্কিমের মতে 'without a loving and reverential study' ভারত-সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ অসম্ভব। বঙ্কিম লিখেছেন, 'I say it most emphatically --- as every other European who has made the attempt has failed' (২:২) হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে ঠিকমতো না জেনেই হেস্টি সাহেব 'without a correct knowledge of its doctrine' যে চেষ্টা করেছেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। শুধু বক্তৃতা দিয়ে হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন ধারাবাহিকতা 'the oldest and the most enduring of all religions systems' -কে ধ্বংস করা (to demolish) একান্ত অসম্ভব। কিছু ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য শ্রদ্ধা জানাতে দ্বিধা করেননি। এঁদের মধ্যে তাঁর বলা ব্যক্তিদের নাম লিখছি :

১. ফ্রেডরিক ম্যাক্সিমিলান মুলার (১৮২৩-১৯০০) অর্থাৎ ম্যাক্সমুলার।

২. থিওডর গোল্ড স্টিকার (১৮২১-১৮৭২)।

৩. হেনরি টমাস কোলব্রুক (১৭৬৫-১৮৩৭)।

৪. অ্যালব্রেক ফ্রিডারিক ভন ও ফেরার (১৮২৫-১৯০১)।

৫. রুডলফ ভন রোথ (১৮২১-১৮৯৫)।

৬. জহন মুইর (১৮১০-১৮৮২)।

বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সময়ের প্রকৃত ভারততত্ত্ববিদদের কাজকর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত ছিলন, শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বঙ্কিম লিখেছেন, যদি পড়তেই হয়, এঁদের মারফৎ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পড়ে, উইলিয়াম হেস্টি নিজেকে প্রস্তুত করুন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্র বা ড. কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ইংরেজিতে লেখা ভারততত্ত্ব সম্পর্কে প্রকাশিত রচনার উপরও নির্ভর করতে পারেন হেস্টি। তা না করে হেস্টির চেষ্টা বঙ্কিমের মতে অপ্রস্তুত আস্ফালন।

হেস্টি যে কতটা অপ্রস্তুত তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন বঙ্কিম। তাঁর প্রথম চিঠিতে (২:১) সূত্র স্থলে 'suka' ছাপা হয়। হেস্টি তাঁর চিঠিতে শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূক্তকে 'among the pearls of Sanskrit Literature' -এর মধ্যে একটি বলে চিহ্নিত করেন। সে চিঠিতে তিনি সংশোধন করেন এটি। তাঁর ধারণা ছিল, 'সূক্ত'স্থলে 'suka' ছাপা হয়েছে। এনিয়ে বঙ্কিম তাঁর দ্বিতীয় চিঠিতে তীব্র ব্যঙ্গ করেন হেস্টিকে (২:২)। এই তো তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের মণিমাণিক্য সন্ধান!

তৃতীয় পত্রেও বঙ্কিম হেস্টির কথাকে লঘু ভাবে অস্বীকার করে বলেছেন, ব্রাহ্মণ যখন পেশাদার তখন তাদের কাছে বিশেষ কিছু গভীরতা আশা করা যায় না। 'a Brahman's proper occupation during the Puja is feasting, not controversy' (২:৩)— তারা তর্ক করেন না। আসলে বঙ্কিমকে হেস্টি চাল কলাভোজী বামুন ভেবেছিলেন। 'Modern Ramchandra' কোন ধাতুতে গড়া তা বুঝতে বাকি ছিল তাঁর। ক্রমে সেই গভীর ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন উপলব্ধি উচ্চারিত হল— হিন্দুধর্মের নতুন ভাষ্য রচনা করলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

।। ৪ ।।

বঙ্কিমচন্দ্র সৃজনশীল সাহিত্যিক। তাঁর উপমা রূপক ভাষ্য অব্যর্থ। তৃতীয় পত্রে তিনি একটি প্রচলিত লোককথা উত্থাপন করেছেন। এক ক্ষুধার্ত নাবিক এক দেশীয় মানুষের কাছে নারকেল উপহার পেয়ে মুশকিলে পড়ে। 'The hungry sailor who had never seen a coconut before'। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, উইলিয়াম হেস্টিও আসলে ওই নাবিকের মতো ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞ। উনি জানেন না, ছোবড়া ভেদ করে শাঁসে প্রবেশের উপায়। পাশ্চাত্যের বহু বিশেষজ্ঞই অনুরূপ, তারা জানেন না বিশেষ কিছু, নিজেদের অতিরিক্ত বুদ্ধিমান ভাবেন, ফলে এই তথাকথিত 'intellectual superiority' না দেখিয়ে উইলিয়াম হেস্টির উচিত ছিল দেশীয় কোনও বিশ্বাসী জ্ঞানীর সাহায্য নেওয়া। এইরকম 'native guidance' ছাড়া তিনি ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না।

ভারতের জ্ঞান শ্রবণ-কথনের উপর নির্ভরশীল এই মৌখিক পরম্পরা বাইরে থেকে অনুভব, উপলব্ধি করা অসম্ভব। এই 'bulky literature which has to be handed down from teacher to pupil by word of mouth' হেস্টি জানবেন কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে গুরু-শিষ্য পরম্পরাবাহিত 'vast mass of traditionary and unwritten knowledge in India' জানার একমাত্র উপায় এদেশের মৌখিক পরম্পরা-বাহিত শিক্ষাদানের কৌশল 'oral instruction' যা আসলে 'systematised into an art' (২:৩)। আমাদের দেশীয় জ্ঞানকাণ্ডের একটি প্রধান অংশই 'শ্রুতি'। একে লিপিবিদ্যার মাধ্যমে জানার ধৃষ্টতা ব্যর্থ হতে বাধ্য। বঙ্কিমের পরামর্শ তখন পর্যন্ত দেশে টোলের ভট্টাচার্যরা এই শ্রুতি সংস্কৃতি অল্প হলেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁদের কাছে কিছু হলেও ভারতের অতীতকালের ধারাবাহিকতার কিছুটা পাওয়া যেতে পারে। একথা ঠিক, এদেশে মুসলমান শাসনের পর প্রাচীন জ্ঞান অনেকাংশে লুপ্ত হয়েছে। এর অন্য কারণও ছিল।

বঙ্কিম তাঁর তৃতীয় পত্রে লিখেছেন, এদেশের পণ্ডিতবর্গ পারস্পরিক দ্বেষ-ঈর্ষা-দলাদলির কারণে এই প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'India has uutterly lost so many of her ancient arts, and so much of her ancient science'। এখন ভারতীয় জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় শুকনো হাড়, কঙ্কাল মাত্র। এতে রক্ত মাংস প্রাণ সঞ্চার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পক্ষে অসম্ভব। যদিও 'the breathing form of the old hearing and the old civilisation is visible to native eyes only'। একে উপেক্ষা করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা ভারতবিদ্যা (Indology), প্রাচ্যতত্ত্ব (Orientalism) যা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) প্রভৃতি জ্ঞানচর্চা করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে শুকনো হাড়ের ঠোকাঠুকি বলতে চান। যারা প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, হিন্দুধর্মে আস্থা ও বিশ্বাস রাখেন, সেই দেশীয় পণ্ডিতদের মধ্যেই ভারতের আদি ও অকৃত্রিম জীবন্ত রূপটি ধরা পড়বে বলে বঙ্কিম জোর দিয়ে উত্থাপন

করেছেন।

বৈদিক সাহিত্য ও জ্ঞানরাশি ভারতেও হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে রঘুনাথ শিরোমণি (১৪৭২— ১৬শ শতকের মধ্যভাগ), গদাধর, জগদীশ তর্কালঙ্কার (১৬শ-১৭শ শতক) প্রভৃতি পণ্ডিতদের টোলে বাংলার মনীষার পরিচয় ('the pride and glory of the Bengali race') পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া রামানুজ (১১শ শতক)[১], জীব গোস্বামী (১৪৩৩-১৫২৮)[২] প্রমুখ ভাগবতপুরাণের যে দার্শনিক ও অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছেন ওইসব না জেনে কিসের অহঙ্কার করছেন হেস্টি? তন্ত্রের কথা সামান্য উল্লেখ করে এর কদর্য দিকটি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন হেস্টি। বঙ্কিম লিখলেন তন্ত্র বিষয়ে 'the European knows next to nothing'। আর ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে তার জ্ঞান হয়তো চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪০-১৯২৪)-র 'শকুন্তলা তত্ত্ব' এক ঘণ্টা মাত্র পড়ার ফল। এমনভাবে মহাকবি কালিদাস সাহিত্যের মর্ম বোঝা অসম্ভব।

With Best Compliments

from-

S. S. FORGINGS

G. T. Road,
Bye-Pass,
Near Ptk. Chowk
Jalandhar - 144 012
(Punjab) India
Off. : 0181-2601976,
2601719
Fax : 0181-2601719

এমনকী কালিদাস বোঝার জন্য তিনি কবি জোহান উল্‌ফগাঙ ভন গ্যেটে (Johann Welfgang von Goethe-১৭৪৯-১৮৩২) -এর ভাষ্যাদির সঙ্গেও পরিচিত হননি।

হিন্দু সমাজের ব্যবহার বিধি, দিনানুদৈনিক সম্পর্কে জানার অধিকার স্মৃতি-শাস্ত্রাদির পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব-তল্লাশ ছাড়া জানা যায় না। হেস্টি তা করেননি। যথারীতি বঙ্কিম হেস্টিকে অপ্রস্তুত বলে উপেক্ষা করেছেন। তাঁর ভাষা 'he did not possess the necessary qualifications'। এইভাবে যথাসম্ভব তির্যকভাবে সমালোচনা করার পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর যুক্তি সাজিয়েছেন। গড়ে তুলেছেন হিন্দুধর্মের নবভাষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই মহা পরিবর্তনের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের এই নবভাষ্য হিন্দুধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যান উপস্থাপন করলেন। সংস্কৃত ভাষায় অনধিকারী, ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে বিশ্ব দর্শনের প্রবণতায় একটি প্রজন্ম তখন বাংলায় উৎকেন্দ্রিকতার চূড়ান্ত করছে। হেস্টিকে উপলক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র এই ইংরেজি নবীশ বাঙ্গালি যুবকদেরও ঘরে ফেরার ডাক দিচ্ছেন বলে মনে করি। স্টেটসম্যান পত্রিকায় তিনি যে চিঠিগুলি লিখলেন তার মধ্যে এই দুধারি তরবারির কুশলী ব্যবহার আমাদের তেমনি এক সিদ্ধান্তের দিকে নির্দেশ করছে।

হিন্দুধর্ম বুঝতে হবে হিন্দুর দৃষ্টিতে। বঙ্কিমের মুখ্য প্রতিপাদ্য ছিল তাই— 'Hinduism from the Hindus point of veiw' দেখতে হলে, বঙ্কিম লিখেছেন— তার তিনটি স্তরকে জানতে হবে। বস্তুত এখান থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ঋষিত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ধর্মবেত্তা এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টি সে যুগের পক্ষেও ছিল বিরল। বঙ্কিম উল্লেখিত এই তিন স্তর হল—

১. হিন্দু ধর্ম হলো একটি জীবনবোধ - 'a doctrinal basis or the creed'। এই জীবনবোধ বা জীবনচর্যাটি না বুঝলে চলবে না।

২. দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্ম পূজা বা আচার (wordhip or rites)। দিকে দিকে দেশে দেশে ছড়ানো এই পূজাচারে সঙ্গতি বিধান অসম্ভব। বিশেষ করে যদি কেউ নিছক তথ্যসন্ধানী হয় এর মর্ম বোঝা অসম্ভব। এর পিছনে যে বিনয় ও আত্মনিবেদন আছে তা উপলব্ধির বিষয়।

৩. শেষপর্যন্ত হিন্দু ধর্ম হলো এক ধরনের নৈতিকতা, নিষ্ঠা আর সংযম। বঙ্কিমের ভাষা— 'a code of morals more or less dependent upon the doctrinal basis'।

এই ত্রিমাত্রিক হিন্দুধর্মকে না বুঝে হিন্দু ধর্ম সমালোচনা দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ হতে বাধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র উক্ত জীবনবোধ বা জীবনচর্যার দুটি ভেদ করেছেন। ক) একে বলা যায় বিশ্বাস বা নির্ভরতা— 'dogmas'। তবে তার পিছনে আছে দার্শনিক সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যান। এইসব 'dogmas

formulated, explained and illustrated in a mass of philosophical literature'।

খ) আর আছে বিভিন্ন লোককথা, জনশ্রুতি— 'legends' এবং 'Purans'।

বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, এসবই অর্বাচীন কালের। আধুনিক সময়ের হিন্দু জীবনবোধ ও চর্যা 'modern Hinduism'-এর ভিত্তি বেদ-উত্তর পর্বে বিকশিত; এসবই 'post-Vedic'। ক্রমে তা দর্শন, সংস্কার (dogma) সমূহের ভিত্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর একটি মৌল কাঠামো গড়ে উঠেছে সাংখ্য দর্শনের উপর ভিত্তি করে। কপিল মুনির নামে চলা এই সাংখ্য দর্শনকে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক হিন্দু ধর্মের ভিত্তি বলে ধরতে চান।

সাংখ্য মতে বিশ্বব্যাপার পুরুষ-প্রকৃতি সত্তার যুগপৎ যুগবদ্ধ একাত্ম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজের উপযোগী করে একে ব্যাখ্যা করেছেন, হেস্টির বিভ্রান্তি দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাঁর চিরস্থায়ী কীর্তি।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির মাধ্যমেই এদেশের প্রধান দেবদেবীর মূর্তি গড়ে উঠেছে। যেমন,

প্রকৃতি : অর্থাৎ 'Nature', 'simply the Manifestations of force'। এই 'force' হলো শক্তি। শক্তি যখন ধ্বংসাত্মক, 'destructive' তখন তা 'কালী'তে রূপান্তরিত, কল্পিত পূজিত। আর যখন তা 'constructive' তখন তা 'দুর্গা' রূপে কল্পিত হয়।

পুরুষ : বঙ্কিম একে বলেন 'The universal soul' একে তিনি 'ব্রহ্ম'স্বরূপ ভেবেছেন। এর গুণ ও রূপ বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে দেখতে চান।

গুণ	ক্রিয়া	কর্ম	রূপ
'goodness'	'Love'	'creats'	ব্রহ্মা
'passion'	'power'	'preserves'	বিষ্ণু
'darkness'	'justice'	'dooms;	শিব

এই গুণ শব্দ আমাদের। বঙ্কিম লিখেছেন 'English translation'; আর ক্রিয়াকে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁর ভাষা 'I translate'। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণের মৌলিকতা সুস্পষ্ট হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রকৃতি-পুরুষের দ্বন্দ্বাত্মক বিন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র রাধাকৃষ্ণ কথায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষা 'The great duality - Nature and soul presies over all. Krishna is soul Radha is Nature'— প্রকৃতি পুরুষ রূপী রাধা-কৃষ্ণের এই আশ্চর্য বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু ধর্ম-দর্শনের নব ব্যাখ্যান বলে মনে করি। এ প্রসঙ্গে লিখিত উইলিয়াম হেস্টি রাধা-কৃষ্ণ কেন্দ্রিক বৈবত ও ধর্মাচারকে মনোরঞ্জক উপাদানে সমৃদ্ধ বলে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে, এই রূপক 'child like simplicity' আর সেখানে নৈতিকতার উপস্থিতি নেই— 'moral pureness' না থাকায় তাকে তিনি অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন (১:১)। বঙ্কিম স্বীকার করেছেন, 'The legend of Radha and Krishna retains the illegitimate coneection' (২:৩) তা সত্ত্বেও এই কল্পকথা জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই জনপ্রিয়তা অবৈধ অনৈতিক প্রণয়কথাকে এক তুঙ্গ শিল্পকলায় সত্য ও প্রেম আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করেছে। ফলে বঙ্কিম রাধা-কৃষ্ণ প্রণয় মহিমার ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে 'this union of the soul with Nature lies the source of all beauty all truth, and all love'। তাঁর ব্যাখ্যা হিন্দু জানে 'love for all that exists'। পাশ্চাত্য আলোচকরা রাধা-কৃষ্ণকথায় দেখেছে বিদ্রোহ, অনৈতিকতা, অপরাধ। এই হলো প্রেমহীন সৌন্দর্যবোধহীন পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের সীমা। এছাড়া তারা কিই বা ভাববেন! একে বঙ্কিম বলেছেন, 'invented by the brain of man. So much for the intellectual superiority of Europe' (২:৩) তাদের পক্ষে সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরীয় লীলা বোঝা অসম্ভব।

'কুমার সম্ভব'— বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই লীলারই অন্য রূপ। এ হচ্ছে পবিত্র বিবাহের মহাকাব্যিক রসঘন অভিব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা 'কুমারসম্ভব' 'least understood both in India and Europe'। সাহিত্য, প্রাকৃত নরনারীর সম্পর্ক, যৌনতার শিল্প রূপ হিসাবে ভাবার পাশাপাশি বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে সাংখ্য দর্শনের রূপান্তরিত রূপকল্প হিসাবে ভাবতে চেয়েছেন। এই সাহিত্যখণ্ড আসলে 'celebrates the marriage of Nature with soul, typified in Uma and Siva' (২:৩)। ভারতে দর্শন, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান আর লোককৃত্য তথাকথিত সর্বদজনীন সাহিত্যের সঙ্গে এইভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। একে বোঝার জন্য এই দেশের মানুষের কাছে জ্ঞানলাভের জন্য সবিনয় নিবেদন করতেই হবে।

।। ৫ ।।

উইলিয়াম হেস্টির আসল আক্রমণাত্মক সমালোচনা এদেশের মানুষদের পৌত্তলিকতার বিকৃতি। হেস্টি লিখেছিলেন, ঈশ্বর কেন মন্দিরে থাকবেন, তিনি তো 'dwelleth not in temples' (১:১)। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, হিন্দুদের পূজাচারের অনর্থকতা এর পুরোহিতরাও জানে। 'Hindu rituals is mere murmmery (২:৩)। বিশ্বাসী হিন্দুরা সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। তাঁর স্পষ্ট কথা— আহ্নিক কখনোই পৌত্তলিকতা নয়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণরা কখনো কখনো বিষ্ণু বা শিব পূজা করে। কিন্তু এক্ষেত্রে মন্ত্র ধ্যানই প্রধান— 'he is not bound to worship their image'।

হেস্টি তাঁর চিঠিতে রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের কথা লিখেছিলেন, রাধাকান্ত নাকি তাঁকে বলেছিলেন মূর্তি পূজা আসলে শিশুদের পুতুল খেলা ছাড়া অন্য কিছু নয়। হেস্টি হিন্দুর ধর্মাচারে কোথাও এর প্রমাণ পাননি 'childlike simplicity' অপেক্ষা কুযুক্তিপূর্ণ চাতুর্য বলেই মনে করেন। বঙ্কিম বিষয়টি মানুষের উচ্চ কবিত্বশক্তি, কল্পনা আর শিল্পশোভন আবেগের সঙ্গে বিবেচনা করতে চান। তাঁর ভাষায় এ হল : 'The passionate Ideal in beauty, in power and in purity, must find the expression in the world of the Real'। এইভাবে সুন্দর, সত্য, শক্তি, শুদ্ধতার আদর্শ বস্তুবিশ্ব থেকে ভাবকল্প হয়ে ওঠা তো বিশ্বজনীন! একে বঙ্কিম 'passionate yearning' বলে গণ্য করতে চান। তাঁর আরও যুক্তি হ্যামলেটের গভীর বেদনার্ত মূর্তি কিংবা প্রমেথিউসের বিদ্রোহ আর ব্যর্থতাও তো তাই। 'The existence of idols is an justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus'। সুতরাং হিন্দুই কেন শুধু পৌত্তলিক বলে নিন্দিত হবে?

মূর্তি আর প্রতিমা এক নয়। হিন্দু প্রতিমাপূজক কিন্তু মূর্তিপূজক নয়। মূর্তি বাজারে বিক্রি হয়। যারা গড়ে তারাও নিষ্ঠার সঙ্গে পবিত্রতা বজায় রেখে মূর্তি নির্মাণ করে। বঙ্কিম বলেছেন এসবই 'made by impure workman sold in bazars'। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তার আগে তা পূজার যোগ্য থাকে না। প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর তা প্রতিমায় উন্নীত হয়। হয়ে ওঠে 'God's image'। এই কল্পনা বিশ্বাস শ্রদ্ধাজ্ঞাপন আমাদের সমাজের সাংস্কৃতিক শক্তি— এ হচ্ছে 'for the sake of culture and discipline' প্রতিমাপূজার ঐ প্রেক্ষাপটটি না জেনেই হেস্টি আক্রমণাত্মক হয়েছেন। অন্য পক্ষে দর্পণ বিসর্জনের পর প্রতিমায় আর দৈবী সত্তা থাকে না। তখন তা যেখানে সেখানে ফেলে দেওয়া হয়।

অন্যপক্ষে মন্দিরের দেওয়ালে মূর্তি গঠিত হয়েছে, এসব প্রস্তরমূর্তি ভাস্করদের নির্মাণ, এই 'sculplor'-দের নন্দিত উপস্থাপনা 'is a question of art only'। আরেকটি কথা বাঙালিই মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করে। এর কারণ, মুসলমান আক্রমণ। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে এ প্রদেশে 'the few good images we have been mutlated or destroyed by the hand of Mussalman Vandals' (২:৩)। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এজন্যই বাংলায় সাময়িকভাবে মূর্তি গড়ে পূজা বিসর্জনের রীতি গড়ে উঠেছে। পুতুল ও প্রতিমার এই সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা, এই মনস্তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটটি না জানলে হিন্দু ধর্মের ভুল ব্যাখ্যান অনিবার্য।

।। ৬।।

স্মৃতি শাস্ত্র হিন্দুর জীবনে ব্যবহারিক বিধি ও বিধান। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন এই নীতি বা ethics-এর দুটি মাত্রা। ১. ব্যক্তিগত আর ২. সামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'It is a system of ethics as well as a polity'। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর ফল অত্যন্ত গভীর। একে 'code of personal morality' বলা যায়। এই মূল্যবোধ ভারতীয়কে সৎ সংযমী বিনয়ী করেছে। ভারতীয় মনের গড়নে যে মধ্যপন্থা আছে তার উৎসে এই বিধিবিধানের প্রভাব বিদ্যমান। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে এর মূল বৈশিষ্ট্যটি আজও অনেকখানি থেকে গেছে। একে খ্রিস্টিয় উপাদান বলে ধারণা করেছিলেন কেউ কেউ, বিশেষত হেস্টি। এটি অসার বলে প্রতিপন্ন করেন বঙ্কিম।

সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভাব কিছুটা ভালো মন্দে মেশানো। রাজ্য পরিচালনা তথা রাজনীতির ক্ষেত্রে (বঙ্কিম যাকে বলছেন ('polity') এর প্রভাব ইতিবাচক। 'The Social polity is even more wonderful'। আমাদের দেশে রাজশক্তি সম্পূর্ণভাবে নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল। এই নীতিনিষ্ঠ শক্তি ('Moral power') ছিল বলেই তা অত্যাচারী লোভী আক্রমণাত্মক হিংস্র হয়নি। নৈতিক বিধি বিধান রাজশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেছেন 'It is the only system which has abolished war and the military power'।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ খুঁজেছে আদর্শ রাজনীতির ভূমিকা। বেনথাম, কঁৎ ও মিল-এর চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্র— পাশ্চাত্যের হিতবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, তাঁদের অভিমত উল্লেখ করা যায়। জেরিমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) ছিলেন রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের সুখ বিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত আইন ও নৈতিকতার সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী। অগুস্ত কুঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) ছিলেন কল্প-সমাজতন্ত্রী '(Utopean socialism)। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গড়েন 'দৃষ্টিবাদী সমিতি'। এই সংগঠনই হিতবাদী দর্শনের প্রধান প্রচারক। সমাজ বিবর্তন ক্রমে অতীতের কাল্পনিক দৈব ধারণা থেকে অধিবিদ্যা বা metaphysical ধ্যানধারণাকে অবলম্বন করেছে। আধুনিক যুগে অধিকতম মানুষের অধিকতম সুখের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক ধানধারণার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করতেন তাঁরা। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ছিলেন সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত সমন্বয় সাধনের পক্ষপাতী। তাঁর 'Essays on Liberty' (১৮৫৯)-র প্রবন্ধগুলির দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এই প্রবন্ধমালার মধ্যে নারীর অধিকার বিষয়ক ভাবনা[৪] বঙ্কিমচন্দ্রকে অত্যন্ত প্রভাবান্বিত করে। তিনি

জনপ্রতিনিধিত্ব সম্পর্কেও ভেবেছেন। এবিষয়ে তাঁর 'Consideration of Representative Goverment' বেশ স্মরণীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র উইলিয়াম হেস্টিকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, এইসব স্মৃতিশাস্ত্র অনুধাবন করলে আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মঙ্গল বিধানের শক্তি সম্পর্কে ধারণা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা যা ভেবেছেন, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র তা হাজার বছর আগেই বিধিবদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষই তাদের স্বপ্নের রাজনীতি বা 'Dream of a positive polity'-র উৎস বিন্দু। হিন্দুধর্মই তাদের বুদ্ধিজীবীতার সুচনায় 'intellectual hierarchy' হিসাবে কাজ করতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিয়ে দিয়েছেন, এই নৈতিক প্রস্থানের সবই হিন্দুধর্মের মৌলিক ভিত্তি (essential of Hinduism) নয়। কিছু আছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন 'non essential adjuncts', কিছু বিশুদ্ধ (pure ethics) আর কিছু ধর্ম বলে গণ্য হবার নয়— not religion। একে বঙ্কিম সামাজিক নৈতিকতা (social polity) বলে অভিহিত করেছেন। এ হচ্ছে জাতিভেদ ও সংক্রান্ত সংস্কার। তাঁর ভাষ— 'Caste, therefore, which in the polity, is non essential' (২:৩)।

জাতিভেদ যে হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত অবিচ্ছেদ্য বস্তু নয়, তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র এনেছেন মধ্যযুগের ধর্মান্দোলন বিশেষত শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম-সমাজ সম্পর্কে; এইসব 'many Hindu sects' জাতপাত মানে না। ফলে জাতিভেদ সংক্রান্ত অন্যায়কে হিন্দু ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করার কারণই নেই।

।। ৭ ।।

রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উইলিয়াম হেস্টিকে আড়াল করার জন্য এই ঐতিহাসিক পত্রযুদ্ধের ইতি টানলেন। ১৪ নভেম্বর ১৮৮২ সালে তাঁর চিঠি 'The Recent Controversy' শিরোনামে ছাপা হলো। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন তাঁর সর্বশেষ পত্র। সেই পত্রের শিরোনাম 'The Recent Controversy' — প্রকাশ পেল ২২ নভেম্বর। এই গভীর আন্তরিক, স্বাদেশিকতায় উজ্জ্বল, আত্মোপলব্ধিতে দীপ্যমান পত্রধারা সমাপ্ত হলো— কার্যত বঙ্কিমচন্দ্রই শেষ কথা বললেন।

বঙ্কিম তাঁর তৃতীয় পত্রের শেষাংশে খানিকটা মজা করে লিখেছেন, 'you strip Hinduism of its rites, its idolatry, its castes; what do you then leave it?' ঠিকই তো, বঙ্কিমচন্দ্র রামচন্দ্র ছদ্ম নামে এই যুক্তির সবই খণ্ড খণ্ড করেছেন, প্রমাণ করেছেন নারকেলের ছোবড়া ছেড়ে সরস সুস্বাদু সারবস্তু বুঝতে হেস্টির নিশ্চয় আর ভুল হবে না : 'I leave the Karnel without the husk'।

তাঁর উদ্দেশে তীব্র ব্যঙ্গ করে হেস্টি লিখেছিলেন 'Ramchandra Redivivus' (১৭.১০.১৮৮২, ১:৬)। বঙ্কিম তাঁর চিঠির শেষে লিখলেন, একালের রামচন্দ্র পশ্চিমের অহঙ্কারী জনকের দেওয়া ধনুটি স্পর্শ করেই ভেঙ্গে ফেলেছেন। এবার কি তিনি সত্য-স্বরূপ জানকী-লাভ করবেন?

কৃষ্ণমোহনকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেননি বঙ্কিম। তিনি স্বীকার করেছেন 'কপাল কুণ্ডলা' উপন্যাসে তিনি তন্ত্রের নৈতিক সিদ্ধান্তকে হিন্দুত্বের সঙ্গে মিশিয়ে ভেবেছেন। কৃষ্ণমোহনকে স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন : 'True Hinduism and Tantrikism are as much opposed to each other as light and darkness' (২:৪), তন্ত্র যদি অন্ধকার হয় হিন্দুধর্ম আলো— একে উচ্চস্তরের রূপক বলা যায়। তন্ত্রের সঙ্গে সাংখ্যদর্শনের সম্পর্ক বঙ্কিম দেখিয়েছেন তাঁর পূর্ববর্তী চিঠিতে (২:৩)— যোগদর্শন ক্রমে তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হতে চাননি বঙ্কিমচন্দ্র। লিখেছেন, তন্ত্র শেষ হোক, কিন্তু সে সম্পর্কে পঠনপাঠন যেন বন্ধ না হয়। 'Let Tantrikism perish --- but let it not perish unstudied' (২:৪)।

বঙ্কিম এই পত্রযুদ্ধের শেষে রামচন্দ্র ছদ্মনাম পরিহার করে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাঁর সেই সুরসিক বক্তব্য, 'As it can no longer be necessary to write under an assumed name, I subscribe my won' । 'রামচন্দ্র' এসে আমাদের পিতৃপিতামহের শত-সহস্র বর্ষ ব্যাপী জীবনধারা ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করে গেলেন— বঙ্কিমচন্দ্র সেই দৈবী চমৎকার দেখালেন এই পত্রগুচ্ছে। দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতি রক্ষায় তাঁর ভূমিকা চিরস্থায়ী হলো সন্দেহ নেই।

অনুষঙ্গ।।

১. হরিদাস দাস সংকলিত 'শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান', তৃতীয় খণ্ডে রামানুজাচর্যের আবির্ভাবকাল বলা হয়েছে '৯৩৮ শতাব্দের চৈত্রী শুক্লা পঞ্চমী' (১৩৪৯ পৃঃ তৃতীয় স্তম্ভ; শ্রীশ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান; দ্বিতীয় খণ্ড; সংস্কৃত বুক ডিপো; কলকাতা; ১ বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ)

২. তদেব ; ১২৪৮ পৃঃ।

৩. সারণিটি আমরা প্রস্তুত করলাম। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের নাম লেখেননি। ইংরেজি শব্দগুলি তাঁর ভাষা অবলম্বনে ব্যবহার করলাম।

৪. রচনাটির নাম 'Subjection of Women' (১৮৬৯)। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' এই রচনাটির দ্বারা প্রভাবিত। ■

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039

সে এক মেয়ে

রমানাথ রায়

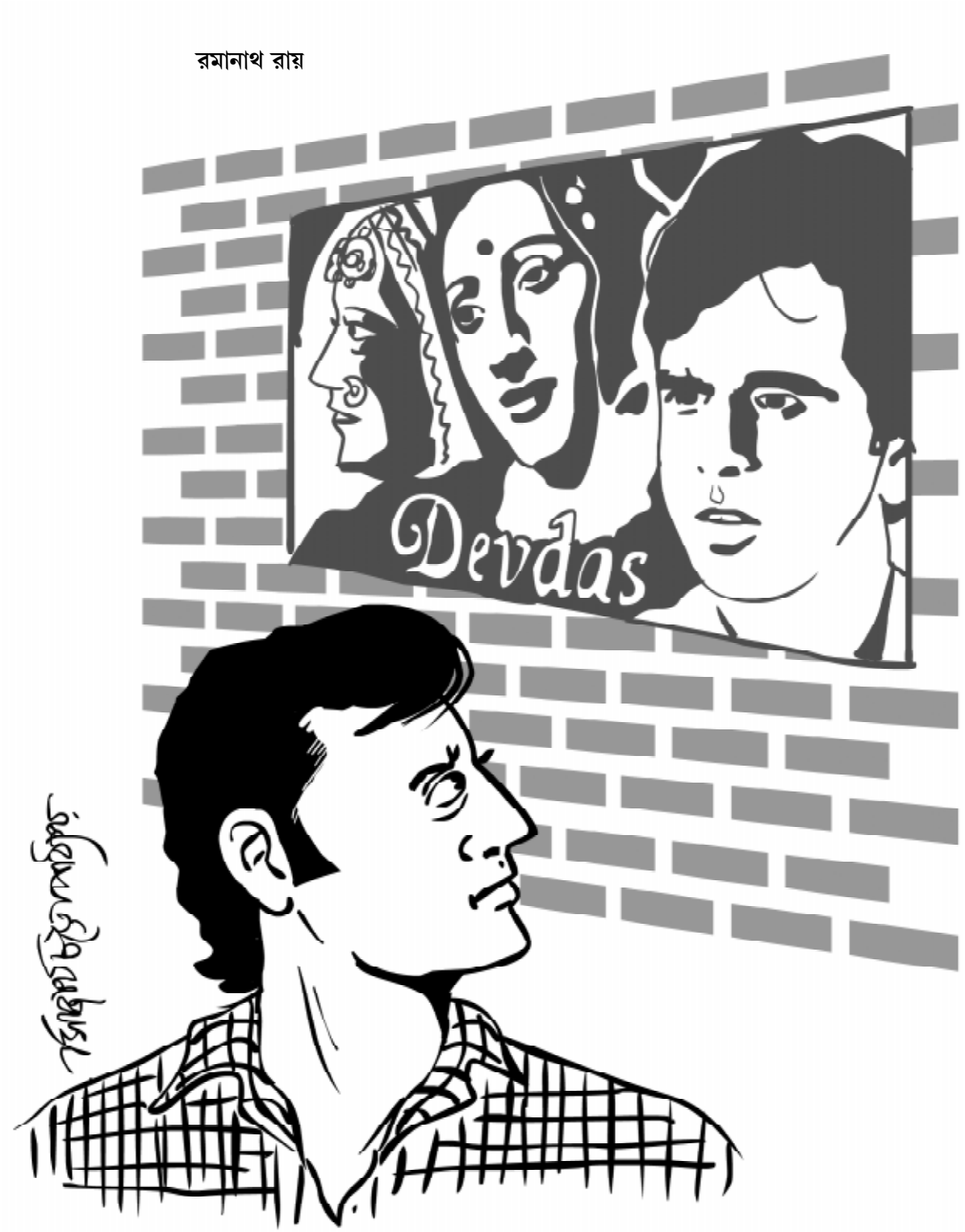

চিনি সিনেমায় নামবে। নামতেই পারে। তার জন্য আমার কিছু করার নেই। আমি বড়জোর বলতে পারি, সিনেমার পথটা খুব সহজ সরল নয়, তুমি এ পথ থেকে সরে এসো। কিন্তু চিনি কি আমার কথা শুনবে? না কি আমার কথা বুঝবে? প্রথমে ভেবেছিলাম, কথাটা বলব না। বলে লাভ হবে না। চিনি যা করতে চায় করুক। ও যদি সুচিত্রা সেন হতে চায়, হোক। আমার তাতে কোনও আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু আমি চুপ করে বসে থাকতে পারলাম না। কী করে থাকব? চোখের সামনে দেখব, চিনি প্রযোজক আর পরিচালকদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। সেটা কি আমার ভালো লাগবে? চিনির বাবা-মাই বা কীরকম? মেয়ের কাজে বাধা দিতে পারছে না! বুঝতে পারছে না এ পথে গেলে আর ফেরার রাস্তা নেই। হয় উত্থান, নয় পতন। আর পতন মানে যে সে পতন নয়, একেবারে নিদারুণ পতন। ব্যর্থতা, অপমান, অবহেলা জীবনকে কুরে কুরে খাবে। তখন কেউ ওর কথা ভাববে না, ওর দিকে ফিরেও তাকাবে না। সেটা কি ভালো হবে? আর যদি উত্থান হয়, সেই বা ক'দিনের? বয়স বাড়লেই আর কোনও গুরুত্ব থাকবে না। সারা জীবন ধরে অভিনয় করে গেছে এমন অভিনেত্রীর সংখ্যা কম, খুবই কম। সুতরাং এ পথে চিনির না যাওয়াই ভালো। জানি, চিনি আমার কথা শুনবে না। না শুনলেও কথাটা বলা দরকার।

একদিন রাস্তায় ফুচকা খেতে খেতে চিনিকে বললাম, তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

চিনি জানতে চাইল, কী কথা?

বললাম, ফুচকা খেতে খেতে সেকথা বলা যাবে না।

— কেন?

— খুব জরুরি কথা। একথা বলার জন্য কোথাও গিয়ে বসা দরকার। দাঁড়িয়ে ফুচকা খেতে খেতে একথা বলা যাবে না।

— তাহলে বোলো না।

— তা হয় না। কথাটা আমাকে বলতে হবেই। তোমার তা শোনা দরকার।

— কিন্তু কী এমন কথা তোমার যে ফুচকা খেতে খেতে তা বলা যায় না!

— খুব জরুরি কথা।

— আমি কোনও জরুরি কথা শুনতে চাই না। শুনতে ভালো লাগে না।

— কিন্তু কথাটা তোমার ভালোর জন্য বলতে চাই।

— আমার ভালো আমি বুঝব। তোমার কাছ থেকে তা জানতে চাই না।

— একথা বলতে পারলে?

— পারলাম।

— তাহলে আমার কিছু করার নেই। বলে আমি ফুচকার দাম মিটিয়ে চলে গেলাম। চিনির দিকে আর ফিরে তাকালাম না।

চিনি আমাকে পিছন থেকে ডাকল, এই! চলে যাচ্ছ কেন?

আমি কোনও উত্তর দিলাম না।

।। ২।।

রাত্রিবেলা চিনি আমাকে ফোন করল।

— কী করছ?

— তা জেনে তোমার কী হবে?

— এটা আমার হওয়া বা না-হওয়ার প্রশ্ন নয়। একটা সাধারণ প্রশ্ন তোমাকে করেছি। তুমি তার উত্তর দেবে।

— কেন উত্তর দেব?

— তাহলে দিও না। — বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

আমি এতে খুশি হলাম। আমি আমার গায়ের ঝাল মেটাতে পেরেছি। সত্যি, আমার খুব রাগ হয়েছিল। সিনেমায় নামার ব্যাপারে আমি ওকে সাবধান করতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, কোথাও বসে কথাটা বোঝাব। এই কথাটা ছিল খুব জরুরি। ফুচকা খেতে খেতে একথা বলা যায় না। এটা চিনির জীবন-মরণের সমস্যা। আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম সিনেমায় নামার পথ মসৃণ নয়। প্রতি মুহূর্তে হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর হড়কে গেলে জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে। আমার মতে, সিনেমায় নামার চেয়ে কবিতা লেখা ভালো। কবিতা লিখে টাকা হয় না ঠিকই, কিন্তু খ্যাতি হতে পারে। অবশ্য কবিতা লিখে খ্যাতি পাওয়াও সহজ নয়। কবিতা লিখে ছাপানোর সমস্যা আছে। বই বের করার সমস্যা আছে। টাকা থাকলে এসব কোনও সমস্যা নয়। নিজের পয়সায় কাগজ বের করা যায়। বই বের করা যায়। একে ওকে ধরে পুরস্কার পাওয়া যায়। আমি তার জন্য চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কবিতা ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢোকে না। যেমন, আমি আজও জানি না মানুষ কেন কবিতা লেখে। কী পায় তারা কবিতার মধ্যে। নিশ্চয় তারা আনন্দ পায়। নইলে তারা কবিতা লিখবে কেন? অনেকে কবিদের নিয়ে ঠাট্টা করে। তবু কবিরা কবিতা লেখা ছাড়ে না। সব অপমান উপেক্ষা করেই তারা কবিতা লেখে। এ বড় শক্ত কাজ। মনের জোর না থাকলে কবিতা লেখা যায় না। যাদের এই জোর থাকে না তারা একসময় কবিতা লেখা ছেড়ে দেয়। আমি কোনওদিন কবিতা লিখিনি। কবিতা লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার দু-একজন বন্ধু কবিতা লিখত। তারা কোথাও কবিতা ছাপাতে না পেরে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে। আমি তাদের কবিতা পড়েছি। পড়ে কিছু বুঝতে

পারিনি। না পারলেও প্রশংসা করেছি। কারণ, কবিদের মনে দুঃখ দিতে চাই না। কবিদের মন খুব নরম হয় শুনেছি। এমনিই কবিরা কবিতার চিন্তায় ভালো করে খেতে পারে না, ঘুমোতে পারে না। দিন দিন তারা রোগা হয়ে যায়। আমি আজ পর্যন্ত কোনও স্বাস্থ্যবান কবি দেখিনি। সুতরাং তাদের কোনওসময় দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। প্রশংসায় তাদের খিদে হয়। ঘুম ভালো হয়। স্বাস্থ্যও ভালো হয়। তারা মনের আনন্দে থাকে। চিনি যদি সিনেমা ছেড়ে কবিতা লেখে তাহলে ভালো হয়। ওর কবিতা ছাপার জন্য আমি পত্রিকা বের করব। ওর কবিতার বই আমি বের করব। ছদ্মনামে আমি ওর বইয়ের প্রশংসা করব। তারপর আমি অনুষ্ঠান করে ওকে পুরস্কার দেব। আমি এই কথাটাই ওকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও আমাকে পাত্তাই দিল না। ঠিক আছে, আমিও ওকে পাত্তা দেব না। ও যা চায় করুক।

এইসময় আবার চিনি ফোন করল—

— তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?

— করেছি।

— আমি দুঃখিত। তুমি এখন যা বলতে চেয়েছিলে বলো। আমি ধৈর্য ধরে শুনব।

— কিন্তু এখন আমার ধৈর্য ধরে বলার সময় নেই।

— কবে তোমার সময় হবে?

— বলতে পারছি না।

— তার মানে তুমি এখনও আমার ওপর রেগে আছো? একটুও রাগ কমেনি।

আমি এবার এর উত্তর না দিয়ে ফোন বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে লাভ হলো না। চিনি একটু পরে আবার ফোন করল—

— আমি এবার তোমার ওপর রেগে গেছি।

— তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

— কী বললে?

— যা বলেছি তা তো শুনতেই পেয়েছ।

— তোমার কথা বলার এ কী ছিরি। আগে তো এভাবে কথা বলতে না। তুমি নতুন

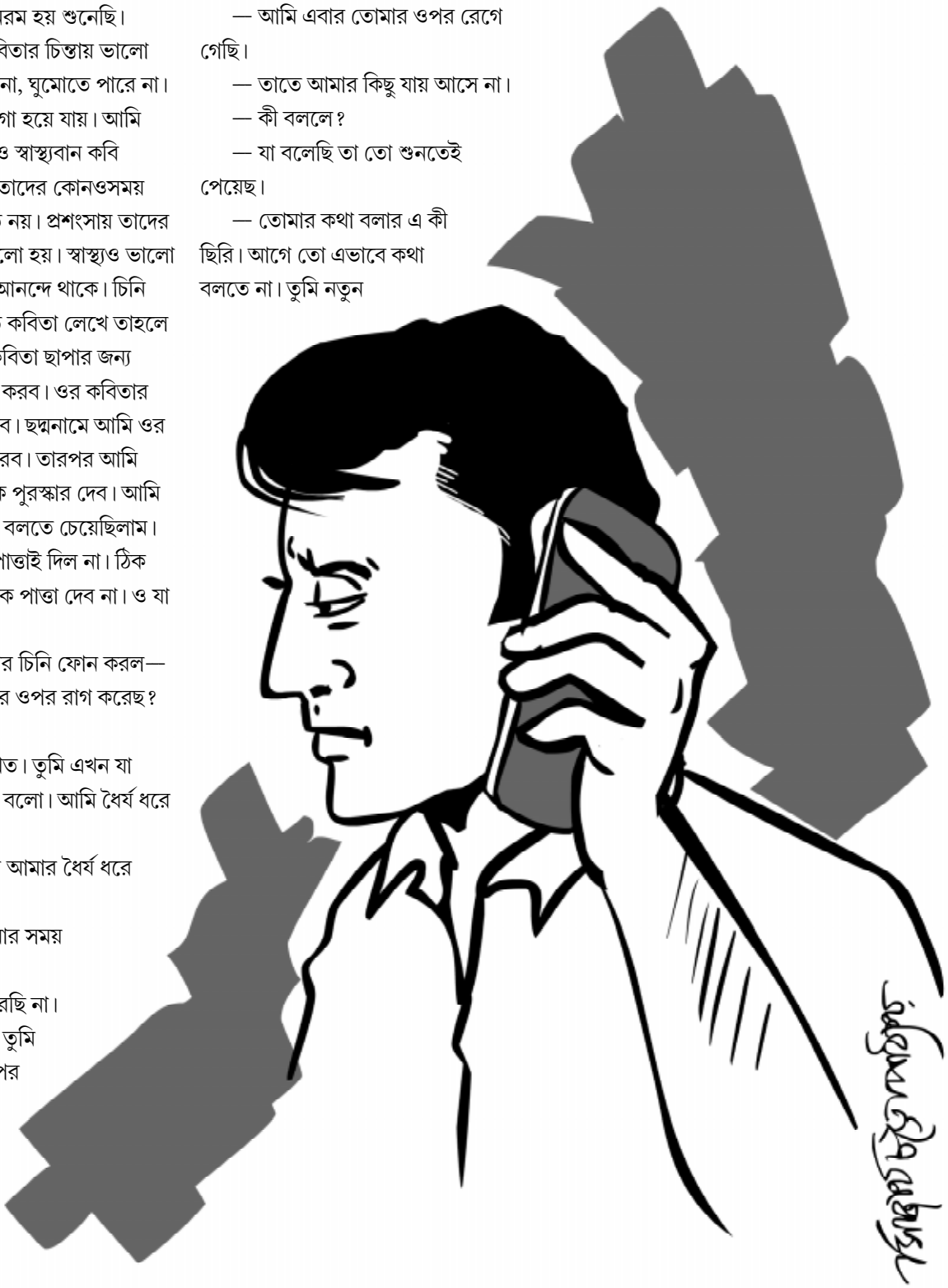

কোনও মেয়ের পাল্লায় পড়েছ?

— আমি পড়িনি। তুমি পড়েছ।

— এই! বাজে কথা বোলো না।

— যা সত্যি তাই বলেছি। — বলে আমি আবার ফোন বন্ধ করে দিলাম।

চিনিও আর আমাকে ফোন করল না।

।। ৩।।

রাগ কারও বেশিদিন থাকে না। আমার রাগও আস্তে আস্তে পড়ে এল। তারপর শুরু হল অনুতাপ। মনে হল, আমি ভুল করেছি। আমি অন্যায় করেছি। কারণ, ফুচকা খেতে খেতে আমি কথাটা চিনিকে বলতে পারতাম। বললে মহাভারত অশুদ্ধ হতো না। রাগ দেখিয়ে চিনিকে ছেড়ে চলে আসা আমার ঠিক হয়নি। তারপর চিনি যখন আমাকে বারবার ফোন করল, তখন আমার কথা বলা উচিত ছিল। বারবার ফোন বন্ধ করে দেওয়া আমার উচিত হয়নি। আমার এবার ক্ষমা চাওয়া উচিত। বলা উচিত, আমি অন্যায় করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু চিনি কি আমাকে ক্ষমা করবে?

আমি একদিন চিনিকে ফোন করলাম। বললাম—

— আমাকে ক্ষমা করো।

চিনি বলল, আমি ব্যস্ত। পরে ফোন কোরো। — বলে ফোন বন্ধ করে দিল।

দুদিন পরে আবার ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম—

— তুমি কি ব্যস্ত?

— হ্যাঁ।

— কথা বলা যাবে না?

— না। — বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

আমি হাল ছাড়লাম না। দু-দিন পরে আবার ফোন করলাম। বললাম, তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।

চিনি বলল, তোমার কথা শোনার সময় আমার নেই।

— তুমি কি ব্যস্ত?

— হ্যাঁ।

— তাহলে কখন ফোন করব?

— ফোন আর করতে হবে না।

— কেন?

— তুমি একটা অসভ্য, তুমি একটা ইতর, তুমি একটা জানোয়ার— বলে চিনি ফোন বন্ধ করে দিল।

বুঝলাম, চিনি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। রাগা স্বাভাবিক। কিন্তু চিনির রাগ কবে পড়বে? আমি কতদিন অপেক্ষা করব? কতদিন?

এদিকে শীত চলে যাচ্ছে। বসন্ত আসছে। মিষ্টি বাতাস গায়ে এসে লাগছে। এইসময় একা একা ঘুরতে ভালো লাগে না। কেবলই চিনির কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এইসময় চিনি পাশে থাকলে ভালো হতো। আমার ভালো লাগত। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা কথা বলতাম। ফুচকা খেতে খেতে আমরা কথা বলতাম। পার্কে বেঞ্চিতে বসে আমরা গল্প করতাম। এখন আর তা হবে না। বসন্ত চলে যাবে। আস্তে আস্তে গরম পড়বে। তখন আর গরমে হাঁটতে ইচ্ছে করবে না। ফুচকা খেতে ইচ্ছে করবে না। পার্কে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করবে না। দুঃখের কথা, কলকাতায় বসন্ত বেশিদিন থাকে না। দুদিন এসেই চলে যায়।

বুঝতে পারলাম না, এখন কী করব? চিনির বাড়ি যাব?

।। ৪।।

অনেক ভেবেচিন্তে কিছুদিন পর চিনিদের ফ্ল্যাটে গেলাম। চিনির বাবা ছিলেন না। ছিলেন চিনির মা। চিনির মাকে আমি মাসিমা বলে ডাকি।

মাসিমা আমাকে দেখে বললেন, এসো। বোসো।

আমি সোফায় বসলাম।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, চা খাবে?

বললাম, না। — বলে জিজ্ঞেস করলাম, চিনি কোথায়?

মাসিমা অবাক হয়ে বললেন, তুমি কিছু জানো না?

— না।

— চিনি কিছু বলেনি?

— না।

— চিনি মুম্বই গেছে।

আমি এবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

মাসিমা হেসে বললেন, চিনি একটা হিন্দি সিনেমায় ভালো সুযোগ পেয়েছে।

— নায়িকার ভূমিকায়?

— হ্যাঁ।

— এতো খুব ভালো খবর। কিন্তু আমাকে কথাটা জানাল না কেন?

— তা জানি না।

আমি একটু থেমে জিজ্ঞেস করলাম, চিনি ফিরবে কবে?

— ফিরতে দেরি হবে।

— এতদিন থাকবে কোথায়?

— মুম্বইতে ওর মামার ফ্ল্যাট আছে। আপাতত ওখানেই থাকবে।

— যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কারণ মুম্বই গিয়ে থাকা খাওয়ার খুব অসুবিধা হয় শুনেছি।

— সে চিন্তা আমার নেই।

আমি এবার কী বলব বুঝতে না পেরে বললাম, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি চিনি একজন সফল নায়িকা হয়ে উঠুক। হয়ে উঠুক রেখা, শ্রীদেবী কিংবা প্রিয়াংকা চোপড়া।

মাসিমা বললেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। — বলে বললেন, মাঝে

মাঝে ওকে ফোন করো।

— করব। নিশ্চয় করব। — বলে আমি চলে এলাম।

রাস্তায় পা দিয়ে আমার দুশ্চিন্তা হলো। আমি যে ভয় করেছিলাম, তাই হল। চিনির কোনও অভিজ্ঞতা নেই। চিনি জানে না সিনেমার জগত সুখের নয়। এখানে প্রতি মুহূর্তে বিপদ। প্রযোজক, পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মনে কী আছে তা জানার উপায় নেই। এখানে শুনেছি সকলেই সকলের প্রতিযোগী, সকলেই সকলের শত্রু। এখানে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। আমি তো এই কথাটাই চিনিকে বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেকথা বলার সুযোগ হলো না। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম, সে সুযোগ আমি নষ্ট করেছি। এখন আর কিছু করার নেই। মনে হচ্ছে আমি চিনিকে হারালাম। মনে হচ্ছে মুম্বই ওকে শেষ করে দেবে।

আমি চিনির জন্য দু-ফোঁটা চোখের জল ফেললাম।

।। ৫ ।।

ভুল, ভুল, চিনিকে শেষ করার সহজ নয়, এক বছরের মধ্যে চিনি বেশ নাম করে ফেলল। প্রথম সিনেমা 'দেবদাস'-এ পার্বতীর ভূমিকার চিনির অভিনয় সাড়া ফেলে দিল। কাগজে কাগজে ওর প্রশংসা ওর ছবি ছাপা হলো। দেবদাস-এর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রণবীর। হিন্দিতে বহু 'দেবদাস' হয়েছে। কিন্তু এবারের দেবদাস আগের সব ছবিকে ছাপিয়ে গেল। ছবির পরিচালক একেবারে নতুন। সে এই ছবি করে পুরস্কার পেল। চিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেল। চিনির মধ্যে যে অভিনয়ের প্রতিভা ছিল তা আমি জানতাম না। 'দেবদাস' দেখে আমিও মুগ্ধ হলাম। তারপর চিনির মোবাইলে একটার পর একটা ফোন করলাম। মেসেজ পাঠালাম। কিন্তু চিনির কাছ থেকে কোনও উত্তর পেলাম না। ফোন করলে বেশিরভাগ সময় এনগেজড্ থাকে। নয় আউট অফ রিচ থাকে। শেষে হাফ ছেড়ে দিলাম। দিয়ে একদিন চিনির মার সঙ্গে দেখা করলাম। চিনির মা বললেন, চিনির সঙ্গে রোজ রাত্রে কথা হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি ফোন করলে ফোন এনগেজড্ থাকে কেন? চিনির মা বললেন, জানি না। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, চিনি ভালো আছে তো?। চিনির মা বললেন, হ্যাঁ, ভালো আছে। ও এখন নতুন

একটা সিনেমায় কাজ করছে। ছবিটার নাম 'দিল খুশ হ্যায়'। কথাটা শুনে চিনির মঙ্গল কামনা করে চলে এলাম।

এক বছর পরে 'দিল খুশ হ্যায়' মুক্তি পেল। প্রথম দিনেই টিকিট কেটে হলে ঢুকলাম। হল ভর্তি লোক। ছবি শেষ হতেই সকলের মুখেই চিনির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। আমারও চিনির অভিনয় ভালো লাগল। এখানে নায়ক হৃত্বিক রোশন। নায়িকা চিনি। গল্প এমন কিছু নয়। মান্ধাতা আমলের ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। তবে হৃতিকের নাচ আর চিনির অভিনয় দেখার মতো। আমি আবার ফোনে চিনিকে ধরার চেষ্টা করলাম। কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। শেষে হঠাৎ একদিন চিনিকে পেয়ে গেলাম। চিনি ফোন ধরেই বলল, আমি ব্যস্ত। আমাকে ফোন করে বিরক্ত করো না।

কথাটা শুনে আমার খারাপ লাগল। চিনি এখন বিখ্যাত অভিনেত্রী। কিন্তু একসময় চিনি তো আমাকে ভালোবাসত। আমিও চিনিকে ভালো বাসতাম। বিখ্যাত হয়ে কি সেসব কথা ভুলে গেল? সব অভিনেত্রীরাই কি এরকম হয়? হতেই পারে। আমাকে আর চিনির দরকার নেই। এখন তার দরকার প্রযোজক আর পরিচালকদের। এখন তাদের সঙ্গে ওঠাবসা। আমাকে আর চিনির মনে থাকার কথা নয়। চিনির ওপর আমার ভীষণ অভিমান হলো, রাগ হলো। ঠিক করলাম, চিনির কোনও সিনেমা আমি আর দেখব না। কিন্তু দেখতে না চাইলেও খবরের কাগজে চিনির ছবি দেখতে হয়। পড়তে হয় তার সম্পর্কে নানা গুজব ও কেচ্ছার কথা। একবার পড়লাম এক পরিচালকের সঙ্গে নাকি ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছে। তারপর একদিন পড়লাম চিনি নাকি এখন এক শিল্পপতির সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে দিন কাটাচ্ছে। কাটাক। চিনি যা খুশি করুক। আমি আর ওকে ভালোবাসবো না। চিনি মুছে যাক। আমার জীবন থেকে মুছে যাক।

মা একদিন বলল, আমার বয়স হচ্ছে। এবার তুই বিয়ে কর।

বাবাও সেই কথাই বললেন।

আমিও বাধ্য ছেলে হয়ে বিয়ে করলাম। বউয়ের নাম তনু। তনুর বড় গুণ সে কবিতা লেখে না, গান গায় না, সিনেমায় নামার মোহ নেই। তনু সংসার করতে ভালোবাসে। আমি তো এরকম বউ চাই।

শান্তিতে আমার দিন কাটতে লাগল। আমি আর চিনির কথা ভুলেও ভাবি না। চিনি খ্যাতি নিয়ে সুখে আছে, সুখে থাকুক।

তিন বছর পরে আমার একটা মেয়ে হল। সবাই বলল, ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। আমি তাই বললাম। আমি আদর করে মেয়ের নাম রাখলাম— পরি।

পরির বয়স দিনদিন বাড়তে লাগল। পনেরো বছর হতে না হতে পরি হিন্দি সিনেমার পোকা হয়ে উঠল। সব সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের নাম তার মুখস্থ। আমি সিনেমা বড় একটা দেখি না। ফলে কোন নায়ক বা নায়িকা উঠছে বা ডুবছে তার খবর আমি রাখি না।

একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলাম, চিনির অভিনয় কেমন লাগে?

পরি খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, চিনি! সে আবার কে?

— একসময় খুব নাম হয়েছিল।

— এবার মনে পড়েছে। চিনির একটা দুটো সিনেমা দেখেছি। রাবিশ।

আমি আর কিছু বললাম না। চুপ করে গেলাম।

।। ৬ ।।

কলকাতায় আবার দুদিনের জন্য বসন্ত এল। রাস্তায় রাস্তায় শিমূল গাছ লাল ফুলে ভরে গেল। সেই ফুলে দিকে তাকিয়ে আমার কষ্ট হতে লাগল। কেন তা জানি না।

ঠিক এইসময় একদিন হঠাৎ একটা ফোন এল—

— হ্যালো...

— আমি চিনি বলছি।

— চিনি! কেমন আছে? কোথায় আছ?

— আমি ভালো নেই। এখন কলকাতায় সেই পুরনো ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছি।

— তোমার সিনেমার কী খবর?

— আমি আর সিনেমা করি না। — বলে একটু থেমে চিনি জিজ্ঞেস করল, আমি একটা কথা জানতে চাই।

— অনেক বছর আগে ফুচকা খেতে খেতে তুমি একটা কথা আমাকে বলতে চেয়েছিলে। কথাটা কী?

কথাটা মনে থাকলেও বললাম, ভুলে গেছি।

— না, তুমি ভোলোনি। তুমি একবার আমার কাছে আসবে?

— কেন?

— অনেক কথা আছে। আমরা আবার আগের মতো...

— কিন্তু আমার যে কোনও কথা নেই। আমার এখন বয়স হয়েছে।

— হোক বয়স। তুমি একবার এসো, প্লিজ

— চেষ্টা করব। — বলে ফোন বন্ধ করে দিলাম।

।। সমাপ্ত ।।

লেখকের কথা : এরপর নায়কের সঙ্গে চিনির দেখা হয়েছিল কিনা তা জানি না। জানি না দেখা হলেও তাদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল। সম্ভব হলে আপনারা সেটা কল্পনা করে নিন।

ব্রিটিশ সংবাদপত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সারদা সরকার

সেদিন তাঁর ঠিকানা ছিল ওয়েস্ট লন্ডনের ১১২ গাওয়ার স্ট্রিট। ভারতীয় ছাত্রাবাসের একটি ঘরে এসেছেন বছর পঁচিশের এক তরুণ। সময়টা ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস। লিঙ্কনস ইন-এ আইন পড়তে এসেছেন তিনি। উদ্দেশ্য যতটা না আইন পড়া, তার থেকে বেশি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়কে একদম সামনে থেকে দেখা। সেদিনের সেই তরুণ ছিলেন ভারতমাতার বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। লিঙ্কনস ইন-এর আর্কাইভিস্ট মেগান ডানমেল আমাকে একটি নথি ইমেল করে পাঠান। সেখানে দেখি, লিঙ্কনস্ ইন-এ শ্যামাপ্রসাদের ছাত্র হিসাবে নাম নথিভুক্ত করার দিন তারিখ। আমি তাঁকে অনুরোধ করি, যাতে শ্যামাপ্রসাদের নাম তাদের বিখ্যাত অ্যালামনি লিস্টে ঢোকানো হয়। পরবর্তী ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্টের সময় তা নিশ্চয় করা হবে বলে কথাও দেন আর্কাইভিস্ট মেগান ডানমেল।

এই ঠিকানায় তখন আসতেন অগুনতি কৃতী মানুষ। এই বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, লালা লাজপত রাই, সরোজিনী নাইডু, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। গান্ধীজী ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে এসে এখানে একটি সর্বধর্ম সমন্বয় আলোচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এসে এখানকার ভারতীয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি উৎসর্গ করে গিয়েছিলেন, যেটি এখনও এখানে বাঁধানো রয়েছে—

'Be not ashamed, My brothers, to stand
Before the Proud and powerful with
your White Robes of Simpleness.
Let your Crown of Humility, Your Freedom,
Build God's Throne daily upon the ample
Bareness of your proverty
And knowing what is Huge is not Great, and
Pride is not everlasting.'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই বাড়িটি বোমার আঘাতে প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়, তাই এখন মানচিত্র থেকে মুছে গেছে এই

ভাগলপুরে সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার পথে শ্যামাপ্রসাদ (১৯৪২)।

লিংকনস্ ইন : এখানেই ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ যে সব রাস্তা দিয়ে হেঁটেছিলেন সেই রাস্তাগুলো তো চেনা হলো। লন্ডনে ১৯২৬ সালে লিঙ্কনস্ ইন কেমন ছিল সেই ছবি আর রাস্তাগুলি মিলিয়ে নিলে মোটামুটি একজন পঁচিশ বছরের ঝকঝকে বুদ্ধিদীপ্ত আইনের ছাত্রকে দেখতে পাই আমরা, যিনি ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়কে কাছ থেকে দেখছেন খুঁটিয়ে। এই অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই তাঁর কাজে লেগেছিল পরবর্তীকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে।

শ্যামাপ্রসাদকে নিয়ে ব্রিটিশ নিউজপেপার আর্কাইভে কী কী লেখা হয়েছে সেই নিয়ে একটু খুঁজে দেখা যেতেই পারে। চলুন না, একটু উঁকি দিয়ে দেখি সেই ইতিহাসের ইবাদৎখানায়। প্রথমেই বলে নিই— ব্রিটিশ সংবাদপত্রের পাতায় সেইসব ভারতীয়রাই গুরুত্ব পেয়েছেন, যাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক গুরুত্ব ভারতে ছিল অপরিসীম। সেদিক দিয়ে দেখলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, নেহরু, গান্ধীজীর পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশদের কাছে সেই গুরুত্ব পেয়েছিলেন।

মহাকালের কোনও টাইমলাইন হয় না, তাই আমরা এলোমেলো ঘুরে বেড়াব। ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৫৩— এই এগারো বছর মাত্র সময় দিয়েছে আমাদের ইতিহাস। সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল তাঁর, ততোধিক সংক্ষিপ্ত তাঁর রাজনৈতিক জীবন। সংবাদের শিরোনামে তিনি উঠে এসেছেন বারেবারে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের জন্যই।

প্রথম যে খবরটি আমাকে দুর্দান্তভাবে টানে, তা হল ১৯৫২ সালের পয়লা জানুয়ারি কভেনট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফ-এ বেরোনো কয়েকটি লাইন। তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেহরুর শাসনকাল। ব্রিটিশ মিডিয়া সবসময়ই গান্ধীজী অথবা নেহরুজীকে খুব সমীহ করে সম্মান জানিয়ে সংবাদ পরিবেশন করেছে। ভাবটা এই যে, এঁরা আমাদের লোক, অথচ সুভাষ বোস বা চন্দ্র বোস অথবা বোস কিংবা সুভাষচন্দ্রের সব খবরগুলিই কেমন যেন নির্লিপ্ত ভাবে বলা। ঠিক ঋণাত্মক নয়, কেমন যেন দায়সারাভাবে লেখা। যারা ব্রিটিশ শব্দবন্ধের সঙ্গে পরিচিত তারা বুঝবেন বিট্যুইন দ্য লাইন — এর মানে কী হয়। এই খবরগুলো লিখতে তাদের কত বিরক্তি হয়েছে। নেতাজীর খবরগুলো দেখে এটাই মনে হয়েছে, যদি সেইসময়ে 'মোস্ট হেটেড ইন্ডিয়ান' তক্‌মা ব্রিটিশ কাউকে দিত তাহলে তা বুঝি নেতাজীর পাওনা ছিল। শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ব্রিটিশ মিডিয়ায় তেমন স্থান না পেলেও রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ স্বাভাবিকভাবে শিরোনামে উঠে এসেছেন এবং নেতাজীর স্টাইলে সমান দায়সারায় এই খবরগুলোও ব্রিটিশ মাধ্যম লিখে গেছে। ব্রিটিশ তখন ভারতবর্ষ

ঠিকানার তদানীন্তন বাড়িটি। তাই ইংলিশ হেরিটেজের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বসানো যায়নি শ্যামাপ্রসাদের স্মারকসূচক নীল ফলক। আবেদনপত্রের উত্তরে ইংলিশ হেরিটেজের ঐতিহাসিক হাওয়ার্ড স্পেন্সার আমাকে লেখেন, শ্যামাপ্রসাদ লন্ডনে যে আরেকটি ঠিকানায় ছিলেন, সেটি খুঁজে বের করার জন্য। সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা স্মৃতিচারণায় বেশ একটি মজার ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। উনি লেখেন, শ্যামাপ্রসাদ লন্ডনে এসে ওঠেন গাওয়ার স্ট্রিটে, কিন্তু কিছুদিন পর আরেকটি বোর্ডিং হাউজে উঠে যান। সেখানে ছিলেন তাঁর বন্ধু গুরুসদয় দত্ত (যদিও বয়সে তিনি শ্যামাপ্রসাদের থেকে কিছুটা বড়ই ছিলেন), সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং যতীন্দ্রমোহন মজুমদার। তিন বন্ধু মিলে খুব আনন্দ করে থাকতেন। স্যার আর্থার কোনান ডয়েল লন্ডনে একটি স্পিরিট ফোটোগ্রাফির ইন্সটিটিউট চালাতেন। এঁরা তিনজনেই খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুপরবর্তী আত্মা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যোগদান করেন। স্পিরিট ফোটোগ্রাফিতে ধরা পড়ে শ্যামাপ্রসাদের মৃতা বোনের ছবি। গুরুসদয় দত্ত সদ্য তাঁর স্ত্রী সরোজনলিনীকে হারিয়েছিলেন, ছবিতে ভেসে ওঠে গুরুসদয় দত্তের স্ত্রীর ছবি। তাই জন্য এই তিন তরুণ আরও বেশি যেন বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। যাই হোক, এইসব ঘটনাই ঘটে সেই বোর্ডিং হাউজে থাকার সময়। সেই ঠিকানা বের করতে আবার দ্বারস্থ হই ব্রিটিশ অ্যানসেস্ট্রির সংগ্রহশালায়।

ডেটাবেস অনুসন্ধান করে যতীন্দ্রমোহন মজুমদারের ব্রিটেন ছেড়ে যাওয়ার দিনটির জাহাজযাত্রার বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে যে ঠিকানা দেওয়া ছিল, সেই অনুযায়ী শ্যামাপ্রসাদের সেই ঠিকানায়ই থাকার কথা। সেই ১২ নং আপার বেডফোর্ড প্লেসটিরও আর অস্তিত্ব নেই আজ। তার বদলে সেখানে আজ ইন্সটিটিউট অব এডুকেশানের বিশাল বাড়িটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই ইংলিশ হেরিটেজের তরফ থেকে ব্লু প্ল্যাকের সম্ভাবনা আর রইল না বটে,

ছেড়ে চলে গেছে বা যাবে বলে মনস্থ করেই নিয়েছে, তাই হয়তো নেতাজীর তুলনায় ঝাঁঝটা কিছুটা কম। এইভাবে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ বুঝিয়ে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের কাছে নেহরু-গান্ধী মিত্র হলেও, সুভাষচন্দ্র এবং শ্যামাপ্রসাদ মোটেই তা ছিলেন না।

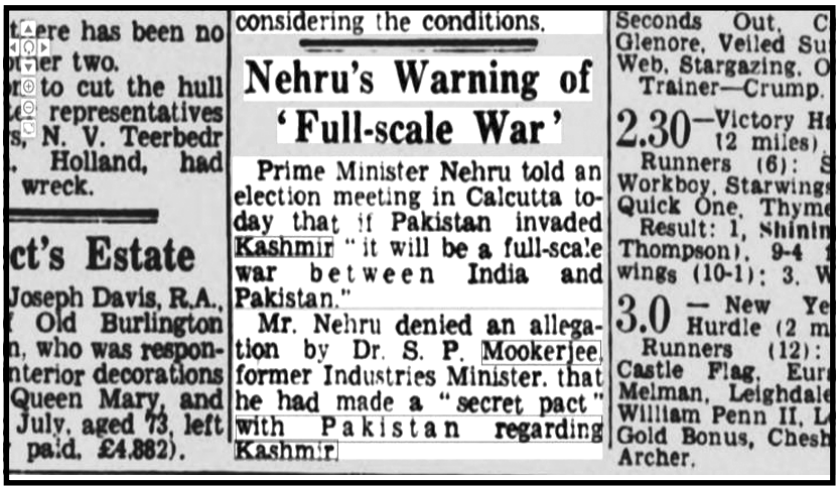

there has been no
other two.
to cut the hull
representatives
N. V. Teerbedr
Holland, had
wreck.

ct's Estate
Joseph Davis, R.A.,
Old Burlington
n, who was respon-
nterior decorations
Queen Mary, and
July, aged 73, left
paid, £4,882).

considering the conditions.

Nehru's Warning of 'Full-scale War'

Prime Minister Nehru told an election meeting in Calcutta today that if Pakistan invaded Kashmir "it will be a full-scale war between India and Pakistan."

Mr. Nehru denied an allegation by Dr. S. P. Mookerjee, former Industries Minister, that he had made a "secret pact" with Pakistan regarding Kashmir.

Seconds Out, C
Glenore, Veiled Su
Web, Stargazing, O
Trainer—Crump.
2.30—Victory H
(2 miles).
Runners (6): S
Workboy, Starwings
Quick One, Thyme
Result: 1, Shinin
Thompson), 9-4
wings (10-1); 3, W
3.0 — New Ye
Hurdle (2 m
Runners (12):
Castle Flag, Eur
Melman, Leighdale
William Penn II, L
Gold Bonus, Chesh
Archer.

খবরে লেখা হয়েছিল 'নেহরু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ যুদ্ধঘোষণা করবেন এমন হুমকি দিয়েছেন। নির্বাচনী সভা করতে এসে কলকাতায় নেহরু বলেন, যদি পাকিস্তান কাশ্মীরে আক্রমণ করে তাহলে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পুরোপুরি যুদ্ধে নামবে। সেই সঙ্গে তিনি প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। শ্যামাপ্রসাদ অভিযোগ এনেছিলেন যে নেহরু কাশ্মীর প্রসঙ্গে 'গোপন বোঝাপড়া' করে নিয়েছেন।' এটুকুই খবর— কিন্তু ভাবছি সেই সময়কার নেহরু, যখন ভারতবর্ষে তাঁর কথাই শেষ কথা, সেই সময়কার ব্রিটিশ রাজতন্ত্র তখনও সদ্য মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে ঢেঁকুর তোলার আবহে বাস করছে, সেই সময় ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী চার্চিল, যার পাকিস্তানপ্রেম এবং হিন্দুবিদ্বেষ কোনও কল্পকথা নয়, সেই অবস্থান থেকে নেহরুকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়াটা সহজ কথা ছিল না বৈকি। দেখুন, কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফ সেটা অস্বীকার করতে পারেনি।

পরের সংবাদটি অনেকগুলি কাগজে প্রকাশিত হয়েছে নিতান্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতায়। কিন্তু ব্রিটিশ ভদ্রতায় হুমড়ি খেয়ে নিন্দে করার কালচার নেই— যারা জানে তা জানে, এই নিরাসক্ত ভাবেই তারা তাদের মনোভাব বুঝিয়ে দেয়। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী তখন জেলে, ভারত ছাড়ো আন্দোলন তখন তুঙ্গে, 'হিন্দু চিফ' অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীর সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কিন্তু কেন? আসুন ব্রিটিশ দৈনিক 'ডেইলি মিরর'-এর সাংবাদিকের মুখে খবরটা শুনি।

'হিন্দু মহাসভার (হিন্দু জনমতের দক্ষিণপন্থী শাখা, লক্ষ্য করুন পুরো হিন্দু জনমত নয় কিন্তু— শুধু হিন্দুদের মধ্যেকার দক্ষিণপন্থী ভাগের কথাই বলা হয়েছে) প্রধান ড: মুখার্জি ভাইসরয়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন গান্ধীর সঙ্গে ভারতবর্ষের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিনি দেখা করতে চান। তিনি মুসলমান নেতা মি: জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনা সেরে নিয়েছেন এবং দিল্লি থেকে রিপোর্ট বেরিয়েছে যে, ড: মুখার্জি ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা এবং অন্তর্বর্তীকালীন স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারতীয় সরকার গঠনের উদ্যোগ নিতে বলেছেন। ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসের মতে, এরকম করা গেলে হিন্দু-মুসলিম বোঝাপড়া হতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। অন্যদিকে ভাইসরয় কাউন্সিলের ডিফেন্স মিনিস্টার, মুসলিম নেতা স্যার ফিরোজ খান নুন বলেছেন, 'কংগ্রেসের এই ধরনের রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। কারণ তারা দেশের শত্রু অর্থাৎ হিন্দু সংগঠন এবং শত্রুপক্ষের (অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে গান্ধীর আলোচনায় বসা) এবং শত্রুপক্ষের (ফিফথ্ কলামনিস্ট) কাজে গোপনে সাহায্য করে। মিস্টার চার্চিল হাউস অফ কমন্স-এ যা বলেছেন সেগুলো ভারতের বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ না করলেও সেটাই সত্যি। তিনি কোনওরকম রাখঢাক না রেখে বলেছেন হয়তো, কিন্তু যা বলেছেন সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।'

ডেইলি মিরর-এর খবরটি পরিবেশনের স্টাইলটা এমনই যে দেখে মনে হয় যেন চার্চিলের হিন্দু এবং ভারতবিরোধী জঘন্য বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ফিরোজ খান নুনের বক্তব্যটা বড় করে লেখা জরুরি ছিল। শ্যামাপ্রসাদের উদ্যোগ, ব্রিটিশ ইউনাইটেড প্রেসের বক্তব্য সবই যেন অত্যন্ত মামুলি, নেহাতই নিরাসক্ত ভাবে বলা। যেন না বললেও চলে, অথচ উপেক্ষাও করা যাচ্ছে না। তাই এভাবে বলতে হয় যে হিন্দু চিফ গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলতে চান। মানে গান্ধীর কোনও দোষ নেই, কিন্তু কংগ্রেস দূষিত হচ্ছে এই সব ফিফথ কলামনিস্টদের' পাল্লায় পড়ে। 'ফিফথ কলামনিস্ট' মানে যারা দেশের শত্রুদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রাখে এবং সমর্থন করে। এখানে তাহলে 'ফিফথ কলামনিস্ট' কারা? বুঝতে অসবিধা হয় না, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং ফিরোজ খান নুনের মতো মুসলিম নেতার মতে এই দক্ষিণপন্থী হিন্দুরাই দেশের শত্রু। এই খবরটিই প্রমাণ করছে স্বাধীনতার প্রাক্ লগ্নেই ব্রিটিশ এবং মুসলিম লিগ — উভয়েরই একটি জাতক্রোধ ছিল শ্যামাপ্রসাদের প্রতি।

এই দিনের খবর অন্য একটি কাগজে বেরোয় 'বেলফাস্ট নিউজ লেটার' বলে। লেখাটি সরাসরি তুলে দিলাম এখানে। লেখাটির প্রথম অংশ খুব মন ছুঁয়ে যাওয়া। ইতিহাস বইতে হয়তো এঁদের নাম নেই, কিন্তু এই বৈষ্ণবে পট্টনায়ক আর পবিত্রমোহন প্রধানকে আমরা জানতে পারলাম এই কাগজের মাধ্যমেই। স্বাধীনতা সংগ্রামী এই দুই ভারতীয়কে ধরিয়ে দিলে যথাক্রমে ১৫০ পাউন্ড এবং ১১০ পাউন্ড দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিল ব্রিটিশ সরকার। তখনকার হিসেবে সে বড় কম টাকা নয়। ২৬ আগস্ট পট্টনায়ক প্রায় ১৬ জন বিপ্লবীর সঙ্গে বোমা বন্দুক, তির-ধনুক নিয়ে পুলিশ চৌকি আক্রমণ করেছিলেন। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন সরকারি নথিপত্রে। শুধু তাই নয়, পরের বার প্রায় ৮০০ জন গ্রামবাসী নিয়ে আবার ৪ সেপ্টেম্বর আরেক জায়গায় হানা দিয়েছিলেন। যেসব গ্রাম তাদের মদত দিয়েছে তাদের প্রত্যেককে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিশাল জরিমানা দিতে বাধ্য করেছে। পবিত্রমোহন প্রধানের কথা এই স্বল্প পরিসরে আর বেশি লেখা হয়নি। কিন্তু ওড়িশা সরকারের সরকারি নথিতে তাঁদের অসীম বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

এখানে আরও লেখা হয়েছে যে, মুসলিম লিগ নেতা মৌলবি মহম্মদ আবদুল ঘানি খান দাবি করেছেন, ব্রিটিশ সরকারের আইন অমান্য করলে যে সাধারণ নাগরিকদের অত্যধিক জরিমানা করা হচ্ছে তার থেকে মুসলমানদের ছাড় দেওয়া হোক। এখানেও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, মুসলিম লিগ স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলিতে অবশিষ্ট ভারতবাসীর থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে আলাদা করে রাখতেই চেয়েছে।

যখন সাধারণ দরিদ্র গ্রামবাসীরা কেউই রেহাই পাচ্ছে না, স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হবার জন্য, তখন মুসলিম লিগ নেতার এহেন আচরণ মনে সন্দেহ আনে বৈকি! এখানে শুধুমাত্র লেখা হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে বসে ঠিক করতে চান, স্বাধীনতার রূপরেখা কী হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারই বা কীরকম হবে। সেখানে মহম্মদ আলি জিন্নাহ বলেছেন, পাকিস্তানের দাবি না মানা অবধি

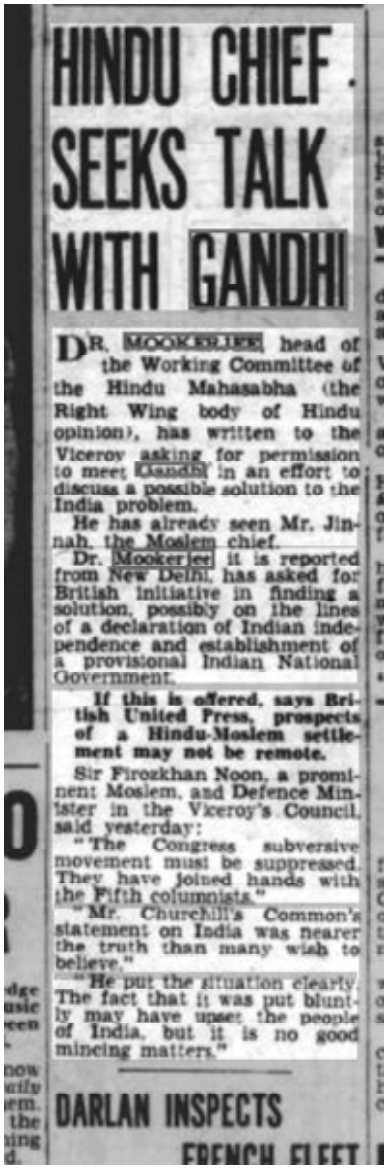

HINDU CHIEF SEEKS TALK WITH GANDHI

DR. MOOKERJEE, head of the Working Committee of the Hindu Mahasabha (the Right Wing body of Hindu opinion), has written to the Viceroy asking for permission to meet Gandhi in an effort to discuss a possible solution to the India problem.

He has already seen Mr. Jinnah, the Moslem chief.

Dr. Mookerjee, it is reported from New Delhi, has asked for British initiative in finding a solution, possibly on the lines of a declaration of Indian independence and establishment of a provisional Indian National Government.

If this is offered, says British United Press, prospects of a Hindu-Moslem settlement may not be remote.

Sir Firozkhan Noon, a prominent Moslem, and Defence Minister in the Viceroy's Council, said yesterday:

"The Congress subversive movement must be suppressed. They have joined hands with the Fifth columnists."

"Mr. Churchill's Common's statement on India was nearer the truth than many wish to believe."

"He put the situation clearly. The fact that it was put bluntly may have upset the people of India, but it is no good mincing matters."

DARLAN INSPECTS

FRENCH FLEET

মুসলিমরা কোনও সরকারে অংশ নেবে না। জিন্নাহের বক্তব্য যে, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ তো হিন্দুরা নিয়েই নিয়েছে, মাত্র এক চতুর্থাংশ ভাগ মুসলমানদের। তাতেও কি খুশি নয়! মুসলমানদের স্বার্থে তিনি আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে পারেন যেটা কংগ্রেসের চেয়ে আরও অনেক বেশি মাত্রায় ভয়ঙ্কর হবে সে কথা যেন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মনে রাখে। এর কয়েক বছর পরই ১৯৪৬ সালে ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ভিতর দিয়ে তা করেও দেখিয়েছিলেন জিন্নাহ। প্রকাশিত খবরটি হুবহু তুলে দিচ্ছি।

TERRORISTS Reward for Arrest of Leaders Bombay, Sunday --- The state of Orissa to-day announced rewards of 150 and 119 respectively for the arrest of the leaders, Vaishnave Patnaik and Pabitramohan, for two attacks on a police station. Villages which gave assistance to Patnaik's gang have been fined. An official said to-day that Patnaik, with 16 others, armed with guns, arrows and other weapons, raided the police station on August 26 and burned the records of the court and other public institutions. Patnaik led nearly 800 men in a later attack on September 4, said the official. The situation was now completely normal. Four effigies of Mr. Churchill were burnt in various parts of Bombay today. At one incident 12 people were arrested.

-- Reuter. Maulvi Muhammed Abdulghani, of the Moslem League, has resolution down exempt Moslem British India from the payment of collective fines imposed under the Defence of India rules in connection with the civil disobedience move-

ment.' The Hindu Mahasabha Committee, it is understood, has applied for permission to interview Gandhi and other Congress leaders now in detention. Dr. S.P. Mookherjee, working President of the Mahasabha, and others of the committee stated; We feel that our efforts have reached a stage which demands immediate consultation with Mr. Gandhi and the leaders of the Indian National Congress.' Pakistan Mr. Jinnah, the Moslem leader, said today that the Moslems would unprepared to enter a provisional Government unless their demand for Pakistan were met. With this provision in favour of any amount of transfer of power,' he said. According to our latest resolution on Pakistan it means that three quarters of India goes to the Hindus and one quarter to the Moslems, but even then the Hindus want to diddle us. Any provisions outside the framework of the present constitution must necessarily involve radical and fundamental constitutiional changes, and once the changes have been made it would be diffcult for us to attain after the war the guarantee on which we are insisting.' Mr. Jinnah said it was in the power of the Moslems to cause the British Governmenrt far greater embrrassment that the Congress Party, but they were not disposed to take such action however they might deplore Brithsh policy in India during the past three years. Blunt, but true Firoz Khan Noon, defence Minister, said today that the continuation of the status quo regard to the political situation will not make any difference to defence, the situation was under control'।

INDIAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

Conflicting Views on Gandhi's Campaign

NEW DELHI, Sunday.

MR. CHURCHILL'S statement on India, and the Commons debate, will influence the Indian Legislative Assembly, which opens to-morrow to discuss the political situation.

To the motion by Mr. M. S. Aney, leader of the Assembly: "That the situation in India be taken into consideration." Dr. P. N. Bannerjee, Nationalist Party Leader, has tabled an amendment urging release of all Congressmen and the formation of an Indian

it was put bluntly may have upset the people of India, but it is no good mincing matters."

Regarding the possibilities of some kind of interim Government being formed on a wider basis, he said that he saw little hope. "The British sold the Moslems to Congress through Sir Stafford Cripps, and it is up to the Hindus—the senior partner in the country—to make a move. Congress, however, I believe, will be incapable of a change of heart whether in prison or out."

About Britain's attitude to India he said: "My experience during a long stay in London was that the British have such an inferiority complex about the Indian problem that all they want is to

১৯৪২ সালে অনেক কাগজে শ্যামাপ্রসাদের নাম পাওয়া যায়। এই বছর ২১ নভেম্বর একটি খবর আসে হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেছেন। দু-লাইনের এই খবর আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হতে পারে কীইবা দরকার ছিল এই খবর ছাপানোর। কিন্তু শিরোনাম থেকে সব স্পষ্ট হয়ে যায়— 'হিন্দু রিজাইনস্'— যেন একটাই পরিচয় ছিল তাঁর।

পরের খবরটিও বেলফাস্ট নিউজ লেটারের। ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন মঙ্গলবার ওয়েভেল প্ল্যান চলছে সিমলায়। রাজগোপালাচারী গান্ধীজীকে বলেছেন অতিথি হিসেবে আসতে, কিন্তু মিটিংয়ে যেন তিনি যোগদান না করেন। সারা ভারত থেকে এসেছেন নেতারা, মিটিংও বেশ ভালো চলছে। ভাইসরয় মাঝেমাঝে গল্‌ফ খেলছেন। এবার একটা না একটা সেটেলমেন্টের রাস্তা বেরিয়ে যাবেই। শেষ দুটি লাইনে লেখা হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পুণায় হিন্দুদের একটা মিটিং ডেকেছেন। আর সেখানে তিনি বলেছেন, ওয়েভেল প্ল্যান যাতে কার্যকর না হয়, তার জন্য আরও অনেক বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এমনকী ১৯৪২ সালের আন্দোলনও যাতে ম্লান হয়ে যায় এরকম। ব্রিটিশ মিডিয়ায় এই ধরনের খবর বারবার এসেছে। যেন চার্চিলই বিভিন্ন কাগজের মাধ্যমে কথা বলছেন। বোঝাই যাচ্ছে, 'হিন্দু নেতা' শ্যামাপ্রসাদকে একেবার অস্বীকার করতে পারছে না ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম।

১৯৪৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াণের পর, অনেক কাগজে এসেছে শ্যামাপ্রসাদের নাম, আর এস এসের নাম। হার্টলেপুল নার্দার্ন ডেইলি মেল লিখছে 'আজ মহাত্মা গান্ধীর

অস্থিভস্ম গঙ্গায় বিসর্জন করে পণ্ডিত নেহরু লোকসভায় ভাষণ দিয়েছেন— 'ভারতীয় হিসেবে এবং হিন্দু হিসেবে তিনি লজ্জিত যে আমরা আমাদের ভারতীয়দের মূল্যবান রত্ন গান্ধীজীকে রক্ষা করতে পারিনি। আরও লজ্জার বিষয় যে, একজন হিন্দু এই জঘন্য কাজ করেছে আর যাকে হত্যা করা হয়েছে তিনি শুধু একজন প্রকৃত ভারতীয় নয়, একজন প্রকৃত হিন্দুও বটে। সংসদের বাইরে যখন স্লোগান উঠছিল আর এস এস মুর্দাবাদ, কারণ গান্ধীর হত্যাকারী একজন আর এস এস সদস্য, তখন নেহরু বলেন, এই ঘৃণার বাতাবরণ সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। ভারতীয় পুলিশ দেশের নানা জায়গা থেকে হিন্দু উগ্রবাদীদের অ্যারেস্ট করেছে, তেমন আবার পাল্টা আক্রমণেরও খবর পাওয়া গিয়েছে। উন্মত্ত জনতা বম্বেতে হিন্দু মহাসভার সদস্যদের বাড়িতে পাথর ছুঁড়েছে, আর তার মোকাবিলা করতে পুলিশ ২ রাউণ্ড ওপেন ফায়ার করেছে। কলকাতায় ক্রুদ্ধ জনগণ ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়িতে ঝড়ের মতো পাথর ছুঁড়েছে।'

উপরের লেখাটি মোটামুটি আক্ষরিক অনুবাদ করে দেওয়া। এই দিনের আরও কয়েকটি কাগজে একই ঘটনার কথা বেরিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, গান্ধী হত্যার সঙ্গে আর এস এস কোনওভাবে জড়িত না হলেও, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম প্রথম থেকেই তাতে আর এস এসের নাম জড়িয়ে দিতে চেয়েছে। পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের শেখানো অভিযোগই করেছে কংগ্রেস।

ডার্বি ডেইলি নিউজ কাগজেও একই কথা— প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী এবং হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্টের কলকাতার বাড়িতে ভাঙচুর করেছে উন্মত্ত জনতা। পুলিশ এসে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে তাদের এবং দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। বাড়ির সামনে সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছে। হায়দরাবাদে বিজয় কেস্কার নামের হিন্দু মহাসভার (হিন্দু জঙ্গি সংগঠন) একজন নেতার বাড়িতে একদল কংগ্রেস কর্মী চড়াও হয়। মহাসভার এই জঙ্গি নেতার হাতে বন্দুক ছিল এবং তার বাড়ির ছাদের ওপর মহাসভার পতাকা অর্ধনমিত করা ছিল না। তার হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে পতাকা নামিয়ে দেয় কংগ্রেসের কর্মীরা। ব্যাঙ্গালোরে মহাসভার কর্মী জি ভি আমাচারের বাড়ির সামনে বোম ফাটালে তার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইসব হিন্দু নেতাদের সাধারণ মানুষের ক্ষোভের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ যথেষ্ট সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। নাগপুরে যথেচ্ছ লুঠতরাজ চলেছে এইসব হিন্দু নেতাদের উপর এবং এইসব নেতাদের বাড়ির সামনে সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে খবরগুলি সাজিয়েছে, যাতে মনে হয়, সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজ এবং হিন্দু নেতৃত্বই গান্ধী হত্যার জন্য দায়ী। বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ভারতের হিন্দু নেতাদের হেয় করার একটি লক্ষ্য ব্রিটিশদের ছিল। পরে ব্রিটিশদের স্থির করে দেওয়া এই লক্ষ্যেই কমিউনিস্টরা এদেশে হিন্দু নেতৃত্বকে বারবার আক্রমণ করেছে।

গান্ধী হত্যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার খবরটি দেখে ১৯৮৪ সালের ইন্দিরা গন্ধী হত্যার পর দেশজুড়ে শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষের ওপর যা অত্যাচার হয়েছে সেকথা মনে করিয়ে দেয়। ব্রিটিশ কাগজে লিখছে, হিন্দুদের ওপর যথেচ্ছ লুঠতরাজের কথা, তার মানে সেই নির্মমতার আসল রূপ না জানি কেমন ছিল। বারবার জঙ্গি সংগঠন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে হিন্দু মহাসভাকে। যেমন, আজকেও হিন্দু সংগঠনগুলিকে জঙ্গি আখ্যায় দেগে দিতে পছন্দ করেন নেহরুবাদী সেকুলার ও বামপন্থীরা। আজকের জমানায় বসে আমরা বুঝি আসল জঙ্গিপনা কাকে বলে, সেদিন ব্রিটিশরাও তা জানত। তবু তারা বারবার অতিরঞ্জিত করে লিখেছে এই শব্দবন্ধটি— শুধু নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য। গান্ধীহত্যা খুব খারাপ, কিন্তু হিন্দু মহাসভাও তো কোনও নিষিদ্ধ সংগঠন ছিল না। গান্ধী হত্যার প্রেক্ষিতটা বিচার করার প্রয়োজন নেই? আবার এই শ্যামাপ্রসাদের প্রয়াণেই যে কলকাতা শোকে আকুল হয়ে উঠেছিল, তাঁর শেষযাত্রায় যে নেমেছিল লক্ষ মানুষের ঢল, তাও ব্রিটিশ সংবাদপত্র অস্বীকার করতে পারেনি। সে প্রসঙ্গ শেষে আসছি।

১৯৪৭-এর এই খবরটিতে এসে থমকে দাঁড়াই আমরা। ব্রিটিশরা এমন নগ্নভাবে কাউকে আক্রমণ করে সাংবাদিকতা করে এমনটা বড় একটা দেখা যায় না। ভারতীয়দের এরা ধর্তব্যের মধ্যে ধরে না— কেবলমাত্র কটূক্তি শোনা গেছে নেতাজির বিরুদ্ধে, বাকি সবাই যেন সত্যি এলেবেলে। জিন্না যেমন এদের গুড বয়, তাঁর সাত খুন মাফ, নেহরুকে এরা ঠিক তেমন একটা বিপদ বলে মনে করেনি কখনও। গান্ধীজী যেন এদের শিখণ্ডী। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের লেখা এই খবরটি বেরিয়েছিল দ্য স্কটসম্যান কাগজে। শিরোনাম ছিল— 'Influence of the Mahasabha' Threat to Permanent Peace in India, Hatred of Moslems, by O. M. Green. "In the tension and fever of India today, one of the most dangerous elements is the Mahasabha (Great Society), quintessence of extreme Hinduism and hatred of Moslems. Its numbers are comparatively small, its political influence uncertain. But its ability to excite the passions of the Hindu mob by inflammatory slogans (just as Moslems may be roused by the cry 'Islam in danger') is justly feared. Its leaders have been conspicuous for their violence and pugnacity -- the once famous Dr. S. P. Mookherjee, formerly 'Vice-Chancellor of Calcutta University; the late,

still more militant Dr. Moonje, founder of two particularly aggressive movements, suddhi and sangathan. (roughly 'purification' and 'self-fortification'); and Mr. V. D. Savarkar, born in 1883, a barrister of London, is the typical aggressive Hindu. He was transported in 1909 for 14 years for abetting a murderous communal crime, and has since known the inside of an internment camp. He is not only anti-Moslem but anti-Congress, accusing it of 'a pro-Moslem mentality' and of having 'betrayed Hindu interests a hundred times'. The Mahasabha was born in 1906, in answer to the formation of the Moslem League at Dacca the year before. At that time, and for some years afterwards, the Mahasabha's aims were mainly religious. The Brahmins were alarmed by the numbers of Hindus who were being converted either to Christianity or Islam. Hinduism, it was said, was becoming lukewarm: intersive work was begun for the rescue and reconversion of backsliders."

India for Hinduism : "But religion in India soon merges into politics. By 1923 the Mahasabha had definitely 'put itself on the map' in its annual session at the sacred city of Benares, and a number of vigorous provincial branches were formed. By 1931 it was imperial enough to have its own representatives at the Round Table Conference in London. A few yeas later it was represented in the enlarged Council of the Viceroy. From the Benares session onwards the Mahasabha became more and more anti-Congress. Its watchword was 'India for Hinduism' and it has always violently opposed Mr. Ramsay MacDonald's 'Communal award' in 1932, by which separate communal electorates were secured in the provincial elections for Moslems, Sikhs, Christians, British-Indians and Europeans. Congress was bitterly attacked for accepting the award which, said the Mahasabha 'flouts the unanimous opinion of the Hindus.' With the election of Mr. Savarkar as President in 1937, the energies of

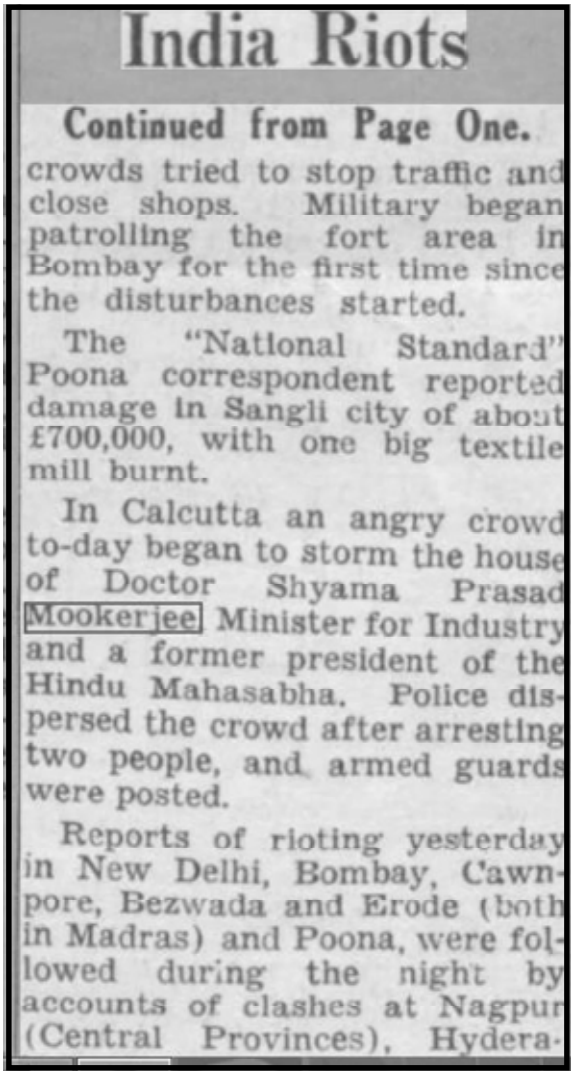

India Riots

Continued from Page One.

crowds tried to stop traffic and close shops. Military began patrolling the fort area in Bombay for the first time since the disturbances started.

The "National Standard" Poona correspondent reported damage in Sangli city of about £700,000, with one big textile mill burnt.

In Calcutta an angry crowd to-day began to storm the house of Doctor Shyama Prasad Mookerjee Minister for Industry and a former president of the Hindu Mahasabha. Police dispersed the crowd after arresting two people, and armed guards were posted.

Reports of rioting yesterday in New Delhi, Bombay, Cawnpore, Bezwada and Erode (both in Madras) and Poona, were followed during the night by accounts of clashes at Nagpur (Central Provinces), Hydera-

the Mahasahba took a pronounced military turn. The formation of Hindu gymnasiums, rifle clubs and volunteer militia corps was preached. On the outbreak of the Second World War in 1919, the Mahasabha (like the Moslems, but unlike Congress) pledged its support to Britain. But, said Mr. Savarkar at the 1940 session at Madura in South India' we must study how the war can best be used to promote the cause of pan-Hinduism. We should participate in the Government a war effort in order to bring about the militarisation of our people. "Partition Threat' : And in 1942 the Mahasabha called upon its followers to give no support to the Congress's rebellion and Gandhi's 'Quit India' slo-

gan. Leading members of the Mahasabha openly declared (though needless to say this will not be found in official documents) that Hindus must assist in the war in order to become proficient in the use of arms against the day. When they would have to fight the Moslems. For 20 years past the Mahasabha has stood for the independence of India, but an India uncompromisingly dominated by Hinduism; and for unyielding opposition to any party which agreed to concessions to the Moslems. When the partition of Bengal 'between Pakistan and Hindustan was decided upon, the Mahasabha proclaimed that unless Calcutta; was awarded to Hindustan, it would bring out every worker, from dockers to mill hands on strike. The peaceful acceptance of the partition by the Moslems (though it lost them Calcutta) has hitherto averted any distrubances in Bengal. How far the Mahasabha's influence may have contributed to the Punjab massacres it is impossible to say though some fiery words by its leaders have been repotred, but the peace which Mr. Nehru's Government is striving to restore, will hardly be secure until the fieriness of the Mahasabha has somehow been quenched.

উপরের লেখাটি বাংলায় অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় সেটা আজকের দিনের তথাকথিত সেকুলার বিদ্বজ্জনের ভাষণ বলে মনে হয়। তাহলে কি ব্রিটিশরাই এই হিন্দু বিদ্বেষটা আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল? এবং এতো সুন্দর করে মস্তিষ্ক প্রক্ষালন করে দিয়ে গিয়েছিল যে সেই ভূত আজও মাথা থেকে নামলো না! বীর সাভারকরের সম্বন্ধে কত কুৎসা রটনাই যে শোনা যায় এদের মুখে। এই খবরের কাগজগুলো পড়লে কিন্তু মনে হয় না কোথাও কখনও এক মুহূর্তের জন্যও সাভারকর আপোশ করেছিলেন। বরং, এই সংবাদটি পড়লে বোঝা যায়, সাভারকর ব্রিটিশদের রণকৌশল শেখার জন্যই যুদ্ধে অংশ নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। সাভারকর আপোশ করলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে এত নিন্দামন্দ তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকতো না। উল্টে থাকতো নেহরুর মতো একটা ফিল গুড অনুভূতি। ভাবটা এই যে, আহা নেহরু এত কষ্ট করে শান্তি আনতে চাইছে আর এই হিন্দু মহাসভার উগ্রপন্থী হিন্দুগুলো তাদের মুসলমানদের প্রতি হিংসা দিয়ে সব বানচাল করে দিচ্ছে। সত্যি কি তাই ছিল সেদিনের আবহাওয়া? একদিকে ব্রিটিশের উস্কানি, জিন্না এবং নেহরু দুজনেরই জাতির পিতা হবার উগ্র বাসনা, সাধারণ দরিদ্র হিন্দু-মুসলমানকে লড়িয়ে দিয়ে দেশভাগ করে নেওয়া আর তার সমস্ত রকম দায় হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া। আজ ব্রিটিশ নেই, ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে কিন্তু সেই ভাবনা তারা আমাদের মনে গেঁথে দিয়ে গেছে। সব দোষ হিন্দুদের? সব দোষ একদা বিখ্যাত কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদের? ততোধিক ব্রিটিশের চোখে জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত মুঞ্জের (ড. মুঞ্জে আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের রাজনৈতিক অভিভাবক ছিলেন), অথবা সাভারকরের মতো বিপ্লবীর, যাঁকে অমানুষিক অত্যাচার করেও ব্রিটিশদের সখ মেটেনি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই লড়াইটা তারা চালিয়ে দিল মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়াই বলে। এই ঢালের আড়ালে বসে কুচক্রী সাম্রাজ্যবাদী এই ব্রিটিশ জাত ছুরি চালিয়ে গেছে সন্তর্পণে। অখণ্ড স্বাধীন ভারতমাতাকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। আর তার সঙ্গে জুটেছে কিছু স্বার্থপর লোভী রাজনীতিকরা। সব দেশে সব কালে এরা ঘৃণ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এখানেও ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯৫১ সালের ২২ অক্টোবর ডান্ডি ক্যুরিয়র রিপোর্ট করছে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার কথা। কংগ্রেসের মুসলমান তোষণের বিরোধিতা করেই এই পার্টির সৃষ্টি হয়েছে। যদি ব্রিটেন এবং অন্যান্য কমনওয়েলথ দেশগুলি ইউনাইটেড নেশনস এবং অন্যান্য জায়গায় পাকিস্তানকে সবসময় সমর্থন করা এবং ভারতের বিরোধিতা করা বন্ধ না করে, তাহলে এই পার্টি ভারতকেও কমনওয়েলথ থেকে বের করে আনবে বলেছে। কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে ইউ এন এ আর কোনও কথা হতে পারে না। কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ— একথাও জনসঙ্ঘ বলেছে।

১৯৫৩ সালের ১২ মার্চের কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফে বলা হয়, আইন অমান্যকারী হিসেবে শ্যামাপ্রসাদ-সহ আরও তিনজন হিন্দু মহাসভার নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন লোকসভার সদস্য, বাকি তিনজন হিন্দু মহাসভার মেম্বার। সাধারণ জনসভায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে এঁরা মিটিং মিছিল করছিলেন, তাই এঁদের আটক করা হলেও পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ছেড়ে দেওয়া হয়।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী নির্ভীক শ্যামাপ্রসাদকে আমরা এখানেও দেখি। আপোশহীন নিরলস সংগ্রামের জন্য তাঁকে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমও অস্বীকার করতে পারেনি। তিনি হয়তো ভালোবাসা পাননি এদের কাছ থেকে, পাবার কথাও নয়, উল্টে ঘৃণাই পেয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসকে অস্বীকার করতে পারেনি কখনও। তাই স্বাধীনতার পরেও ব্রিটেনের স্থানীয় সংবাদপত্রে তিনি এসেছেন নিয়মিত নেগেটিভ নিউজ হিসেবে।

নিচের এই খবরটি দেখে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। আমাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষের দেশভাগের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ঠাকুমা দিদিমার কাছে এই গল্প শুনে আমরা অনেকেই বড় হয়েছি। গল্প শুনেছি রাতারাতি ঘরবাড়ি সব ফেলে প্রাণটুকু নিয়ে পালিয়ে আসার করুণ কাহিনি। কলকাতায় একজন আত্মীয়ের বাড়ি পুরো গ্রাম উজাড় করে উঠে আসা, শিয়ালদহ স্টেশনে হিন্দু বাঙালির মর্মান্তিক কষ্ট। এসব কি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল? নাহলে উনি শ্যামাপ্রসাদের ওপর এত রেগে গেলেন কেন? মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই হতভাগ্য হিন্দু বাঙালিদের জন্য একজন মাত্র মানুষ লড়ে যাচ্ছেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। জোর গলায় বলছেন, তিনটি মাত্র পথ আছে। এক নম্বরে দেশভাগকে অস্বীকার করা হোক। 'নালিফাই' যাকে ইংরাজিতে বলে। দুই নম্বরে হিন্দুদের জন্য আলাদা টেরিটোরি অর্থাৎ অঞ্চল ভাগ করে দেওয়া হোক, আর তিন নম্বরে পুরোপুরি সংখ্যালঘু বিনিময় করা হোক। নেহরু তখন কী বলছেন? দৃশ্যত রেগে যাচ্ছেন (মার্কেডলি অ্যাংগ্রি)। কতটা রাগ হলে ব্রিটিশ মিডিয়া লিখতে পারে এই কথা। নেহরুজী বলছেন তবে কি যুদ্ধ করতে চাও? এই হতভাগ্য বাঙালিগুলো কি এতটা ইম্পার্টন্ট যে তাদের জন্য যুদ্ধ করতে হবে? প্রথম দুটো অপশান মানে তো যুদ্ধই। আর তিন নম্বর অপশান কি সম্ভব, পাগলের প্রলাপ বলছ? আমার সাধের সেক্যুলার ভারতবর্ষ থেকে পুরো মুসলমান পপুলেশানকে চলে যেতে বলব? তাতে আমার দেশের ধর্ম নষ্ট হবে না? নেহরুজী তখন কি একবারও ভেবেছিলেন সেইসব হিন্দু পরিবারের কথা, যারা হপ্তাভর রেল লাইন ধরে হাঁটছে এপারে আসবে বলে অথবা যেসব মেয়েরা আসার পথে ধর্ষিতা হয়েছে বা খুন হয়েছে, যেসব শিশু পথশ্রমের ক্লান্তি সইতে না পেরে মারা গেছে তারা কেন নিজের দেশে বাড়ি ভিটে ছেড়ে পালিয়ে আসছে দলে দলে লাখে লাখে? পপুলেশান ক্লিন্সিং শুধু একতরফা হবে? শ্যামাপ্রসাদ বলছেন দু-তরফের বিনিময়ের কথা। এই হিন্দু বাঙালি যারা এখনও পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে গেল তাদের মনোবল তলানিতে এসে ঠেকেছে। সরকার রিফিউজিদের সামলে উঠতে পারছে না। তাদের কথা ভেবে সরকারের কি কিছু করার নেই? এখানেই শ্যামাপ্রসাদ অদ্বিতীয়, প্রকৃত অর্থেই চাম্পিয়ান। তাই সভায় উপস্থিত কংগ্রেসের অন্যান্যদেরও মনে হয়ে যে, 'চ্যাম্পিয়ন অব রিফিউজি' অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের কথাটা একেবারে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। এই কথাগুলো যখন ব্রিটিশ লোকাল নিউজপেপারে বেরোয় নির্লিপ্তভাবে অথচ না বললে নয়— শ্যামাপ্রসাদ তো তাঁর একার জন্য কিছু বলেননি, ব্যক্তিগত লাভের জন্যও নয়। এর সঙ্গে যে একটা বৃহত্তর জনজীবন জড়িত। তাই শ্যামাপ্রসাদের কথা সেদিন শুনতে বাধ্য হয়েছিল শুধু ব্রিটিশ মিডিয়া নয়, এমনকি পরমভট্টারক নেহরুজিও। খবরটা হুবহু তুলে দেওয়া হলো।

INFLUENCE OF THE MAHASABHA

Threat to Permanent Peace in India

HATRED OF MOSLEMS

By O. M. GREEN

In the tension and fever of India to-day, one of the most dangerous elements is the Mahasabha (Great Society), quintessence of extreme Hinduism and hatred of Moslems. Its numbers are comparatively small, its political influence uncertain. But its ability to excite the passions of the Hindu mob by inflammatory slogans (just as Moslems may be roused by the cry "Islam in danger") is justly feared.

Its leaders have been conspicuous for their violence and pugnacity—the once-famous Dr S. P. Mookerjee, formerly Vice-Chancellor of Calcutta University, the late, still more militant Dr Moonje, founder of two particularly aggressive movements, sudhi and sangathan (roughly, "purification" and "self-fortification"); and Mr V. D. Savarkar, President of the Mahasabha since 1937.

Mr Savarkar, born in 1883, a barrister of London, is the typical aggressive Hindu. He was transported in 1909 for 14 years for abetting a murderous communal crime, and

Few Living on Dole

Such figures are impressive. The Indian Government states that excepting recent migrants from East Pakistan and 90,000 other who are all without means of support, no Indian Refugee is now living on the dole. Excepting migrants from East Pakistan; there's the rub. More than two million have fled into West Bengal and Assam since last January. And though the central Government has allowed a grant of three and three quarter million pounds for their rehabilitation, the refugees keep coming and the money spreads thinner and thinner. In Parliament this week. Pandit Nehru, Indian Prime Minister, spoke twice in support of his April agreement with Liauqat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan. On the second occasion he grew markedly angry with Dr Shyamaprasad Mookherjee, the Bengal refugees champion who spoke sombrely of the minority's utter lack of confidence in East Bengal. Dr Mookherjee demanded either the annulment of partition,

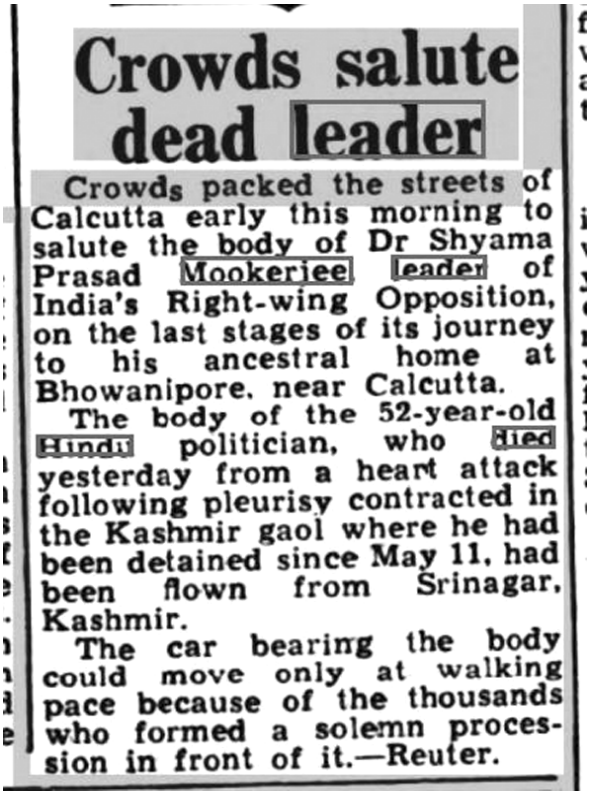

Crowds salute dead leader

Crowds packed the streets of Calcutta early this morning to salute the body of Dr Shyama Prasad Mookerjee leader of India's Right-wing Opposition, on the last stages of its journey to his ancestral home at Bhowanipore, near Calcutta.

The body of the 52-year-old Hindu politician, who died yesterday from a heart attack following pleurisy contracted in the Kashmir gaol where he had been detained since May 11, had been flown from Srinagar, Kashmir.

The car bearing the body could move only at walking pace because of the thousands who formed a solemn procession in front of it.—Reuter.

the cession of territory by Pakistan, or a total exchange of populations. Mr. Nehru reported that the first two meant war and the last was both impracticable and also denied India's belief in the secular state. Nevertheless, it seemed in the lobbies that the majority of Congressmen felt that Dr Mookherjee had a case, felt that it was impossible to treat any further with such a recalcitrant as Pakistan. Against this was the certain knowledge that they could not do without Nehru.

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর আবহে চলে এসেছি আমরা। বীরগতি প্রাপ্ত এই বিপ্লবীর মৃত্যু স্বাভাবিক যে ছিল না তা নিয়ে ব্রিটিশ মিডিয়ারও খুব একটা সন্দেহ ছিল না।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩ সালে সাণ্ডারল্যাণ্ড ডেইলি ইকো অ্যান্ড শিপিং গ্যাজেটে এই খবরটা বেরোয়। কৈলাসনাথ কাটজু পুরোপুরি উড়িয়ে দিচ্ছেন কথাটা, এমনকী বলছেন এটা মনগড়া কথা। বেআইনিভাবে বন্দি করা আর তার পরে চিকিৎসায় অবহেলা করা দুটি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগের উত্তরে খোঁজখবর করার বালাই নেই, উল্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, আরে মশাই এসব কিছু নয়। আমি কাশ্মীরি গভর্নমেন্টের কাছে কৃতজ্ঞ যে তারা শ্যামাপ্রসাদের সম্পূর্ণ দেখভাল করেছিল। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে এভাবে শেষ না করে দিতে পারলে তাদের কপালে অনেক দুঃখ আছে সেকথা বুঝতে দেরি হয়নি এইসব অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের। এখন মনে হয়, আজকের এই যে রাজনৈতিক নেতাদের নৈতিক অবক্ষয় দেখি দলমত নির্বিশেষে, সেই সময় থেকেই তার বীজ বপন শুরু হয়েছিল। স্বাধীন ভারত তো পেলাম আমরা অজস্র রক্তক্ষয়ের মধ্যে দিয়ে, তারপরেও নিজেদের গদির সুরক্ষা করতে যা সব অনৈতিক কাজকর্ম শুরু হয়েছিল তার চরম অবস্থা বোধকরি আজ আমরা দেখি রাজনীতির লোকজনের মধ্যে। তাই বুঝি সাধারণ আম আদমি যারা তারা সক্রিয় রাজনীতির লোক দেখলে সন্দেহ করি, দূরে সরে যাই, এমনকী স্থান বিশেষে ঘৃণাও করি। ইতিহাস তো শুধু অতীত নয়, ভবিষ্যতেরও পূর্বাভাস দেয়। অস্বাভাবিক মৃত্যুকে আইনসিদ্ধ করে দেওয়ার শুরু কি তখন থেকে? শ্যামাপ্রসাদই কি স্বাধীন ভারতে প্রথম রাজনৈতিক হত্যা? সম্ভবত তাই।

Hindu Was 'Liquidated'

The Indian Government today rejected a demand for an open inquiry into the death Dr. S. P. Mookherjee who died in Srinagar last June while under detention - for entering Kashmir without a permit. Dr Mookherjee was leader of the Right-Wing Hindu Jan Sangh party and a former Minister in the Indian Government. Dr Khare, a leader of the Hindu Mahasabha Party, today pressed a demend in the house of the people (Lower house) for an inquiry. He accused the Indian and Kashmiri Governments of the 'liquidating' Dr Mookherjee and described his death as a medical and political liquidation of an inconvenient political opponent. For the medical part, Srinagar was responsible', alleged.

Mr Chatterjee president Mahasabha said Dr Mookherjee had been illegally detained with the Indian Government's Connivance and Conspiracy. The minister of home affairs of sates Dr Katju replied that it was a 'figment of imagination'. To suggest there had been any conspiracy.

He was satisfied that Kashmiri Government had done everything it could to provide medical aid for Dr Mookherjee and there was no need for en-

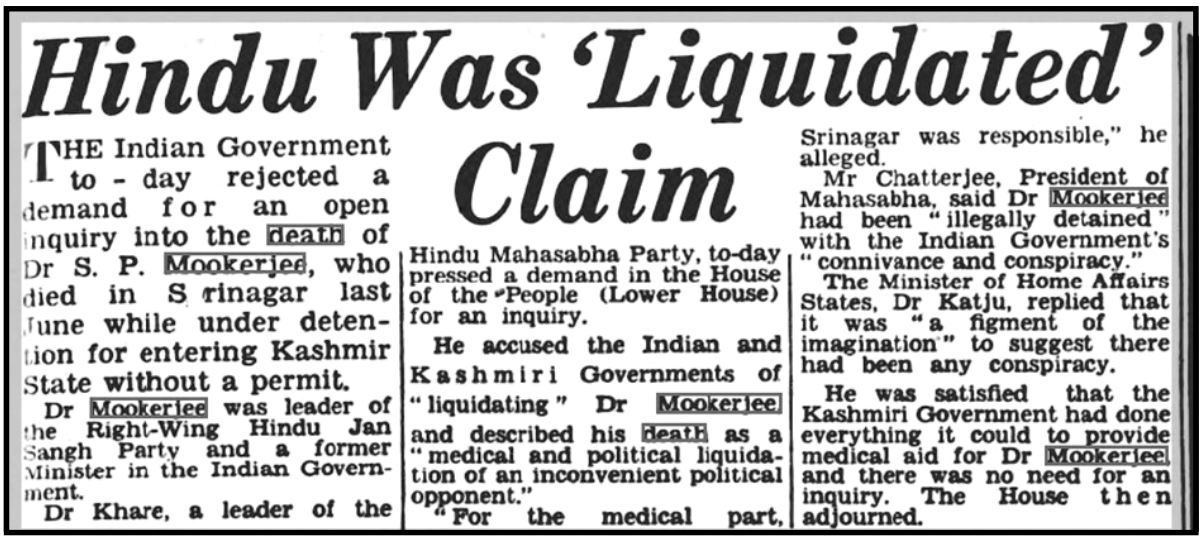

Hindu Was 'Liquidated' Claim

THE Indian Government to - day rejected a demand for an open inquiry into the death of Dr S. P. Mookerjee, who died in Srinagar last June while under detention for entering Kashmir State without a permit.

Dr Mookerjee was leader of the Right-Wing Hindu Jan Sangh Party and a former Minister in the Indian Government.

Dr Khare, a leader of the Hindu Mahasabha Party, to-day pressed a demand in the House of the People (Lower House) for an inquiry.

He accused the Indian and Kashmiri Governments of "liquidating" Dr Mookerjee and described his death as a "medical and political liquidation of an inconvenient political opponent."

"For the medical part, Srinagar was responsible," he alleged.

Mr Chatterjee, President of Mahasabha, said Dr Mookerjee had been "illegally detained" with the Indian Government's "connivance and conspiracy."

The Minister of Home Affairs States, Dr Katju, replied that it was "a figment of the imagination" to suggest there had been any conspiracy.

He was satisfied that the Kashmiri Government had done everything it could to provide medical aid for Dr Mookerjee, and there was no need for an inquiry. The House then adjourned.

quiry. The house then adjourned.

২৩ জুন কভেন্ট্রি ইভিনিং টেলিগ্রাফের পাতায় এলো শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর খবর। শীর্ষনাম এল 'রাজনৈতিক নেতার মৃত্যু রাজনৈতিক বন্দী হয়ে।'

''আজ শ্রীনগরে হিন্দু দক্ষিণপন্থী বিরোধী (জনসঙ্ঘ) নেতার জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুর কারণ হিসেবে হৃদরোগ বলা হয় এবং তখন তাঁর বয়স মাত্র ৫২ বছর। মে মাসের ১১ তারিখ থেকে তিনি বন্দি আছেন শ্রীনগরের জেলে। প্লুরিসি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে গতকাল শ্রীনগরের একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ড. মুখার্জি এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে কাশ্মীরে উপযুক্ত নথিপত্র ছাড়া প্রবেশ করার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য, বাঙ্গালি, একজন বড় মাপের নেতা শ্যামাপ্রসাদ, নেহরুর খুব বড় সমলোচক ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম ক্যাবিনেটে তিনি শিল্পমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ অবধি। কিন্তু পাকিস্তানের প্রতি নেহরুর নীতি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ায় তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৫১ সালে সাধারণ নির্বাচনের কিছু আগে তিনি নিজের রাজনৈতিক দল গঠন করেন। সেই জনসঙ্ঘ দিল্লি সহ উত্তরভারতে যেখানেই পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু জনগণ রয়েছে সেইসব জায়গায় যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।''

এতো গেল শুধু খবর। কিন্তু ব্রিটিশ মিডিয়া এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, উদ্বাস্তু জনগণের মাঝে শ্যামাপ্রসাদের অপরিসীম জনপ্রিয়তার কথা। তাই একটি কাগজে তাঁকে রিফিউজিদের চ্যাম্পিয়ন বলা হয়েছে। প্রশ্নটা হলো, যাদের উচ্চাশার কারণে হিন্দুদের রিফিউজি হতে হল, সেসব রাজনীতিবিদ সেদিন কি করছিলেন? অসহায় মানুষদের দুঃখ-কষ্ট সেদিন জাতির পিতাও বোঝেননি বা বুঝেও কিছু করেননি। আর চাচা তো নিজে প্রধানমন্ত্রী হবার উচ্চাশা পূরণের জন্য ব্রিটিশের হাতের পুতুল হয়ে গিয়েছিলেন। নাহলে এই লক্ষ লক্ষ গৃহহারা মানুষগুলোর কথা তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না কেন? বাঙ্গালি হিন্দু যারা দলে দলে এলো সেদিন তাদের কথা নেহরুর মনে সেভাবে স্থান পেল না কেন?

এভাবেই শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুর হৃদয়সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন— শিল্ড ডেইলি নিউজে এই খবরটি পড়লে বোঝা যায়—

Crowds salute dead leader

"Crowds packed the streets of Calcutta early this morning to salute the body of Dr Shyama Prasad Mookherjee, leader of India's Right-wing, opposition. On the last stages of its journey to his ancestral home at Bhowanipore, near Calcutta. The body of the 52 year old Hindu politician, who died yesterday from a heart attack following pleurisy contracted in the Kashmir gaol where he had been detained since May 11, had been flown from Srinagar, Kashmir. The car bearing the body could move only at walking pace because of the thousands who formed a solemn procession in front of it. - Reuter.

শ্যামাপ্রসাদের শববাহী গাড়ি সেদিন মানুষের ভিড়ে চলতে পারছিল না। হাজার হাজার মানুষ সেদিন পথে নেমেছিল তাদের প্রাণের প্রিয় নেতাকে চোখের জলে বিদায় দিতে। সেদিন যারা শ্যামাপ্রসাদকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, ইতিহাস তাদের ক্ষমা

করবে না। মানুষের আদালতে নাই বা হোক ঈশ্বরের বিচারসভায় তার শাস্তি হবেই। আমরা অনেকেই বড় হয়েছি বাম শাসনকালে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালি আমরা প্রগতিশীল, সেকুলার— বেশিরভাগই আবার কোনও না কোনওভাবে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা উৎখাত হওয়া হিন্দু বাঙ্গালিই। শ্যামাপ্রসাদের অবদানের কথা জানানো হয়নি আমাদের প্রজন্মকে, কলকাতা শহরকে আজ আমরা 'টেকন ফর গ্রান্টেড' নিয়ে নিয়েছি, এই কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ আমাদের নিজেদের, আমাদের মাতৃভূমি, কত কবিতা গান বেঁধেছি, 'এই শহর জানে আমার প্রথম সব কিছু' কিন্তু কোথাও উল্লেখ করিনি শ্যামাপ্রসাদের। শুধু ভবানীপুরের রাস্তার নামটুকু ছাড়া আমাদের এই প্রজন্ম শ্যামাপ্রসাদের কথা কিছুই জানে না। নিজের বলে ধরে নেওয়া শহরটার প্রতিটি ধূলিকণার পিছনে শ্যামাপ্রসাদের যে এত বড় লড়াইটা ছিল তা বাঙ্গালিদের সুকৌশলে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডে নয় নয় করে আজ প্রায় পঁচিশ বছর আছি, এখানে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছি— এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি স্কুলশিক্ষায় ব্রিটিশরা ইতিহাস বিকৃত করেনি কোথাও। ফ্রান্স সহ সারা ইউরোপে যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি, ধর্মসংক্রান্ত যুদ্ধই তার মধ্যে বেশি, কিন্তু আজকের সেকুলার ব্রিটেন খুবই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে রয়েছে। তবে তাই বলে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শেখায়নি কখনও। শ্যামাপ্রসাদের সেদিনের লড়াইকে অস্বীকার করে আজকের কলকাতাকে সাজানো অকৃতজ্ঞতা। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালি, আত্মঘাতী বাঙ্গালি যতই লিবারেল বা সেকুলার হোক, তার প্রকৃত ইতিহাসটা জানা অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ আর্কাইভে ব্রিটিশ জার্নালিস্টদের লেখা বিবরণ বা মূল্যায়ন দেখে অবাক হয়েছি। তাদের নির্লিপ্ততা, কারণে অকারণে জঙ্গি বা টেররিস্ট আখ্যা দেওয়া, হিন্দু এক্সট্রিমিস্ট আখ্যা দেওয়া মনে করিয়েছে বর্তমান সেকুলার প্রোগ্রেসিভ বাঙ্গালির কথা। মনে হয়েছে ব্রিটিশরা যা শিখিয়ে দিয়ে গেছে সেটাই আমরা আউড়ে চলেছি ৭০ বছর ধরে। মনে হয়েছে নেহরু যেন ব্রিটিশদের নিজেদের সন্তান, নেহরুর বিরোধিতা করা আর ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানান একই ব্যাপার। দুজন বাঙ্গালি ব্রিটিশদের কাছে ঘৃণার পাত্র হয়েছেন, একজন নেতাজী, অন্যজন শ্যামাপ্রসাদ। মুগ্ধ হয়েছি শ্যামাপ্রসাদের বীরত্বে। খবরগুলো পড়ে চোখের সামনে দেখতে পেলাম যেন পার্লামেন্টারিয়ান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে, আয়ত দুটি চোখে যেন আগুন ঝরে পড়ছে, গলার শিরা ফুলে উঠছে, হাতের মুঠিতে প্রতিজ্ঞা। উল্টোদিকে চরম শক্তিমান রাজাধিরাজ জওহরলাল নেহরু। লড়াইটা তাঁর নিজের জন্য নয়, লড়াইটা ছিল আমাদেরই জন্য। চোখে ভেসে উঠল একটি দৃশ্য— অধুনা বাংলাদেশের বরিশালের প্রত্যন্ত একটি পাড়াগাঁ— ঝালোকাঠির সরাই গ্রাম থেকে আমার জন্মদাত্রী মা তখন তিনবছরের ক্ষুধার্ত শিশু, হপ্তাভর চড়াই উতরাই ভেঙে, স্টিমার, হাঁটা পথ, রেললাইন সবকিছু পেরিয়ে কাকার হাত ধরে কলকাতায় পা রাখছে— ভাগ্যিস! কলকাতাটা আমাদেরই ছিল। ■

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

A Well Wisher

K 3N LIFESTYLES

With Best Compliments

from-

ANIL AHUJA

Ahujas Web Pvt. Ltd.

6/47, W. E. A.

Karol Bag

New Delhi- 110005

জয়-পরাজয়

এষা দে

কালিঞ্জর দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে সপ্তপ্রাসাদের একটির অন্তঃপুরে এক প্রকোষ্ঠ। উপস্থিত মাহোবা রাজ্যের প্রধান আমাত্য বলদেব, রাজজ্যোতিষী আচার্য বিদ্যার্ণব ও রাজবৈদ্য অনন্ত শাস্ত্রী। রাজা কিরাত রাই কারুকার্যশোভিত কাষ্ঠাসনে চিবুকে হাত রেখে বসে। স্পষ্টত চিন্তিত। সামনে তিনটি আসনে বাকিরা। মধ্যে মধ্যে অনন্ত প্রকোষ্ঠের কপাট খুলে ভিতরে গিয়ে ফিরে আসছেন। অমনি নারী কণ্ঠের চাপা আর্তনাদ কিছুক্ষণ বাদে বাদে ভেসে আসছে, সঙ্গে অন্য নারীকণ্ঠের সান্ত্বনা বাক্য। অনন্ত আস্তে আস্তে বলেন, 'রাজন্, উতলা হবেন না। প্রকৃতির নিয়ম, সহ্য করতেই হবে।'

রাজা সম্মতিসূচক মাথা হেলান। অনন্ত তাকান বলদেবের দিকে, নীরব ইঙ্গিত। বলদেব যেন বুঝেই শুরু করেন, ‘চারিদিকে মানুষের কার্যকলাপে উদ্বেগের অন্য অনেক কারণ নেই কি প্রভু?’

‘সেই জন্যই তো চিন্তা। গত কয়েক শত বছর ধরে বর্বরদের আধিপত্য সারা ভারত জুড়ে বেড়েই চলেছে। কত হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্মস্থান, নালন্দা, বিক্রমশীলা ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সোমপুরীর মতো জ্ঞানবিজ্ঞানশাস্ত্র চর্চার বিশ্ববিখ্যাত কেন্দ্র ধ্বংস, শত শত বছরের সাধনা ফল অমূল্য সব পুঁথি অসভ্যরা অগ্নিতে ভস্ম করেছে।’

‘শুধু কি তাই মহারাজ? সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাবুন। হিন্দু বৌদ্ধ শাসনে ফসলের পাঁচ বা ছ’ভাগ ছিল রাজাকে দেয় খাজনা। এখন তাদের দিতে হয় পঞ্চাশ শতাংশ, উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক। কৃষক স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে খাবে কী? তার ওপর মুসলমান না হলে মাথাপিছু আদায় করে জিজিয়া। কাশীর গঙ্গায় হিন্দুদের ডুব দিতে হলে লাগে তীর্থকর।’

বলদেব উত্তেজিত।

আচার্য বিদ্যার্ণব যোগ করেন, ‘পিতৃপুরুষের স্বভূমিতে আমরা আজ ধিকৃত জিম্মি। সুফি নামধারী অতি চতুর এক শ্রেণীর যবন আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনযাপন অনুকরণ করে মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করছে। তাদের কাজ হলো অজ্ঞ নিম্নবর্গকে ভুলিয়ে ভালিয়ে ধর্মান্তরিত করে দেশের জনবিন্যাসকে পরিবর্তন ঘটানো।’

রাজা মন্তব্য করেন, ‘শুধু রাজ্যস্থাপন, অর্থনৈতিক শোষণই এদের লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য, আমাদের সার্বিক অস্তিত্ব বিলোপ। তাই তো আমার এত উদ্বেগ। এ দুঃসময়ে রাজ্যের যোগ্য উত্তরাধিকারী চাই।’

এর মধ্যে অনন্ত দুবার উঠে কপাট খুলে ভিতরে গেছেন, আর্তনাদ তীব্র থেকে তীব্রত। প্রকোষ্ঠে সকলে না শোনার ভান করেছেন। এবারে রাজবৈদ্য ভিতরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলেন না। আর্তনাদ তীব্রতর ও ঘন ঘন। রাজা আসন ছেড়ে পায়চারি করতে থাকেন। এক চরম উচ্চতার শীর্ষে পৌঁছাল আর্তনাদ। হঠাৎ এক কচি গলার কান্না। মহারাজ হাতজোড় করে কপালে ঠেকান। অন্যরাও। অনন্ত ফিরে আসেন, পিছনে ঘর্মাক্ত কলেবর বয়স্কা নারী। ‘রাজন্, অপরূপ সুন্দরী কন্যা হয়েছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী।’

কন্যা! কত আশা করেছিলেন পুত্র হবে, ঘটাবে ক্ষাত্র শক্তি পুনর্জাগরণ। চান্দেল বংশের একদা বিরাট সাম্রাজ্য, স্থাপত্য শিল্পে সাহিত্যে অমর কীর্তির গৌরব আজ কোথায়? সেই সৌভাগ্য সূর্যের দ্বিপ্রহরের দীপ্তি অস্তাচলে। তিনি কিরাত রাই অবশিষ্ট একটি ক্ষীণ দীপশিখা মাত্র। এমন সঙ্কটকালে কিনা কন্যাসন্তান!

অনন্ত সামনে আসেন, ‘প্রভু নিরাশ হবেন না। মহারানি সবল সুস্থ। পরের বার পুত্র হবে। সময়টা খেয়াল করেছেন তো?’ জ্যোতিষীর উদ্দেশে প্রশ্ন। মাথা হেলান বিদ্যার্ণব। ‘অবশ্যই। যদি অপরাধ না নেন, জ্যেষ্ঠ সন্তান কন্যা পিতার সৌভাগ্যবর্ধক। যথা সময়ে নামকরণ ও কোষ্ঠি প্রস্তুত করব।’

করলেন, ‘মহারাজ, কন্যা অতি সুলক্ষণা। অসামান্য তেজস্বিনী, তীক্ষ্ণধী কর্মদক্ষ। রাজরাজেশ্বরী, কীর্তিময়ী, কুলের গৌরব বর্ধনকারিণী।’

নাম হল দুর্গাবতী। যথাবিহিত রাজকন্যা আদরে যত্নে বড়ো হচ্ছেন। মহারানি আবার সন্তানসম্ভবা। আর একটি কন্যা হলো। রাজা পুত্রের আশা ত্যাগ করলেন।

এদিকে দুর্গাবতী অন্দরমহলে পুত্তলিকা বসনভূষণ নিয়ে থাকতে রাজি নন। সখীদের সঙ্গে সময় কাটাতেও তাঁর মন চায় না। উদ্যানে নিয়ে যাওয়া হলে পুষ্পশোভার দিকে চোখ নেই। চড়ে বসেন সবচেয়ে উঁচু গাছটির মগডালে। ভয়ভীত সখিদের ক্রন্দনে উদ্যানরক্ষকরা দৌড়ে আসে। সর্বদা পিতার সঙ্গে তাঁর থাকা চাই। পিতারও প্রাথমিক হতাশা দূরীভূত। একেবারে দুর্গাঅন্ত প্রাণ। কন্যার আবদার, পিতা যা করবেন তাঁরও সেটাই করা চাই। না, রাজকুমারীর চোলি ঘাগরা পরিধান তাঁর অঙ্গে ওঠে না। পিতার মতো পুরুষের পরিচ্ছদ চাই। তাঁর জন্য প্রস্তুত রাজকুমারের সজ্জা। যে পোশাকে দুর্গা পিতার ছায়ার মতো অনুসরণকারী। রাজসভায় পর্যন্ত উপস্থিত। শ্রবণমাত্র কণ্ঠস্থ রাজসভার সব আলাপ-আলোচনা। তারপর পিতাকে একলা পেলেই হাজারটা প্রশ্ন। রাজকুমারের মতোই তাঁর শিক্ষার আয়োজন হলো। তার প্রখর মেধা ও স্মরণশক্তির ভূয়সী প্রশাংসাকারী রাজপণ্ডিত। শাস্ত্রাদি পাঠের পর পিতার সঙ্গে অশ্বারোহণ, তরবারি চালনা, চাঁদমারি লক্ষ্য করে বন্দুক ছোঁড়া। বনে-জঙ্গলে মৃগয়ায় সর্বদা পিতার সঙ্গে। উদ্বেগে মহারানির রাতে ঘুম নেই। বারবার অভিযোগ করেন স্বামীর কাছে, ‘প্রভু, এ তো প্রকৃতি সমাজ সবকিছুর বিরুদ্ধতা। কন্যাসন্তান পত্নী হবে, মাতা হবে, রানি হিসাবে অন্তঃপুরের দায়িত্ব পালন করবে। দুর্গা তো সেসব কিছুই শিখছে না।’

‘ও সব তুমি কমলাবতীকে শেখাও। দুর্গা আমার সাধারণ রাজকন্যা নয়। আচার্য বিদ্যার্ণব কী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন মনে নেই? দুর্গাই আমার কুল ধন্য করবে।’

‘স্নেহে আপনি অবোধ হয়ে গেছেন।

কন্যাসন্তান কি পিতৃকুলের? তার স্থান স্বামী কুলে, শ্বশুরের বংশে, তাকে গোত্রান্তরিত হতে হয়।'

রাজা মৃদু হেসে নিরুত্তর। অব্যাহত দুর্গার পুরুষসুলভ প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশিক্ষা থেকে রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে পরিচয়।

'এ যে আধুনিক বঙ্কিম।' অভ্যাসমতো কম্পিউটারে বরুণের লেখাটা পিছনে দাঁড়িয়ে পড়তে পড়তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা স্ত্রী অরুণিমা মন্তব্য করে।

'কিন্তু এখন তো বঙ্কিম আর ফ্যাশন নয়। ঐতিহাসিক গপ্পোর বাজারই নেই। লেখকরা সর্বহারা বনবাসী সংখ্যালঘু নিদেনপক্ষে নারীর দুঃখ নিয়ে কাহিনি লেখে আর অত্যাচারী সমাজ বা রাষ্ট্রের গুষ্টির পিণ্ডি চটকিয়ে পুরস্কার লোটে।'

লিখতে লিখতে বরুণের জবাব, 'পুরস্কারের জন্য লিখি না। বিশ্বাসের জন্য লিখি। আমি মনে করি প্রত্যেকের নিজের দেশের ইতিহাস জানা উচিত। অতীতকে ভুলে গেলে কী হয় জানো তো?'

'অতীত মনে রাখবে কী করে? হিন্দুদের লেখা বংশলতিকা আর রাজাদের প্রশস্তি পড়ে? জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটল, যতটা সম্ভব তার যথার্থতার প্রমাণ নিয়ে তাকে নথিভুক্তিকরণ করাকেই বলে ইতিহাস। গ্রিক হেরেডোটাস সেই কত হাজার বছর আগে শুরু করে গেছেন। হিন্দুদের এমন অনুশাসন ছিল? আমরা তো পড়ি বিজেতার লেখা বিজিতের ইতিহাস।'

লেখা থামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বরুণ। 'আপশোষ করে লাভ নেই। তাদের চোখ দিয়েই শুরু করতে হবে।'

প্রকৃতির নিয়মে দুর্গাবতী যৌবনে পদার্পণ করলেন। ইতিমধ্যে তিরধনুক তরবারি বর্শা বন্দুক— সর্বপ্রকার অস্ত্রচালনায় দক্ষতা অর্জন হয়ে গেছে। রাজসভার কার্যকলাপে পিতার সহায়ক। রানিমা তার বিবাহের জন্য স্বামীকে বলে বলে হতোদ্যম। কিরাত রাই অপেক্ষা করে আছেন উপযুক্ত পাত্রের। মনের ভিতর গভীর বেদনা। চান্দেল বংশের অতীত গৌরব ছাড়া আর বিশেষ যৌতুক তিনি প্রাণাধিক কন্যাকে দিতে অপারগ। এমন সর্বগুণান্বিতা কন্যা, যে রূপেও কম যায় না, তাকে তো যার তার হাতে সম্প্রদান করতে পারেন না।

ভারতের রাজন্য সমাজে মাহোবা রাজকুমারীর ব্যতিক্রমী চরিত্র আলোচনার বিষয়। কেউ ভ্রূ কুঞ্চিত করেন, কেউ বা মৃদু হাসেন। কেউ আবার সখেদে বলেন, ক্ষাত্রশক্তির এমন দুরবস্থা যে নারীকে সংসারধর্ম পালনের পরিবর্তে পুরুষের ভূমিকা নিতে হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে বিবাহের কোনও প্রস্তাব আসে না। এমন সময় মধ্য ভারতের গড়কাটাঙ্গা রাজ্য থেকে এক দূতের আগমন ঘটল কালিঞ্জর দুর্গে। রাজগোণ্ড বংশের নৃপতি দলপত শাহ মাহোবা রাজকুমারী দুর্গাবতীর পাণিপ্রার্থী। দূতকে যথাবিহিত আপ্যায়ন করে প্রস্তাব বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায়দান। এখন কিরাত রাইয়ের উভয় সংকট। কন্যা তাঁর সুন্দরী, অনন্যা, যৌতুকও তেমন নেই, কিন্তু চান্দেল বংশ বলে কথা, ক্ষত্রিয় চূড়ামণি। আর গড়কাটাঙ্গা হলো গোণ্ডদের ভূমি গণ্ডোয়ানায়। তার রাজা ক্ষত্রিয়ই নন, নন রাজপুত। গোণ্ড জনজাতি থেকে বাহুবলে উত্থান। চারিদিকে পর্বত ও ঘন জঙ্গল বেষ্টিত এক রাজ্য, না আছে তেমন নগর না কালিঞ্জরের মতো দুর্গ, না সংস্কৃতি শিল্পস্থাপত্যের ঐতিহ্য।

মন্ত্রী বলদেব বললেন, 'মহারাজ, গণ্ডোয়ানার ইতিহাস অতি প্রাচীন। হ্যাঁ, গোণ্ডরা একটি বনবাসী জনজাতি, সাধারণত শিকার, পশুপালন, সামান্য কৃষি নিয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সকলেই অগ্রসর হতে চায়। গত শ'দুয়েক বছর ধরে ওরা কৃষিকাজ শিখেছে, কয়েক সহস্র বর্ধিষ্ণু গ্রাম গড়ে উঠেছে গড়কাটাঙ্গায়। এখন তো গণ্ডোয়ানা নামটাও চলে না। বিশাল পরিসর সারা মধ্য ভারত জুড়ে। তার ওপর বনজ সম্পদ অঢেল। অত্যন ধনী রাজবংশ। যেহেতু নিজেরা জনজাতি, তাই ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে অতি আগ্রহী। যৌতুক এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাছাড়া শুনেছি তরুণ রাজা সুপুরুষ, বীর, সুশাসকও।'

'সবই তো বুঝলাম। কিন্তু রাজপুত সমাজে চান্দেল বংশের সম্মানের কী হবে?'

'তুর্কিদের কৃপায় রাজপুত বলুন ক্ষত্রিয় বলুন, কারও কি আর বিশেষ সম্মান আছে? একটা কাজ করলে হয়। রাজকুমারী ব্যক্তিত্বসম্পন্না, তাঁর মতামতই সর্বাগ্রে নেওয়া উচিত নয় কি?'

নয়নের মণি কন্যার ইচ্ছাই রাজা ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা করা হলো। দুর্গাবতী জানালেন, জন্মগত পরিচয় ভাগ্যমাত্র, পুরুষের অর্জিত কীর্তিকে তিনি অধিক সমাদর করেন। রাজ গোণ্ডবংশের দলপত শাহকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে তাঁর আপত্তি নেই।

যথাবিহিত পরিণয় অনুষ্ঠানের পর দুর্গাবতী এলেন পতিগৃহে। গড়কাটাঙ্গার রাজধানী সিংগৌরাগড়ে রাজরানি সংসারধর্ম পালন করছেন। সেই সময়ে উত্তর ভারতে তুর্কি তৈমুর বংশের বিজেতা বাবরের পুত্র হুমায়ুনকে হটিয়ে আফগান শের শাহ সুরি ক্ষমতায় আসীন। বুন্দেলখণ্ড অভিযানে কালিঞ্জর দুর্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, যে কারণে বারবার আক্রান্ত। সসৈন্যে অগ্রসর হলেন শের শাহ। যবনের ভয়ে কালিঞ্জরে ত্রাহি ত্রাহি রব। কিরাত রাইয়ের মনে সর্বদা জাগরুক গজনির সুলতান মাহমুদের অভিযানের লজ্জাকর ইতিহাস। তাঁর

শ্রেষ্ঠ পূর্বজ, খাজুরাহোর অন্যতম স্রষ্টা রাজাধিরাজ বিদ্যাধর বাধ্য হয়েছিলেন বর্বর আক্রমণকারীকে উপঢৌকনাদি দিয়ে বিদায় করতে। সেই যবন আবার উপস্থিত। এখন তাঁর সামরিক শক্তিই বা কী, আর্থিক ক্ষমতাই বা কী!
কন্যা-জামাতার কাছে সংবাদ গেল। সন্তানসম্ভবা দুর্গা নিজেই যুদ্ধের সাজ পরতে উদ্যত। তাঁকে নিবৃত্ত করে স্বামী যবনকে রুখতে পাঠালেন সেনাবাহিনি কালিঞ্জরে। তাদের আধুনিক অস্ত্র ছিল না বটে, কিন্তু সাহস এবং সংখ্যা যথেষ্ট। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে হতচকিত শের শাহ। দুর্গে ঢুকতে না ঢুকতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে মৃত্যু। বজায় রইল চান্দেলরাজের স্বাধীনতা। মন্ত্রী বললেন, 'মহারাজ, মনে আছে কন্যা জন্মের জন্য আপনি দুঃখিত হয়েছিলেন? দেখুন, পড়ে কন্যা পাত্রে সমান দশ পুত্রে।'

কিন্তু সেই পাত্রেরই আয়ু ফুরাল। পুত্র বীরনারায়ণের বয়স পাঁচ বছর হতে না হতে দলপত শাহের জীবনান্ত। নাবালক রাজার অভিভাবক হিসাবে রাজ্য শাসনের ভার নিলেন দুর্গাবতী।

'এসব কখন হচ্ছে গো?'

'দুর্গাবতীর জন্ম ৫ই অক্টোবর ১৫২৪, বিয়ে ১৫৪২ সালে। রানি হলেন ১৫৫০ সালে। মানে ২৬ বছর বয়সে।'

তরুণী বিধবার হাতে রাজত্ব, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান সব অধিপতি পিছনে লেগে গেল। তবে দুর্গাবতীকে তারা চিনত না। এবারে চিনল। সিংহাসনে বসে প্রথমেই দুর্গা রাজধানী নিয়ে গেলেন সাতপুরা পর্বতের দুর্গম শীর্ষে চৌরাগড়ে। তৈরি হলো সারা রাজ্য জুড়ে ছোট ছোট দুর্গ। প্রজাদের চাষবাসে উৎসাহ দিতে নিজে সারা রাজ্য চষে বেড়াতে থাকেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তিতে অগণিত গ্রামপ্রধানের নাম মুখস্থ। এতকাল পশু শিকার করেই যাঁরা বেঁচে ছিলেন, এখন তাদের দিয়ে বাড়িয়ে তোলেন সেনাবাহিনীর সংখ্যা। পশুপালকদের কাজে লাগান সামরিক বাহিনীর জন্য বন্যহাতি পোষ মানাতে। প্রজাদের, গ্রামসভার সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ বিচার হয় তাঁর সামনে। অপরাধীর শাস্তি অনিবার্য, নিরপরাধের আশঙ্কা নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে মুক্তহস্ত। প্রজাদের দুঃখে দুঃখী, তাদের সুখে তাঁর সুখ। কয়েক বছরের মধ্যে দুর্গা গোণ্ড জাতির ভক্তিশ্রদ্ধায় দেবীত্বে উন্নীত। আবার তাদের অতি কাছের মানুষও। মৃগয়ার ঋতুতে রাজ্যের বিস্তৃত অরণ্যে তাঁর নিয়মিত অভিযানে সোৎসাহে প্রজামণ্ডলীর যোগদান। লোকালয়ে বাঘের উৎপাত মাত্র রানিমাকে সংবাদ দিতে দৌড়য় প্রজারা। জানে, যতক্ষণ না সেই মারক জানোয়ারকে নিজ হাতে বধ করছেন ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না।

এদিকে বাইরের জগতে যথারীতি যুদ্ধবিগ্রহ আগ্রাসন চলছে। রানির প্রতিবেশী মালোয়া রাজ্যের সিংহাসনে বাজবাহাদুর নামে এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক। ঘরের পাশে এমন ঐশ্বর্য আর তার মালিক কিনা এক হিন্দু বিধবা। ফৌজ সাজিয়ে ঢুকে গেলেই সোজা দখল করা যায়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বাজবাহাদুর সেনাবাহিনী নিয়ে রানির রাজ্যে প্রবেশ করে আক্রমণ শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরমাশ্চর্য দৃশ্য। সমরসজ্জায় সজ্জিত স্বয়ং রানি দুর্গাবতী গোণ্ড সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে। প্রচণ্ড মার খেয়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি মাথায় নিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাতে হলো বাজবাহাদুরকে। এক হিন্দু নারীর কাছে এমন শোচনীয় পরাজয়ে ঘটে গেল তাঁর মানসিক বিপর্যয়। রাজ্যবিস্তার দূরস্থান, এমনকি করায়ত্ত মালোয়া রাজ্য দেখাশুনাও ছেড়ে নারী সুরা আমোদপ্রমোদে নিজেকে ভুলে রইলেন। অন্য দিকে দুর্গাবতী তাঁর বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যগুলি থেকে উৎপাত সমূলে দমন করে নিজের প্রজাপালনের কর্মযজ্ঞে সমর্পিত মনপ্রাণ।

ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে তুর্কি শাসন ও তৈমুর বংশ ফিরে এসেছে। হুমায়ুনের পুত্র আকবর সিংহাসনে। সমস্ত বিরোধী শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে সারা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের স্বপ্ন। বাজবাহাদুর অপদার্থ শাসক, অতএব তাঁকে পরাজিত করে মালোয়া রাজ্য আকবরের ফৌজদার দখল করলেন। তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তৃত হলো রানি দুর্গাবতীর রাজ্যের সীমানা অবধি। সুশাসক ও বীরাঙ্গনা হিসাবে রানির সুনাম লোকমুখে চারিদিকে বহুল প্রচারিত। বাদশাহের কানেও পৌঁছেছে এবং কানে পৌঁছেছে তাঁর রাজ্যের বৃত্তান্ত। সত্তর হাজার কৃষিসমৃদ্ধ গ্রাম, যেগুলির মধ্যে বহু এত বৃহৎ যে শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন রানি। সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষিত বিশ হাজার অশ্ব ও সহস্র হস্তী। রাজ্যে অসংখ্য পর্বতের গুহাকন্দরে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, গহন বনে-জঙ্গলে সীমাহীন ধনরত্নের ভাণ্ডার। বন্য হস্তী রপ্তানি করে বিশাল উপার্জন। দুর্ধর্ষ তৈমুরের বংশধর জালাল উদ্দিন আকবরের মতো সর্বশক্তিমান বাদশাহেরই প্রাপ্য নয় কি এমন ঐশ্বর্য? রানির রাজধানী চৌরাগড়ের রাজসভায় উপস্থিত তাঁর দূত।

যথাবিহিত সম্ভাষণের পর সবিনয়ে নিবেদন করেন, 'মহারানি, হিন্দুস্থানের বাদশাহ মহামান্য আবুল-ফথ জালালউদ্দিন মহম্মদ আকবর আপনার শৌর্য বীর্য ও প্রজাপালনের কৃতিত্বের খ্যাতি শুনে অত্যন্ত মোহিত। এমন গুণবতী রানিকে যথাযোগ্য সমাদর জানাতে উৎসুক তিনি। বহুমূল্য অলঙ্কার

পট্টবস্ত্রাদির আয়োজন করেছেন। তাঁর ইচ্ছা আপনি স্বয়ং আগ্রায় বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাত থেকে উপঢৌকনাদি সম্মান গ্রহণ করুন। আপনার যাতায়াতের যাবতীয় বন্দোবস্ত তাঁর দায়িত্ব।'

রাজসভায় অস্ফুট সানন্দ কলরব, পারিষদরা এর ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। শুধু দুর্গাবতীর মুখে হাসি নেই। গম্ভীর মুখে রানি প্রশ্ন করলেন, 'যবন তুর্কি তৈমুর বংশের তিনি একজন নৃপতি, আমি হিন্দু রাজপুত চান্দেল বংশের রাজকুমারী, গণ্ডোয়ানা র‍্যাজরে অধিশ্বরী। তিনি কি এই পরিচয়ের জন্য আমার সাক্ষাৎ অভিলাষী?'

দূত মথা চুলকোলেন, 'আজ্ঞে তা ঠিক নয়। বাদশাহ সাধারণ এক বিদেশি শাসক নন, তিনি রাজাধিরাজ। সারা দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয়ের অনেক রাজ্য তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন, হিন্দু রাজপুত অম্বর রাজকন্যাকে তিনি বিবাহ করেছেন।'

'হ্যাঁ, কীভাবে করেছেন তাও অগোচর নয়। অম্বররাজ বিহারীমলকে আপনাদের বাদশাহের আত্মীয় প্রচণ্ড নির্যাতন করছিল। রাজা তার প্রতিকার প্রার্থনা করলে আপনাদের বাদশাহ রাজার সম্পূর্ণ বশ্যতা দাবি করেন এবং বশ্যতার প্রমাণস্বরূপ তাঁকে কন্যাদান করতে বাধ্য করেন। এবং এই তথাকথিত বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় পাত্রীর পিতার গৃহ অম্বরে নয়, সম্ভারে, পাত্রের সেনাবাহিনীর ছাউনিতে।'

দূত ক্রোধ সম্বরণ করে বলেন, 'কী ভাবে বিবাহ হয়েছে ইতিহাস ভুলে যাবে, বিবাহ সম্পন্ন সেই সত্যই থাকবে। আপনার রাষ্ট্রীয় জ্ঞানে নিশ্চয় মানবেন, এই বিবাহের ফলে সারা দেশে তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সম্রাট। তাঁর সাম্রাজ্যের অধীনে সব রাজ্যের সমান্তরাজারা শান্তিতে রাজত্ব করছেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে। তিনি চান তাঁদের মতো আপনিও বাদশাহের ছত্রছায়ায় আসুন। যেমন রানি আছেন তেমনি থাকবেন, শুধু আর সকলের মতো স্বীকার করে নেবেন বাদশাহের সার্বভৌমত্ব।'

রাজসভা নিস্তব্ধ। স্তম্ভিত মন্ত্রী, সেনাপতি কোষাধ্যক্ষ ও পারিষদবৃন্দ। দুর্গাবতীর মুখে ঘন মেঘ।

'অর্থাৎ তিনি আমার স্বাধীনতা হরণ করতে চান? কেন? কী অপরাধ আমার?'

বিপন্ন মুখে দূত বলে, 'না, না। কোনও অপরাধের কথাই নয়। বাদশাহ মনে করেন হিন্দুস্তান জুড়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজ্য থাকার চেয়ে সকলের এক সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয়।'

'তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা সর্বজনের মান্য এমন বিধান কার? আমি তো মনে করি আরব-তুর্কি-মোঙ্গল প্রভৃতি অর্ধবর্বর জাতিরা নিজেদের উৎসভূমিতে সভ্যতা সৃজনে অপরাগ বলেই প্রাচীন উন্নত সভ্যতাগুলি ছলেবলে কৌশলে অধিকার করে বিনাশের পথে নিয়ে চলেছে।'

রক্তবর্ণ মুখে দূত বলে, 'মহারানি, আপনি কূটনৈতিক সৌজন্যের সীমা অতিক্রম করছেন।'

'সৌজন্য সমানে সমানে হয়। আপনাদের বাদশাহের চোখে আমি তাঁর অধীনস্থ। তিনি দাবি করছেন বশ্যতা, সৌজন্য নয়।'

'শেষবারের মতো বিনীত অনুরোধ করছি, আপনি নিজের এবং আপনার একমাত্র পুত্র, নাবালক রাজার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, আপনার রাজ্যের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, বাদশাহের প্রস্তাবে সম্মত হোন। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনার অপমানজনক কথাগুলি বাদশাহকে জানাবো না।'

'অবশ্যই জানাবেন। কারণ, রানি

দুর্গাবতী কোনওদিন বিদেশি বিধর্মীর পদতলে নিজের রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবে না।'

'আপনার অহঙ্কারের ফলাফল আপনার সমস্ত প্রজাকুল ভোগ করবে। আপনি নিজে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন।'

'আর তৈমুরের বংশধররা চিরকাল এ মাটিতে রাজত্ব করবে?' রানির ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপের হাসি।

বিনা বিদায় সম্ভাষণে ক্রোধোন্মত্ত দূত রানির দিকে পিছন ফিরে দ্রুতপদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত।

রাজসভার সকলে এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে দৃশ্যটির দর্শক। এখন একাধিক কণ্ঠ একযোগে কথা বলে ওঠে। মন্ত্রী হাতের ইঙ্গিতে সকলকে নীরব হতে নির্দেশ দিয়ে নিজে মুখ খোলেন।

'মহারানি, এ যে সর্বনাশ হয়ে গেল। নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে আমরা। বাদশাহী ফৌজ বিশাল, সুশিক্ষিত, তাদের হাতে পশ্চিমের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, তারা সর্বদা রণে লিপ্ত, অভিজ্ঞতায় বলুন, সমরকৌশ্যল বলুন, কার্যত আজ সারা দেশে অপ্রতিরোধ্য।' সেনাপতিও সায় দেন, 'ঠিক, ঠিক।' সভাসদরা মাথা হেলান।

দুর্গাবতী একটুক্ষণ নীরব থেকে তারপর ধীরে ধীরে বলেন, 'আমি এত বছর এরাজ্যের রানি। প্রথমদিন থেকে আজ অবধি রাজ্যের, প্রজাবৃন্দের কল্যাণ ছাড়া আর কিছুতে কখনও ক্ষণিকের জন্যও মন দিয়েছি কি? এমন কোনও কর্ম কি কখনো আমার দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে, যাতে প্রজাদের মঙ্গল সাধিত হয়নি?'

সমস্বরে উত্তর, 'না, রানিমা। কখনও নয়।'

'গত তিনশো বছর তুর্কি শাসনে উত্তর ভারতের অবস্থা দেখেছেন? হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন কারও সম্মান আছে? আছে তাদের কন্যা-ভগিনীদের নিরাপত্তা? আমাদের শাস্ত্রকে পদাঘাত করে হিন্দু নারীর গর্ভে মুসলমান সন্তান অহরহ জন্মাচ্ছে, হিন্দু সন্তানের মুসলমান জননীর দৃষ্টান্ত ক'টা? সবচেয়ে বড়ো কথা, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী। জমির ফসল বাবদ মুসলমানদের ধার্য এত অধিক পরিমাণে খাজনা দিয়ে তাদের কী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে?'

সমস্বরে উত্তর, 'নেই, নেই।'

'প্রজাদের এই বর্বরদের হাতে সমর্পণ করে অবধারিত বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেব আমি রানি দুর্গাবতী?' অসম্মানের কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সসম্মানে মৃত্যুবরণ গৌরবের। আমি হয় জিতবো, নয় মরবো।'

'জয় রানি দুর্গাবতীর জয়, জয় রানি দুর্গাবতীর জয়।'

'উরিব্বাস, একেবারে ফিলমি ডায়লগ! তুমি যে গণ্ডোয়ানার রানিকে একেবারে ঝাঁসির রানি করে দিচ্ছ।' বরুণের পিছনে দাঁড়িয়ে লেখাটি পড়তে পড়তে স্ত্রীর মন্তব্য।

'আমি করছি না, দুর্গাবতী এমনই ছিলেন বাস্তবে। মুসলমানরাই লিখে গেছে।'

'বল কী! আমরা এতদিন ইতিহাসে পড়িনি কেন?'

মৃদু হাসে বরুণ, 'জিজ্ঞেস করো আমাদের তথাকথিত ঐতিহাসিকদের।'

'তারপর কী হলো?'

আগ্রায় বাদশাহের দরবার। গড়কাটাঙ্গা ফেরত দূত উপস্থিত হয়ে কুর্নিশ করেন। দৌত্যের সাফল্যে নিশ্চিত আকবার প্রসন্ন মুখে প্রশ্ন করেন, 'কবে রানি দুর্গাবতী দরবারে হাজির হচ্ছেন? তাঁকে উপযুক্ত উপঢৌকনের সঙ্গে একটা খেতাবও দেব ভাবছি, তারিখটা কী?'

অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে ম্রিয়মাণ দূত। স্বর প্রায় রুদ্ধ। আকবর অধৈর্য, 'কী হল কী? কবে আসছেন দুর্গাবতী?'

'জাঁহাপনা, তিনি আসবেন না।'

'আসবেন না! কেন?'

'জাঁহাপনা, কারণ বলতে শঙ্কাবোধ করছি।'

বিস্মিত আকবর অভয় দেন। দূত তো শুধু বার্তাবহ। অতঃপর চৌরাগড়ে রানির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আনুপূর্বিক বিবরণ। নীরবে শুনতে শুনতে বাদশাহের মুখ হিংস্র আহত শার্দূলের। আদেশ দিলেন, আক্রমণ এখনি, সর্বশক্তি দিয়ে। তবে একটা কথা, রানি দুর্গাবতীর গায়ে যেন আঁচড়টি না লাগে। তাঁকে জীবিত বাদশাহের সামনে হাজির করা চাই, একদন। এ সম্বন্ধে কোনও ভুল যেন না হয়।'

আসগর খানের নেতৃত্বে বিশাল সেনাবাহিনী গড়কাটাঙ্গায় প্রবেশ করল। রাজ্যের বন-জঙ্গল পাহাড় পর্বত, নদীনালা দুর্গাবতীর নখদর্পণে। তেমনি তাঁর সামরিক কৌশলজ্ঞান। চৌরাগড়ে নয়, তিনি শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে রইলেন কৌশলী স্থানে, নাড়াইয়ের সঙ্কীর্ণ গিরিপথে, যার একদিকে ঘন জঙ্গলে ঘেরা পর্বতশ্রেণী আর দুদিকে নর্মদা ও গৌর নদী। বাদশাহি ফৌজের হামলা শুরু হলো। গোণ্ডদের না ছিল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, না সমর অভিজ্ঞতা। তবু তাদের বিশ হাজার অশ্বারোহী, সহস্র হস্তী এবং জাতির সব সমর্থ পুরুষের পদাতিক বাহিনী লড়ে গেল। দু'পক্ষেই হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। নিহত গোণ্ড সেনাপতি অর্জুন দাস। তখন রানি স্বয়ং যুদ্ধের পোশাকে তাঁর নিজের হাতির পিঠে প্রতিরোধে নামলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে গোণ্ড সেনা মরণপণ করে তাঁর

সঙ্গী। বাদশাহি ফৌজকে উপত্যকায় বেরিয়ে আসতে হলো। রানিও বেরিয়ে এসে তাদের তাড়িয়ে সমরাঙ্গন থেকে হটিয়ে দিলেন। জঙ্গলে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হলো ফৌজ। উৎসাহিত রানি তাঁর মন্ত্রী দেওয়ান পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে পরামর্শে বসলেন, 'শুনুন, এখনই আমরা এগিয়ে যাই, পিছন থেকে বাদশাহি ফৌজের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি।'

মন্ত্রী দেওয়ান সেনাপ্রধানরা সকলে একবাক্যে বলে ওঠেন, 'সে কি!'

'কেন, অসুবিধা কোথায়?' রানির প্রশ্নের উত্তরে বাকিরা প্রায় সমস্বরে বলেন, 'রানিমা সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, রাত্রি নেমে গেছে। এখন সব সেনার বিশ্রামের সময়। কাল সূর্যোদয়ে নবোদ্যমে রণ শুরু হবে।'

রানি বিরক্ত মুখে বলেন, 'সূর্যোদয় সূর্যাস্ত মেনে যুদ্ধ! আপনারা কি মহাভারতের যুগে বাস করেন? এটা কুরু-পাণ্ডবের লড়াই নাকি? যুদ্ধের নিয়মকানুন মেনে একই পরিবারের একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে? বাদশাহের ফৌজ কাদের নিয়ে জানেন না? আফগান, উজবেক, তাজিক ইস্পাহানি আরব, হাজার হাজার বিদেশি ভাড়াটের দল। তাদের লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে শত্রু নিধন করে প্রাণ ভরে লুণ্ঠন।'

বয়স্ক দেওয়ান বলেন, 'তাঁরা তো মানুষ, আজ সারা দিন তাদের পরিশ্রম তো আমাদের সেনার চেয়ে কম হয়নি।'

মন্ত্রী মান ঠাকুর প্রধানদের দিকে চেয়ে বলেন, 'সব সেনারাই ক্লান্ত নয় কি?'

সম্মতিসূচক মাথা হেলান তাঁরা। রানি প্রশ্ন করেন, 'আর ওরা যদি রাতের মধ্যে তাদের বিশাল বন্দুক যাকে কামান বলে, সেগুলো নিয়ে আসতে পারে তখন কাল কী হবে? আমাদের কামান আছে?'

'এই ঘোর অন্ধকারে অজানা বনজঙ্গল পাহড়ের মধ্যে দিয়ে অত ভারী ভারী অস্ত্র ওরা আনা নেওয়া করতে পারবেই না।' দেওয়ানের বিজ্ঞ মত। মান ঠাকুর তাল দেন, 'প্রশ্নই ওঠে না।' সেনাপ্রধানরা নীরব।

'তাহলে এটাই আপনাদের সকলে সুচিন্তিত মত, কাল প্রভাতের আগে যুদ্ধ নয়?' উপদেষ্টারা মাথা হেলান, হ্যাঁ। খানিকক্ষণ নীরব থেকে গম্ভীর মুখে দুর্গাবতী বলেন, 'বেশ তবে তাই হোক।'

অতঃপর নিশাবসান। দিনের আলো ফোটে। দুপক্ষের সেনা মুখোমুখি হতে না হতে শোনা গেল কামানের গর্জন। রাতের অন্ধকার, দুর্গম পরিবেশের প্রতিবন্ধকতা অগ্রাহ্য করে বাদশাহি ফৌজ কামান এনে উপস্থিত করে ফেলেছে। এখন নবোদ্যমে নবোৎসাহে তাদের সংগ্রাম অসম শত্রুর সঙ্গে। দুর্গাবতী নিজের হাতি শরমনের পিঠে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁর কিশোর পুত্র বীরনারায়ণও মায়ের সঙ্গে সংগ্রামে রত। কামানের গোলার সামনে তিরধনুক বর্শা তরবারি ক'টা বন্দুক কী করবে! তবু বাদশাহি ফৌজ দু-দুবার পিছু হটতে বাধ্য হলো। বীর নারায়ণ আহত। তৎক্ষণাৎ রানি তাকে অর্ধেক হস্তী বাহিনীর পাহারায় নিরাপদ চৌরাগড়ের দুর্গে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি নিজে বাকি বাহিনী সঙ্গে নিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ চালালেন। আরও একবার বাদশাহি ফৌজ পিছু হটতে বাধ্য হলো।

ফৌজদার আসগর খান দেখলেন রানিকে কাবু করতে না পারলে যুদ্ধে জয় শক্ত। এদিকে বাদশাহের হুকুম তাঁকে জীবিত দরবারে হাজির করতে হবে। আদেশ দিলেন প্রাণে না মেরে তাঁকে আহত করতে। রানিকে লক্ষ্য করে ঘোড়সওয়ারদের চারিদিক থেকে আক্রমণ শুরু হলো। একটি তির এসে বিঁধল দুর্গাবতীর কানের তলায় কণ্ঠে। যুদ্ধ করতে করতেই তিনি টান মেরে তিরটি তুলে ফেললেন। আরেকটি এবার বিদ্ধ করল তাঁর ললাট। সেটিও তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাত ও যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের জন্য। জ্ঞান ফিরতে তিনি দেখলেন দ্রুত ধেয়ে আসছে ফৌজের রিসালাদারেরা। দুর্গাবতী মাহুতকে বললেন, 'তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গী, তুমি জানো এ অবস্থায় তোমার কর্তব্য কী। আমাকে বধ কর।'

মাহুত উত্তর দিল, 'এ আদেশ কী করে মানবো রানিমা? যে হাতে সারা জীবন আপনার কাছ থেকে এত কিছু গ্রহণ করেছি, সেই হাতে আপনার প্রাণ নেবো! অসম্ভব। এ হাতি অতি দ্রুতগতি। বরং আপনাকে আমি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছি।'

'কাপুরুষ!' গর্জে উঠে রানি নিমেষের মধ্যে ছুরিকা বের করে নিজের বক্ষে বসিয়ে দিলেন। শহিদ হলেন দুর্গাবতী।

'ইস্ কী ট্রাজিক! এ সব ঐতিহাসিক ঘটনা? তারিখ জানো?'

'নিশ্চয়, ২৪ জুন, ১৫৬৪।'

'তারপর কী হলো?'

'গোণ্ড সেনারা তাদের রানির মতো আমৃত্যু চালিয়ে গেল সংগ্রাম। বাদশাহি ফৌজ চৌরাগড় দখল করতে গেলে দুর্গাবতীর কিশোর পুত্রও মাতৃপদ অনুসরণ করে প্রতিরোধের যুদ্ধে প্রাণ দিল। গোণ্ড রাজাদের কয়েক শত বছরের সঞ্চিত স্বর্ণভাণ্ডার লুণ্ঠন করল বিজয়ী তুর্কি ফৌজদার। নিয়ে গেল রণহস্তীগুলিও। তবে তার সবটাই খোদ বাদশাহের প্রাপ্তি হলো কিনা সে বিষয়ে কতক সন্দেহ। অতঃপর গড়কাটাঙ্গা আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। গোণ্ড জাতির যে বিকাশ কয়েক শত বছর আগে শুরু হয়ে দুর্গাবতীর প্রয়াসে বিশেষ দ্রুতগতি প্রাপ্ত হয়েছিল, তার গতি স্তব্ধ। বরং তাদের আদিম অস্তিত্বে পুনর্যাত্রা। ক্রমে বহিরাগতের আগমনের চাপে হাজার হাজার বছরের বাসভূমি থেকে উৎখাত হয়ে চারিদিকের অন্যান্য রাজ্যে প্রান্তিক জনজাতিতে পর্যবসিত। হিন্দুস্তানের জনমানস থেকে নিশ্চিহ্ন দুর্গাবতীর নাম।

কেটে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী। কালের অবধারিত নিয়মে একদিন পালাবদল। ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছে নতি স্বীকারের পর প্রবলপ্রতাপান্বিত তুর্কি বাদশাহ জালালউদ্দিন আকবরের উত্তরাধিকারী ভারতভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

অতঃপর সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ইংরেজদের একজন যাঁরা শুধু শোষণেই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন না, ছিলেন এ দেশের মানুষের প্রকৃত রক্ষক, তেমনি এক ব্যতিক্রমী পুরুষ এলেন মধ্য ভারতে, গোণ্ডদের একদা রাজ্যে। ঘুরতে ঘুরতে দেখলেন অরণ্যে পাহাড়ের তলায় সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ও দুটি নদীর মধ্যে এক সমাধি। সঙ্গী গ্রামবাসীরা সসম্ভ্রমে জানাল, তাদের রানি দুর্গাবতীর সমাধি। কে এই রানি? শুনলেন তাঁর কাহিনি, যে কাহিনি গোণ্ডরা সব হারিয়েও সযত্নে মনের মণিকোঠায় রক্ষণ করে এসেছে, শুনিয়েছে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে প্রতি প্রজন্মকে জাতির গৌরবগাথা। ইংরেজ দেখল রানির সমাধির দুই দিকে দুটি বিশাল গোলাকার ঢাকের আকৃতির প্রস্তরখণ্ড।

'অদ্ভুত তো!' একজন গ্রামবাসী জানায়, 'ও দুটি রানিমার রাজডঙ্কা। শত্রু দেখা দিলেই সেনাদের ডাকার জন্য বাজানো হতো। উনি এইখানেই অস্ত্র হাতে বীরগতিপ্রাপ্ত হন। তাই ডঙ্কাদুটিও পাথর হয়ে তাঁর সঙ্গে রয়েছে।'

প্রকৃতি ও মানুষের কি আশ্চর্য সংযোগ, জড় পদার্থেরও কি অনুভূতি সম্ভব, বিস্মিত ইংরেজ মনে মনে ভাবেন। বহু বছর বাদে এ অঞ্চলে কাজে এসে আবার দর্শন করতে এলেন দুর্গাবতীর সমাধি। তার সামনে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলেন রানির অমর কাহিনি। সমাধির চারিপাশে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের সব স্ফটিক খণ্ড, এ মাটিতে প্রকৃতির দান। কয়েকটি তুলে নিয়ে রাখেন সমাধিতে। তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি।

'এজন্যই বাঙালিকে বাকি ইন্ডিয়ানরা সাহেবের চামচা বলে। কী দরকার ছিল সাহেবকে আনার?' পাঠিকা অরুণিমার মন্তব্য।

'আমি জানি না। এনেছে ইতিহাস। এ সাহেব কে জানো? স্যার মেজর জেনারেল উইলিয়াম হেনরি স্লিম্যান।'

'ইনি কি সেই স্লিম্যান যিনি বহু বছর ধরে জনগণের ত্রাস খুনি-ডাকাত ঠগিদের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে আমাদের রক্ষা করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, সেই স্লিম্যান ভারতে তাঁর ভ্রমণ ও বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে আদান-প্রদানের ওপর দারুণ বইও লিখে গেছেন। সেখানেই এই শ্রদ্ধাঞ্জলিটি লিপিবদ্ধ। নিজে বীরপুরুষ ছিলেন, তাই মর্যাদা দিয়ে গেছেন বীরাঙ্গনাকে। আজ দেশ স্বাধীন, রানি দুর্গাবতীর মূর্তি জব্বলপুরে, তাঁর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত, হয়েছে স্মৃতিসৌধ, তাঁকে নিবেদিত সংরক্ষণাগার। তাঁর নামে রাজ্যের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়, দূরপাল্লার ট্রেন। ২৪ জুন তাঁর শহিদত্বের স্মরণে ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন বিশেষ ডাকটিকিট।'

'সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'শেষ আর হলো কই?' বরুণ মৃদু হেসে আবার লেখে।

নাড়াইয়ের পর্বত বনজঙ্গল ঘেরা সংকীর্ণ গিরিপথে আকবর বাদশাহের ফৌজের সঙ্গে দুর্গাবতীর সেই অসম রণে যে অগণিত গোণ্ড সেনা সংগ্রাম করে মৃত্যু বরণ করেছিল তারা সব শায়িত তাঁর চারিধারে। গ্রামবাসীরা শোনে কোনও কোনও নিশুতি রাতে দুর্গাবতীর রাজডঙ্কা বেজে ওঠে। ডাক দেয় মাটির তলায় অশরীরি সেনাদের, 'বীরগণ জাগো, ওঠ, শত্রু নিধন কর। জাগো ওঠ, জাগো, জাগো...' ▮

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

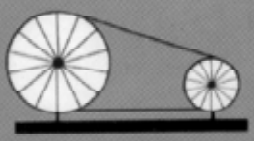

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম

চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩

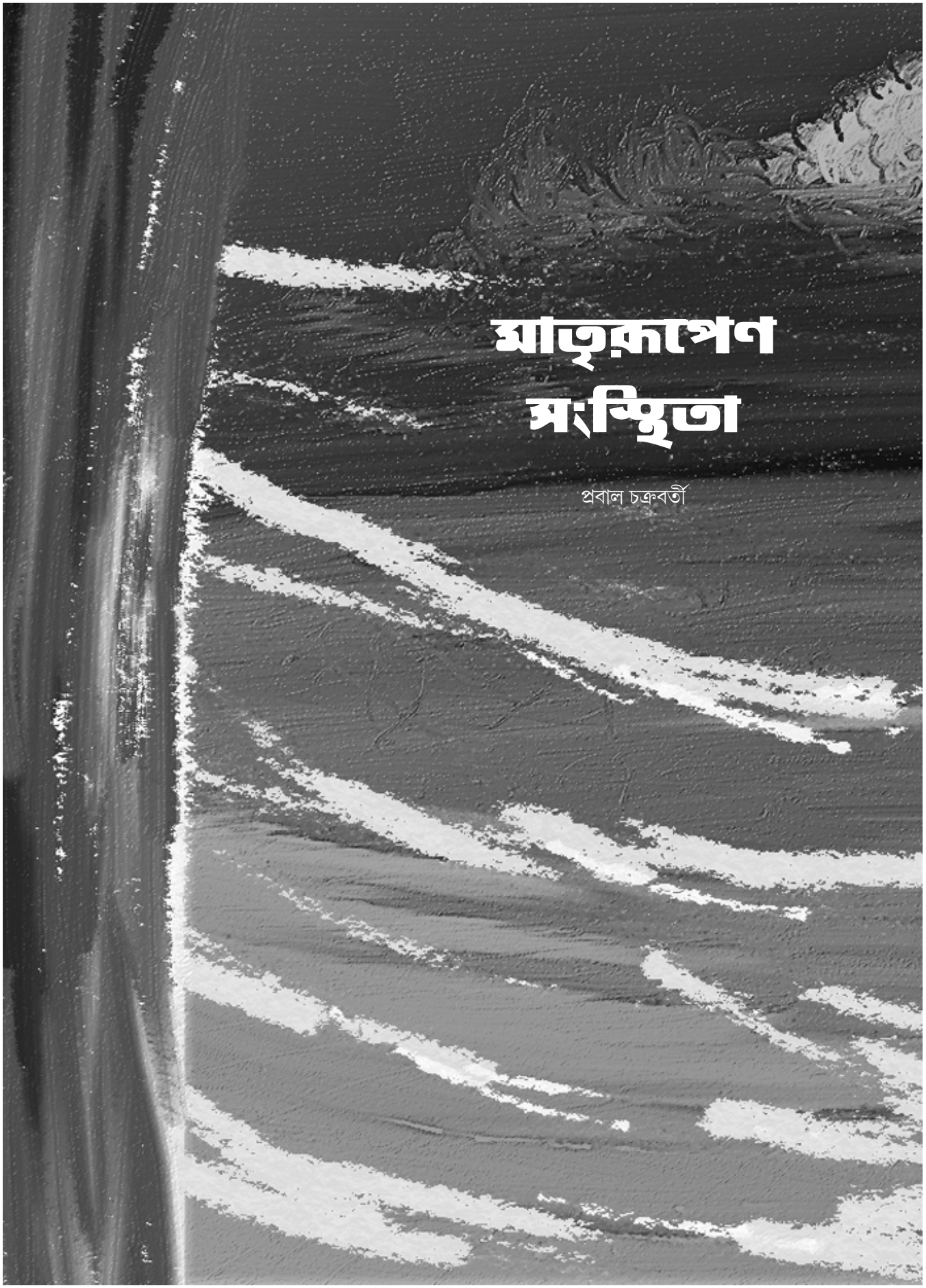

মাতৃরূপেণ সংস্থিতা

প্রবাল চক্রবর্তী

উপন্যাসোপম কাহিনি

হঠাৎ তূর্যনিনাদে কেঁপে উঠল প্রান্তর।

দূরে দিগন্তরেখায় আকাশছোঁয়া বরফ-ঢাকা পর্বতমালা, দু-হাত দিয়ে আগলে রেখেছে অভিরাম এক শ্যামল ভূভাগকে। তারই মাঝে অতিকায় এক হলুদ পাথরের বেদী। সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে সেদিকে। সে বাহিনীর সবাই নারী। তাদের পায়ের তলায় চূর্ণ হচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দানব-সেনাদের মৃতদেহ। বাহিনীর নেতৃত্বে রক্তবস্ত্র পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারীযোদ্ধা, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। তাঁকে ঘিরে রেখেছেন দশজন নারী-যোদ্ধা। তাঁরা কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। ঝোড়ো বাতাস বইছে শন্‌শন্‌ শব্দে। রাশি রাশি ধূলিকণা পাকসাট খেতে খেতে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ব্যোমমার্গে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রাণপণে ডানা ঝাপটে এদিক ওদিক পালাচ্ছে। আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় হতভম্ব প্রকৃতি থরথর করে কাঁপছে। আকাশ ফাটিয়ে রুপোলি বিদ্যুতের তরবারি ধেয়ে গেল দিগন্তের এপার থেকে ওপারে। প্রাণপণ চেষ্টা করছে মহিষ, দৌড়ে পালাতে। পা অসাড়। শরীর অসাড়। ঝাপসা চোখে মহিষাসুর দেখল, দশদিক আলো করে সিংহবাহিনী নারীযোদ্ধার ত্রিশূল ধেয়ে আসছে তারই দিকে। মেরুদণ্ড বরাবর তীব্র এক হিমশীতল স্রোত বয়ে গেল। জীবনে এই প্রথম প্রাণভয় জাগলো মহিষাসুরের মনে।

'মা! রক্ষা করো মা!!!'

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসল মহিষ। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। যেদিন থেকে ব্রঙ্গায় এসেছে, সেদিন থেকে প্রায় রাতেই এই স্বপ্নটা ফিরে ফিরে আসে। তারপর আর ঘুম আসে না সারারাত। কে ওই নারী? কেন তাকে এত ভয়? সিংহবাহিনীর মুখখানা যেন ঠিক মাতামহী দনুর মতো।

বাঁ চোখের ওপরের গভীর কাটা দাগটার ওপর অন্যমনস্কভাবে হাত বোলালো মহিষ। গবাক্ষের বাইরে নিরন্ধ্র মেঘলা আকাশ। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে সেই সকালবেলা থেকে। এখনও থামার নাম নেই। বাতাসে ভিজে জঙ্গলের গন্ধ। পাঁকের গন্ধ। ভিজে জংলি পশুর বোঁটকা গন্ধ। দূর থেকে ভেসে এল হাড়-কাঁপানো একটা হুঙ্কার। ব্রঙ্গার বাঘ শিকার খুঁজছে। হঠাৎ ভীষণ গা গুলিয়ে উঠল মহিষের। ওই ঘন জঙ্গলের মাঝে, মাতলী নদীর ওই থক্‌থকে কালো কাদার নীচে পোঁতা আছে বহু রক্তপিপাসু রাজার দিগ্বিজয়ের নিষ্ফল স্বপ্ন। বড় অলক্ষণা এই ব্রঙ্গা।

একটি রাজ্য অধিকার করতে কতদিন সময় লাগে? বেশিদিন লাগে না, যদি সে রাজ্যের শাসক অযোগ্য হয়। আর যদি সে রাজ্যের প্রচারা ভাবে, কে রাজা হল তাতে কী আসে যায়, সব রাজাই তো সমান।

না, একটি রাজ্য অধিকার করতে বেশিদিন তো লাগে না। তা সে যত শক্তিশালী রাজ্যই হোক না কেন।

ঠিক ছ'মাস আগের কথা।

পাড় থেকে অনেক দূরে গভীর সমুদ্র। সেখান থেকেও পরিষ্কার দেখা যায়, ব্রঙ্গার সমুদ্রবন্দরের ব্যাপ্তি এতটাই। মাতলী নদীর মোহনায় সুন্দরী ও গরান গাছের ঘন জঙ্গল ফুঁড়ে যেন মন্ত্রবলে বেরিয়ে এসেছে এক মায়ানগরী। জড়ো হয়েছে অগণিত পালতোলা নৌকা। নিত্যনতুন নৌবহরের আনাগোনা, নাবিকদের উচ্চস্বরে গান হইচই, নৌকা-সারাইয়ের ঠুকঠাক ও মালবাহকদের তর্কাতর্কিতে মুখরিত এক অতিকায় বন্দর। ধূসর সন্ধ্যা নামছে ব্রঙ্গাসাগরে। বন্দর থেকে শতহস্ত পরিমাণ দূরত্বে পৌঁছনোমাত্র ছোট্টো নৌকাটি বাঁক নিল পশ্চিমদিকে। বাহুল্যবিহীন নৌকাটির আরোহী মাত্র দু'জন। একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। উভয়েরই মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে ঢাকা। নৌকার হাল নারীটির হাতে, দাঁড়দুটি পুরুষটির। কিছুদূর পশ্চিমমুখী চলার পর বন্দরের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এল। জঙ্গল এখানে নিবিড়। সঘন জটাজাল ভেদ করে শীর্ণ একটি নদী অনেক দ্বিধায় এসে মিশেছে সমুদ্রে। দুর্ভেদ্য লতাগুল্মর আড়ালে প্রায় অদৃশ্য তার মোহনা, নদীটির নাম মালঞ্চ। নৌকা এখানে এসে আবার অভিমুখ পরিবর্তন করে নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। নিমেষে সূচীভেদ্য আঁধার ঘনিয়ে এল। এখানে দিনের বেলাতেও সূর্যদেবের প্রবেশ নিষেধ, সন্ধ্যা তো কোন দূরস্থান। তিন হাত দূরে কী আছে, তাও ঠিক করে ঠাহর করা যায় না। বাতাসে পচা শ্যাওলার দুর্গন্ধ। অখণ্ড নীরবতা, পাখিও ডাকে না। অসংখ্য উর্ধ্বমূল বৃক্ষের গোলকধাঁধা পেরিয়ে অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে চলল নৌকাটি। মাঝেমাঝেই নৌকা আটকে যায়, জঙ্গল কেটে পথ বানাতে হয়। ঠিক সেই সময় সরসর শব্দ করে কুমীর সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় নৌকার পাশ কাটিয়ে। ক'ঘণ্টা এইভাবে চলার পর দূরে শোনা গেল মানুষের স্বর। শিশুদের

কলকাকলি, গৃহস্থালীর ঠুংঠাং। ভারী শকটের রাজপথ দিয়ে দৌড়ে চলার ঘর্ঘরধ্বনি। সেইদিকে আঙুল তুলে নৌকারোহী মহিলাটি বলল, 'এবার থামো। আমরা এসে গেছি।'

'হুঁ', এই বলে লোকটি মুখের কাপড় সরালো। খর্বাকৃতি বলিষ্ঠদেহী এক যুবক। ফর্সা রং। থুতনির নিচে চাপবাঁধা দাড়ি, চোখে ক্রূরতা ও শঠতার এক নৃশংস সংমিশ্রণ। দাঁড়ের সাহায্যে নৌকাটিকে ধীরে ধীরে তীর সংলগ্ন একটি সুন্দরী গাছের সন্নিকটে এনে ফেলল, বেঁধে ফেলল উর্ধমুখী একগাছি শিকড়ের সঙ্গে। এখান থেকে দিব্যি দেখা যায়, দূরে জঙ্গলে ঢাকা একটি গ্রাম। উল্কা জ্বলছে স্থানে স্থানে। আলোছায়ার অলৌকিক হিজিবিজিতে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে গ্রামটিকে।

'শোনো রক্তবীজ', বলল মহিলাটি, 'যে পথ দিয়ে আমরা এলাম, ঠিক সেই পথ দিয়ে প্রতি রাতে পাঁচটি নৌকা বোঝাই করে তোমার লোকেদের এই গ্রামে নিয়ে আসবে। প্রতি রাতে পাঁচটি নৌকা, তার বেশি কোনোমতেই নয়। অন্যথায় ব্রঙ্গার নৌসেনা টের পেয়ে যাবে। গ্রামের অধিবাসীরা তোমার লোকেদের থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবে। তিন-চারমাস এইভাবে চালিয়ে যেতে হবে। তাহলেই...'

'এ গ্রামের লোকেরা বহিরাগতদের স্বাগত জানাবে কেন? বিশেষত আমরা যখন অসুর, আর এরা ব্রঙ্গাহৃদি।'

'এরা ব্রঙ্গাহৃদি নয়', বললেন মায়াবলী, 'ব্রঙ্গাসাগরের ওপারের কোনও এক দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এসেছিল এখানে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। আমার পিতা তখন ছিলেন ব্রঙ্গার শাসক। তাঁকে অনুরোধ করে আমিই এদের এখানে বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিই। সেই থেকে এরা আমার বশংবদ। আমি যা বলব, এরা তাই শুনবে। হুঁঃ...' মনে মনে হেসে উঠলেন মায়াবলী, 'না আমার পিতা, না আমার ভ্রাতা— কেউই তখন খেয়াল করেনি, রাজ্যে এত জায়গা থাকতে এদের বসতির জন্য এই জায়গাটাই আমি কেন বেছে নিয়েছিলাম। এই স্থানটির একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বলো তো সেটি কী?'

'বৈশিষ্ট্য হল', বলল রক্তবীজ, 'গঙ্গানগরের মূল রাজপথ এই বসতির পাশ দিয়ে গেছে। সমুদ্রবন্দর ও গঙ্গানগরের মধ্যেকার একমাত্র যোগস্থল সে রাজপথ।'

'ঠিক তাই, 'বললেন মায়াবলী, 'এখানে কোনও বড়সড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারলে গঙ্গানগর অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। সেই সুযোগের সঠিক সদ্ব্যবহার করতে পারলে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়েই রাজপ্রাসাদ জয় করা সম্ভব। তাই যেমন বললাম, সেইমতো কাজ শুরু করো। আজ রাত থেকেই। তোমার সাথে গ্রাম প্রধানের পরিচয়...'

'কী নাম এই গ্রামের?' প্রশ্ন করল রক্তবীজ।

'অলতু', বললেন মায়াবলী।

জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে চাঁদ উঠল এইমাত্র। রুপালি নয়, হলদে চাঁদ। নোংরা, ভুতুড়ে তার আলো। অলতু। অদ্ভুত নাম তো! গা-ছমছম গ্রামটিকে একবার ভালো করে দু'চোখ ভরে দেখলো রক্তবীজ। শান্ত, নিস্তরঙ্গ, বৈশিষ্ট্যহীন একটি গ্রাম। ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেবে এই গ্রামটি। পূর্ব ভারতে অসুর বিজয়কেতন এখানেই প্রথম উড়বে।

দিগন্তে রঙের আবির ছিটিয়ে সূর্যদেব সবে চিক্‌চক্রবালে উঁকি দিয়েছেন, এমন সময় দিগন্তের অন্ধকার ওপার থেকে হাঁসফাঁস শব্দ করতে করতে চলমান প্রেতের সারির মতো একদল মহিষ হাজির হল নদীখাতে। দীর্ঘ যাত্রাশেষে ধূলিমলিন তাদের বর্মাবৃত দেহ। পিঠে আসীন বর্মাচ্ছাদিত ভীমকায় যোদ্ধারাও সবাই শান্ত। মাথায় তাদের মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ, তবু সগর্বে উঁচিয়ে রয়েছে, যেন প্রতিস্পর্ধায় আহ্বান করছে সূর্যদেবকে। সবার পিছনে ধীরগতিতে গড়িয়ে চলেছে একটা খালি খাঁচাগাড়ি, চারটে মহিষ টেনে নিয়ে চলেছে সেটাকে। সবাই একসঙ্গে থমকে দাঁড়ালো।

রাজপথ এখানেই শেষ হয়েছে।

একরাশ মানুষ-সমান উঁচু প্রস্তরখণ্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে সেখানে। তাদের ফাঁক দিয়ে সাদা নুড়িপাথর বিছানো আঁকাবাঁকা নদীখাত বেয়ে তিরতির বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জলের ধারা। রাজপথ মিশে শেষ হয়েছে সেই নদীতেই। নদীর ওপারে সমতল জুড়ে যতদূর চোখ চায় ঢেউখেলানো বনানী। ঘন বন নয়। এই পাথুরে জমিতে মহীরুহ জন্মায় না। ঝোপঝাড় লতাগুল্ম একত্রিত হয়ে কাননের রূপ পরিগ্রহ করেছে। সে কাননের আনাচে-কানাচে বাজরার খেত। ভোরের সোঁদা বাতাসে পাকা ফসলের সুগন্ধ।

ধীর সন্তর্পণে নদী পেরোলো মহিষসেনা। বাজরার খেত মাড়িয়ে জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এক প্রহর পথ চলার পর দেখা গেল, সমতলভূমি ধাপে ধাপে গড়িয়ে উঠেছে উঁচু পাথুরে পাহাড়ে। সেই পাহাড়কে বেড় দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা এক তটিনী। শীর্ণকায় সেতু এপারের সঙ্গে ওপারের সংযোগ রক্ষা করেছে। ওপারে পায়ে চলা পাকদণ্ডী পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে গেছে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত।

সেখানেই পাহাড়ের চাঁদির ওপরে জড়ো হয়েছে শ'খানেক কুটির। জংলি লতাগুল্ম দিয়ে তৈরি তাদের শরীর, লতাগুল্ম দিয়ে ছওয়া মাথা। পাহাড়ের কোলে আয়েশে গা এলিয়ে রয়েছে ছোট্ট শান্ত পাহাড়ি গ্রাম। সেতু পার হয়ে মহিষ-বাহিনী সেদিকেই এগিয়ে চলল।

গ্রামের পাঠশালায় এখন পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীরা একে একে শিক্ষকের সামনে এসে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল, এমন সময় পাঠশালার বাইরে শোনা গেল মহিষ-বাহিনীর খুরের শব্দ। সঙ্গে একাধিক অচেনা কণ্ঠের হুঙ্কার।

'ও-ওটা কী গুরুমশাই?' ভয়ে কেঁপে উঠলো ছাত্র-ছাত্রীরা।

'আমি দেখছি। তোমরা কেউ কিন্তু বাইরে বেরিও না না।' বলে শিক্ষক বেরিয়ে এলেন পাঠশালা থেকে। বেরিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। পাঠশালা ঘিরে ধরেছে একদল মহিষ-সৈন্য। প্রতিবাদ করার আগেই শিক্ষককে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল সৈন্যরা। তুলে দিল খাঁচাগাড়িতে। একদল সৈন্য ধেয়ে এল পাঠশালার ভেতরে। শিক্ষার্থীদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে তুলতে লাগলে সেই খাঁচাগাড়িতে। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনে গ্রামের লোকেরা জড়ো হয়েছে পাঠশালার আশপাশে। নিজেদের সন্তানদের খাঁচাগাড়িতে বন্দি দেখে আর্তনাদ করে উঠল তারা। মারমুখী হয়ে খাঁচাগাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন।

'গ্রামবাসীরা', চিৎকার করে বলল সৈন্যদের দলপতি, 'তোমরা নিশ্চয়ই অবগত আছো, সম্রাট তার সেবার জন্য সাম্রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম থেকে প্রতিবছর পাঁচটি বালক ও পাঁচটি বালিকাকে রাজপ্রাসাদে পাঠাতে বলেছেন। তোমরা সে আদেশ এখনও পালন করোনি। সম্রাট মহিষাসুর দয়াবান, তাই তোমাদের কোনওরূপ শাস্তি দেননি। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য তো তাঁকে দিতেই হবে। তাই আজ আমরা তোমাদের গ্রাম থেকে সম্রাটের প্রাপ্য ও ক্ষতিপূরণ বাবদ কুড়িটি বালক-বালিকাকে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো না, তাহলে ফল ভয়ঙ্কর হবে।'

সন্তানদের আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে শিউরে উঠল গ্রামবাসীরা। যে যা পেল হাতের কাছে, তাই নিয়ে আক্রমণ করল মহিষাসুরের সৈন্যদের। মহিষ-দলপতি নির্দেশ দিল, 'আক্রমণ'। দেখতে দেখতে বাতাসে ঝড় তুলে দৌড়ে এল মহিষ-যুথ, নিমেষে পিষে ফেলল গ্রামবাসীদের। অসম এই যুদ্ধের পরিণতি নিয়ে সংশয় থাকার কথা নয় কারোর। কিন্তু তাতে কী আসে যায়! বুকের সন্তানকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে নরপিশাচরা, এটা দেখার পর কোন বাবা-মা নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে? দলে দলে গ্রামবাসী দৌড়ে এল চারিদিক থেকে। তাদের লাশের পাহাড় জমে উঠল পাঠশালার সামনে। রক্তের দুর্গন্ধ মিশে গেল ভোরের পবিত্র বাতাসে।

আড়াল থেকে সবই দেখল মেয়েটি।

ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা গ্রামবাসীদের মৃতদেহগুলিকে মাড়িয়ে মহিষ-যুথ এগিয়ে চলল ফেরার পথে। খাঁচাগাড়ি ভর্তি শিকার নিয়ে। পাকদণ্ডী বেয়ে অর্ধ প্রহরকালের মধ্যেই পৌঁছে গেল সেতুর সামনে। এমন সময় দলপতি দেখল, সেতুর অন্য পারে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কিশোরী। গাত্রবর্ণ রক্তাভ, এলোচুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। পরনে ধূলিমলিন ছিন্নভিন্ন বসন। অস্বাভাবিক রকমের রুগ্ন ও লম্বা মেয়েটি। জলভরা চোখদুটোয় দাবানলের আগুন জ্বলছে। 'সাবধান।' হুঙ্কারের সঙ্গে বলল সে, 'সেতু পার হওয়ার চেষ্টা করেছো কী মরেছো।'

'কে রে তুই, আমাদের সাবধান করছিস?' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেঁকে বলল দলপতি, 'হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন ব্যাঙ বলে কত জল! অ্যাই, মেয়েটাকে ধর তো।' এই বলে বাহন মোষটিকে ছুটিয়ে দিল সেতুর ওপর, পেছনে বাকি সৈন্য।

নিশ্চল দেহে দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত পার হয়ে গেল। মহিষ-দলপতি কাছেই এসে পড়েছে। মেয়েটি তবু স্থির দৃষ্টিতে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ব্যাপারটা কী? দলপতির মনটা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে উঠল। পেছন ফিরে দেখল, সৈন্যরা সবাই সেতুর ওপরে উঠে পড়েছে। খাঁচাগাড়িটা যেহেতু সবার পেছনে ছিল, সেটা এখনও রয়েছে সেতুর অন্য পারে, মাটির ওপর। দলপতি ঘাড় ফিরিয়ে সামনে দেখল, দীর্ঘদেহিনী সেই কিশোরী তার শীর্ণ হাত মাথার ওপরে তুলেছে। হাতে দীর্ঘকায় এক খড়্গ। মুহূর্তে দলপতির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, কী ঘটতে চলেছে। ক্ষীপ্রগতিতে নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে নিভুল লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিল মেয়েটির দিকে। সেই মুহূর্তেই খড়্গের ভয়ঙ্করী আঘাতে সেতুর রুজ্জবন্ধনী ছিন্নভিন্ন করে দিল মেয়েটি। মড়মড় করে সেতু হেলে পড়ল একধারে। দেখতে দেখতে মহিষের দল আরোহীশুদ্ধ গড়িয়ে পড়ল নদীতে। খরস্রোতা পাহাড়ি নদী ধুয়ে নিয়ে গেল তাদের। শুধুমাত্র বন্দিভর্তি খাঁচাগাড়িটাই রয়ে গেল ওপারে। অরক্ষিত।

দলপতির তরবারি মেয়েটির গলা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, গভীর এক ক্ষত রেখে গেছে। সেই ক্ষতস্থান হাত দিয়ে চেপে ধরে মেয়েটি হাঁটতে শুরু করল। গ্রাম যেদিকে তার ঠিক উল্টোদিকে। মহিষের সঙ্গে শত্রুতা করে নাকি কেউ বেঁচে থাকে না। বাঁচার একটাই উপায়, পালাতে হবে। আঙুলের ফাঁক গড়িয়ে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, সে রক্তে ভিজে যাচ্ছে জামা। তবু

মেয়েটির চলা থামলো না। পালাতে হবে। অনেক অনেক দূরে।

সেদিন থেকেই ছিন্নমস্তা গ্রামছাড়া।

মন্ত্রণাগৃহের আসন ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় প্রতিহারী এসে সংবাদ দিল, গুপ্তচর-প্রধান বিরুপাক্ষ এসেছে। বিরক্ত হয়ে মহারাজ অমিতবল প্রহর-প্রদীপটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আলোকশিখা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার মানে, প্রহর শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। সে এসে পড়বে... এসময় বিরুপাক্ষ কেন এসেছে বিরক্ত করতে? ইচ্ছে করছিল, লোকটাকে তাড়িয়ে দিতে। কিন্তু ব্রঙ্গরাজ্যের প্রাচীন পরম্পরা, গুপ্তচর-প্রধান যদি রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়, তবে তাকে ফেরানো যায় না। তা সে দিবা বা রাত্রির যে কোনও সময়েই হোক না কেন। তার ওপর এই লোকটা পিতার সময় থেকেই গুপ্তচর বিভাগের সর্বেসর্বা। বাধ্য হয়েই মহারাজ অনুমতি দিলেন।

'প্রণাম মহারাজ!' বিরুপাক্ষ করজোড়ে রাজার সামনে এসে দাঁড়াল।

'কী বলতে চাও, তাড়াতাড়ি বল।' বিরুপাক্ষের সৌজেন্যের উত্তর না দিয়েই বললেন রাজা।

'মহারাজ, সমস্যাটা অলতু নিয়ে।'

'কী হয়েছে সেখানে? নতুন কী সমস্যা?'

'সমস্যাটা ঠিক সেখানে নয়', বলল বিরুপাক্ষ, 'সমস্যা তার নিকটবর্তী বনানীকে নিয়ে। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, গত মাসে আপনি রাজকীয় অধ্যাদেশ জারি করেছেন, মালঞ্চ নদীর মোহনা পর্যন্ত যাবতীয় বনানী পরিষ্কার করে সেখানে সমুদ্রবন্দর বিস্তারের কাজ শুরু করতে হবে।'

'হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই। বন্দরে বড্ড ভিড় হচ্ছে, সময়মতো জাহাজগুলোর শুল্ক আদায় হচ্ছে না। মেরামতির কাজ দিনের পর দিন পড়ে থাকছে। বন্দর বিস্তার না করতে পারলে বহু বণিক অন্য বন্দরে চলে যাবার কথা বিবেচনা করবে। অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে তাতে।'

'ঠিক মহারাজ। কিন্তু সমস্যা হল, ওই বনানীর মধ্যে বহু জায়গায় অলতুবাসীরা চাষবাস ও পশুচারণ করে। জমি ছেড়ে দিতে হবে শুনে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। তারা ঠিক করেছে, রাজপথ অবরোধ করবে।'

'করলে করবে। তখন তাদের লাঠিপেটা করে হটিয়ে দিলেই চলবে।'

'সেখানেও একটা সমস্যা রয়েছে। আমার কাছে গুপ্ত সংবাদ এসেছে, রাজভগিনী মায়াবলী সেই অবরোধের নেতৃত্ব দেবেন। সৈন্যরা কি রাজভগিনীর ওপর বলপ্রয়োগ করতে রাজি হবে? আরেকটি ব্যাপার আমার সন্দেহের উদ্রেক করছে। শুনেছি, সম্প্রতি অলতুবাসীরা সবাই অসুধর্ম গ্রহণ করেছে। গ্রামের কেন্দ্রে যে মাতৃমন্দিরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা আপনার পিতার হাত দিয়ে হয়েছিল, সেটিকে অপবিত্র ও ভূলুণ্ঠিত করেছে গ্রামবাসীরা।'

'বটে! তাদের এতবড় স্পর্ধা!' উত্তেজিত হয়ে উঠতে গিয়েও দমে গেলেন রাজা। নজর পড়ল প্রহর-প্রদীপটির দিকে। এইমাত্র নিভে গেল সেটি। প্রতিহারী এসে নতুন একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। অর্থাৎ, রাতের প্রথম প্রহর শুরু হল। সে মায়াবিনী হিরণ্যকেশী নিশ্চয়ই এসে পড়েছে। আমার প্রতীক্ষায় সে বসে আছে। ওহ, বড্ড সময় নষ্ট করে এই বিরুপাক্ষ।

'তাতে কী হয়েছে।' বললেন রাজা, কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ভাব স্পষ্ট। সেই বিরক্তিকে অগ্রাহ্য করেই বিরূপাক্ষ বলল, 'মহারাজ, আমি বহুদিন ধরে অসুরদের সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করছি। দেখছি, সারা জম্বুদ্বীপ জুড়েই এরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আর তার মূলে রয়েছে এদের বিশেষ ধরনের কার্যপদ্ধতি, যার মোদ্দা কথা হল, জনসংখ্যার বিস্তার। নারী, ভূমি ও নেতৃত্ব— এই তিনটি এদের লক্ষ্য। নারীদের এরা মানুষ নয়, বর্ধিত হারে প্রজননের উপায়মাত্র বলে মনে করে। আর সেই প্রজননের মাধ্যমে এরা একের পর এক ভূমি অধিকার করে। এরপর সেই ভূমির অধিকারের মাধ্যমেই এরা সমাজের নেতৃত্ব জবরদখল করে। কোনও রাজ্যে এদের সংখ্যা যখন রাজ্যের মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশের কম থাকে, তখন এরা বলে, আমি একজন অসুবাদী, তাই বলে আমি সন্ত্রাসী নই। আমি রাজ্যের শত্রু নই। আমিও একজন মনুসন্তান, একজন মানুষ। আমি শুধু সম্মানের সঙ্গে শান্তিতে বাঁচতে চাই। চাই ন্যূনতম নাগরিক অধিকারটুকু, আর কিছু চাই না। আমার অসুবাদ শান্তির মতবাদ, আমি শুধু শান্তি চাই। এই বলে সকলের অগোচরে এরা নিজেদের জনসংখ্যা বাড়িয়ে চলে। অনুপ্রবেশ, ধর্মান্তর, বর্ধিত হারে প্রজনন— নানান পদ্ধতিতে। এই করতে করতে যেই এদের জনসংখ্যা কুড়ি শতাংশে পৌঁছায়, এদের হাবভাব যায় বদলে। এরা তখন বেশ রোয়াবের সঙ্গে বলে, এ রাজ্যটা কারোর একার নয়। আমরা কারোর দয়ায় এখানে নেই। এখানে অসুরদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। অসুবাদ শান্তির মতবাদ। কিন্তু আমাদের স্বতন্ত্র উপাসনা-পদ্ধতি অনুসরণের জন্য আমাদের

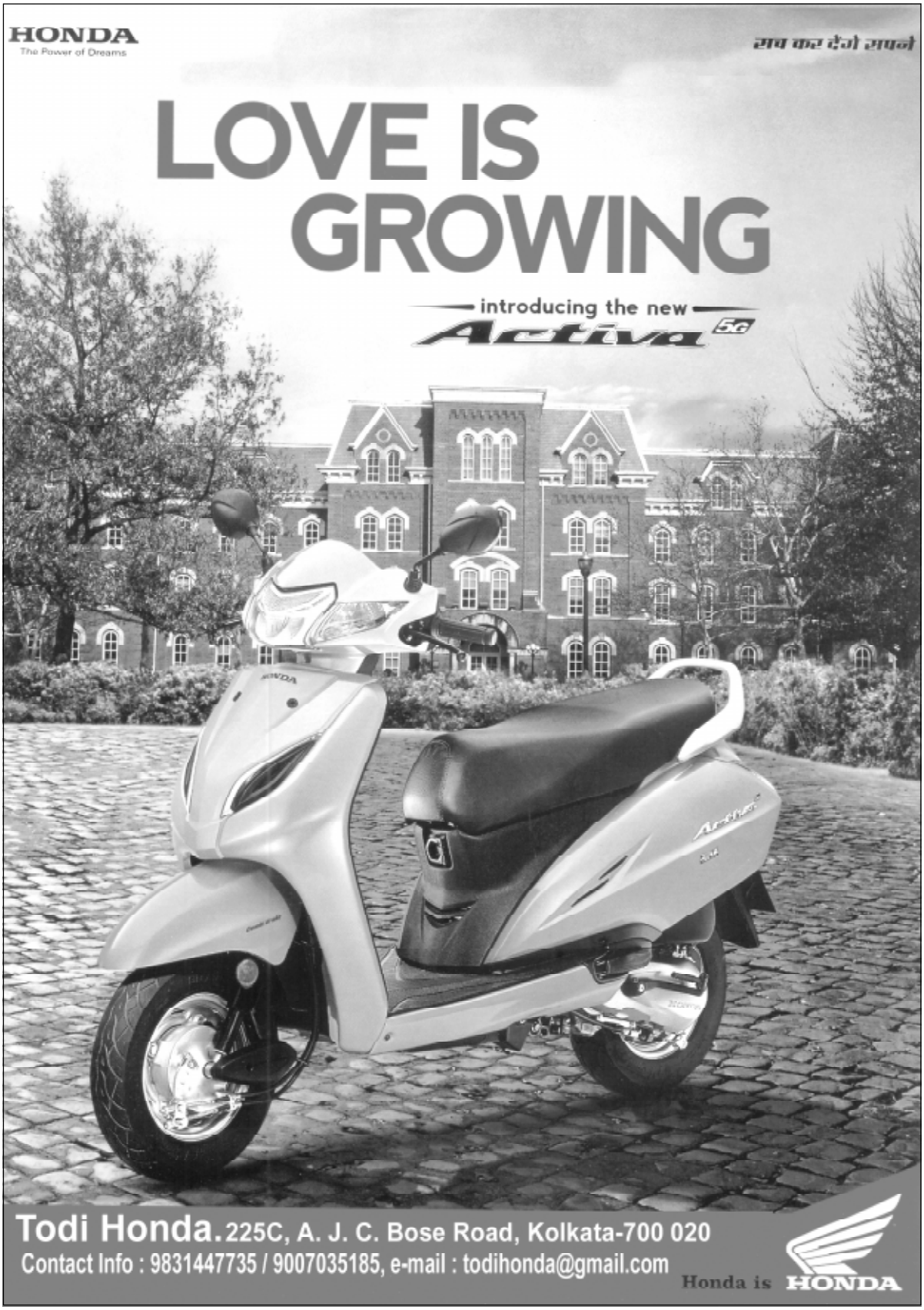
HONDA
The Power of Dreams
सब कर देंगे सपने
LOVE IS GROWING
introducing the new
Activa 5G
Todi Honda. 225C, A. J. C. Bose Road, Kolkata-700 020
Contact Info : 9831447735 / 9007035185, e-mail : todihonda@gmail.com
Honda is HONDA

অমুক অধিকার চাই। তমুক অধিকার চাই। এটা চাই, ওটা চাই। না দিলেই মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে দেয় এরা। এদের উৎপাতে বিরক্তিতে বা ভয়ে অন্য মতাবলম্বীরা সেই রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে শুরু করে। অসুরদের সংখ্যার অনুপাত আরও বাড়তে থাকে তাতে। এবার যখন এদের জনসংখ্যা রাজ্যের জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশ ছাড়ায়, তখন শুরু হয় মূল বিপদ। তখন এরা বলে, এই রাজ্যটা শুধুমাত্র অসুরদের। পুরোটা রাজ্যই। এখানে অন্য কাউকে থাকতে দেবো না। কারণ, অন্যদের অপবিত্র পূজা-অর্চনা আমাদের পবিত্র পূজাপদ্ধতিকে কলুষিত করে দিচ্ছে। বাকিরা সবাই অন্য রাজ্যে চলে যাক না কেন? আমরা তো কারোর সঙ্গে অশান্তি করতে চাই না। কারণ, আমাদের অসুবাদ শান্তির মতবাদ। এইসময় শুরু হয় অন্য পন্থাবলম্বীদের বলপূর্বক বিতাড়ন। এর ফলে আরও দ্রুত এদের জনসংখ্যার অনুপাত বাড়তে থাকে। তারপর যেই এদের জনসংখ্যা আশি শতাংশ ছাড়ায়, এরা বলে, এ রাজ্য অসুরদের পবিত্রভূমি। বিধর্মীরা এরাজ্যের পরিবেশকে কলুষিত করে দিচ্ছে। যারা অসুর নয়, তারাই আমাদের শত্রু। চলো, এদের হত্যা করি। ব্যাস, শুরু হয় গণহত্যা। যে অসুবাদী নয়, তাকেই সপরিবারে কচুকাটা করা হয়। তা সে শিশুই হোক বা বৃদ্ধ। এতেই শেষ নয় মহারাজ। এরপর সে রাজ্যে যখন আর কোনও অন্য পন্থাবলম্বী বাকি থাকে না, তখন এরা নিজেদের মধ্যেই হানাহানি শুরু করে। এখন যেটা শুরু হয়েছে জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থানে, দিতি ও দনুর সন্তানদের মধ্যে। সবই শান্তির মতবাদ অসুবাদের নাম করে। আমার কথা শুনুন মহারাজ। যখনই দেখবেন রাজ্যের কোনও অংশে অসুবাদীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান, জানবেন সেটা অশনি সংকেত। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না নিলে রাজ্যটাই আর থাকবে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও, সব অসুররাই খারাপ? এই যে দ্বারব্রহ্মায় আমাদের এত অসুর নাগরিক রয়েছে, সবাই খারাপ?'

'আমি তা বলিনি মহারাজ। ব্যক্তিগতভাবে একজন অসুবাদী ভালো হতেই পারে। কিন্তু তারা একজোট হলে অনিষ্টই শুধু করে। তাদের সামুহিক সত্ত্বা শুধু একটি পথেই ক্রিয়াশীল, আর তা হল...'

'তোমার ভাষণ শেষ হয়েছে?' হুঙ্কার দিলেন মহারাজ অমিতবল, 'কে কার আরাধনা করল, তাতে রাজার কী আসে যায়? এসব গোঁড়ামি ছাড়ো বিরুপাক্ষ, নাহলে তোমার চাকরি চলে যাবে।' এই বলে রূঢ় পদক্ষেপে মন্ত্রণাগৃহ ছেড়ে চলে গেলেন রাজা। অসহায়, কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিরুপাক্ষ পড়ে রইল পিছনে। কিছুক্ষণ স্থানুর মতো বসে রইল সে। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে কক্ষত্যাগ করল। যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, আমি একা ভেবে কী করব? মরুক গে যাক সব!

গ্রাম ছাড়ার পর বেশ ক'টা মাস পার হয়ে গেছে। চুলে জট পাকিয়ে জটা হয়েছে। একবারও তা পরিষ্কার করার চিন্তা মাথায় আসেনি। বনৌষধির প্রলেপ রক্তপাত বন্ধ করেছে। গভীর ক্ষত তবু রয়ে গেছে। ক্ষুধার তাড়নায় জঙ্গলে পশু শিকার করেছে, দিনের পর দিন কাঁচা মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। জঙ্গলের মাঝেমাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ। গত ক'মাসে অনেক জনপদ দেখেছে ছিন্নমস্তা। সবখানেই মহিষাসুরের সৈন্যদের দেখা মিলেছে। অমনি সে জনপদ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। গোটা উত্তরাপথে কী এমন কোনও জনপদ নেই, যেখানে মহিষাসুরের শাসন এখনও শুরু হয়নি?

জঙ্গলের এলাকা শেষ হয়ে শুরু হয়েছে মালভূমি। গত দু'দিন তাই শিকার জোটেনি। অভুক্ত শরীর আর হাঁটতে পারে না। মালভূমির প্রান্তে এই জনপদটির দেখা পেয়ে একপ্রকার মরিয়া হয়েই ঢুকে পড়েছিল ও। জনপদের কেন্দ্রে নয়নাভিরাম চন্দ্রমন্দির, তারই সামনে বসে ছিল, যদি কিছু প্রসাদ জোটে। কোথায় কী! জনপদের নাগরিকরা দলে দলে আসছে, দেবতাকে উপঢৌকন চড়িয়ে চলে যাচ্ছে। সে উপঢৌকনের কণামাত্রও বাইরে বসে থাকা অভুক্ত ভিখারিদের কাছে আসে না। মরিয়া হয়ে ঠিক করল, মন্দিরে আসা-যাওয়ার পথে কোনও ভক্তকে লুঠ করবে।

মন্দিরের পাশেই একটি সরু গলি রয়েছে। তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে খড়্গ হাতে প্রতীক্ষা করছিল শিকারের। না, কোনও অশক্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা শিশুর ওপর হাত ওঠাতে পারবে না। এমন কাউকে আক্রমণ করতে হবে, যার প্রতি-আক্রমণের ক্ষমতা রয়েছে। অর্ধপ্রহর প্রতীক্ষার পর দেখল, এক বলিষ্ঠ যোদ্ধা। মন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে মন্দিরের দিকে। কোমরবন্ধে তরবারি, দু'হাত ভর্তি ফলমূল মিষ্টান্নভরা রেকাবি। এক পা পিছিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়ালো ও। শরীর টানটান, শিকারোদ্যত বাঘের মতো। যেই না লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে, অমনি কে যেন পেছন থেকে টেনে ধরল ওকে, এক ঝটকায় অনায়াসে ঘাড়ে তুলে নিল। উত্তেজনায় অবসাদে মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, চোখে অন্ধকার দেখল ছিন্নমস্তা।

জ্ঞান ফিরল এক জলাশয়ের ধারে। দেখল, ওর চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে একটি মেয়ে। শ্যামলা ছোটখাটো মেয়েটি, নোংরা জামাকাপড়। গা-ময় শ্যাওলা। কটিদেশে খর্বাকৃতি অদ্ভুতদর্শন তরবারি, সাথে জড়ানো একরাশ দড়িদড়া। ফাঁস নাকি? দেখে তো তাই মনে হচ্ছে। শুনেছিল, এই অঞ্চলের দস্যুরা এরকম ফাঁস ব্যবহার করে পথচারীদের আক্রমণ করে সর্বস্ব হরণ করে। এই মেয়েটিরও সেরকমই উদ্দেশ্য নাকি?

নিতান্তই সাধারণ দেখতে। নাঃ। এ ডাকাত হতে পারে না। কিন্তু এই ছোটখাটো মেয়েটির এত গায়ের জোর, যে ওকে ঘাড়ে তুলে এতদূর নিয়ে এসেছে? ছিন্নমস্তাকে চোখ খুলতে দেখে ওর দিকে একটা পিতলের ঘটি এগিয়ে দিল মেয়েটি। ধড়মড়িয়ে উঠে বসার চেষ্টা করল ছিন্নমস্তা, ওকে জোর করে শুইয়ে দিল। মুখের কাছে ঘটিটা এগিয়ে দিল আবার।

'এই দুধটুকু খেয়ে নাও বোন, গায়ে জোর পাবে।'

'কে তুমি?' বলল ছিন্নমস্তা।

'নাম আমার মাতঙ্গী। ভয় নেই, তোমার কোনও অনিষ্ট আমি করব না। দুধটুকু খাও, তারপর বলো তো, তোমার গল্পটা কী? গলায় এমন গভীর ক্ষত, চট করে দেখে মনে হয়, কবন্ধর ওপর কেউ যেন কাটামুণ্ডু বসিয়ে দিয়েছে। কে তোমার এই দশা করেছে? এ শহরের বাসিন্দা তো তুমি নও। কোত্থেকে এসেছো? মন্দিরের ভক্তর ওপর চড়াও হয়েছিলে কেন?'

ধীরে ধীরে সব বলল ছিন্নমস্তা। একেবারে শুরু থেকে। শুনে দুঃখের হাসি হাসলো মাতঙ্গী।

'তুমি কি কখনও কোনও অসু-মন্দিরে ঢুকছো?' বলল মাতঙ্গী।

'না, কেন?'

'অসুর-মন্দিরে দক্ষিণা নেওয়ার রীতি নেই। আমাদের মন্দিরগুলো কিন্তু দক্ষিণা নেয়। শুধু তাই নয়, দক্ষিণার মূল্যের ওপর ঠিক হয়, কে আগে দেবতার দর্শন পাবে, আর কে পরে। গরিব সহায়-সম্বলহীন অসুররা দুপুরের গরমে ও শীতের রাতে অসু-মন্দিরে আশ্রয় পায়। খেতে পায়। আমাদের মন্দিরগুলো গরিবদেব দেখলে দূরদূর করে তাড়িয়ে দেয়। তারা শুধু হাত পেতে নিতেই আছে, হাত উপুড় করে না কখনও।'

'হুঁ, ভালোই বলছো', বলল ছিন্নমস্তা, 'ভিক্ষাবৃত্তিটাকে বৈরাগ্য থেকে বিযুক্ত করে ব্যবসায়ের পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে এই অসুররা। আর অসু-মন্দিরে গরিবদের আশ্রয়দান? উদ্দেশ্য ওদের শুধু গরিব মানুষদের মগজধোলাই। দুঃস্থ-দুঃখীদের দু-মুঠো অন্ন ও একটু আশ্রয় দিয়ে ওরা তাদের ইহকাল পরকাল, এমনকি পরিবার সন্তান-সন্ততিদেরও কিনে নিচ্ছে। পাশবিক কাজকর্ম করাছে তাদের দিয়ে। সেটাকে তুমি ভালো বলছ? ছিঃ!'

'আমাকে ভুল বুঝো না বোন,' বলল মাতঙ্গী, 'আমি শুধু আমাদের দুর্বলতাটা দেখাচ্ছি। যে উদ্দেশ্যেই অসুররা এটা করুক না কেন, এর ফলে গরিব অসুররা ভাবে, বিপদে অসু তাদের পাশে দাঁড়াবে। আমরা সেটা ভাবতে পারি না। গত তিন বছর ধরে অনাবৃষ্টি চলছে এই অঞ্চলে। কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। কিন্তু অসুবাদী কোনও কৃষককে তো আত্মহত্যা করতে দেখি না। কেন, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? অসুররা ভাবে, অসু তাদের পরিত্রাতা। ঘরে খাবার না থাকলে অসু-মন্দিরে গেলে দু-মুঠো তো জুটবেই, এই ভরসাতেই তারা বেঁচে থাকে। আর আমাদের অভিজ্ঞতা শেখায়, আমাদের দেবতা শুধু পেটমোটা বড়লোকের দেবতা। সেই হতাশাতেই আমরা করি আত্মহত্যা। অথচ দোষটা তো দেবতার নয়, দোষ এইসব মন্দিরের প্রধানদের। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে দেখবে, একদিন অসুবাদ সারা দেশটাকে গ্রাস করে নেবে। সে যাই হোক, এখন চলো। প্রথমে কিছু খাবার জোগাড় করা যাক। তারপর এই শহর থেকে পালানোর ব্যবস্থা করতে হবে। অসুর-সৈন্যরা আমাদের খোঁজ পাওয়ার আগে।'

'পালাবে? তুমিও পালাবে? কেন?' বলল ছিন্নমস্তা।

'বোন,' বলল মাতঙ্গী, 'আমার গল্পটা তোমার থেকে খুব একটা আলাদা নয়। আমিও অসুরদের নাগাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। তবে তোমার থেকে বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা আমার বেশি। তাই তোমার মতো দশা হয়নি আমার। অসুরদের জব্দ করার অনেকরকম প্যাঁচপয়জার জানি আমি। চলো, আমার সঙ্গে থাকলে এক এক করে সব শিখিয়ে দেব তোমাকে।'

'কোথায় যাবে? যেখানেই যাবে, সেখানেই তো রয়েছে অসুররা।'

'এই উত্তরাপথে একটাই জায়গা রয়েছে, যেখানে এখনও ওরা ঢুকতে পারেনি। ব্রহ্মা। সেখানেই যাবো ঠিক করেছি। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?'

মাসতিনেক পরের কথা।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে অধীর পদক্ষেপে পদচারণা করছিলেন মহারাজ অমিতবল। প্রাসাদের সিংহদরজা আজ

অর্গলাবদ্ধ। সেই বন্ধ দরজার বাইরে জড়ো হয়েছে সহস্রাধিক নাগরিক। তাদের সম্মিলিত চিৎকারে কান পাতা দায়। নাগরিকদের দোষ দেওয়া যায় না। গত মাসখানেক ধরে গঙ্গানগর অবরুদ্ধ হয়ে আছে। আর সে অবরোধ যে শীঘ্রই হটে যাবে, এমন কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রতিদিন অবরোধকারীর সংখ্যা বাড়ছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিক্ষুব্ধ নাগরিকরা এসে জড়ো হচ্ছে অলতুতে। হাট বন্ধ, দোকানপাট বন্ধ। কালোবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তবু জনসাধারণের যাবতীয় ক্ষোভ কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজার ওপর। অবরোধকারীদের ওপর নয়। কেন, তা শক্তিমাতাই জানেন।

সিংহদরজার ওপারে সমবেত জনতার ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়েছিল বিরুপাক্ষ। শুনছিল লোকেদের কথোপকথন।

'এই রাজাটাই যত নষ্টের গোড়া।'

'রাজ্য সামলাতে পারে না, একটা সামান্য অবরোধ হঠাতে পারে না, রাজা হয়েছে কী করতে?'

'মায়াবলীকে দোষ দেওয়া যায় না। উনি তো রাজ্যের গরিব মানুষদের অধিকারের জন্য লড়ছেন।'

'ঠিক কথা। সব দোষ এই রাজাটার। নিজের বোনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করতে পারছে না?'

'লোভী রাজা। নিজের লোভের জন্য চাষিদের জমি কেড়ে নিচ্ছে। মাঝখান থেকে আমরা পাচ্ছি শাস্তি।'

'দরজায় খিল দিয়ে ভেতরে লুকিয়ে বসে আছে, ভীতু রাজা।'

'এসময় যদি মহারাজ মহীবল থাকতেন, সবকিছু এক লহমায় ঠিক করে দিতেন।'

মাথা নাড়তে নাড়তে বিরুপাক্ষ ভিড় ছেড়ে বেরিয়ে এল। নাঃ, কিছু করার নেই আর। প্রজাবিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী। কী যে ভাবছেন মহারাজ, কে জানে! কিছুই কি খেয়াল করছেন না? এই ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে বহিঃশত্রু ব্রঙ্গা আক্রমণ করবে না তো? কোনও বহিঃশত্রু? মহিষাসুর? এই অবরোধের পেছনে কি মহিষাসুরের হাত আছে? মায়াবলীর সঙ্গে কি মহিষাসুরের যোগসাজস রয়েছে? হতেই পারে! কিন্তু এসব কথা কে বলবে রাজাকে। রাজা তো সবকিছু জেনে বসে আছেন। আমার কথা শুনবেন না, কে বাঁচাবে ওঁকে? মাৎস্যন্যায় শুরু হতে চলেছে ব্রঙ্গারাজ্যে। কেউ তা ঠেকাতে পারবে না। সময় থাকতে বরং রাজ্য ছেড়ে পালাই।

পায়ের গতি বাড়িয়ে দিল বিরুপাক্ষ।

'আহুই একমাত্র আরাধ্য। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড!'

কথাগুলো বারবার মনের দেওয়ালে ধাক্কা মারছিল। ঠিক যেমন করে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠার পরেও রাতের দুঃস্বপ্ন ধাক্কা মারে সচেতন মনের পর্দায়। অস্বস্তিতে ভরিয়ে দেয় মনটাকে। মাথার ওপরে মিটমিট করছে অগুনতি তারা। আকাশের পারাপারে কে যেন এইমাত্র চকখড়ি দিয়ে ছায়াপথ এঁকে দিল। হিরের গুঁড়োর ওপর হিরের কুচি ছাওয়া পথ। আজ বোধহয় অমাবস্যা। চাঁদের দেখা নেই নির্মেঘ আকাশে। মিশকালো অন্ধকারে সমুদ্র-সমান নদীতীরে বসে দুর্গা।

'এই তো সবে ফিরলি। আবার এত তাড়াতাড়ি চলে যাবি!' বলেছিল মা। সে তো গতকাল ভোরের কথা। ভোররাতে যাত্রা শুরু করেছিল, হিমালয়ের কোলে ওদের ছোট্ট গ্রামটা থেকে। থলি ভর্তি করে শুকনো পিঠে, ফল ও শুকনো মাংস দিয়েছিল মা। চামড়ার থলিতে জল। বাবা কিছু তামার পয়সা দিয়েছিল দুর্গাকে। বহু কষ্টে জমানো— ওই পয়সাগুলো। বলেছিল, 'দূরদেশে যাচ্ছিস মা, শহুরে মুলুকে। জানি না কবে ফিরবি। জানি না তুই যেদিন লেখাপড়া সেরে ফিরে আসবি, সেদিন আমি বেঁচে থাকবো কিনা।'

'বাবা,' গলা ধরে এসেছিল দুর্গার, 'তুমি যদি বলো, তাহলে আমি কোথাও যাবো না।'

'না, মা,' বলেছিল বাবা, 'তোর প্রতিভা এ গ্রামে আটকে থাকার মতো নয়। জম্বুদ্বীপের সেরা এই তালীবনশ্যাম বঙ্গ, আর বঙ্গদেশের সেরা ওই গঙ্গানগর। জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা সেখানেই থাকেন। সেখানেই তোর প্রতিভার সত্যিকারের কদর হবে। এই গ্রামে পড়ে থেকে কী করবি? আমার মতো জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার ধরে বেড়াবি সারাজীবন?'

বঙ্গ। বাবা 'ব্রঙ্গ' বা 'ব্রঙ্গা' উচ্চারণ করতে পারে না, বলে 'বঙ্গ'। ঠিক যেমন ওই আগন্তুক 'অসু' উচ্চারণ করতে পারছিল না। বলছিল 'অহু' বা 'আহু'। গুরুমশাই বলেছিলেন, ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের লোকেরা অনেকে 'স'-কে 'হ' বলে। এই লোকটা বোধহয় সেখান থেকেই এসেছে। চিঙ্কার পিঠে চড়ে বসার আগে মা কোমরে বেঁধে দিয়েছিল শক্তি-মা'র সিঁদুর-মাখা খড়্গটা। হাতে বেঁধে দিয়েছিল এই মণিবন্ধটা। লাল

কাপড়ের ওপর সোনালি সুতো দিয়ে শক্তি-মা'র মন্ত্র আঁকা রয়েছে মণিবন্ধতে। বলেছিল, 'মা মহামায়া তোকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।'

একরাশ মন-খারাপ নিয়ে শেষবারের মতো বরফ-ঢাকা উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়েছিল দুর্গা। কেমন দেখাবে আকাশখানা, ওই পাহাড়গুলো ছাড়া? চিঙ্কা মহা-উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে সামনে দিকে, পেছন ফিরে তাকানোর ওর কোনও ইচ্ছেই নেই। দেখতে দেখতে মা-বাবার চেহারাদুটো ঝাপসা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর ছবির মতো সুন্দর গ্রামটাও পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সমতলে পৌঁছালো দুর্গা, সূর্য তখন মাথার ওপর। দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে দুচোখ যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ, কাঁচা সোনার আলোয় ঝলমল করছে। ব্রহ্মপুত্র-গঙ্গার যুগল আলিঙ্গনে আবদ্ধ ব্রহ্মা, গায়ে তার সবুজ ধানক্ষেতের চাদর, মাথায় হিমালয়ের মুকুট, সমুদ্র পা ধুইয়ে দিচ্ছে, এমনটি কী আর কোথাও আছে, এ ত্রিভুবনে?

রাস্তায় একবারই থেমেছিল দুর্গা, রাতে বিশ্রাম নেবার জন্য। দুদিন পথ চলার পর পৌঁছালো গঙ্গার পাড়ে, তখন সন্ধ্যে নেমেছে। খেয়া-পারাপারের মাঝি বাড়ি চলে গেছে, আজ রাতের মতো ওপারে যাবার পথ বন্ধ। পিঠ থেকে নেমে লাগাম ও জিন খুলে চিঙ্কাকে ছেড়ে দিল দুর্গা। এদিক-ওদিক দেখে, গা-ঝাড়া দিয়ে, নাক দু'বার কুঁচকে চিঙ্কা দৌড়ে ঢুকে পড়ল পাশের জঙ্গলে, খাবার জোগাড় করতে। বেচারা দু'দিন শুধু শুকনো মাংস খেয়ে আছে। নদীর পাড়ে বসে খড়্গ ও কোমরবন্ধ খুলে পাশে রাখল দুর্গা। থলি থেকে বার করে শুকনো পিঠে চিবোতে চিবোতে অনেকক্ষণ ধরে সূর্যাস্ত দেখল। আলোয় ঝলমল করছে অথৈ গেরুয়া জল। মুহুর্মুহু নানারঙের ঢেউ জাগছে তার বুকে। বিচিত্র সব রং। দুর্গা ভাবছিল, কোনটা বেশি সুন্দর। হিমালয়, না গঙ্গা? পাহাড়ে বরফে সূর্যাস্তের রংয়ের ছটা অবর্ণনীয় রূপে বর্ণালী সৃষ্টি করে। জন্ম থেকে প্রতিদিন ও সেই দৃশ্য দেখে এসেছে। সমুদ্রের মতো বিশাল এই নদীর ওপর সেই সূর্যাস্তের রংয়ের এক অন্য রূপ। জীবনে প্রথমবার তা দেখে নতুন করে মুগ্ধ হল দুর্গা। সম্মোহিতের মতো বসে ছিল অনেকক্ষণ। আচমকাই খুব কাছ থেকে গম্ভীর গলার স্বর শুনে চমকে উঠল।

'আহুলা ধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম। বাকি সব ব্যাভিচার মাত্র। আহুই একমাত্র আরাধ্য। তাঁকে ছাড়া আর কাউকে উপাসনার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মূর্খ নারী, তোমার ওই মণিবন্ধটি তুমি খুলে জলে ফেলে দাও।'

দুর্গা মুখ ফিরিয়ে ভালো করে দেখল আগন্তুককে। পরনে তাপ্পিমারা ময়লা আলখাল্লা। থুতনির ওপর চাপ দাড়ি, চোখে কোণে কালি। দু'চোখ থেকে ক্রুরতা ও লোভ যেন ঝরে ঝরে পড়ছে। মাথায় শিরস্ত্রাণ, সম্ভবত মোষের করোটি থেকে তৈরি। বিরাট দুটো শিঙ মাথা থেকে হাত বাড়িয়েছে দুদিকে।

'তুমি অসুর উপাসক?' বলল দুর্গা, 'ভালো। কিন্তু আমাকে আমার মণিবন্ধ খুলে ফেলতে বলছ কেন?'

'তুমি কি ভিনদেশী? এদেশের আইন-কানুন কিছু জানো না?'

'ভিনদেশী নই,' বলল দুর্গা, 'আমি পাহাড়ের মেয়ে। কেন?'

'জম্বুদ্বীপের অধিপতি, ত্রিভুবন যাঁর বশ, সেই মহাবলী মহিষাসুর ঘোষণা করেছেন, যে আহুর উপাসনা করবে না, তার শিরশ্ছেদ করা হবে।'

'বটে!' বলল দুর্গা, 'আর তুমি বুঝি সেই আইন দেশজুড়ে বলবৎ করতে বেরিয়েছ?'

'মহিষ ইহলোকে আহুর সাক্ষাৎ প্রতিরূপ', বলল আগন্তুক, 'তাই আমরা সবাই মহিষের দাস। তাঁর আদেশ পালন করা ও করানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য।'

'পবিত্র কর্তব্য?' দুর্গার গলায় শ্লেষের সুর, 'সে তো বুঝলাম, কিন্তু তুমি ভুল জায়গায় খাপ খুলেছ বন্ধু। এটা ব্রহ্মাহ্রদিদের এলাকা। সবার স্বাধীন ধর্মাচরণের অধিকার আছে এখানে।'

'অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে তুমি। কিছুই জানো না। এটা আর ব্রহ্মাহ্রদিদের এলাকা নেই। গঙ্গানগরের পতন হয়েছে।'

'অসম্ভব! ব্রহ্মাধিপতি মহারাজ অমিতবলকে হারাবে, এমন মানুষ কে আছে এই পৃথিবীতে?'

'সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী মহিষাসুরের সামনে তোমারে এই অমিতবল দু'দণ্ডও দাঁড়াতে পারেনি।'

'বিশ্বাস করি না।' সদর্পে বলল দুর্গা।

'তাতে কিছু আসে যায় না, অবাধ্য নারী।' বলল আগন্তুক, 'তুমি মহিষাসুরের আদেশ পালন করবে কিনা, সেটা বলো।'

'মণিবন্ধ খুলে ফেলবো? তোমার কথায়?' হা-হা করে হেসে উঠল দুর্গা, 'তার আগে বলো তো, তোমার কবজিতে ওই উল্কিটা কী? মনে হচ্ছে অগ্নিচিহ্ন। তুমি কি এককালে অগ্নি-উপাসক ছিলে? এখন অগ্নিদেবকে ত্যাগ করে অসুকে ধরেছ, কিন্তু উল্কিটার মায়া ত্যাগ করতে পারোনি?'

দপ্ করে জ্বলে উঠল আগন্তুকের ক্ষুধিত চোখদুটো। চিৎকার করে উঠল, 'অবাধ্য পৌত্তলিক নারী, বাঁচার কোনও অধিকার নেই তোমার।' মুহূর্তে কোমর থেকে তরোয়াল বের

করে আক্রমণ করল দুর্গাকে। আচমকা আক্রমণে টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল দুর্গা। পাশ থেকে খড়্গ তুলে নিয়ে কোনওক্রমে আক্রমণ প্রতিহত করল। পরমুহূর্তেই 'হুম!' গম্ভীর গর্জনের অভিঘাতে তরঙ্গ উঠল গঙ্গায়। টুঁ-শব্দটি বেরলো না মুখ দিয়ে, নিমেষে আগন্তুকের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছিটকে পড়ল তরোয়াল ও মোষের মুকুট।

'চিঙ্কা, তুই আজ আমার প্রাণ বাঁচালি,' বাহনের পিঠে হাত বুলিয়ে বলল দুর্গা। আরামে গলা দিয়ে ঘুঁ ঘুঁ আওয়াজ বেরলো বিশালদেহী চিঙ্কার, নিজের রক্তমাখা হাতটা চাটতে চাটতে চোখ বুজে চার পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাটিতে। লাশটা ঠেলে নদীতে ফেলে দিল দুর্গা। মোষের মুকুট ও তরোয়াল লুকিয়ে ফেলল ঝোপঝাড়ের মধ্যে। তারপর চিঙ্কার গায়ে হেলান দিয়ে বসে রইল গঙ্গার পাড়ে। আগন্তুকের কথাগুলো ঘুরপাক খেতে লাগল মনের মধ্যে। কে এই মহিষাসুর? কেন সে দেশ জুড়ে জোর করে অসুর উপাসনা বলবৎ করতে চাইছে? কিছুক্ষণ পরেই চিঙ্কার নাক ডাকতে শুরু করল। দুর্গা বসে রইল, খড়্গার বাঁটে হাত রেখে। দেখল, ওর অজান্তেই আকাশে অনেক মেঘ জড়ো হয়েছে। ঢেকে ফেলেছে তারাগুলোকে। গোটা আকাশটাকে।

দূরে কোথাও শৃগালের ঐকতান রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করল। নিরন্ধ্র গগনপট মেঘের চাদরে ঢাকা। অন্ধকার চরাচর। কালো নয়, নীল আঁধার। প্রকৃতি ভাস্বর অজানা এক আলোকে।

আজ রাতে ঘুম আর আসবে না।

ভোররাতে খেয়া-নৌকায় গঙ্গা পার হয়েছিল দুর্গা। সেখান থেকেই ওর সঙ্গে চলেছে এই রাস্তাটা। নাক বরাবর সোজা গঙ্গানগর পর্যন্ত গেছে।

দু'ধারে ঘন জঙ্গল। হিমালয়ের জঙ্গলের মতো নয়, অন্যরকম জঙ্গল। গরম সোঁদা গন্ধ বাতাসে। ভেজা ঘাসের গন্ধ। রকমারি শব্দ ভেসে আসছে জঙ্গলের মধ্যে থেকে। জলের কুলুকুলু, পাতার খস্‌খস্‌। পাখির ডুবডু, টুইটুই, কুউউউ কুউউউউ। মিহি একঘেঁয়ে ঝিঁঝিঁঝিঁঝিঁ ডাক, কানে তালা ধরে যায়। চিঙ্কা বারকতক এদিক-ওদিক তাকিয়ে নাক কুঁচকে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, দুর্গার ধমক খেয়ে রাস্তায় ফিরেছে।

সোনালি সূর্য তখন গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে, জঙ্গল হঠাৎই ফুরিয়ে গেল। পরিবেশটাই বদলে গেল এক লহমায়। আদিগন্ত ফাঁকা তেপান্তরের মাঠ, তার মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে লালমাটির পথ। দু'ধারে তালগাছের সারি। মাঠে গোরু চরছে, রাখাল গাছতলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। মাঝেমাঝে চাষের ক্ষেত, ঝোপঝাড়। কখনও বা একটা গ্রাম। তারপর আবার ধান, পাট, ডাল বা তরিতরকারির ক্ষেত। বড় সুন্দর গ্রামগুলো। বাড়িগুলো মাটির তৈরি, গ্রামের মাঝে পোড়ামাটির ইঁটের মন্দির। কোনও গ্রাম থেকে ভেসে আসছে কুমোরের চাকার ঘর্ঘর, কোথাও তাঁতির তাঁর বোনার খট্‌খট, কোথাও বা কামারের হাতুড়ির ঠনাঠন। গোয়ালা দুধ দুইছে, চাষি চাষ করছে। কথক-ঠাকুর অশ্বত্থতলায় বসে পুঁথি পড়ছে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, কেউ বসে নেই। এরই মাঝে কেউ কেউ অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছে দুর্গা আর ওর বাহনকে।

'পূর্বে কামাখ্যা, পশ্চিমে হিঙ্গুলা', বলেছিল যোগিনী, 'এর মাঝখানে ছড়িয়ে আছে বহু শক্তিপীঠ। তার বেশিরভাগই তো রয়েছে ব্রহ্মায়'। হুঁ, যোগিনীর কথা অনুসারে এখানেই কোথাও একটা শক্তিপীঠ থাকার কথা। কোথায় সেটা? ভাবছিল দুর্গা।

কিছুক্ষণ পর আবার শুরু হল জঙ্গলের এলাকা। রাস্তার দুদিকেই ঘন জঙ্গল। তখন সন্ধ্যে নামবো নামবো করছে, এমন সয় একটা বিশ্রী গন্ধ নাকে এল। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা? দুর্গার ইশারায় চলার গতি বাড়িয়ে দিল চিঙ্কা। একটু পরেই রাস্তার ডানদিকে জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এল ধূ-ধূ এক তেপান্তরের প্রান্তর। সে প্রান্তরে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এবড়ো-খেবড়ো পাথর। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মতো উষ্ণ প্রস্রবণের কুণ্ড। টগ্‌বগ্‌ করে জল ফুটছে, কটু গন্ধকাগন্ধী ধোঁয়া বেরোচ্ছে সেগুলো থেকে। গুনে দেখলো দুর্গা, সাতটা কুণ্ড। তাদের মাঝখানে পাহাড়ের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটা মন্দির। লাল পোড়া মাটির আটচালা মন্দির। বড্ড চেনা সে মন্দিরটার গড়ন। দুর্গার ইশারায় চিঙ্কা পথ ছেড়ে এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। কালচে ছোপ মন্দিরের সারা গায়ে। গন্ধকের গন্ধ ছাপিয়ে বিশ্রী গন্ধটা হঠাৎই তীব্র হয়ে উঠল। ছ্যাঁৎ করে উঠল বুকটা। মন্দিরের সামনে গিয়ে চিঙ্কার পিঠ থেকে নামলো দুর্গা। কাছে গিয়ে দেখল, কালচে ছোপগুলো আসলে পোড়ার দাগ। কেউ মন্দিরটায় আগুন লাগিয়েছিল, পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। নেহাত পোড়ামাটির বলে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। কিন্তু মন্দিরের জানালা দরজা, এমনকী চৌকাঠ পর্যন্ত

পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

একরাশ আশঙ্কা ও ভয় নিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুকলো দুর্গা।

এ মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শভুজা শক্তিমাতা। তাঁর সিন্দুরচর্চিত অষ্টধাতুর বিগ্রহের মাত্র তিনটি বাহুই অবশিষ্ট আছে। বাকি বাহুগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে চারপাশে। বিগ্রহের সর্বাঙ্গে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন। কেউ যেন অসীম ক্রোধে মাতাকে আসনচ্যুত করার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। রক্তস্রোতে ভিজে কালচে-লাল রং নিয়েছে বেদীমূল।

'মা, তুই এলি শেষপর্যন্ত?' কাতর কণ্ঠের কান্নায় চমকে উঠল দুর্গা।

'কে ওখানে?'

'আমরা যে হেরে গেলাম মা! ওদের সাথে লড়াইয়ে পারলাম না। সবকিছু একেবারে শেষ করে দিয়ে গেল ওরা!'

দুর্গা দেখল, এক অশীতিপর বৃদ্ধ, দুটি হাতই তার বিচ্ছিন্ন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর, পড়ে আছে মায়ের পায়ের তলায়। বৃদ্ধের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিল দুর্গা।

'একটু জল!' অস্ফুট স্বরে বলল বৃদ্ধ।

চিঙ্কার পিঠ থেকে চামড়ার তৈরি জলের থলিটা টেনে নামালো দুর্গা। বৃদ্ধের মুখে জল ঢেলে দিল একটু একটু করে। শান্ত হল বৃদ্ধ। কিছুক্ষণ মুগ্ধ নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইল দুর্গার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধার চোখ থেকে যন্ত্রণা মুছে গিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল অপার এক প্রশান্তি। 'মা, জগজ্জননী মা আমার। তুই এ অবিচারের প্রতিকার করিস। পচাগলা এ লাশের পাহাড়ের ওপর তুই প্রতিশোধের আগুন জ্বালিস। মা... মা আমার...' এই বলে দুর্গার কোলে পরম নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়ল বৃদ্ধ। ঘোলাটে হয়ে এল চোখ। তারপর একেবারে স্থির।

বৃদ্ধের মৃতদেহ কোলে তুলে নিয়ে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এল দুর্গা। তখনই নজরে পড়ল দৃশ্যটা। মন্দিরের পেছনদিকে বেশ বড় একটা দীঘি। কাকচক্ষু জল কানায় কানায় ভর্তি। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে দীঘিতে। সেই সিঁড়ির পাশেই বিরাট একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে সদ্য। প্রায় পঞ্চাশটা মৃতদেহ পড়ে আছে তার মধ্যে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা হয়েছে দেহগুলোকে। প্রতিটি দেহই মুণ্ডহীন। খানিকটা দূরে খাড়াই উঁচু এক সদ্যনির্মিত স্তম্ভ থেকে এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। নরমুণ্ড দিয়ে তৈরি সে স্তম্ভ।

গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার।

বৃদ্ধের মৃতদেহ সেই গর্তেই শুইয়ে দিল দুর্গা। স্তম্ভ ভেঙ্গে মুণ্ডগুলো জড়ো করল সেখানে। পাশের জঙ্গল থেকে কাঠ আহরণ করে এনে চিতা সাজালো গর্তের ওপর। আগুন যখন জ্বলে উঠল, চিতার পাশ থেকে সরে গিয়ে মন্দিরের বারান্দায় বসলো দুর্গা। চামড়ার থলি থেকে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। খানিকটা জল ঢেলে দিল মাথায়, ঝাপটা দিল মুখে। কে এই মন্দিরে এরকম নারকীয় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে? কেন করেছে এরকম জঘন্য কাজ? কী ক্ষতি করেছিল এরা? বৃদ্ধ কেন ওকে 'মা' বলে ডাকল? কোন সে অবিচারের প্রতিকার করতে হবে দুর্গাকে?

দাউদাউ করে জ্বলছে চিতা। আগুনের ফুলকি ছুটছে ঊর্ধ্বমুখে, মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আঁধারে। যেন একঝাঁক ক্ষণজন্মা জোনাকি। জন্মাচ্ছে, জীবনের পূর্ণাহুতি দিয়ে সানন্দে মরছে, আবার জন্মাচ্ছে। বৃদ্ধের মুখটা ঠিক গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাইয়ের মতো। লোলচর্মসম্বল মুখটা সেরকমই বিশ্বাস ও স্নেহে ভরপুর। কোটরাগত চোখদুটো ঠিক সেরকমই জ্ঞানের তেজে ভাস্বর।

'বুঝলি মা, মেরুদণ্ডের মূলে রয়েছে মূলাধারচক্র', বলছিলেন গুরুমশাই, 'উঁ? অন্যমনস্ক মনটাকে ঝটকা দিয়ে গুরুমশাইয়ের কথায় ফিরিয়েছিল দুর্গা। সেদিনও একই উদ্দেশ্যে পথ চলছিল ও। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে। সে তো বছর দুয়েক আগের কথা। সেদিন গুরুমশাই ছিলেন পথপ্রদর্শক। আজ ও একা।

উচ্চ হিমালয়ের বন্ধুর রুক্ষ পাহাড়ের সারি, খয়েরি ধুলোয় ঢাকা। আকাশছোঁয়া, দুর্গম। আকাশ আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে তারা, পরতের পর পরত। নীচ থেকে ওদের দিকে তাকালে মনে ভয় ধরে। চূড়ায় ওদের বরফের টুপি, এই গ্রীষ্মকালেও। দুই পাহাড়ের ফাঁকে সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম। তার মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে নিয়ে পথ চলা সহজ কাজ নয়।

'এর ঠিক ওপরে নাভির সন্নিকটে রয়েছে স্বাধিষ্ঠানচক্র'— বলছিলেন গুরুমশাই, 'আর তার ঠিক ওপরে বক্ষপিঞ্জরের যোগস্থলে রয়েছে মণিপুরকচক্র। আরেকটু ওপরে হৃদয়ের সন্নিকটে রয়েছে অনাহতচক্র। কণ্ঠমূলে রয়েছে বিশুদ্ধাচক্র। ভ্রূমধ্যে রয়েছে আজ্ঞাচক্র। আর ব্রহ্মতালুর কেন্দ্রে রয়েছে সহস্রারচক্র।'

'কিন্তু গুরুমশাই,' প্রশ্ন করেছিল দুর্গা, 'শল্যচিকিৎসা শাস্ত্রের পুঁথিতে শব-ব্যবচ্ছেদের বহু ছবি দেখেছি। মানব-শরীরের নানান যন্ত্রাংশের ছবি রয়েছে তাতে। কিন্তু এইসব চক্রের কোনও ছবি দেখিনি সেখানে।'

'মা,' বলেছিলেন গুরুমশাই, 'প্রদীপের শিখা নিভে যাওয়ার পর কেউ যদি তাতে আগুনের হদিশ খোঁজে, সে কি তা

খুঁজে পাবে? মৃত মানব-শরীরে চক্র খুঁজে লাভ নেই।'

'তবে কোথায় খুঁজে পাবো এইসব চক্রকে?'

'জীবিত মানব-শরীর জুড়ে নিরন্তর এক বিদ্যুৎপ্রবাহ চলে। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহই সূক্ষ্মশরীর। এই সাত চক্র সেই সুক্ষ্ম শরীরেরই অংশ। তাই স্থূলশরীর ব্যবচ্ছেদ করে তাদের খুঁজে পাওয়া যায় না।'

'সেই সূক্ষ্মশরীরকে কি দেখা যায়?'

'প্রশ্নটা জমিয়ে রাখ মা,' বলেছিলেন গুরুমশাই, 'যার কাছে তোকে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি সূক্ষ্ম শরীর সম্পর্কে যতটা জ্ঞান রাখেন, এ জম্বুদ্বীপে ততটা আর কেউ বোধহয় রাখে না।'

ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে বরফগলা একটা নদী বয়ে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে ঝরনা হয়ে ঝাঁপ দিয়েছে সমতলে। কোত্থেকে এসেছে নদীটা? কে জানে! এর আগে দু'একবার দুর্গা চেষ্টা করেছিল, নদীর উৎস পর্যন্ত যাওয়ার, একা একা। টানা দু-তিনদিন হেঁটেও সে উৎস খুঁজে পায়নি, ফিরে এসেছিল হতোদ্যম হয়ে। মা কত্ত বকাঝকা করেছিল তাই নিয়ে। সেই নদীর পাড় ধরেই হেঁটে চলেছিল সেদিন, গুরুমশাইয়ের সঙ্গে, উত্তর-পূর্ব দিক বরাবর। 'আসনসিদ্ধিই হল গোড়ার কথা, বুঝলি মা।' বলেছিলেন গুরুমশাই। তা, সেটা কি আর জানে না দুর্গা? দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক আসনে বসে থাকা। ওই আসনেই লেখাপড়া। সাথে ধ্যান, প্রাণায়াম, সমাধি। দিনে একবার মা এসে একটু দুধ খাইয়ে যেত। প্রথম ক'দিনের পর ক্ষুধাতৃষ্ণা উবে যেত। শরীরবোধ লোপ পেত। গুরুমশাই বলতেন, 'আসনসিদ্ধি না হলে কোনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, বুঝলি মা! যদি একভাবে প্রহরের পর প্রহর বসে না থাকতে পারলি, তবে একাগ্রচিত্তে কোনও বিদ্যার অভ্যাস করবি কী করে?'

প্রায় তিনদিন হাঁটার পর সঙ্গী সেই শীর্ণকায়া তটিনীটি মিলিত হল তার উৎসে, সাগরপ্রমাণ এক নদে। সেখানেই ঘাট থেকে নৌকা ধরলো ওরা। দু'দিন নদীপথে পূর্বাভিমুখে চলার পর ওরা এসে পৌঁছলো পূর্বী হিমালয়ের বাঁকে, সমৃদ্ধ এক নদীবন্দরে। সেইখান থেকে শুরু হল পাহাড়ে চড়া। পাকদণ্ডী বেয়ে সারাদিন ওঠার পর সন্ধ্যের ঠিক আগে পাহাড়ের আড়ালে উঁকি দিল লাল পাথরে গড়া এক মন্দিরচূড়া। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। 'তন্ত্রসাধনা শেখার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান জম্বুদ্বীপে আর নেই, বুঝলি মা।' বললেন গুরুমশাই।

গা-ছমছম অন্ধকার। ঘন জঙ্গলে ঢাকা সবুজ পাহাড়, তারই মধ্যে ছোট্ট এক ঝরণা পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক নীচে

With Best Compliments From :-

RTS POWER CORPORATION LIMITED

Manufacturers of

E- H - V - GRADE TRANSFORMERS

Power & Distribution Transformers

From 25 KVA to 40 MVA, 132 KV Class

Single Phase Transformers 5 KVA to 25 KVA

Dry Type & Special Type Transformers

Head Office
56, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001
Phones : 2242-6025 / 6054
Fax No, : (033) 2242-6732
E-mail : rtspower@vsnl.net

Howrah Works:
130, Dharamtolla Road
Salkia, Howrah - 711 107
Phone No. : 2655-5376 / 3093-6492

Jaipur Works :
C-174, Vishwakarma Industrial Area, Chomu Road, Jaipur - 302 013
Phone No. : 2330-405 / 2330-269
Fax No. : 0141 2330315
email : rtspower@sancharnet.in

Agra Works :
Mathura Road, P.O. Artoni, Agra - 282 007
Phone No. : (0562) 2641-431

প্রায়-অদৃশ্য সমতলে ঝাঁপ দিয়েছে। সেই ঝরনাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বিস্তীর্ণ এক মহাশ্মশান। মাটি পুরু ছাইয়ে ঢাকা, পা বসে যায় তাতে। অনেক পোড়া গাছ এদিক ওদিক, সেগুলোও পুরু ছাইয়ে ঢাকা। ছড়িয়ে পড়ে আছে অজস্র নরকঙ্কাল, নরকরোটি। প্রতি পদক্ষেপে তারা তাদের অস্তিত্ব জানান দেয়, পায়ের নিচে মট মট শব্দে। ধুনি জ্বলছে জায়গায় জায়গায়। জনবিরল সেই প্রান্তরের একেবারে শেষপ্রান্তে জঙ্গলে ঢাকা এক আটচালা মন্দির। এ মন্দিরে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, তাই মন্দির-সীমানায় এসে দুর্গাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল গুরুমশাই। পুরনো মন্দির। কত পুরনো? দেখে মনে হয় হাজার দু-হাজার বছর তো হবেই। বেশিও হতে পারে। জায়গায় জায়গায় মন্দিরের দেওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে, সেখান থেকে বট অশ্বত্থর ঝুরি নেমেছে। মন্দিরের ভেতরে লম্বা চাতাল। সে চাতালের শেষ কোথায়, দেখা যায় না। অন্তহীন সুড়ঙ্গের মতো চলেছে তো চলেছেই। সেখানে ইন্দ্রিয়াতীত বিদেহীদের আনাগোনা অন্ধকারে চুপিসারে। ধমনীতে তাদের গা-ছমছমে অতিন্দ্রীয় অনুরণন। ওরা কি জানে, ওরা বিদেহী? মণ্ডপে সারি সারি প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপগুলো নরকরোটি দিয়ে তৈরি। মধ্যে অধিষ্ঠিত দেবী কালো পাষাণের নারীমূর্তি। সিঁদুর মাখা, লাল কাপড়ে মোড়া। দূরে কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে সমবেত স্বরে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। সে মন্ত্র প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে। তৈরি করছে পরতের পর পরত শব্দব্যূহ। সেই ব্যূহে আটকা পড়েছে কত না ছায়া ছায়া অস্তিত্ব। অন্ধকারের গায়ে পিছনে চরিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, ছায়ার আবরণ ভেঙ্গে মূর্ত হতে চাইছে। ব্যর্থ তাদের হাহাকারে অমাবস্যার রাতের অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে বারবার। শিউরে উঠল দুর্গা।

শুরু হল ওর নতুন শিক্ষা, নতুন গুরুর অধীনে। প্রথম ক'দিন শুধু আয়ুধকলার স্পর্ধা। একের সঙ্গে দশের স্পর্ধা, বিশ-ত্রিশজনের স্পর্ধা। একের পর এক প্রতিস্পর্ধা। বিচিত্র সব অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা। তারপর শুরু হল আসনবদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন ক্রিয়ার অভ্যাস। এরপর সেইসব ক্রিয়ার সংযোগে আয়ুধকলার অভ্যাস। পাশাপাশি বিভিন্ন দুরূহ প্রক্রিয়ার মনঃসংযোগ, ধ্যান, জপ্, সমাধি।

'তন্ত্র শব্দের অর্থ হল — পদ্ধতি।' বলছিলেন রক্তস্বরা তেজস্বিনী সেই যোগিনী। দুর্গার নতুন গুরু, 'এ হল সূক্ষ্ম শরীরকে জাগ্রত করার পদ্ধতি। তন্ত্রসাধক তার সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূলশরীরের মতোই অনায়াসে ব্যবহার করতে পারে। মুক্ত সুক্ষ্ম শরীর স্থূলশরীরের সীমারেখার বন্ধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। এর ব্যবহার তন্ত্রে রয়েছে। সুক্ষ্মশরীরকে প্রসারিত করে প্রতিস্পর্ধীকে দূর থেকে আক্রমণ করা যায়। এমনকী, স্থূলশরীরকে পেছনে ফেলে রেখে সুক্ষ্মশরীর ব্রহ্মাণ্ডের যে কোনও স্থানে পৌঁছে যেতে পারে এক লহমায়। কিন্তু সেসব পরের কথা। প্রাথমিকভাবে যে সমস্যায় তুই পড়বি সেটা হল, যেই মুহূর্তে সুক্ষ্মশরীর স্থূলশরীরের সীমারেখা ছেড়ে বেরোবে, ব্যবহারের সামান্য ত্রুটি সুক্ষ্মশরীরের ক্ষতিসাধন করতে পারে, এমনকি তার বিনাশও ডেকে আনতে পারে। আর সেজন্যই প্রয়োজন যন্ত্রের।'

'আপনি বলেছিলেন', প্রশ্ন দুর্গার, 'যন্ত্র ও মন্ত্র, এই দুই হল তন্ত্রের মূল উপাদান। তাহলে মন্ত্রের কাজটা ঠিক কী?'

'সূক্ষ্মশরীর ক্রিয়াশীল থাকে কম্পনের মাধ্যমে। মন্ত্র সেই কম্পনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ভিন্ন মন্ত্র, ভিন্ন কম্পন, তার মাধ্যমে সূক্ষ্মশরীরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও গুণ দেওয়া যায়, তাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়।'

ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় সম্বিৎ ফিরল দুর্গার। শীত করছে। ভয় করছে। চিতার দাউদাউ আগুন শান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু ধিকিধিকি মন্দলয়ে সে এখনও জ্বলছে। মাতৃভক্তের আত্মত্যাগের আগুন। মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। ধ্বজদণ্ডে স্বর্ণাভ-সিন্দুর পতাকাটি এখনও অক্ষত আছে। আগুনের লেলিহান শিখার মতো মন্দিরশীর্ষ থেকে সে এখনও পত্‌পত্ করে উড়ছে। যেন কাকে ডেকে বলছে, তুমি আমার শরীরটাকেই শুধু ক্ষতবিক্ষত করেছ, আমার প্রাণটাকে ছুঁতে পারোনি। আমার প্রাণভোমরা কোথায় লুকিয়ে আছে, সে বোঝা তোমার সাধ্য নয়। চিঙ্কার পিঠ থেকে কম্বলের আসনটা নামিয়ে আনলো দুর্গা। কম্বল গায়ে জড়িয়ে বসল। হিমালয়ের দুর্গম চূড়ায় সেই শক্তিপীঠের কথা, যোগিনীর কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে। সে যদি আজ এখানে থাকতো, ভালো হতো। বহু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে। কারা এই নরপিশাচ? উপাসনা পদ্ধতির নামে কারা ব্রহ্মায় এরকম নারকীয় হত্যালীলা চালাচ্ছে? হয়তো কিছু উত্তর পাওয়া যেত যোগিনীর কাছে।

যোগিনীর শিক্ষার গুণ, খুব শিগগিরই একদিন ধ্যানরত অবস্থায় তার দেখা পেয়েছিল দুর্গা। সে, যে শরীরের গহনে বাস করে। দেখতে পেল, ওর শরীরের অভ্যন্তরে কোষ থেকে কোষে বয়ে চলেছে নিরন্তর তড়িৎপ্রবাহ, নদীর স্রোতের মতো।

অগণিত জলকণিকার মিলিত গতিশীলতা যেমন করে নদীর রূপ পরিগ্রহ করে, তেমন করেই কোষ থেকে কোষে প্রবহমানা সূক্ষ্ম সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ শরীরের রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবাক হয়ে দেখেছিল দুর্গা— সে শরীরে হাত আছে, পা আছে, মাথা আছে। এরপর থেকে সেই সূক্ষ্মশরীরের সম্যক উপলব্ধিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল দুর্গার দিবারাত্রির ধ্যানজ্ঞান। দ্বন্দ্বযুদ্ধে দুর্গা পটু তো ছিলই। যোগিনীর কাছে শিখল কীভাবে সূক্ষ্মশরীরকে প্রসারিত করে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে হয়। শিখল যন্ত্রের ব্যবহার। শিখল কীভাবে মন্ত্র ব্যবহার করে সূক্ষ্মশরীর দ্বারা সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্মাণ করা যায়। বিবিধ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিবিধ যন্ত্র। শেষমেশ একদিন যোগিনী দুর্গাকে একটা অন্ধকার ঘরে বন্ধ করে বাইরে থেকে অর্গল লাগিয়ে দিল। 'যতক্ষণ ডাঙার সঙ্গে সংযোগ থাকে, ততদিন সাঁতার শেখা যায় না। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে জলে ঝাঁপ দিলে তবেই সাঁতার শেখা যায়। অনেক কিছু শিখেছিস তুই, এবার সেসব হাতে-কলমে প্রয়োগ কর। তারপর খুলবো এই দরজা।'

ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ। নাকি মাস, বছর? নাকি শুধুই এক পল, এক মুহূর্ত? ধীরে ধীরে জাগলো কুণ্ডলিনী জুড়ে শক্তির ঊর্ধ্বমুখী স্রোত। আসনবদ্ধ দুর্গার মনে অদ্ভুত সব অনুভূতির আনাগোনা। তীব্র ক্ষুধা ও নিদ্রার অনুভূতি। হঠাৎই সেটা এল, আবার বিলীনও হল। জাগলো শারীরিক সম্ভোগের ইচ্ছা। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুখ একসঙ্গে সম্ভোগের ইচ্ছা। তাও বিলীন হল, জাগলো ক্রিয়াশীলতা। ভূমণ্ডলের সব সমস্যা এক লহমায় সমাধান করে ফেলবে, এমন আত্মবিশ্বাস জাগলো মনে। পরমুহূর্তে সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে জেগে উঠল অনির্বচনীয় সৃষ্টিসুখ। জগতের যাবতীয় রূপ রস বর্ণ গন্ধ একসঙ্গে ধেয়ে এসে ভাসিয়ে দিয়ে গেল ওকে। শিশুকাল থেকে দেখা প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি সুর নবরূপে ধরা দিল ওর কাছে এসে। তারপর সেই অনুভূতিকে ছাপিয়ে জাগলো অসীম শক্তির অনুভূতি। হঠাৎ কপালের মধ্যিখানে যেন দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। তার সঙ্গেই, সবকিছু কেমন যেন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কোনও দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, নেই কোনও বিশৃঙ্খলা, নেই কোনও ভুল বোঝাবুঝি। পরমুহূর্তেই ব্রহ্মতালুতে যেন বিস্ফোরণ হল। মন ভরে গেল এক অনির্বচনীয় আনন্দে। আলোয় আলো হয়ে গেল অন্ধ চরাচর। বাঁধভাঙা সেই আলোর বন্যা একসময় শান্ত হল। দুর্গা দেখল, কুটিরের খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে সূর্যোদয় হচ্ছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন যোগিনী। চোখে তাঁর জল।

'বাড়ি যাওয়ার সময় হল তোর,' বলল যোগিনী।

'এত তাড়াতাড়ি?' অবাক হল দুর্গা।

'আমার যা জ্ঞান, সব তোকে শিখিয়ে দিয়েছি। তুই আজ আমায় নিঃস্ব করে দিয়েছিস। তুই কি জানিস, আজ পর্যন্ত কেউ... কোনও শিক্ষার্থী এত ছোটো বয়সে এখান থেকে সব শিক্ষা সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতে পারেনি। কে তুই মা?'

হঠাৎ করেই শরীর জুড়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণা-শ্রান্তির বোধগুলো সব ফিরে এসেছিল তখন। ঠিক আজকের মতো। খুব খিদে পেয়েছে। কিন্তু খাওয়ার কথা ভাবতেই গা গুলিয়ে উঠছে। খুব শীত করছে। ইচ্ছে করছে, মা-কে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতে। অনেকক্ষণ ঘুমোতে। ছাইয়ের আভরণ শরীরে জড়িয়ে চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েছে ভক্ত-চিতা। নিরন্ধ্র অচক্ষু অন্ধকার গ্রাস করেছে চরাচর। তবু কেন এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম এল না চোখে।

রাতটা সেই ভক্ত-শ্মশানে জেগে কাটিয়ে দিল দুর্গা।

পরপর দু'রাত জাগা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ছে। তবু বিরামহীন পথ চলা। পরদিন সন্ধ্যা নামার একটু আগে বিদ্যাধরী নদীর উত্তর পাড়ে পৌঁছলো দুর্গা। গঙ্গানগর এই নদীরই অন্য পাড়ে। শহরে ঢুকতে গেলে সেতুর এই পাড়ে সীমান্তরক্ষী ছাউনি থেকে অনুমতি নিতে হয়।

'কোথায় যাচ্ছ?', জিজ্ঞেস করল সীমান্তরক্ষী।

'অক্ষুমুনির গুরুকুলে। এই যে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের চিঠি', থলি থেকে বার করে এগিয়ে দিল দুর্গা।

'ঠিক আছে,' চিঠি পড়ে মাথা নাড়ল রক্ষী, 'তুমি যেতে পারো, কিন্তু তোমার এই ভয়ানক জন্তুটিকে এখানে ছেড়ে যেতে হবে।'

'কেন?' আশঙ্কায় চিঙ্কার গলার কাছের রোঁয়াগুলো আঁকড়ে ধরল দুর্গা।

'বাঘ বা সিংহ নিয়ে শহরে ঢোকার নিয়ম নেই', বলল প্রহরী।

'আমার চিঙ্কা বাঘ বা সিংহ কোনওটাই নয়,' সগর্বে বলল দুর্গা।

'তবে কি এটি?'

'চিঙ্কা হল বাংহ,' বলল দুর্গা, 'ওর বাবা বাঘ, মা সিংহ।'

'এরকমটি আবার হয় নাকি?' রক্ষীর গলায় অবিশ্বাস।

'হয়, আমাদের পাহাড়ি অঞ্চলে হয়,' বলল দুর্গা,

‘একমাত্র হিমালয়েই বাঘ-সিংহ দুটোই পাওয়া যায়, তাই। যাই হোক, বাংহ নিয়ে কোনও আইন আছে কি, আপনার বইতে?’

‘না, তা নেই, তবে...’

‘তবে আর কিছু নয়,’ বলল দুর্গা, ‘আইন যখন নেই, তখন চিঙ্কাকে আপনি আটকাতে পারেন না। আমার হাতে আর সময় নেই। চললাম, নমস্কার।’

চিঙ্কার পেটে গোড়ালি দিয়ে চাপ দিল দুর্গা। মুহূর্তে হতভম্ব সীমান্তরক্ষীকে পেছনে ফেলে রেখে লাফিয়ে সীমান্ত-বেষ্টনী পার হয়ে গেল চিঙ্কা।

ব্রহ্মার দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রের মোহনায় অসংখ্য ছোট বড়ো দ্বীপ রয়েছে। এরকম সাতাশটা দ্বীপকে সেতু দিয়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে গঙ্গানগর। পৃথিবীর বর্ধিষ্ণুতম নগরী। এখান থেকে বাণিজ্যপোত যায় পৃথিবীর সেরা বন্দরগুলোতে। ব্রহ্ম, শ্যাম, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন, চিহ্ন, মিশ্র, যবন— এমনকি পাতালদেশ পর্যন্ত যায় ব্রহ্মার পসরা। সেসব বাণিজ্যপোত পাহারা দিতে ব্রহ্মা-নৌসেনার তিনশো রণতরী পাহারা দেয় সপ্তসমুদ্র। ব্রহ্মারাজের নৌসেনা ও হস্তীসেনার ভয়ে কাঁপে ধরাধাম। লোকে বলে, এক লক্ষ রণহস্তী আছে ব্রহ্মারাজের। ব্রহ্মার ধনুর্ধররা শরক্ষেপণে সিদ্ধহস্ত। তাদের বিষ-তির মুহূর্তে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয় যে কোনও প্রাণীকে। সোনায় মোড়া এই গঙ্গানগর বহু রাজাই আক্রমণ করেছে যুগে যুগে। তাদের সবার মৃতদেহ পোঁতা আছে মাতলী নদীর ওই কালো কাদায়।

চওড়া বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার ধারে জলনিকাশী নালা। প্রতিটি নালার প্রস্থ সমান। তার ধার ধারে সারবন্দি পোড়ামাটির তৈরি দোতলা বাড়ি। পোড়ামাটির ইঁটের গায়ে খোদাই করা নানান পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি। প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি ইঁটের দৈর্ঘ-প্রস্থ-উচ্চতা সমান। প্রতিটি বাড়ির সামনে অভিন্ন আয়তনের নাম-ফলক, সোনার তৈরি। সোনার পাত বাড়ির জানালায়, দরজায়। একুশটা রাস্তা শহরের উত্তর-দক্ষিণে গেছে, বারোটা রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে। যেখানে রাস্তাগুলো একে অপরকে কেটেছে, সেই চৌমাথার মোড়গুলোতে রয়েছে সোনার স্তম্ভ, মাথায় একটি করে পশুর মূর্তি। হস্তীস্তম্ভ, ব্যাঘ্রস্তম্ভ, বরাহস্তম্ভ, নাগস্তম্ভ— এইরকম। রাস্তায় ছোট ছোট নদী পড়ছে মাঝেমাঝেই। নোনাজলের নদী, ওপরে বাঁশের সেতু। সে সেতু এমনই মজবুত, রণহস্তী দৌড়ে গেলেও তার কোনও ক্ষতি হবে না। স্থাপত্যের নিয়মের নিগড়ে বাঁধা শহরের প্রতিটি অংশ ব্রহ্মাবাসীদের উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে শিল্পনৈপুণ্যেরও পরিচয় বহন করছে। নতুন জায়গা দেখে উৎসাহে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে চিঙ্কা। রাস্তায় লোকজন খুব কম। এতবড় শহর, রাস্তায় এত কম লোক কেন? পথচলতি যে দু-একজনের দেখা মিলছে, সে চমকে সরে যাচ্ছে রাস্তা ছেড়ে, চিঙ্কার ভয়াবহ আকৃতি দেখে। এক চৌরাস্তার মোড়ে দেখতে পেল দুর্গা, সোনার স্তম্ভের মাথায় মকরমূর্তি। হ্যাঁ, এই জায়গাটার কথাই তো বলেছিলেন পাঠশালার গুরুমশাই। এখান থেকে পশ্চিমে একটা রাস্তা চলে গেছে। সেটা ধরে নাক-বরাবর এগিয়ে গেলে পড়বে সমুদ্রতীর। সেখানেই আছে অক্ষুমুনির গুরুকুল।

সন্ধ্যা হলো, কিন্তু কোনও বাড়ি থেকেই শঙ্খধ্বনি উলুধ্বনি শোনা গেল না।

শহরতলীর এলাকাতে এসে পড়েছে দুর্গা। এখানকার বাড়িগুলো শহরের থেকে অনেকটাই অন্যরকম। খড়ের তৈরি চারচালা বা আটচালা বাড়ি। মাটির দেওয়াল, তার গায়ে চকখড়ির কারুকার্য। প্রতিটি বাড়ির চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমি। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি বেড়া গৃহস্থের জমির সীমানা নির্দেশ করছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে ফুলের বাগান, ঔষধি বৃক্ষ ও লতাগুল্ম। বাড়ির পেছনে সবজিবাগান ও গোশালা। গোবর নিকোনো উঁচু দেউড়ি ও প্রাঙ্গন, নয়নাভিরাম আলপনায় সজ্জিত। প্রতিটা বাড়ির সামনে সুসজ্জিত তুলসীমঞ্চ। অবাক কাণ্ড, কোনও তুলসীতলাতেই প্রদীপ জ্বলছে না। গঙ্গানগরের মানুষগুলোর হলটা কী? দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের একটানা গুরুগম্ভীর গর্জন। বাতাসে লোনা গন্ধ। হঠাৎ তার সঙ্গেই ভেসে এল ক্ষীণ এক আর্ত চিৎকার। নাকি কোনও রাতচরা পাখির ডাক? আবার এল শব্দটা। এবার আরও স্পষ্ট। দুর্গা দেখল, চিঙ্কাও শুনতে পেয়েছে, কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আবার শোনা গেল। পাখির ডাক নয়, নারীকণ্ঠের আর্তচিৎকার। ‘চল চিঙ্কা’। বাহনের পিঠ থাবড়ে দিল দুর্গা। বিরাট একটা লাফ দিয়ে শব্দের উৎসের দিকে দৌড়লো চিঙ্কা।

সরু নখের মতো একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। সেই ক্ষীণ আলোয় দেখতে পেল দুর্গা, দূরে একটা বাড়ির সামনের বাশের বেড়া ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে একপাশে। সে বেড়ার ওপারে বেশ কিছু জমাট-বাঁধা অন্ধকার ইতস্তত নড়াচড়া করছে। আর্তনাদের উৎস ওই জায়গাটাই। আরেকটু কাছে যেতেই দুর্গা দেখতে গেল, চার-পাঁচটা মাথা, মোষের করোটির শিরস্ত্রাণে ঢাকা। মাটিতে কিছু একটা পড়ে আছে, সবাই মিলে

With Best Complements From

AN ISO-9001
CERTIFIED
COMPANY

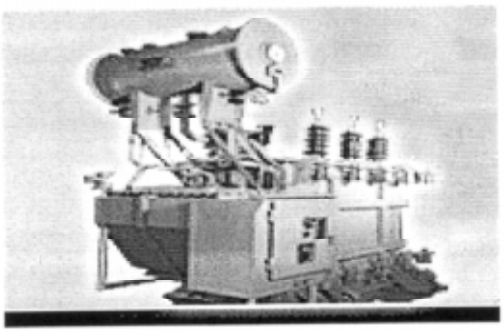

EIU EIU

East India Udyog Limited

145, G.T. ROAD, SAHIBABAD
GHAZIABAD - 210 005 (UP)

Phone : [0120] 4105890
e-mail : eiulgbd@vsnl.com
eiulgbd@rediffmail.com
URL : www.eastindiaudyog.com

Manufacturers of :
"ETS" MAKE POWER & DISTRIBUTION
TRANSFORMERS UPTO 15 MVA & 33 KV CLASS

ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। কী ওটা? মাটিতে একটা নারীর অবয়ব। সে অবয়বের হাত-পা চেপে ধরে আছে লোকগুলো। একটা মোষ-মুকুট লোক উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটির ওপর। ছটফট করছে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে মেয়েটি। মুহূর্তে যেন আগুন জ্বলে উঠলো দুর্গার মাথায়। 'অ্যা-ই-ই-ই-ই-ই!' হুঙ্কারে রাত্রির স্থবিরতা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ল। লোকগুলো চমকে উঠে দাঁড়ালো। 'খবরদার!' আবার হুঙ্কার দিল দুর্গা, হাতে উদ্যত খড়্গ। জবাবে সাঁই করে উড়ে এল একটা তরোয়াল। দুর্গার খড়্গের আঘাতে আকাশেই দু-টুকরো হলো সেটা। চিঙ্কা গর্জে উঠল কান-ফাটানো শব্দে। বিরাট এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। এর পরের কয়েক মুহূর্ত শুধু শোনা গেল তলোয়ারে-খড়্গে ধাতব টঙ্কার ও পুরুষ-কণ্ঠের আর্তনাদ। যেন ঝড় বয়ে গেল জায়গাটার ওপর দিয়ে। উপড়ে পড়লো গাছপালা, ভেঙ্গে পড়লো তুলসীমঞ্চ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকটা লোক রক্তাক্ত কলেবরে ভূমি-শয়ন নিল। 'উম্মমমমহ!' চিঙ্কার গর্জনে কেঁপে উঠল মাটি।

'জল... জল...' কাতর আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখল দুর্গা, মাটিতে পড়ে আছে ওরই বয়সী একটি মেয়ে। পরনের জামাকাপড় নরপশুদের হিংস্রতার আগুনে ঝলসে ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে। সারা শরীর রক্তে মাখামাখি— নখদাঁতের হিংস্র লালসার অত্যাচার দেহটাকে দুমড়ে থেঁতলে দিয়েছে। চিঙ্কার পিঠে বাঁধা জলের থলিটা টেনে নামিয়ে আনলো দুর্গা। থলিটা খালি। কী হবে এখন? জল কোথায় পাই? ওই তো, সামনের বাড়িটার জানালার আধভেজানো কবাটের পেছন থেকে কে যেন উঁকি মারছে। দুর্গা দৌড়ে গেল সেদিকে। লাফিয়ে দেউড়িতে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বলল, 'শুনছেন? একটু জল চাই। আর একজন বৈদ্য।'

জানালা সজোরে বন্ধ করে দিল বাড়ির ভেতরের লোকটা।

অবাক দুর্গা ধাক্কা দিল জানালায়। 'দরজা খুলুন। একটু সাহায্য দরকার।'

'দয়া করে এখান থেকে চলে যাও।' ভেতরের লোকটা বলল।

'কী বলছেন আপনি! এভাবে পড়ে থাকলে মেয়েটা যে মরে যাবে।'

'ও তো এমনিই মরে গেছে। মহিষের লোকেদের সঙ্গে শত্রুতা করেছ, তুমিও মরবে। আমি সামান্য গৃহস্থ, আমাকে এর মধ্যে টেনে এনো না। বউ-বাচ্চা নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে।'

'কাপুরুষ!' রাগে বাড়ির দেওয়ালে সজোরে একটা লাথি মারল দুর্গা।

না, মাথা গরম করে লাভ নেই। দেউড়ি থেকে নেমে দুর্গা মেয়েটির কাছে গেল, কোলে তুলে নিল দেহটাকে। লাফিয়ে উঠলো চিঙ্কার পিঠে। 'চল চিঙ্কা!' দুর্গার ইঙ্গিতে চিঙ্কা দৌড়লো সমুদ্রের অভিমুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সামনে দেখা দিল সমুদ্রতীর। পাহাড়ের মেয়ে ও, এই প্রথম সমুদ্র দেখল। অন্ধকার মাটিতে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে অনন্ত জলধি, সবুজ থাকব রসায়নে ভাস্বর। সাদা ফেনার স্রোত দিগন্ত থেকে ধেয়ে আসছে বারবার। তীরভূমি ছুঁয়ে ফেলার আগেই কোনও এক অদৃশ্য খড়্গের আঘাতে ভেঙে সহস্রধারায় ছড়িয়ে পড়ছে ভূবলয় জুড়ে। না, এসব দেখে মুগ্ধ হবার সময় নেই এখন। মেয়েটির শরীর থেকে বয়ে যাওয়া রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর হাতদুটো, ভেসে যাচ্ছে চিঙ্কার পিঠ। নেতিয়ে পড়েছে মেয়েটি, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ওই তো, দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রতীর থেকে একটু দূরে বাঁশের বেড়ায় ঘেরা অনেকখানি জায়গা জুড়ে তপোবন। ওটাই সম্ভবত অক্ষুমুনির আশ্রম। দুর্গার ইশারায় চিঙ্কা ছুটলো সেইদিকে। বেড়া পেরোতেই সামনে পড়ল একটা চারচালা বাড়ি। তার সামনে এসে দুর্গা চিঙ্কার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল, কোলে মেয়েটির দেহ। পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলল, 'শুনছেন, একটু দরজা খুলবেন?'

দরজা খুলে গেল। সামনে সৌম্যদর্শন একজন বৃদ্ধ। সাদা লম্বা চুল, লম্বা সাদা দাড়ি। তাঁর ঠিক পেছনে একজন বৃদ্ধা, তাঁরও চুল সব সাদা। অচৈতন্য দেহটা কোলে দুর্গা দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'মেয়েটার আঘাত খুব গুরুতর। একটু দেখবেন ওকে?' মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল দুর্গা।

শুভ্রকেশ সেই মহিলা স্খলিত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন দুর্গার দিকে। কোলের মেয়েটির মুখ দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'মৃন্ময়ী-ই-ই-ই-ই।'

বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়ে এল অল্পবয়স্কা একটি মেয়ে। বয়সে দুর্গার থেকে অনেকটাই ছোট। চিতাবাঘের মতো ঋজু, দৃঢ় গড়ন, চকচকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গায়ের রঙ। একঢাল কালো কোঁকড়ানো চুল পিঠ গড়িয়ে কোমরে নেমেছে। সফরীসদৃশ দীঘল কাজলকালো চোখদুটো, মুখময় ছড়িয়ে রয়েছে স্বর্গীয় লাবণ্য। হাত বাড়িয়ে মৃন্ময়ীর দেহটা কোলে তুলে নিল অবলীলাক্রমে। বোঝা গেল, ছিপছিপে ওই শরীর অসীম শক্তি ধরে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে খুব সাবধানে দেহটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। পেছন পেছন দুর্গাও বাড়ির ভেতরে ঢুকলো।

'তোমার নাম কী ভাই?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'আমার নাম কালী।' বলল মেয়েটি, 'আর তোমার?'

সুদীর্ঘ এক অন্ধ রজনীর শেষলগ্নে মৃন্ময়ী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

নরপশুগুলো দেহটার ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছে। ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে শরীরটাকে, শস্ত্রাঘাতে শরীরের অভ্যন্তরও ক্ষতবিক্ষত করে রেখেছে। বৈদ্য সারারাত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারল না মৃন্ময়ীকে। গাছতলায় চুপটি করে বসেছিল চিঙ্কা। দুর্গাকে উঠোন থেকে নামতে দেখে মুখ ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে। দুর্গা এগিয়ে গিয়ে চিঙ্কার গলা জড়িয়ে ধরল। চিঙ্কা খুব আলতো করে ওর মাথা ঘঁষলো দুর্গার কাঁধে। চেটে দিল দুর্গার হাতের তালু। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা, এক এক করে তারারা মুছে যাচ্ছে আকাশ থেকে। সে আকাশের নিচে নিথর ধরিত্রী যেন জমাটবাঁধা অন্ধকার। যেন পাপের পাহাড়। সামনে ফেনায়িত অপার্থিব দামাল সমুদ্র। দু'ধারে কৃষ্ণাঙ্গী নিবিড় বনানীতে মাতৃগর্ভের অমানিশা। মাঝে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে দুর্গা। এ যেন সভ্যতার উষালগ্নের পূর্বরাত্রি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দুর্গা, 'মানুষ কী করে এত খারাপ হয় বলতো চিঙ্কা?'

কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশের পূর্ব কোণে রাঙা রঙের ছোঁয়া লাগলো। পাখির ডাক শোনা গেল ইতিউতি। কয়েকজন আশ্রম-বালিকা বেরিয়ে এল কুটির থেকে। তারা শিউরে উঠল চিঙ্কাকে দেখে।

'কী এটা?' ভয়ে ভয়ে বলল একটি মেয়ে।

'চিঙ্কা হল বাংহ', বলল দুর্গা, 'ওর বাবা বাঘ, মা সিংহ।'

'এরকমটা আবার হয় নাকি?' মেয়েটির গলায় অবিশ্বাস।

'হয়', বলল দুর্গা, 'আমার গ্রামের লোকেরা বলে, চিঙ্কা হল 'ঘোড়াদাবা সিংহ'। ঘোড়ার মতো দৌড়তে পারে, বাঘ-সিংহর মতো যুদ্ধও করতে পারে।'

সাদা-দাড়ি বৃদ্ধ বললেন, 'কে তুমি মা? এখানে কী করে এলে?'

দুর্গা দেখল, সমুদ্রের রং কালো থেকে হয়েছে ঘন লাল। যেন সমুদ্র ভিজে আছে রক্ত। চিঙ্কার পিঠের থলি থেকে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের চিঠিটা বার করে বৃদ্ধর হাতে দিল দুর্গা।

'তুমি ঠিক জায়গাতেই এসেছ মা', চিঠি পড়ে বলল বৃদ্ধ, 'কিন্তু এসেছ ভুল সময়ে।'

'আপনিই কি অক্ষুমুনি?'

'হ্যাঁ। এই গুরুকুলের আমি প্রধান আচার্য।'

'কেন বলছেন, ভুল সময়ে এসেছি?'

'এ রাজ্যে এখন আর কেউ নিরাপদ নয়, বিশেষ করে মেয়েরা। তার ওপর নতুন রাজা মেয়েদের লেখাপড়া করা পছন্দ করেন না। গুরুকুলের ছাত্রীদের ভয় দেখাতে সৈন্যদের ছেড়ে দিচ্ছেন তাদের ওপর। আমি ঠিক করে ফেলেছি, এ গুরুকুল বন্ধ করে দেব।'

'নতুন রাজা কেন? মহারাজ অমিতবলের কী হল?'

'তুমি দেখছি জানো না। গত মাসে গঙ্গানগরের পতন হয়েছে। মহারাজ খুন হয়েছেন।'

'সেকি! মহারাজ অমিতবলের এতবড় সেনাবাহিনী, কে তাঁকে হারালো?'

'তার নাম মহিষ। সেই এখন এই রাজ্যের শাসক।'

'একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার,' বলল দুর্গা, 'গঙ্গা পার হওয়ার সময়। সে আমাকে বলছিল, এরাজ্যে নাকি অসু ছাড়া আর কারোর উপাসনা করা নিষেধ। সে বলেছিল, এটা নাকি মহিষাসুরের আইন।'

'তুমি ঠিকই শুনেছ।'

'কে এই মহিষ? কেন সে জোর করে অসুর উপাসনা সবার উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে?' বলল দুর্গা

'মা, দেবাসুরের দ্বন্দ্বের ব্যাপারে তুমি কী জানো?'

'আমি দুর্গম পাহাড়ের মেয়ে, সমতলের রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ,' বলল দুর্গা, 'এটুকু শুধু শুনেছি— দেব ও অসুর, ভিন্ন উপাসনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী দুই সম্প্রদায় বহুকাল ধরে লড়াই চালিয়ে আসছে, এই জম্বুদ্বীপে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। দেবতারা সূর্য, অগ্নি, বরুণ, বজ্র, পবন ইত্যাদি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। অসুরদের মধ্যেও দুটি গোষ্ঠী আছে, দৈত্য ও দানব। এছাড়া বিস্তারিত আর কিছু জানি না।'

'তবে বসো এখানে। সব বলব তোমায়। বললে মনের ভারও কিছুটা লাঘব হবে।'

দুর্গা দেখল, একটা কমলা গোলক ধীরে ধীরে জল ছেড়ে আকাশে ভেসে উঠছে। যত সে ওপরে উঠছে, রং বদলাচ্ছে তার। সমুদ্রেরও রং বদলাচ্ছে তার সঙ্গে। ভোরের বাতাসে নতুন দিনের গন্ধ।

'গোড়া থেকেই বলি মা, শোনো', শুরু করলেন অক্ষুমুনি, 'হিমালয়-কিরিটী সমুদ্র-মেখলা এই জম্বুদ্বীপের ওপর প্রকৃতির অপার স্নেহ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে অপর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়। অসংখ্য নদী ও তাদের শাখাপ্রশাখা এদেশের মাটিকে পুষ্ট করেছে।

চাষাবাদ বা পশুপালনের জন্য খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না। তাই এদেশের মানুষ কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক। এদেশকে 'ভা-রত' অর্থাৎ 'জ্ঞানে রত' বলা হয়, তা অর্থহীন নয়। কে আমি, কীভাবে এখানে এলাম, কী রহস্য এ প্রকৃতির, কে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, এসব প্রশ্ন মানষকে সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই ভাবিয়ে এসেছে। এদেশের মানুষরা তাদের অখণ্ড অবসর, তাদের বুদ্ধি, যুক্তি ও কল্পনা দিয়ে সেইসব প্রশ্নের নানা উত্তর পেয়েছে। তাই এদেশে অসংখ্য সম্প্রদায়, অসংখ্য মতবাদ।

পুরাকালে কাশ্যপ মুনি বলেছিলেন, এ জগতে যত শক্তি আছে, সবই একমেবদ্বিতীয়ম এ মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। সেই মহাশক্তির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ঈশ্'। এক মতান্তরে 'অস্'। এই নিয়ে গোলমাল বাধলো কাশ্যপ মুনির সন্তানদের মধ্যে। তুমি বোধহয় শুনেছ কাশ্যপ মুনির তিন পত্নীর কথা— দিতি, অদিতি ও ধনু। তিনজনেই প্রগাঢ় জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্বময়ী। দিতির সন্তানরা দৈত্য, দনুর সন্তানরা দানব, অদিতির সন্তানরা আদিত্য। দৈত্যরা বলল, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অনাচার চলছে। কেউ পুজো করছে আগুনের, কেউ জলের, কেউ গাছের, কেউ বা পাথরের। এসব অনাচার বন্ধ করতে হবে। কাশ্যপ মুনির বর্ণনার মহাশক্তি 'অস্'। যাকে দৈত্যরা বলত 'অসু', সারা দেশ জুড়ে শুধু তারই উপাসনা বলবৎ করতে হবে। দানবরাও এই মতেরই সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু বেঁকে বসল আদিত্যরা। তারা বলল, প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বা মূর্তিপূজা অনাচার নয়। সত্য এক, কিন্তু তার প্রকাশ বিভিন্ন। সেই সত্যকে একটি বিশেষ নাম দিয়ে এক বিশেষ উপাসনা-পদ্ধতি সমস্ত দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। যেমন এক মাপের জামা সকলের পরিধেয় হতে পারে না, তেমনই একই উপাসনা পদ্ধতি সমস্ত জাতির উপযুক্ত হতে পারে না। সে চেষ্টা করলে জাতির আধ্যাত্মিক চেতনার পতনই শুধু সুনিশ্চিত করা হবে। কাশ্যপ মুনির বর্ণনার 'ঈশ্', যাকে আদিত্যরা বলতো 'ঈশ্বর', তাঁকে এক মেনেও প্রত্যেকের স্বাধীনতা থাকতে হবে ভিন্ন ভিন্ন 'দেব'-এর, অর্থাৎ শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনার করার। ভক্ত যেমন, ঈশ্বরও তেমন। প্রত্যেককে নিজের রুচিমতো এগোতে দিতে হবে, তাতেই জনগণের সর্বাধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।

যুক্তি হিসেবে অসু-মতবাদ জোরালো। ব্রহ্মাণ্ডের একটাই শক্তি, সেটাই তো যুক্তিযুক্ত। বিদগ্ধ মহলে অসু-মতবাদ তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু প্রকৃতি-নির্ভর গ্রামীণ ও বনবাসীদের কাছে প্রাকৃতিক শক্তির রূপে ঈশ্বরের আরাধনাই স্বাভাবিক। সে অধিকার কেড়ে নিতে গেলে সংঘর্ষ অনিবার্য। কালক্রমে দেখা গেল, দেশের অর্ধেক মানুষ অসু-মতবাদী, চাইছে গোটা দেশের ওপর অসু-উপাসনা চাপিয়ে দিতে। বাকি অর্ধেক দেব-মতবাদী, চাইছে এদেশের প্রাচীন প্রকৃতি-পূজার পরম্পরা বজায় রাখতে। এই নিয়েই দ্বন্দ্ব।'

'আপনি কোন মতকে ঠিক বলে মনে করেন?'

'দ্যাখো মা, বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখাকে আমি যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারি না,' বললেন অক্ষুমুনি, 'তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে অসু-উপাসক। কিন্তু আধুনিক অসু-মতবাদীদের সঙ্গেও আমি পুরোপুরি একমত হতে পারি না। তারা বলে এই ব্রহ্মাণ্ডের অসুই একমাত্র প্রভু। সূর্য, চন্দ্র, তারকারাশি, অগ্নি, জল, বায়ু— এরা সবাই অসুর দাস। অসু যেমন আদেশ দেন, এরা তেমনটিই করে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কীভাবে প্রযোজ্য হবে? কে তাদের বলে দেবে, মানবজাতির জন্য অসুর কী নির্দেশ? তখন মহিষের মতো ঠগবাজ কেউ এসে জোটে। সে এসে বলে, সে যা বলছে, সেটাই অসুর নির্দেশ। পৃথিবীসুদ্ধু সবাইকে সেটাই মানতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না, শাসক দ্বারা সমাজ উৎপীড়নের পথই শুধু প্রশস্ত হয়। তাছাড়া, আমি তো প্রকৃতির সব শক্তির মধ্যেই অসুকে দেখতে পাই। প্রতিটি শক্তির কাছ থেকেই আধ্যাত্মিক প্রেরণা পাই। কোনও দেব-মতবাদী যদি আগুনের পূজা করে, তবে তার মাধ্যমে তো সে সেই অসুরই পূজা করছে, তাই না? আগুনকে 'দাস' বলে অশ্রদ্ধা করার থেকে তা বহুগুণে ভালো।'

'ক্ষমা করবেন, আমি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে ফেললাম,' বলল দুর্গা 'আপনি এবার মহিষের কথা বলুন।'

'মহিষের পিতা রম্ভ ছিল দনুর পুত্র,' বললেন অক্ষুমুনি, 'সে প্রেমে পড়ল মহিষপালক এক উপজাতি প্রধানের কন্যার। এই উপজাতির তত্ত্বাবধানে আছে প্রায় পাঁচলক্ষ মোষ। সেই মোষেদের চারণভূমি উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল এই উপজাতির দখলে। মহিষ তার পিতার সূত্রে পেয়েছে উন্নত যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতি-বিদ্যার শিক্ষা, জেষ্ঠ্যতাত দৈত্যদের সূত্রে পেয়েছে অন্ধ অসু-ভক্তি। মাতার সূত্রে পেয়েছে পাঁচ লক্ষ মোষ, মহিষপালক সমাজের নেতৃত্ব, আর পেয়েছে বিশাল এক ভূমিখণ্ডের মালিকানা। অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর তপস্যায় সেই মোষেদের ও মোষপালকদের সে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলেছে। ভারতে যুদ্ধের প্রধান বাহন ঘোড়া। কল্পনা করতে পারো, আক্রমণোদ্যত মোষকে দেখলে ঘোড়ার কী হাল হতে পারে? ঝটিকা আক্রমণে সমগ্র উত্তর ভারত জয় করে ফেলেছে মহিষ। সেখানকার প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক উপজাতি, অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু, জল আদি প্রতিটি 'দেব' মহিষের শক্তির সামনে পরাজয় স্বীকার করেছে। অর্ধেক ভারতের অধীশ্বর হয়ে মহিষ

An ISO 9001 : 2008
certified Company

With Best
Compliments From :-

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

FOR ANY TYPE OF PILE FOUNDATION WORK

CAST-IN-SITU DRIVEN, CAST-IN-SITU BORED, PRECAST DRIVEN, PRECAST PRE-BOARD, STEEL OR R.C.C. SHEET PILES ETC

AND

ALL TYPES OF ENGINEERING AND CONSTRUCTION WORKS FOR CIVIL, STRUCTURAL, MARINE, TANKAGES, PIPING EQUIPMENT ERECTION IN

Power Station, Road Projects, Fertilizer Projects, Cement Plants, Refinery Construction, Coal Handling Plants,Paper Mills, R.C.C. or Prestressed Concrete Bridges, Fabrication & Erection of Steel Structures, Hydrocarbon Storage Tanks and Pipeline, Cross-Country Pipeline, Steel Plant Construction, Multi-storied Building, Micro-Tunneling, Box/Pipe Pushing, HDD, High-rise Silo Structures By Slipform Technique,Bunkers, Jetties, Marine Structures, Deep Underground Basement, Textile factories, Effluent Treatment Plant, Water & Sewage Treatment Plant Etc., as Well as Turnkey Construction And for any other type of Industrial and Utility Projects For Economy, Speed and Quality Construction.

CONTACT :

SIMPLEX INFRASTRUCTURES LIMITED

Foundation, Reinforced & Prestressed Concrete Specialist

REGD. OFFICE
"Simplex House"
27, Shakespeare Sarani, Kolkata – 700017
Phone :- (033) 2301 1600
Fax :- (033)2283 5964/65/66
E-mail :- simplexkolkata@simplexinfra.com
Web :- www.simplexinfrastructures.com

ADM. OFFICE
12/1, Nellie Sengupta Sarani
Kolkata – 700087
Phone :- (033)2252 8371/8373/8374
Fax :- (033) 2252 7595

BRANCHES

NEW DELHI **MUMBAI** **CHENNAI**

'মহিষাসুর' নাম নিয়েছে। সে নিজেই অসুর প্রতিরূপ, তার নির্দেশই অসুর ইচ্ছা, এমনটিই সে লোকমধ্যে প্রচার চালাচ্ছে।'

'উত্তর ভারত জয় করল মহিষ', জিজ্ঞেস করল দুর্গা, 'আর দক্ষিণ ভারত?'

'বিন্ধ্য পর্বতের উপজাতিরা আপাতত মহিষের অগ্রগতি রোধ করে দিয়েছে।'

'কী করে?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'মোষ যতই শিক্ষিত হোক না কেন, পাহাড় ডিঙোতে সে ঘোড়ার মতো পটু নয়। তাছাড়া দক্ষিণের রাজাদের হাতি আছে। হাতি তো আর মোষকে ভয় পায় না।'

'দক্ষিণে হেরে গিয়ে এখন মহিষের নজর পড়েছে পূর্বদিকে?'

'কতকটা তাই।' বললেন অক্ষুমুনি, 'মহিষ তার উত্থানের সময় দেশজুড়ে অসু-উপাসকদের সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু নিজেকে অসুর প্রতিভূ ঘোষণা করার পর থেকেই সেই সমর্থকদের একটি বড় অংশ উপলব্ধি করেছে, মহিষাসুরের অসু-ভক্তি আদতে লোকদেখানো। অসু-মতবাদের নাম করে সে গোটা দেশটাকে নিজের পদানত করতে চাইছে। মহিষের সিংহাসন টলে উঠল প্রজা-বিদ্রোহের ভয়ে। অসুবাদীদের সমর্থন ফিরে পেতে সে তখন দু'হাত ভরে স্বর্ণমুদ্রা ছড়াতে শুরু করল। ঘুষ দিয়ে কিনে নিতে শুরু করল অসু-ধর্মগুরুদের। এমন অবস্থা কি বেশিদিন চলতে পারে? কিছুদিনের মধ্যেই সাম্রাজ্যের অর্থকোষে টান পড়ল।'

'আর তাই মহিষের নজর পড়ল এদিকে?' বলল দুর্গা।

'ঠিক তাই। সবাই জানে, সারা পৃথিবীতে যত সোনা আছে, তার অর্ধেক আছে এই ব্রহ্মারাজ্যে।'

'কিন্তু মহিষাসুর এরাজ্য জয় করল কী করে?' প্রশ্ন দুর্গার, 'ব্রহ্মারাজের তো এক লক্ষ হাতি ছিল!'

'মোষ-বাহিনী দিয়ে নয়,' অক্ষুমুনি বললেন, 'শঠতা দিয়ে ব্রহ্মা জয় করেছে মহিষ।'

ধীরে ধীরে আকাশের লালে লাগলো সোনার ছটা, দিগ্বলয়ে বান ডাকলো গেরুয়া রঙের। আশ্রমবালিকারা সবাই একে একে এসে অক্ষুমুনি ও দুর্গাকে ঘিরে বসেছে। তাদেরই একজন একটা পিতলের ঘটি এগিয়ে দিল অক্ষুমুনির দিকে। তা থেকে ঢক্‌ঢক্ করে খানিকটা জল খেয়ে অক্ষুমুনি আবার বলতে শুরু করলেন—

'মহারাজ মহীবল ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা, আমার বিশেষ বন্ধু। আমার মতো অনেকেই ছিল তাঁর গুণমুগ্ধ। কিন্তু তাঁর পুত্র অমিতবল ছিলেন ভোগী ও অযোগ্য। তিনি সিংহাসনে বসার পর থেকে গঙ্গানগরের ক্রমাগত অধোগতিই হয়েছে। বেতন ও পদোন্নতি থেকে শুরু করে নানান বিষয় নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ জমেছে। জোর করে বর্ধিত হারে কর আদায় করতে গিয়ে বহু ব্যবসায়ীকে চটিয়েছেন তিনি, তাদের অনেকেই নিজেদের ব্যবসা এখান থেকে গুটিয়ে নিয়ে লোথাল বা করাচপায় চলে গেছে। অমিতবলের এসব দিকে বিশেষ কোনও নজর ছিল না। ইতিমধ্যে অলতু নামক এক জনপদের প্রজারা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে রাজপথ অবরোধ করল। সেই সমস্যাও অমিতবল সময়মতো সামলাতে পারলেন না। প্রজারা ক্ষেপে উঠল রাজার উপর। রাজার তাতেও হুঁশ ফিরল না। সম্প্রতি তিনি কাশ্যপমীর থেকে হিরণ্যলোম এক বারবণিতাকে নিয়ে এসেছিলেন। সে নাকি অপূর্ব সুন্দরী। এবং অসুর-বংশীয়। সারাক্ষণ তাকে নিয়েই মত্ত ছিলেন রাজা। রাজপ্রাসাদে সেই বারবণিতার আগমন-নির্গমন প্রজাদের থেকে গোপন রাখতে প্রাসাদের খিড়কির ঘাটের প্রহরা সরিয়ে নেন উনি। মহিষের কানে এই খবর পৌঁছায়। এক রাত্রে মাত্র বাইশজন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে চুপিসারে নৌকা করে রাজপ্রাসাদের খিড়কির ঘাটে পৌঁছায় সে। অরক্ষিত খিড়কির দরজা দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকে পড়ে।'

'অবিশ্বাস্য! বারবণিতার মোহে রাজদ্বার অরক্ষিত রাখা, এমনটা কী করে কোনও রাজা করতে পারে!' বলল দুর্গা।

'রাজা কী করে, তার অনেকটাই নির্ভর করে রাজার পরামর্শদাতাদের ওপর। মতিভ্রান্ত অমিতবল পরামর্শদাতা হিসাবে ভরসা করতেন তাঁর জ্যোতিষীদের ওপর। শোনা যাচ্ছে, সেই জ্যোতিষীরা বহুদিন থেকেই গোপনে মহিষের উৎকোচভোগী। মহিষ যেমন চেয়েছে, তেমন করেই তারা অমিতবলকে পরিচালিত করেছে।'

'তারপর কী হলো?'

'মহিষের আক্রমণের সংবাদ রাজ-চরেরা দ্রুত পৌঁছে দিয়েছিল বন্দরে প্রতীক্ষারত সেনাবাহিনীর কাছে। কিন্তু পথ-অবরোধের কারণে সেনাবাহিনী সময়মতো রাজপ্রাসাদে পৌঁছাতে পারল না। ইতিমধ্যে ঝটিকা আক্রমণে মহিষ দখল করে নিল রাজপ্রাসাদ। মহারাজ অমিতবল খুন হলেন সে রাতে। মহিষ সিংহাসনে আরোহণ করল। মহারাজের ভগিনী রাজদুহিতা মায়াবলীকে বিবাহ করেছে মহিষ, মায়াবলী তার

পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে 'মহিষী' নাম গ্রহণ করেছে। সবচেয়ে নক্কারজনক কাজ সেটি করেছে মহিষ, সেটি হল, রাজপ্রাসাদের প্রতিটি নারীকে বলপূর্বক যৌনদাসী বানিয়েছে। এমনকি রাজপুত্রদেরও নপুংসক বানিয়ে নিজের যৌনসেবার কাজে লাগিয়েছে। শুধুমাত্র ছোটো রাজকুমার দিব্যবল পালিয়ে বেঁচেছে।'

গা গুলিয়ে উঠল দুর্গার। 'এমন ঘৃণ্য কাজ, মহিষের সঙ্গীসাথীরা মেনে নিল কী করে?'

'মহিষ ফরমান জারি করেছে— বিধর্মীদের, বিশেষত বিধর্মী নারীদের ধর্ষণ ও সম্ভোগ নাকি পুণ্যের কাজ। সেটিই নাকি অসু-র নির্দেশ। বিধর্মীদের যত যন্ত্রণা দেওয়া যায়, ততই নাকি অসু খুশি হন। মহিষের অনুগামীরা মহিষের কথাকেই অসু-বাক্য বলে বিশ্বাস করে। আর তাই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে নারীধর্ষণ, অত্যাচার, অপহরণ ও হত্যা—' বলতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন অক্ষুমুনি।

'এরকম নারকীয় উদ্দেশ্য?' বলল স্তম্ভিত দুর্গা।

'কেউ তো আর শখ করে মহিষের সৈন্যদলে যোগ দেয় না। যেখানে যত পিশাচ স্বভাবের ধর্ষকামী আছে, তাদের এইসব লোভ দেখিয়ে নিজের সৈন্যদল স্ফীত করেছে মহিষ।'

'রাজ্যে এতসব ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে, আর প্রজারা বিদ্রোহ করছে না? ব্রহ্মার সৈন্যরাই বা কী করে মহিষকে রাজা বলে মেনে নিল?' দুর্গার চোখে বিস্ময়।

'প্রজারা বা সৈন্যরা মহারাজ অমিতবলের ওপর মোটেই খুশি ছিল না। তাই তাঁর পরাজয়। তারা একরকম নিরাসক্ত মন দিয়েই দূর থেকে দেখেছে। ভাবখানা এমন— সব রাজাই খারাপ, তাই কে রাজা হল তাতে কী আসে যায়? তার ওপর মহিষের উৎকোচভোগী জ্যোতিষীর দল রাজ্যে প্রচার চালাচ্ছে— মহিষ সর্বশক্তিমান, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, সেই একমাত্র আরাধ্য। মাতৃ উপাসনার যুগ শেষ, এটা এখন অসুর যুগ, মহিষাসুরের যুগ। প্রজারা তা বিশ্বাসও করছে। এটা তো সত্যি, যে দেবতারা একে একে পরাভূত হয়েছেন মহিষের কাছে। শোনা যাচ্ছে, মহাদেব ও বিষ্ণুও চেষ্টা করে মহিষকে হারাতে পারেননি। প্রজারা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, মহিষ সত্যিই অসু-র প্রতিভূ। কেউ তাকে হারাতে পারবে না। রাজভগিনীর মহিষের পক্ষে যোগদান সেই ভাবনাকেই পুষ্ট করেছে। দুঃখের কথা কি জানো মা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষে ভেদ ছিল না কখনও এদেশে। আর আজ নারীসমাজ গৃহকোণে সীমাবদ্ধ হয়ে রয়ে যাচ্ছে। অঙ্গনের বাইরে পা রাখা তার পক্ষে নিরাপদ নয় আর। এমতবস্থায় এই গুরুকুল চালিয়ে লাভ কী?'

'না, এ চলতে পারে না।' মাথা নেড়ে বলল দুর্গা, 'আমি গ্রামের মেয়ে, শহুরে রাজনীতি আমি অতশত বুঝি না। শুধু এটুকু বুঝি, এ মাৎস্যন্যায়ের প্রতিকার না করতে পারলে জীবন বৃথা। এই শহরে আমি এসেছিলাম লেখাপড়া করতে। কিন্তু যেখানে নারীর মূল্য এরকম কানাকড়ি, সেখানে লেখাপড়া করে কী হবে? আজ এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, মহিষাসুরকে এ পবিত্র ব্রহ্মাভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তবেই আমি আবার পুঁথিতে হাত দেব, তার আগে নয়।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত,' মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে থেকে বলে উঠল কেউ, 'এখন কী করবে, সেটা বলো।'

'কে তুমি ভাই?' পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'আমার নাম ভুবনেশ্বরী,' আশ্রমবালিকাদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

ভালো করে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। ওর থেকে কয়েক বছরের বড়ই হবে মেয়েটি। লম্বা গড়ন, স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ। নীল চোখে মহাশূন্যের গভীরতা।

'আমি ভুবনেশ্বরী', আবার বলল মেয়েটি, 'তুমি একা এতগুলো মহিষ সৈন্যকে হারিয়েছ, সাধারণ মেয়ে নও তুমি। আমার মন বলছে, পারলে তুমিই কিছু করতে পারবে। তোমার কথায় ভরসা করতে ইচ্ছে করছে। এ শহরের সবাইকে আমি চিনি। কী তোমার পরিকল্পনা বলো। বিদ্রোহের জন্য কীরকম লোকজন লাগবে, বলো। লোক সংগ্রহের ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

গতরাতের আলাপ হওয়া মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। দুর্গা দেখল, মেয়েটির কান্নাভেজা কাজলকালো চোখদুটো জিঘাংসায় জ্বলজ্বল করছে। 'আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি,' বলল কালী, 'প্রতিজ্ঞা করছি, আগে অসুরদের রক্তপান করব, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস নেব।'

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। মনে হল, সূর্যদেব তাঁর ভাণ্ডারের সব সোনা গলিয়ে সমুদ্রে ঢেলে দিয়েছেন। দিগন্ত পর্যন্ত থৈ থৈ করছে তরল সোনা।

মৃন্ময়ীর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হল সমুদ্রতীরে।

তার পরের কয়েকটা দিন দুর্গা, ভুবনেশ্বরী ও কালী তিনজনে মিলে গঙ্গানগরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালো। শহরের কোথায় কত সেনা মোতায়েন রয়েছে, কোন ছাউনিতে

কত সৈন্য আছে, রাজপ্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কীরকম, সেসব বিস্তারে নথিবদ্ধ করল। দুর্গা দেখল, বড় কঠিন ঠাঁই এই গঙ্গানগর। গোটা শহরটাই তৈরি হয়েছে ভয়ানক দুর্গম এক জঙ্গলের ঠিক মধ্যিখানে। সে জঙ্গলের জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। মহিষের আগে আর কোনও বহিঃশত্রু গঙ্গানগর জয় করতে পারেনি, তার একটা কারণ বোধহয় এটাও। রাজপ্রাসাদের খিড়কির দরজার ওপারে মাতলী নদীর ঘাট, সেখান দিয়েই মহিষ ঢুকেছিল রাজপ্রাসাদ দখল করতে। দুর্গার অভিমত, সেই রাস্তা দিয়েই ঢুকে রাজপ্রাসাদ পুনর্দখল করতে হবে। ভুবনেশ্বরীর পরিচিত বনবাসীদের সাহায্যে সেই ঘাটের বিপরীতে ঘন জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়ল ওরা। গাছের ওপরে মাচান বাঁধা হলো, যেখান থেকে রাজপ্রাসাদের ওপর সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখা যায়।

রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সন্ধ্যেবেলা থেকে চাঁদ অদৃশ্য, অনন্ত নক্ষত্রবীথিও অলক্ষিত। সবুজ অন্ধকারে ডুবে আছে ব্রহ্মার ভয়াল জঙ্গল। দম বন্ধকরা সেই অন্ধকার ভেদ করে মাঝেমাঝে এদিক-ওদিক থেকে ভেসে আসছে শিকার-সন্ধানী ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন। জঙ্গলের বাতাসে পচা পাতার গন্ধ। বন্য পশুর গন্ধ। মাচানে কালী ও দুর্গা। গাছের নীচে পাহারা দিচ্ছে চিঙ্কা, যাতে কোনও বাঘ অতর্কিতে গাছে উঠে আসতে না পারে। জঙ্গলের শরীরে বৃষ্টির জলতরঙ্গ। অপার্থিব সে স্তবগাথা শুনতে শুনতে লেগে এসেছিল ক্লান্ত চোখদুটো। ক্ষীণ একটা শব্দ সচকিত করে দিল দুর্গাকে। দেখল, এক এক করে পাঁচটি নৌকা জড়ো হলো ঘাটে। খিড়কির দরজা ধীরে ধীরে খুলে গেল। একটা একটা করে অনেকগুলো সিন্দুক রাজপ্রাসাদের ভেতর থেকে টেনে নৌকায় তোলা হলো। প্রতিটি নৌকায় দুটি করে সিন্দুক।

‘কী আছে সিন্দুকগুলোতে কে জানে!’ ফিসফিস করে বলল দুর্গা।

‘খুব ভারী কিছু আছে,’ বলল কালী।

‘কী করে জানলে?’

‘সিন্দুক তুলতেই নৌকাগুলো কতখানি জলের মধ্যে ঢুকে গেল, দেখলে না?’

‘ভারী জিনিস!’ বলল দুর্গা, ‘মহিষ চুপিসারে রাজপ্রাসাদ থেকে কী পাচার করছে?’

‘দাঁড়াও দেখছি,’ এই বলে বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগ না দিয়ে কালী মাচান থেকে ঝাঁপ দিল

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন :—

কুমির-কিলবিল সেই নদীতে। ঝুপ করে একটা আওয়াজ, তারপর সব চুপচাপ। আতঙ্কে নিজের হাতে কামড় দিল দুর্গা। মেয়েটা কি পাগল!

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। একটি একটি করে সবক'টি নৌকা ঘাট ছেড়ে গভীর জলের দিকে এগোলো। সবার শেষের নৌকাটি আচমকা একটু নড়ে উঠল। দুর্গা দেখল, নৌকার মাঝির গায়ে কালো কী যেন অজগরের মতো জড়িয়ে রয়েছে। ছটফট করছে মাঝি, যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ উল্টে গেল নৌকাটি। মাঝির আর্ত চিৎকারের মধ্যেই একটা কুমির ঝাঁপ দিয়ে তার দেহটা টেনে নিয়ে গেল কালো জলের গভীরে। হায় হায় করে উঠল খিড়কির প্রহরীরা। দেখতে দেখতে সিন্দুকগুলো তলিয়ে গেল জলের তলায়।

কালী কী হলো?

'দুর্গা!' ফিস ফিস করে কেউ যেন ডাকলো। কিছুই দেখতে পেল না। শুধু অনুভব করল দুর্গা, একটা কালো ছায়া দ্রুত গাছ বেয়ে ওপরে উঠে এল।

'কালী, তুমি!' আর একটু হলেই চিৎকার করতে যাচ্ছিল দুর্গা।

'এই দ্যাখো,' দু'হাতের মুঠি খুলল কালী। বাঁ মুঠো ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা। ডান মুঠোয় একরাশ হিরে চুনী পান্না।

'গঙ্গানগরের কোষাগার এইভাবে খালি হচ্ছে প্রতি রাতে।' বলল কালী।

কর্দমাক্ত মাটি, প্রতিপদে পা ডুবে যায়। মাঝেমাঝে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। সেই কাদা ঠেলে বৃদ্ধ লোকটি এগিয়ে চলেছে দ্বীপের মধ্যভাগের দিকে। মাঝেমাঝে টাল সামলাতে কোনও একটা গাছের উর্ধ্বমুখী শিকড় আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে। অন্ধকার রাত। চাঁদ একফালি উঠেছে বটে, কিন্তু ঘন জঙ্গলের এই ঘেরাটোপের মধ্যে তার দেখা মেলা ভার। সে অভাব পুষিয়ে দিয়েছে জোনাকিরা, সংখ্যায় তারা লক্ষ লক্ষ। বিন্দু বিন্দু হলুদ আলো দিয়ে একটা নকশা এঁকেছে তারা, নিকষ কৃষ্ণকায় জঙ্গলের পটভূমিকায়। দল বেঁধে উড়ছে ইতিউতি, পথ দেখাচ্ছে বৃদ্ধকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মশালের আলো নজরে পড়ল। গাছের ডালে বাঁধা মশালটা নদীর মৃদু বাতাসে দুলছে। তার নিচে গাছের শিকড়ে হেলান দিয়ে এক যুবক বসে আছে। বৃদ্ধকে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়ালো।

'রাজকুমার, কেমন আছো?' বৃদ্ধ বললেন।

'গুরুদেব, শুনলাম আপনি আমাকে খুঁজছেন!'

'হ্যাঁ, শুনলাম, তুমি নাকি এই দ্বীপে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তপস্যা করছ?'

'ঠিকই শুনেছেন গুরুদেব।'

'সে তপস্যার কতখানি অগ্রগতি হলো?'

'শহরের দুটো সৈন্য ছাউনি আমার সঙ্গে আছে, আমি সঙ্কেত করলেই তারা বিদ্রোহ করবে।'

'আর নৌবাহিনী?'

'তারা পিতৃস্বসার অধীনে। তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে না।'

'আর কার কাছ থেকে সহায়তা পাওয়া যেতে পারে?'

'নাগরিকদের একাংশ আমার সঙ্গে আছে। লড়াইয়ের ময়দানে তারা কতটা কার্যকর হবে, তা প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ বা অন্তর্ঘাতে নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। বনবাসী ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের সামরিক সাহায্য আমি পাব। বন্দরের শ্রমিকদের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, আশা করছি, তাদেরও সমর্থন পাওয়া যাবে। কিন্তু রাজপ্রাসাদের বর্তমান রক্ষীরা সবাই মহিষের বিশ্বস্ত। এরা সবাই মহিষের উপজাতির, মহিষকে সর্বশক্তিমান জ্ঞানে ভক্তি করে। এরকম সহস্রাধিক সৈনিক আছে প্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ জয় এই মুহূর্তে অসম্ভব।'

'তোমার পিতামহ মহীবলের ভাব নিয়ে জন্মেছো তুমি। সফল তুমি হবেই। মহাকালের ওপর ভরসা রাখো। তিনি শীঘ্রই তোমাকে সুযোগ করে দেবেন।'

'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।'

'প্রাসাদের খবর শুনেছো কি?'

'কোন খবর গুরুদেব?'

'গুপ্ত সংবাদ পেয়েছি, মহিষ তোমার পিতৃস্বসাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।'

'সেকি!' চমকে উঠল দিব্যবল, 'কেন, কী হল?'

'মায়াবলী ভেবেছিল, ধর্মত্যাগ করে, স্বজাতিদ্রোহ করে, মহিষের মহিষী হয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপ শাসন করবে। সে জানতো না, নারীর সম্মানের মূল্য কানাকড়িও নয় মহিষের কাছে। শোনা যাচ্ছে, ব্রহ্মারাজ্য পরিচালনার খুঁটিনাটি নিয়ে প্রায়শঃই মায়াবলীর সঙ্গে মহিষের মতবিরোধ হতো। এরকমই এক মতবিরোধের মুহূর্তে ক্রোধিত হয়ে মহিষ সে হতভাগিনীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করেছে।'

একটা দমকা বাতাস এসে মশালটাকে জোরে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। স্থানচ্যুত হয়ে গাছের কাণ্ডে ধাক্কা খেয়ে নিভে

গেল মশালের আলো। একরাশ আগুনের ফুলকি জ্বলতে জ্বলতে ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। মুহূর্তে অন্ধকার ধেয়ে এল চারপাশ থেকে। আকাশ ফাটিয়ে বিদ্যুতের রুপোলি রেখা ধেয়ে গেল ঊর্ধ্ব থেকে অধোমুখে। প্রকৃতির সম্মোহন চূর্ণ হলো নভোস্থলের আর্তনাদে। ক্রুদ্ধ সরীসৃপের আস্ফালনের মতো সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বইতে লাগলো হু-হু করে।

সুন্দরী জঙ্গলে হুল্লোড়। ঝড় আসছে ব্রঙ্গার মিশকালো সমুদ্রে।

ভুবনেশ্বরী মেঝের ওপর বিছিয়ে দিল বিরাট একটা চাদর। 'এই দ্যাখো— রাজপ্রাসাদের নকশা,' বলল ও।

'এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?' অবাক দুর্গা প্রশ্ন করল।

'রাজ-স্থপতির দপ্তরে,' বলল ভুবনেশ্বরী।

'রাজ-স্থপতির সঙ্গেও তোমার পরিচয় আছে?' হেসে বলল দুর্গা।

'না, তার সঙ্গে নয়,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'তার ভৃত্যের সঙ্গে পরিচয় আছে। তাছাড়া রাজ-স্থপতিকে বললে কি আর সে এ জিনিস আমাকে দিত? কিন্তু ভৃত্যকে বলতেই সে বার করে দিল। অবশ্য কিছু পারিতোষিক দিতে হয়েছে তাকে।'

'কত?' জিজ্ঞেস করল দুর্গা।

'পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রায় রফা হয়েছিল।'

'এত টাকা...'

'সে নিয়ে চিন্তা করো না,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আমার এক বন্ধু আছে— কমলা। সে টাকা দিয়েছে। ওর অনেক টাকা। ওর পরিবারের সপ্তডিঙ্গা ময়ূরপঙ্খী মলাক্কা পর্যন্ত যায়। আরও টাকা লাগলে তাও ওর কাছে পাওয়া যাবে।'

'জানো নিশ্চয়ই, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ,' বলল দুর্গা, 'তোমার এই বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায়?'

'নিশ্চিন্তে,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। তাছাড়া, মহিষকে ও মোটেই পছন্দ করে না।'

'যাই হোক, নকশাটা ভালো করে দেখা যাক,' বলল দুর্গা। 'হুঁ... সিংহদরজা, প্রাসাদ-প্রাচীর, সবই খাড়াই উঁচু, দুর্লঙ্ঘ্য, দেখেছো? তার ওপর ধাতব পাত দিয়ে মোড়া। বাইরে থেকে ভাঙা যাবে না। এর উল্টোদিকে খিড়কির দরজায় যেরকম কড়া পাহারা দেখলাম, সোজাসুজি নৌকা নিয়ে ওখান দিয়ে ঢুকতে গেলে আগেই জানাজানি হয়ে যাবে। কিছু একটা ভাবতে হবে এব্যাপারে। রাজপ্রাসাদের ভেতরেও তো অনেক সৈন্য, সেটা আরেকটা সমস্যা।'

'একটা মজার ব্যাপার খেয়াল করেছ,' বলল কালী, 'মাতলী নদীর একটা শাখা সোজা রাজপ্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে রাজপ্রাসাদটাকে।'

'এই ব্যাপারটা আমি শুনেছিলাম অনেককাল আগে,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'আগে রাজপ্রাসাদটা ছিল শুধু মাতলীর শাখার পূর্বদিকে। পশ্চিমদিকে ছিল জঙ্গল। মহারাজ মহীবল শাখানদীর ওপর সেতু বানিয়ে রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দিটাকে পশ্চিমদিকে বাড়িয়েছিলেন। প্রাসাদের প্রমোদ উদ্যান আছে ওদিকে, আর আছে অতিথিশালা। সেতুর ওপর খুব সন্দরভাবে মাটি ফেলে বাগান তৈরি করা হয়েছে। যে জানে না, সে বুঝতেই পারবে না, ওখানটায় নদী আছে।'

'সেই প্রমোদ-কানন ভেঙে ফেলে মহিষ ওখানে সৈন্য ছাউনি বানিয়েছে,' বলল কালী, 'বোঝাই যাচ্ছে, আর কেউ বাইশজন সৈন্য নিয়ে রাজপ্রাসাদ দখল করুক, সে পথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। আর সেজন্যই খিড়কির দরজাতেও কড়া পাহারা বসিয়েছে,' বলল কালী।

'তার মানে, তার মানে', দুর্গার চোখ উৎসাহে জ্বলে উঠল, 'ভুবনেশ্বরী, তোমার চেনা কেউ আছে, যে বিস্ফোটকের ব্যবহার জানে?'

খড়্গ দিয়ে লতাপাতার জাল ছিন্ন করতে করতে এগিয়ে চলেছে দুর্গা। সঙ্গে কালী। কানে ভেসে আসছে ঝড়ের গর্জন, সমুদ্রের গভীর নিস্বন। বাতাসে লোনা গন্ধ। মাতলী নদীর অববাহিকা থেকে আরও কিছুটা দক্ষিণে গেলে দিগন্তরেখা জুড়ে নজরে পড়ে অগুনতি পালতোলা নৌকা। প্রায় দু'ক্রোশ জায়গা জুড়ে গঙ্গানগরের সমুদ্র-বন্দর। নৌকা সারাইয়ের ঠুকঠাক ও মালবাহকদের হাঁকডাকে মুখরিত। সেখান থেকে সোজা পূর্বদিকে চলতে থাকলে কিছুকাল পর দেখা যায়, কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। জঙ্গল ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে। সঘন সে অটবি-ব্যূহের মধ্যে দিয়ে সমুদ্র স্থানে স্থানে হাত বাড়িয়েছে ডাঙার দিকে। সেইসব প্রণালীর ওপরে তৈরি হয়েছে বসতি। বন্দরের শ্রমিকরাই মূলত এখানে থাকে। প্রাচীন পাদপের ঘন

সারি দিয়ে ঘেরা প্রতিটি বাড়ি যেন একেকটি শান্তির নীড়। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে বসতবাটি, সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। সুন্দরী গাছের কাণ্ড দিয়ে তৈরি শক্ত কাঠামো, দরমার দেওয়াল। বর্ষায়, বন্যায়, ভরা কোটালেও এসব বাড়ি নিরাপদ থাকে। প্রতিটি বাড়িতে উঠোনের ওপর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি তুলসীমঞ্চ। উঠোনের ধার ধরে বাঁশের তৈরি পাত্রে মাটি ফেলে নানান ঔষধি গাছ-গাছালি লাগানো হয়েছে প্রতিটি উঠোনে। এরকমই একটি জল-বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো কালী। বাড়িটার ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সিঁড়ির কাঠগুলো ভাঙা। তুলসীমঞ্চ হেলে পড়ে আছে একদিকে। দরমার বেড়া খুলে কাত হয়ে ঝুলে পড়েছে জলের ওপর।

'দুর্গা', বলল কালী।

'উঁ', দুর্গার নজর জঙ্গলে দিকে, সেখান থেকে দৃষ্টি সরালো না ও।

'ওই বাড়িটার দিকে দ্যাখো,' বলল কালী।

দ্রুত বাড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল দুর্গা, 'হুঁ, কেউ ভাঙচুর করেছে।'

'চলো দেখে আসি।' বলল কালী।

'বাড়ির মধ্যে ঢুকবে?' অবাক হল দুর্গা, 'কার বাড়ি কে জানে!'

'আমার মন বলছে, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে এখানে,' বলল কালী, 'চলো, একটিবার দেখে আসি।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল দুর্গা। হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। যার সঙ্গে দেখা করার কথা, সূর্যাস্তের আগে সে এখানে এসে পৌঁছাবে না।

'চলো,' বলল দুর্গা।

লাফিয়ে ভাঙা সিঁড়ি টপকে উঠোনে উঠল ওরা। দরমার দরজা ঠেলে সন্তর্পণে ঢুকলো কালী, পেছনে দুর্গা। দুজনের হাতেই উদ্যত খড়্গ। ভেতরের দৃশ্যটা দেখে চমকে উঠল ওরা। ঘরের মাঝখানে নারকোল দড়ির খাটিয়া, তার ওপর সস্তা কাপড়ের জীর্ণ বিছানা পাতা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে সে বিছানা। বিছানায় পড়ে আছে একটি নারীদেহ, অচেতন। সে দেহের পাশে পড়ে আছে আরেকটি দেহ। সদ্যোজাত একটি শিশু।

'জাত' বলাটা কি ঠিক হবে? শিশুটি মৃত।

অচেতন মেয়েটির পাশে খাটের কোণে বসে আছে আরেকটি মেয়ে। অপূর্ব সন্দরী সে মেয়েটি। হাতে খল-নুড়ি, ঘন শ্যামলা গায়ের রঙে হালকা নীলচে আভা। একঢাল কালো চুল কাঁধে গড়িয়ে নেমেছে। সে চুল যাতে চোখের ওপর এলে না পড়ে, তারজন্য মাথার চারপাশে সোনালি কাপড়ের একটা ফেট্টি জড়ানো রয়েছে। বিছানায় শুয়ে থাকা অচেতন মেয়েটির শুশ্রূষা করছে। বিছানার ওপরে পড়ে আছে কাপড়ের পট্টক ও কাঁচি, একরাশ ঔষধি ও লতাপাতা। ঘরের কোণে মাটিতে একটি যুবক বসে আছে। দু-হাঁটুর মাঝে থুতনি। চোখদুটো স্থির, যেন মৃত মানুষের চোখ। সশস্ত্র কালী ও দুর্গাকে ঢুকতে দেখেও যুবকের কোনও ভাবান্তর হলো না। কিন্তু বিছানায় বসা মেয়েটি সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'কে তোমরা', শঙ্কিত গলায় বলল মেয়েটি।

'ভয় পেয়ো না বোন,' বলল কালী, 'এ হলো দুর্গা, আর আমি হলাম কালী। আমরা এইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখে মনে হল, বাড়িতে কিছু একটা বিপদ ঘটেছে, তাই...'

'যদি নিজেদের ভালো চাও, তবে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাও।' বলল মেয়েটি।

'নিজেদের ভালো যে আমরা চাই না বোন,' স্থির স্বরে বলল দুর্গা, 'এবার বলবে কি, এখানে কী হয়েছে?'

মেয়েটি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল ওদের দিকে। 'কে তোমরা?' জিজ্ঞেস করল, 'কোন বাড়ির মেয়ে?'

'আমরা গুরুকুলের মেয়ে,' বলল কালী।

'গুরুকুল? অক্ষুমুনির গুরুকুল?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তো সেখানে থেকেই বিদ্যার্জন করেছি,' অন্যমনস্ক ভাবে বলল মেয়েটি, 'কী যেন বললে তোমাদের নাম?'

'এ হলো দুর্গা, আর আমি কালী।'

'আমার নাম তারা,' বলল মেয়েটি, 'বসো এখানে। বলছি তোমাদের কী হয়েছে এখানে।'

কালী সন্তর্পণে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে খাটের পায়ার কাছে মাটিতে বসল। হাতের খড়্গ কোলের ওপর রেখে ওর পাশেই বসল দুর্গা। খলনুড়ি থেকে একটা কালচে সবুজ পদার্থ ধীরে ধীরে অচেতন মেয়েটির মুখে ঢেকে দিল তারা। তারপর এসে বসল কালীর পাশে।

'আমি বৈদ্য, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো,' বলল তারা, 'এই মেয়েটির স্বামী আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে। লোকটির অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে যতটুকু বুঝেছি, সেটা হল, মহিষাসুরের আদেশ অমান্য করে মেয়েটি প্রতি সন্ধ্যায় লুকিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতো। কোনওভাবে মহিষের সৈন্যদের কানে খবরটা পৌঁছায়। কাল সন্ধ্যেবেলা ওরা হাতেনাতে ধরে ফেলে মেয়েটিকে। বাড়ি ভাঙচুর করে। মেয়েটিকে, ওর স্বামীকে প্রচণ্ড মারধর করে। মেয়েটির পেটে লাথি মেরেছিল ওদের কেউ। ওর গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই...'

শুনতে শুনতে দুর্গার চোয়াল শক্ত হয়ে এল। খড়্গার বাঁট

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ঃ—

KALA SANGAM

Kolkata

আঁকড়ে ধরল দৃঢ়মুষ্টিতে, আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলো লাল হয়ে উঠল। কালী দেখলো, দরমার দেওয়াল ভাঙা ফোকর দিয়ে অস্তগামী সূর্যের আলো এসে পড়েছে অজাত শিশুটির মুখে। সন্বিত ফিরল কালীর। বাইরে বেরিয়ে দেখল, পূবের আকাশের নীল নিবিড় হতে শুরু করেছে। পশ্চিমাকাশে নানারঙের হিজিবিজি। সূর্যাস্তের কালখণ্ড সমাগত।

'দুর্গা', বলল কালী, 'যেতে হবে এখন। নাহলে...'

'হ্যাঁ,' উঠে দাঁড়ালো দুর্গা, দৃপ্ত কাঞ্চনবর্ণ ক্রোধের লাল আভায় জ্বলজ্বল করছে। তারার দিকে ফিরে বলল, 'এদের সহায়তা করতে এসেছ, তোমারও তো দেখছি প্রাণের মায়া নেই। ভালোই হলো। তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি দরকার আছে। আগামীকাল সূর্যাস্তের পর একবার দেখা হতে পারে কি?'

চৌমাথার মোড়ে ব্যাঘ্রস্তম্ভ। তার পাশেই বিরাট একটা মাঠ। প্রতি বৃহস্পতিবার হাট বসে এখানে। ব্রঙ্গার গ্রাম-শহর থেকে বিক্রেতারা আসে পশরা নিয়ে। ক্রেতারা আসে সমগ্র জম্বুদ্বীপ থেকে। চাল-ডাল ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্য অঢেল বিক্রি হয় এখানে। বিক্রি হয় মসলাপাতি। প্রদর্শিত হয় নানা শিল্পকর্ম। পাট বেত পোড়ামাটি থেকে শুরু করে সোনা, রুপো, তামার নানান মনোহারি কারুশিল্প। পিতলের ডোকরার কাজ। বিক্রি হয় অস্ত্র ও যন্ত্রাদি। ব্রঙ্গাহৃদিদের কারিগরী বিদ্যার খ্যাতি পৃথিবীজোড়া। হাট শেষে পণ্য বোঝাই হয় নৌকায়। রওনা হয় বিশ্বের নানান বন্দরের উদ্দেশ্যে। আগত ক্রেতা-বিক্রেতাদের মনোরঞ্জনের নানারকমের ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। মুখরোচক খাবারের অঢেল সম্ভারের গন্ধে আমোদিত হয়ে থাকে হট্টমেলার বাতাস। বাজিকররা খেলা দেখায় স্থানে স্থানে। ঘোড়ার খেলা, হাতির খেলা, সাপের খেলা, বাঘ-ভল্লুক-সিংহের খেলা। তিরন্দাজি, ছোরাবাজি, তলোয়ারবাজি, হাতসাফাই।

মাঠের ঠিক কেন্দ্রে বৃহৎ এক কাষ্ঠনির্মিত পেটিকার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে উচ্চঃস্বরে ভাষণ দিচ্ছিল একটি লোক। দূর থেকে লোকটিকে ভীষণ চেনা-চেনা ঠেকলো দুর্গার। সেই তাপ্পিমারা আলখাল্লা, থুতনির ওপর চাপদাড়ি, সেই মহিষ করোটির শিরস্ত্রাণ, কালিমালিপ্ত চোখদুটির কোণে লুক্কায়িত সেই একই ভাব— বুভুক্ষা ও ক্রূরতা। ঠিক যেন গঙ্গার পাড়ের সেই অসু-উপাসক। কিন্তু তাকে তো... এ তবে কে? দুর্গা শুনতে পেল, লোকটি বলছে, 'ভাইসকল, বিদ্যাধরীর উত্তরে কদলীপত্র গ্রামে আমার বাস। সেই গ্রামের অষ্টভুজা শক্তিমাতার মন্দিরের কথা কে না শুনেছে। আমার পূর্বজ সবাই বংশ পরম্পরায় ভুবনখ্যাত সেই মন্দিরের পূজারি। আমিও হয়তো তাই হতাম। কিন্তু মহান অসুর অসীম কৃপা, আমার হাতে একদিন এসে পড়ল কৃসুণ্ডপুরাণ নামক একটি ধর্মগ্রন্থ। দেখলাম, মাতৃ-উপাসকদের রচিত সেই পুরাণের ছত্রে ছত্রে লুক্কায়িত রয়েছে মাতৃ-উপাসনার অবাস্তবতা ও ব্যভিচারের উদাহরণ। আবার সেই পুস্তকের মধ্যেই আমি খুঁজে পেয়েছি এই দুনিয়ার প্রভু অসুর শ্রেষ্ঠত্বের অকাট্য প্রমাণ। যে পুষ্পের সৌরভে সমগ্র জম্বুদ্বীপ মাতোয়ারা, আমাদের প্রভু সেই মহিষাসুরের আগমনবার্তা, তার ভবিষ্যদ্‌বাণীও পেয়েছি সেই কৃসুণ্ডপুরাণে। তাই আমি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি আমার কদলীপত্র গ্রামের যাবতীয় পৈতৃক সম্পত্তি। অষ্টভুজার মন্দিরের পুরোহিতবৃত্তির লোভও আমি আনন্দের সঙ্গে ত্যাগ করেছি। ঘরসংসার ত্যাগ করে বেড়িয়েছি অসুধর্ম প্রচার করতে। ভাইসব, সময় এসেছে, আপনারাও...'

'কে এই লোকটি? চেনো নাকি একে?' ধীর পদক্ষেপে সেই জমায়েত থেকে দূরে সরে আসতে আসতে প্রশ্ন করল দুর্গা।

'এদেরকে বলে রক্তবীজ,' বলল ভুবনেশ্বরী, 'মহিষাসুর এদের নিয়োগ করেছে দেশজুড়ে অসুধর্ম প্রচার করতে। দুনিয়ায় যতরকমের মিথ্যে হয়, সেসব এরা বানিয়ে বলে লোকেদের অসুধর্ম গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ করে। এরা যত না অসুর প্রশংসা করে, তার চেয়ে বেশি করে অন্য ধর্মের নিন্দা। কেউ যদি তাতে ক্ষেপে গিয়ে কোনও রক্তবীজকে মারধর করে, অমনি মহিষাসুর সেই অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে গ্রামকে গ্রাম শ্মশান করে দেয়।'

'ভারী অদ্ভুত কায়দা তো,' বলল দুর্গা, 'আর এই কৃসুণ্ডপুরাণ ব্যাপারটা কী? লেখাপড়ায় আমি খারাপ নই, পুরাণ অনেকেই পড়েছি। কিন্তু কৃসুণ্ডপুরাণ পড়া তো দূরস্থান, নামটাই কখনও শুনিনি।'

'মহিষাসুরের নির্দেশে বেশ কিছু নতুন পুরাণ লেখা হয়েছে, কৃসুণ্ডপুরাণ তাদেরই একটা। ভাষা ও আঙ্গিকে এগুলো আসল পুরাণের মতোই। কিন্তু এগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য অসুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা, সঙ্গে নানা উপাসনাপদ্ধতিগুলিকে ব্যাভিচারী হিসেবে দেখানো। এইসব তথাকথিত পুরাণ পড়ে সত্যি বলে বিশ্বাস করে জম্বুদ্বীপের প্রকৃতিপূজকদের মতামত সব গুলিয়ে যাচ্ছে। নিজের ধর্মকে ঘৃণা করতে শুরু করছে, অসুবাদকে গ্রহণ করছে পরম আগ্রহে।'

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পড়েছিল শেষপ্রান্তে। সেখানে একটি বটগাছের তলায় এক বাজিকর খেলা দেখাচ্ছিল। একটি ছোট্ট ছেলে একটা টাটুঘোড়ায় চড়ে এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। যেতে যেতে আকাশে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা করে লেবু। বাজিকর নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করছে লেবুটাকে। কোনওবার ছুরি দিয়ে, কোনওবার তির দিয়ে, কোনওবার আবার গুলতি দিয়ে। প্রচণ্ড দ্রুততায় তির-ধনুক তুলে নিচ্ছে, তির ছুঁড়েই পরমুহূর্তে তুলে নিচ্ছে ছুরি বা গুলতি। মুহুর্মুহু হাততালি পড়ছে। হঠাৎ দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা গেল, ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসছে জনাদশেক সৈন্য, সবার মাথায় মোষের করোটির মুকুট। তাদেরই একজন জাপটে ধরল বাজিকরকে, হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। ভয়ে পালাতে লাগলো দর্শকরা।

'এ একি! কী অপরাধ করেছি আমি!' কাতরোক্তি করে উঠল বাজিকর।

'গত রবিবার সন্ধ্যেবেলা তুমি কী করছিলে?' জিজ্ঞেস করল সৈন্যদের দলপতি।

'আমি... আমি তো আমার বাসায় ছিলাম।'

'মিথ্যে কথা। ওদিন তুমি শহরের উপকণ্ঠে রাজসৈন্যদের আক্রমণ করেছিলে। ঠিক কিনা?'

'বিশ্বাস করুন, হুজুর, সে আমি নই, আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও জানি না।'

'একটা মেয়ে এখানে বাঘ-সিংহর খেলা দেখাতো। খুব লম্বা-চওড়া একটা মেয়ে। সে আজ কোথায় আছে?'

'বাঘ-সিংহর নয় হুজুর, শুধু বাঘের খেলা। সে কোথায় আছে জানি না হুজুর! আমি তাকে কতটুকুই বা চিনি!'

'আবার মিথ্যা কথা!'

সৈন্যরা ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাজিকরকে মাটিতে ঠেলে ফেলে দিল। ভয়ে চোখ বুজে ফেলার আগে দেখলো বাজিকর, উদ্যত তরোয়াল নেমে আসছে ওর ওপর।

'অঁক্' একটা শব্দ হল। চিৎকার করারও সুযোগ পেল না সৈন্য দলপতি, মাটিতে ঢলে পড়ল। দুর্গা দেখলো, দলপতির গলায় বিঁধে আছে একবিঘত লম্বা একটা কালো তির। সচকিত হয়ে অন্য সৈন্যরা কোমর থেকে তরোয়াল খুলে অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। যেন কোনও জাদুমন্ত্রে একঝাঁক কালো তির বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ল আকাশ থেকে। প্রতিটা তির নির্ভুল লক্ষ্যে সৈন্যদের কণ্ঠা বিদ্ধ করল। আর্তনাদ করারও সুযোগ পেল না কেউ। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। যে ক'জন দর্শক তখনও দাঁড়িয়েছিল, দৌড়ে পালালো। বাজিকর ও তার সঙ্গীও পালালো জায়গাটা ছেড়ে। ভুবনেশ্বরী দৌড়ে যাচ্ছিল বাজিকরকে আটকাতে, বাধা দিল দুর্গা।

'ও চলে গেলে ওকে আর পাওয়া যাবে না', বলল ভুবনেশ্বরী।

'দরকার নেই ওকে,' বলল দুর্গা, 'আমাদের দরকার ওই অদৃশ্য তিরন্দাজকে। এত ক্ষুদ্রকায় তির দিয়ে এত দূর থেকে এমন নির্ভুল ভাবে যে লক্ষ্যভেদ করতে পারে, তার মতো তিরন্দাজ ভূ-ভারতে বোধকরি আর দুটো নেই। চলো, খুঁজে বার করি লোকটাকে। আমার আন্দাজ, দক্ষিণের ওই গাছগুলোর কোনও একটায় চড়ে বসে আছে লোকটা।'

বিকেলের আলোর পরশ এখনও লেগে আছে নারকেল গাছগুলোর মাথায়। তাদের ঝাঁকড়া চুলে, তাদের ছুরির ফলার মতো পাতার পিঠে, এবড়ো-খেবড়ো কাণ্ডের খাঁজে সোনার টুকরো লেগে আছে এখনও।

ওধারে সমুদ্র, এধারে খাঁড়ি। মাঝে একফালি জমিতে সারবন্দি নারকেল গাছ। জোয়ারের সময় খাঁড়ি ভরে ওঠে। ভাটার সময় সে জল সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দেয় গাছগুলো। জলধারার দল তখন গাছের এপাশ-ওপাশ দিয়ে পথ খোঁজে। সেরকমই একটি জলধারার পাশে, একটি বাজ-পড়া নারকেল গাছের তলায় বসে আছে দুর্গা, কালী, ভুবনেশ্বরী। আরও দুটি মেয়ে আছে ওদের সঙ্গে। একজন অস্বাভাবিক রকমের লম্বা, সেরকমই অস্বাভাবিক বলিষ্ঠ গড়ন। হাতে বিশাল এক রণকুঠার। মেয়েটির পেশীবহুল হাতে সে রণকুঠার মানিয়েছে ভালো। অন্য মেয়েটি লম্বায় সাধারণ হলেও বেশ বলিষ্ঠ তার গড়ন। সোনার মতো গায়ের রঙ, তেজদীপ্ত মুখমণ্ডল। পরনে হলুদ বস্ত্র।

'সংখ্যায় আমরা কম,' লম্বা মেয়েটি বলল, 'তাই সোজাসুজি লড়াইয়ে জেতা অসম্ভব। এটাই একমাত্র পথ।'

'ভৈরবী,' মেয়েটিকে বলল দুর্গা, 'এই পরিকল্পনার আরও একটা লাভ আছে।'

'কী সেটা?' জিজ্ঞেস করল ভৈরবী।

'মহিষের সৈন্যদের সবাইকে মেরে ফেলা সম্ভব নয়। কিছু সৈন্য তো পালিয়ে বাঁচবেই। তাদের ব্রহ্মায় ফিরে আসা আটকাতে হবে।'

'কীভাবে?'

‘এই পরিকল্পনার মূল লাভ, ওদের ভয় দেখানো যাবে,’ বলল দুর্গা, ‘যাতে আর কোনওদিনও ওরা ব্রহ্মার ধারেকাছে আসার সাহস না পায়। ব্রহ্মা-ভীতি যেন বংশ-পরম্পরায় ওদের তাড়া করে বেড়ায়।’

খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠল অন্য মেয়েটি।

‘হাসছো কেন?’ প্রশ্ন দুর্গার।

‘ভাবছি, মহিষের লোকজন যখন তাদের রাজ্যে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মার জাদুটোনা, ভূতপ্রেত আর বাঘ-সিংহরূপী অপচ্ছায়াদের গল্প করবে, তখন ওদের মুখগুলো কেমন দেখাবে।’

‘বগলামুখী’, বলল দুর্গা, ‘তোমার ওপর কিন্তু খুব বড় দায়িত্ব রইল। আমাদের সবার প্রাণ এখন তোমার হাতে।’

‘মনে থাকবে। কাউকে মুখ খুলতে দেবো না সে রাতে। টুঁ-শব্দটি করতে দেব না। আমার বাবা ব্রহ্মার শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর ছিলেন। আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যা। তিরন্দাজীতেও আমার মোকাবিলা করার মতো কেউ নেই ওই রাজপ্রাসাদে।’

বিড়বিড় করে বলল ভৈরবী, ‘আসছি আমরা, পারলে সামলা।’

‘কিছু বললে?’ প্রশ্ন দুর্গার।

‘না, কিছু না,’— বলল ভৈরবী, ‘সামনের ক’টা দিন খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের সবাইকে। আর মনে রাখতে হবে, ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।’

অনেক পাখি দেখা যায় এখানে। বিশেষ করে এই সময়ে। বিকেলবেলায়।

চারিদিকে ঘন জঙ্গলের মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জলা, সমুদ্রের খাঁড়ির অংশ। তারই মাঝে ছোট্ট একটা গ্রাম। মাত্র সাতটা পরিবারের বাস এখানে, তারা সবাই পেশায় জেলে। শহরের মাৎস্যন্যায়ের আঁচ এখনও এখানে এসে পৌঁছায়নি। মানুষ-পাখি-গিরগিটি-পতঙ্গ-গাছপালা সবাই বেশ মিলেমিশে রয়েছে। চারিদিকে শান্তি, কোনও তাড়া নেই কারোর। গা-ছমছমে হিজিবিজি শিকড়ের দঙ্গল, তিমির-সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে জলতল জুড়ে। তার ঠিক পাশেই তালপাতায় ছাওয়া ছোট্ট একটা পর্ণকুটির। কুটিরের সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্রের লোনা বাতাসে শুঁটকি মাছের তীব্র গন্ধ। বারান্দায় শীতলপাটির ওপর তিনজন মানুষ বসে আছে। প্রথমজনের গাত্রবর্ণ অত্যধিক ফর্সা। জম্বুদ্বীপে এত ফর্সা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। সারা গায়ে ছাই মেখে সে বর্ণ প্রেতগাত্রের রূপ নিয়েছে। মাথাভর্তি জটা, সে জটার চুড়োয় জড়ানো রুদ্রাক্ষের মালা। গলা ও হাতেও রুদ্রাক্ষের মালা। পরনে ব্যাঘ্রচর্ম। দ্বিতীয় ব্যক্তি যেন প্রথমজনের সাক্ষাৎ বিপরীত। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এতটাই কালো যে চট করে দেখে মনে হয় গায়ের রং ঘন নীল। সুবিন্যস্ত লম্বা চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। চুড়োয় গোঁজা ময়ূরের পালক। কণ্ঠে তুলসীর মালা। উপবীত। পরনে হলুদ রেশম বস্ত্র। দু’জনেই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি। তৃতীয়জনের গায়ের রঙ তামাটে, পরনে শ্বেতবস্ত্র। তুলনায় খর্বাকৃতি, রোগা। সাদা লম্বা চুল, লম্বা সাদা দাড়ি।

‘শুঁটকির গন্ধে কি খুব অসুবিধা হচ্ছে, মুনিবর?’ প্রশ্ন প্রথম ব্যক্তির।

‘আপনি বোধহয় আমার কথায় খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন না, তাই না রুদ্র?’ তৃতীয় ব্যক্তি দৃশ্যতই কিছুটা অসহিষ্ণু।

‘গুরুত্ব কেন দেব না, মুনিবর?’ জবাব রুদ্রর, ‘কিন্তু একদিকে মহিষ, অন্যদিকে এগারোজন মেয়ে, তাদের অধিকাংশই বয়ঃসন্ধির। যাদের কারোর যুদ্ধবিদ্যা বা রাজনীতিতে কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। এ তো আত্মহত্যার শামিল!’

‘আপনি তবে বিশ্বাস করছেন না, এই দুর্গা মেয়েটির মধ্যে অভাবনীয় কিছু আছে?’

‘কেন বিশ্বাস করব না?’ রুদ্র বললেন, ‘কিন্তু মনে হয় না, এই মুহূর্তে কারোর পক্ষেই মহিষকে পরাজিত করা সম্ভব।’

‘আমি রুদ্রর সঙ্গে একমত,’ বললেন দ্বিতীয়জন, ‘আবহমানকাল থেকে আমার সংগঠন ভারতীয় সমাজে শুভশক্তির বিকাশ ঘটানোর দায়িত্ব পালন করে এসেছে। যাতে সেখানে অশুভ শক্তির আবির্ভাব না হয়। কিন্তু আমরা শত চেষ্টাতেও মূর্তিমান অশুভ এই মহিষের জন্ম বা অগ্রগতি রোধ করতে পারিনি।’

‘আর আমার সংগঠনের দায়িত্ব,’ বললেন রুদ্র, ‘ভারতীয় সমাজে অশুভ শক্তির জন্ম হলে সে শক্তিকে চিহ্নিত করা ও তার বিনাশ ঘটানো। কিন্তু আমরাও তো মহিষকে সময়মতো চিহ্নিত করতে পারিনি, দমন করতে পারিনি। আদিযোগী শঙ্করের কাছে এজন্য আমি দণ্ডার্হ!’

‘শুধু আমরা দু’জনেই নয়,’ বললেন হরি, ‘সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ আদি এদেশের প্রকৃতি-উপাসক প্রত্যেক সম্প্রদায় আলাদা আলাদা ভাবে মহিষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

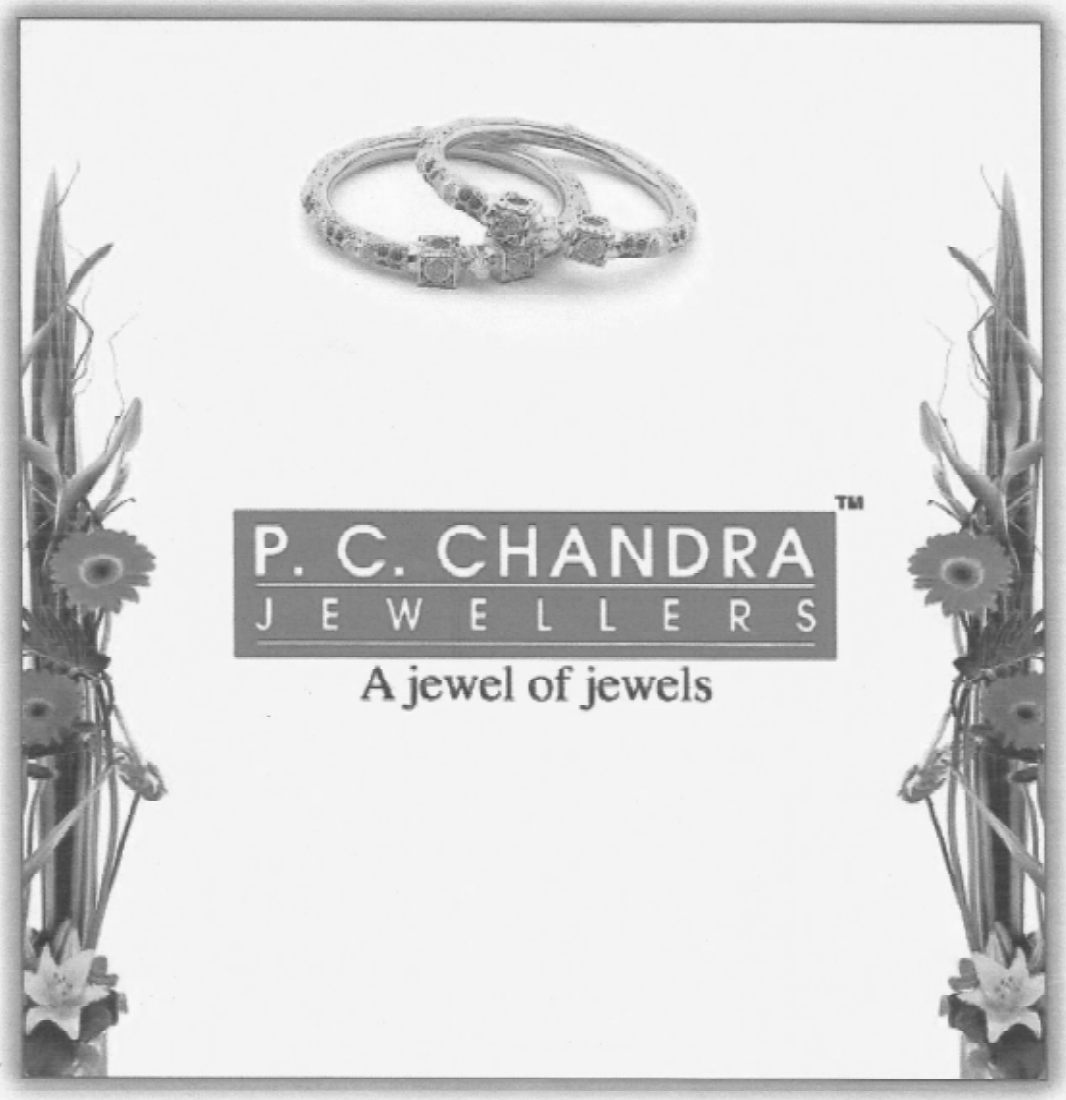

Kolkata Showrooms:Bowbazar:2227272;Gariahat :24618680; Chowringhee:22238062; Golpark : 24645370 ; Ultadanga :23554747; Barasat :25843093; Serampore :26526413; Behala :23970204; Howrah:9836211515.Baruipur: 8336923180,Hatibagan: 25330207, Sodepur: 25655251, Newtown: 25722016.
West Bengal Showrooms : Asansol :[0341]2274-331; Siliguri:[0353]2532194; Malda [03512] 256558; Burdwan :[0342]2569652; Midnapore:[03222]261996; Behrampore: [03482]259066 ; Cooch Bihar :[03582]228301; Durgapur :[0343]2588121 Chandan Nagar :26858581;Tamluk:[03228]266525; Kanchrapara:25854417 ; KrishnaNagar: [0347] 2223109,Raigunj: 0352 3244076, Jamshedpur:0657 2222126,Siuri: 07797401111,Katoa: 07407305555,Bankura: 0324 2259929, Purulia : 6294743189
Other States Showrooms :Delhi: [011]40616364; Bangaluru :[080] 49344444 Bhubaneshwar [0674] 2380888; Agartala:[0381]2326666.,Noida : 0120 4102516 Mumbai : 022 26406030.

কেউ মহিষকে হারাতে পারেনি। সে তো আপনি জানেন।'

অন্যমনস্ক অক্ষুমুনি তাকালেন জলের দিকে। গাছগুলোর শিকড় নেমে এসেছে জল পর্যন্ত, ছায়া-ছায়া অন্ধকার তৈরি করেছে জলের ধার ধরে। কত নাম-না-জানা পতঙ্গ ও মাছের বাস ওই ছায়াঘন স্থানগুলিতে।

'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন,' বললেন অক্ষুমুনি, 'হয়তো সেখানেই আপনাদের ভুল। আপনারা আলাদা আলাদা ভাবে লড়েছেন মহিষের বিরুদ্ধে। হয়তো দরকার ছিল, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব ও সব দেবগনের শক্তিকে সংহত করে একযোগে মহিষের বিরুদ্ধে লড়াই করা।'

'তা সম্ভব নয়,' বললেন রুদ্র, 'শিব ও বিষ্ণুর শক্তি বিপরীতধর্মী। আমাদের সংগঠনের চরিত্র ও প্রবৃত্তি ভিন্ন। আমি বিষ্ণুর সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে পারি না, হরিও পারে না আমার সংগঠনকে নেতৃত্ব দিতে। যদি তা চেষ্টা করি, তবে সমাজের মধ্যে যে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হবে, তাতে গোটা সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

জলের ওপর ঝুলন্ত শিকড়ে চড়ে একটা গিরগিটি আরামে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। নীচে জলে অনেক মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে ঘাই মারছে, জলে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠছে। মন বড্ড খারাপ আজ। মৃন্ময়ীর মৃত্যুটাকে কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলেন না অক্ষুমুনি। বারবার মেয়েটার মুখটা ভেসে উঠছে চোখের ওপর। সন্তানস্নেহে তিলে তিলে গড়ে তোলার পর তার এমন পরিণতি... আজও জানেন না অক্ষুমুনি, যেদিন মৃন্ময়ীর বাবা-মা'র সঙ্গে দেখা হবে, সেদিন কী বলবেন তাদের।

'সারাক্ষণ যেন টুংটাং ঘন্টি বাজছে কোথাও,' হঠাৎ প্রশ্ন অক্ষুমুনির, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'পাখির ডাক,' বললেন বিষ্ণু, 'ওই দেখুন, পাখিটা।'

অক্ষুমুনি দেখলেন, ছোট্ট একটা পাখি, ঘন পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। ঘন নীল বর্ণ, উজ্জ্বল কমলা রঙের লেজ। মাঝেমাঝেই ইতিউতি উড়ছে। এক ডাল ছেড়ে অন্য ডালে গিয়ে বসছে দুরন্ত ক্ষিপ্রতায়। এতটাই ক্ষিপ্র যে প্রায়-অদৃশ্য হয়ে গেছে ওর আনাগোনা।

'পাখিটা যে এত সুন্দর উড়ছে,' বললেন অক্ষুমুনি, 'তাতে তো পাখির গোটা শরীরই একযোগে কাজ করছে, তাই না? ডানাজোড়া যদি ভাবতো, আগে লেজ চেষ্টা করে নিক, তারপর আমি চেষ্টা করব, তাহলে পাখিটা কি কোনওদিনও উড়তে পারতো?'

'আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না মুনিবর', বললেন রুদ্র, 'কিন্তু মহিষের যুদ্ধে বারবার পরাজয়ে দেবতারা এখন হতোদ্যম। আরেকটি পরাজয় তাদের অস্তিত্বের সংকট তৈরি করবে। এই মুহূর্তে মহিষ অপরাজেয়। তাকে হারানোর সঠিক পন্থা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অনুগ্রহ করে একটু ধৈর্য ধরুন।'

'তবে আর কী? আপনারা আপনাদের মতো চেষ্টা করুন, ওরা ওদের মতো চেষ্টা করুক। মহিষের হাতে সবচেয়ে বেশি সম্মানহানি হয়েছে নারীদেরই। তাই মহিষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের লড়াইটাও ওরাই করুক। কে বলতে পারে, মহাকালের হয়তো সেটাই ইচ্ছা। যাই আমি, সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় বয়ে গেল। প্রণাম!'

শীতলপাটির আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন অক্ষুমুনি। উঠোন থেকে নেমে এগিয়ে গেলেন পাড়ে অপেক্ষারত ছোট্ট ডিঙি-নৌকাটির দিকে। ওঁর চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হরি ও রুদ্র চুপচাপ বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

সূর্য ঢলছে, হলুদ থেকে কমলা হচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া নেমে আসছে গাছের ডালে। কিচিরমিচিরে কানে তালা ধরে যায়। জেলে পরিবারগুলো একে একে মাছ ধরে ফিরছে। তাদের ভাটিয়ালি সুরে প্রকৃতি-বন্দনা সন্ধ্যার আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। ঠাণ্ডা বাতাসে বিদেহী হাতের পরশ। বিস্মৃত জন্মের অন্তরাল সরিয়ে ভিড় করছে অজস্র অশরীরী। গাছের ফাঁকের জমাট অন্ধকারে বেগুনি কুয়াশার লুকোচুরিতে কাদের যেন ফিসফিস। ওরা কারা? ওরা কি এখানেই থাকতো, অনেক অনেকদিন আগে? লক্ষ দু-লক্ষ বছর আগে? শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হলেও আত্মা ওদের এখনও এই জল-জঙ্গলের মায়ায় আবিষ্ট। ওরা কি পূর্বজ? এই জম্বুদ্বীপের প্রথম সভ্য মানব? যারা প্রথম আগুন জ্বেলেছিল? চাকা বানিয়েছিল? গণিত আবিষ্কার করেছিল? বুক দিয়ে আড়াল করে বাঁচিয়েছিল এই সমাজটাকে, আদিম উন্মত্ত পৃথিবীর প্রতিটি আক্রমণ থেকে? প্রতিপদে ভয়কে জয় করে জীবনের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল যুগ থেকে যুগান্তরে?

ওঁরা কি কিছু বলতে চাইছেন?

বাতাসে অরণ্যের গন্ধ। অনেক মায়া সেই সোঁদা বাতাসে।

ক'দিন পরের কথা। রুপোর থালার মতো চাঁদ উঠেছে দিগন্তরেখার ওপরে। রুপোলি আলোয় ঝলমল করছে

গঙ্গানগর। ঝলমল করছে ব্রঙ্গার সুন্দরবন। প্রাসাদশীর্ষ থেকে দু'চোখ ভরে সেই দৃশ্যই দেখছিল সেনাপতি চিক্ষুষ। কাঠখোট্টা মানুষ সে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে কোনওকালেই আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ব্রঙ্গায় আসার পর থেকে সবকিছু কেমন যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। মাটি তার নিজের মতো করে বদলে নেয় মানুষকে। এমনকি, আক্রমণকারীকেও। সবাইকে নয়, তবে কাউকে কাউকে। চন্দ্রালোকের সৌন্দর্যসুধা উপভোগ করতে করতে মদিরার ভৃঙ্গারে চুমুক দিচ্ছিল চিক্ষুষ আর ভাবছিল, কী যে এক আশ্চর্য মদিরা বানায় এই স্থানীয়রা, ভূ-ভারতে এর জুড়ি মেলা ভার। তণ্ডুলজাত এই তরল জলবৎ স্বচ্ছ, অথচ ধমনীতে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিস্রোতের ন্যায়। চন্দ্রালোককল্প এই মদিরার মাত্র এক ভৃঙ্গারই ভূমানন্দের অনুভূতি জাগায়। ভুলিয়ে দেয় জগৎসংসার।

'অসুর জয় হোক!' দরজার কাছ থেকে কে যেন বলল।

'কে? ও, বিলোচন। এত রাতে, কী ব্যাপার?'

'আজ্ঞে, একটা সমস্যা ঘটেছে।'

'কী সেটা?' চিক্ষুষ বলল।

'আজ বহুদিন পরে নগরের প্রতিটি গৃহে তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বলতে দেখা যাচ্ছে।'

'তুলসীতলায় প্রদীপ! ক'টা গৃহে?'

'আজ্ঞে, বলললাম যে, সবকটি গৃহে।'

'বলছো কী! তোমার কোনও ভুল হয়নি তো?'

'আজ্ঞে, ভুল হয়নি।'

'বৃক্ষপূজা! নগরবাসীদের সকলের কি একসঙ্গে ভীমরতি হয়েছে? তারা কি মহিষাসুরের আজ্ঞা ভুলে গেছে?'

'আজ্ঞে, শুধু তাই নয়, নাগরিকরা স্থানে স্থানে মিছিল বার করেছে। হাতে তাদের অস্ত্রশস্ত্র, মশাল, নরকরোটি। হাবভাব দেখে তো মনে হচ্ছে, নগরবাসীরা বিদ্রোহ করবে ঠিক করেছে।'

'বিদ্রোহ, করাচ্ছি। যাও, প্রাসাদের ছাউনি থেকে পাঁচশত সৈন্য নিয়ে এক্ষুনি নগরে ছড়িয়ে পড়ো। প্রতিটি প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে, প্রতিটি নাগরিককে রাজপথ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসবে।'

'যথা আজ্ঞা সেনাপতি।'

বিলোচন চলে গেলে পাশ থেকে মদিরার ভৃঙ্গারটি আবার তুলে নিল চিক্ষুষ। পুনরায় ডুবে গেল মায়াবী চন্দ্রালোকের সৌন্দর্যসুধায়।

অপার্থিব বনজ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে দশদিক। জঙ্গলের মধ্যে একদল শৃগাল রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করল এইমাত্র। রাজপ্রাসাদের খিড়কির ঘাট দিয়ে একটু আগেই প্রতি রাতের নিয়মমতো দশ সিন্দুক ধনরত্ন পাচার হয়েছে। বাকি রাতে আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। প্রহরীরা নিরুদ্বিগ্ন মেজাজে তাই একটু ঝিমিয়ে নিচ্ছিল। নারীকণ্ঠের কান্নার আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল। দেখল, একটি নৌকা ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। সে নৌকায় বসে আছে একাকি একটি মেয়ে। চাদরে মুখ ঢাকা, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মুহূর্তে দশজন প্রহরীর দশটা বর্শা উদ্যত হলো নৌকাটির দিকে।

'কে ওখানে?' হাঁক দিল প্রহরীদের দলপতি।

'আমি ষোড়শী!' কান্নাভেজা গলায় উত্তর ভেসে এল নৌকা থেকে। সেই কণ্ঠস্বর শুনেই সৈন্যদের হৃদ্‌স্পন্দন নিমেষে দ্বিগুণ হয়ে গেল। কে এই মেয়ে? কার এত সুন্দর কণ্ঠস্বর?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। মাথার ওপর জড়ানো চাদরটা আলগা করে ফেলে দিল। নিটোল গোলাকার চাঁদের রুপোলি আলোর সবটুকু এসে পড়ল মেয়েটির মুখে। গলা শুকিয়ে গেল প্রহরী দলপতির। জগতের সব নারীর সব সৌন্দর্য এক করে যেন তৈরি করা হয়েছে মেয়েটিকে। দলপতির শিরায় শিরায় ছুটলো আগুনের বন্যা। প্রায় দৌড়ে জলে নেমে নৌকাটিকে ঘাটে ভেড়ালো সে। হাত ধরে মেয়েটিকে নৌকা থেকে নামিয়ে আনলো। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র একটা মিষ্টি গন্ধে মাতাল হয়ে উঠল দলপতি সহ প্রতিটি সৈন্যর শরীর-মন।

'সর্দার,' ফিসফিস করে বলল এক রক্ষী, 'এ মেয়েকে মহিষাসুরের কাছে ভেট দিলে অনেক বকশিস পাওয়া যাবে।'

'চুলোয় যাক বকশিস, আর গোল্লায় যাক মহিষাসুর।' চাপা গলায় গর্জে উঠল দলপতি, 'এ মেয়েকে না পেলে জীবনই বৃথা।'

মাতাল-করা গন্ধটা অবশ করে দিচ্ছিল প্রহরীদের অনুভূতিগুলোকে। বোধবুদ্ধি লোপ পাইয়ে দিচ্ছিল। চেষ্টা করেও সেটা আটকাতে পারছিল না কেউ।

'তুমি একাই... সর্দার? আর আমরা কি এখানে শুধু বসে থাকবো?' বলল আরেকজন রক্ষী।

'খবরদার!' চিৎকার করে উঠল দলপতি, 'এ মেয়ে শুধু

আমার।' এই কথা বলেই সে আচমকা গদা তুলে সেই রক্ষীর মাথায় বসিয়ে দিল। ব্রহ্মতালু ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল। তাই দেখে অন্য রক্ষীরা আক্রমণ করল দলপতিকে। দেখতে দেখতে ধুন্ধুমার বেধে গেল। দলপতির গায়ে অসম্ভব শক্তি। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, সে একাই টিকে আছে, বাকি রক্ষীরা ভূমিশয্যা নিয়েছে।

'চলো সুন্দরী, আর তর সইছে না।' এই বলে মেয়েটির কবজি আঁকড়ে ধরল দলপতি।

হঠাৎ চাঁদের ওপর একটা কালো ছায়া প্রবেশ করল। জ্যোৎস্নার ফিনিক-ফোটা আলো ম্লান হয়ে গেল নিমেষে। চন্দ্রগ্রহণ শুরু হয়েছে।

'দাঁড়াও।' কঠোর গলায় বলল মেয়েটি, 'আমি তোমার সঙ্গে আদৌ যেতে চাই কিনা, সেটা তো জিজ্ঞেস করলে না?'

'তুমি নারী, তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছার আবার দাম কী! চলো আমার সঙ্গে! নাহলে এখানেই প্রকাশ্যে তোমাকে সম্ভোগ করব।'

'তাই নাকি?' কে যেন বলল পেছন থেকে।

'কে!' চমকে পেছন ফিরে তাকালো দলপতি। দেখল, যেন কোনও মন্ত্রবলে আরেকটি মেয়ে আবির্ভূত হয়েছে সেখানে। বলিষ্ঠ গড়ন, তেজদীপ্ত মুখমণ্ডল, সোনার মতো গায়ের রঙ, পরনে হলুদ রঙা বস্ত্র। যেন একটুকরো সূর্য আবিভূত হয়েছে মাতলীর ঘাটে। চিৎকার করার সুযোগ পেল না সর্দার। মুহূর্তে মেয়েটি এগিয়ে এসে বাঁ-হাত দিয়ে দলপতির জিভ টেনে ধরল। ডান হাতের এক ঝাঁকুনিতে কবজির ভেতর লুকোনো মুগুরটা বেরিয়ে এল, সেটা ধড়াম করে এসে পড়ল প্রহরী দলপতির মাথায়। ছেঁড়া জিভটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিসফিস করে বলল বগলামুখী, 'মেয়েদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেটা যখন শিখিসনি, তখন এজন্মের মতো আর কথা বলার দরকার নেই তোর।'

চাঁদ অদৃশ্য হয়েছে আকাশ থেকে। অন্ধকারে ডুবে গেছে প্রকৃতি। সবার চোখ এড়িয়ে আরও চারটি নৌকা চুপিসারে জড়ো হয়েছে ঘাটে। তারই একটা থেকে লাফিয়ে নামলো দুর্গা। প্রাসাদের বন্ধ দরজায় গুনে গুনে চারবার ধাক্কা দিল।

'কে?' চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল ওদিক থেকে।

'আদি পরাশক্তি', ফিসফিসিয়ে বলল দুর্গা।

'উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন অন্যদিক থেকে।

'সন্তানজ্ঞানে সমাজের প্রতিপালন,' বলল দুর্গা।

'প্রমাণ?' আবার প্রশ্ন ওদিক থেকে।

Mahavir Institute of Education & Research

Affiliated with I. C. S. E.

&

I. S. C.

17/1, Canal Street, Kolkata - 700 014

Ph. No. 2265-5821/22

A School of UKG to Class - XII

(English Medium)

For Boys & Girls

'ঐম হ্রীম ক্লীম।' দুর্গার উত্তর।

খিড়কির দরজা খুলে গেল। ওদিকে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। নোংরা তার জামাকাপড়। গা-ময় একরাশ সবজেটে শ্যাওলা।

'মাতঙ্গী!' মেয়েটির হাত চেপে ধরল দুর্গা, 'তোমার জন্য খুব চিন্তায় ছিলাম।'

'ওসব আদিখ্যেতা পরে হবে, আগে আমাকে আমার কাজের জায়গাটা দেখিয়ে দে দিকি।' খনখনে গলায় কে যেন বলে উঠল। দুর্গার পেছনেই দাঁড়িয়ে কালী। তার কোলে এক কঙ্কালসার বৃদ্ধা। শনের দড়ির মতো পাকানো সাদা চুল। মাত্র ক'গাছি দাঁত মুখে, মাড়ি অস্বাভাবিক রকমের কালো। গায়ে শতচ্ছিন্ন তালিমারা পোশাক।

'অ্যাই মেয়ে, ওরকম সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন? নামা আমাকে মাটিতে।' ধমক দিল বৃদ্ধা।

'এই নাও বুড়িমা, নামো।' বৃদ্ধাকে মাটিতে নামিয়ে দিল কালী।

'খবদ্দার, আমাকে বুড়িমা বলবি না, আমার নাম ধূমাবতী।' বলল বৃদ্ধা, 'এখন চল, আমাকে দেখিয়ে দিবি, কোথায় কাজটা করতে হবে। তোদের মধ্যে কে আমাকে নে'যাবি?'

'মাতঙ্গী তোমাকে সব দেখিয়ে দেবে,' হেসে বলল দুর্গা, 'গত এক সপ্তাহ ধরে ও এই প্রাসাদে চাকরানির কাজ করছে।'

প্রাসাদ-চূড়ায় প্রহরের ঘণ্টা বাজলো। পরমুহূর্তেই তুমুল বিস্ফোরণের আওয়াজে মাটি কেঁপে উঠল। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল প্রাসাদ। অন্ধকার ও চোখ-ধাঁধানো আলো মিশে এক নারকীয় হট্টগোল তৈরি হলো। লোকজন অন্ধের মতো ইতস্তত দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে কতজনকে যে পায়ে পিষে মেরে ফেলল, তার আর ইয়ত্তা নেই। ধোঁয়া কাটলে দেখা গেল, প্রাসাদের পশ্চিমদিক আলাদা হয়ে গেছে পূর্বদিক থেকে। সৈন্যাবাসের সবাই সেখানে আটকা পড়ে গেছে। হঠাৎ চারিদিকের অন্ধকার জঙ্গলে অসংখ্য স্বরে উলুধ্বনি শুরু হল। সঙ্গে সেখান থেকে সৈন্যাবাসের ওপর শুরু হল একনাগাড়ে বিষ তির বৃষ্টি। দিশেহারা সৈন্যরা যে যেখানে পারলো, ঢাল দিয়ে শরীর আড়াল করে মাটিতে শুয়ে রইল। কয়েকজন সৈন্য জলে ঝাঁপ দিয়ে এপারে আসার চেষ্টা করল। পাড়ে ওঠার আগেই তাদের টেনে নিয়ে গেল কুমিরে। সিংহদুয়ারের ওপরে তির-ধনুক হাতে পাহারা দিচ্ছিল কয়েকজন সৈন্য। তারা নীচে তাকিয়ে দেখল, দরজা ভেঙে একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে। সেই ভাঙা দরজা দিয়ে ঢুকছে বিশালাকায় এক ব্যাঘ্রে আরোহিণী ততোধিক বিশালাকায়া এক নারীমূর্তি। লম্বায় যে কোনও দীর্ঘদেহী পুরুষের থেকেও সে অনেক বেশি লম্বা। হাতে তার উদ্যত কুঠার, পিঠে বাঁধা ত্রিশূল। তার পেছন পেছন সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছে একপাল হলুদ-কালো ডোরাকাটা বাঘ। প্রমাদ গুনলো সৈন্যরা। ব্রঙ্গার বাঘ, সে বাঘ নয়, মূর্তিমান প্রেতবিশেষ। মানুষের মতোই বুদ্ধি ধরে। গাছেও ওঠে, জলেও সাঁতার দেয়। জন্ম-নরখাদক। মহিষের সৈন্যরা এমনটিই শুনে এসেছে জন্মাবধি। ব্রঙ্গায় আসার আগে তাদের বাড়ির লোকেরা পইপই করে বলে দিয়েছিল, ব্রঙ্গার বাঘ থেকে দূরে থাকতে। সেই বাঘ এতগুলো একসঙ্গে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেছে।

'কী দেখছো! তির চালাও।' চিৎকার করে উঠল তিরন্দাজ দলপতি। তড়িঘড়ি ধনুকে তির সংযোজন করল সৈন্যরা, কিন্তু জ্যা-মুক্ত করার সুযোগ পেল না। প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে একরাশ তির ছুটে এল, নির্ভুল লক্ষ্যে বিদ্ধ করল প্রতিটি সৈন্যকে। বিষে অসাড় হয়ে তারা একে একে গড়িয়ে পড়ল নীচে। প্রাসাদ-শীর্ষে লুকিয়ে থাকা বগলামুখীর উদ্দেশে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ভৈরবী ঢুকে পড়ল ভেতরে।

প্রাসাদের রাত-প্রহরায় নিয়োজিত প্রায় তিনশো সৈন্য প্রাসাদের প্রাঙ্গণে জড়ো হয়েছিল। ভৈরবী ও তার ব্যাঘ্র-বাহিনী ঝটিকা গতিতে আক্রমণ করল তাদের। মহিষের সৈন্যরা যদি মাথা ঠাণ্ডা রেখে লড়াই চালাতো, তাহলে লড়াইয়ের ফলাফল কী হতো বলা কঠিন। মাতঙ্গী গতরাতে সৈন্যদের খাবারে এক বিশেষ ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। আচমকা বিস্ফোরণ, ব্রঙ্গার বাঘের আজন্ম-লালিত ভয়, পরশু-ধারী নারীমূর্তির অতর্কিত আক্রমণ, সব মিলিয়ে সৈন্যদের মানসিক অবস্থা এমনিই শোচনীয়। ওষুধের প্রভাবে সে আতঙ্ক শতগুণে বর্ধিত হয়ে উঠল। দিশেহারা সৈন্যরা দেখল, শয়ে শয়ে ভূতপ্রেত ঘিরে ধরেছে চারদিক থেকে, তাথৈ তাথৈ নাচছে, ঘাড় মটকে খাচ্ছে সৈন্যদের। ভয়ে তারা পালাতে শুরু করল খিড়কির দরজার দিকে। দেখল, সেখানে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে অতিকায় সিংহে আরোহিণী আরেক নারীযোদ্ধা। দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে সেনারা চক্রাকারে ব্যূহ রচনার একটা শেষ চেষ্টা করল। হঠাৎ কালো কুচকুচে প্রকাণ্ড একটা নেকড়ে যেন আকাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সৈন্যদের ব্যূহের ঠিক মাঝখানে। সে নেকড়ের পিঠে আরোহিণী ঘোর কৃষ্ণাঙ্গী এক নারীযোদ্ধা। হাতে তার

রক্তমাখা খড়্গ, গলায় মুণ্ডমালা, চোখে ধিকিধিকি রক্তপিপাসা।

কোথায় যেন শঙ্খ বেজে উঠল। কানফাটানো শব্দে।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো, স্রোতের মতো ছড়িয়ে পড়ল দশদিকে। শত্রুরুধিরে অভিষেক হলো পরাশক্তি। কচুকাটা হতে লাগলো মহিষের দিশেহারা সৈন্যরা।

এত গোলমাল কীসের?

প্রতিরাতে শুতে যাবার আগে কিছু ব্রহ্মাবাসীর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা না করতে পারলে মহিষের ঘুম আসে না। গত রাতেও প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ব্রহ্মাবাসীকে হত্যা ও তাদের মুণ্ড দিয়ে অসুর বিজয়স্তম্ভ বানানোর নির্দেশ দিয়ে তারপর শুতে গিয়েছিল মহিষাসুর। যতক্ষণ ঘুম আসেনি, ততক্ষণ একের পর এক মদিরার ভৃঙ্গার খালি করে গিয়েছে। নেশা তাই বেশ কড়া হয়েছিল। ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। রঞ্জক দিয়ে রাঙানো চাপদাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমচোখে শয়নকক্ষের গবাক্ষ দিয়ে অলস দৃকপাত করল নীচে প্রাঙ্গনে। মুহূর্তে সব ঘুম উড়ে গেল, মাথা পুরোদস্তুর গুলিয়ে গেল। মহিষাসুর দেখল, প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে ভুতুড়ে চাঁদের আলোয় একপাল বাঘ সৈন্যদের ধরে ধরে খাচ্ছে, তাদের ওপর তাণ্ডবনৃত্য করে বেড়াচ্ছে তিন ভীষণাকায়া নারীমূর্তি।

গতরাতের মলিন শয্যার দিকে ক্ষণিক দৃকপাত করল মহিষ। বিছানার কোণে পড়ে আছে নিরাভরণ নির্জীব দুটি নারীশরীর। ঘৃণাভরা তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে দ্রুত পোশাক পরিবর্তন করে নিল। কোমরে গুঁজলো অস্ত্রশস্ত্র। মাথায় পরল মহিষ-করোটির শিরস্ত্রাণ। দরজা খুলে বেরোতেই দেখল, খণ্ডযুদ্ধ চলছে সেখানেও। মহিষের দেহরক্ষীরা লড়াই করছে দু'জন কুশলী নারীযোদ্ধার সঙ্গে। এবং মোটেই পেরে উঠছে না। এদের পেছনে তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একজন লোলচর্মাবৃতা বৃদ্ধা। শিড়িঙ্গে লম্বা, অস্বাভাবিক রোগা, বয়সের গাছপাথর নেই তার। বিড়বিড় করে কী যেন মন্ত্র পড়ছে, আর ক্রমাগত ঝোলা থেকে ধুলোর মতো কিসব যেন বার করে ছুঁড়ে মারছে দেহরক্ষীদের দিকে। যার গায়ে সে ধুলো পড়ছে, সেই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

ধুলো-পড়া!

ডাকিনী!

ভূত-প্রেত!

বাঘ!

ব্রহ্মার কালো জাদু!

পরিস্থিতি মোটেই ভালো ঠেকল না। চুলোয় যাক ব্রহ্মার রাজকোষ! সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে দৌড়লো মহিষ।

ভেবেছিল, প্রাসাদের খিড়কির দরজা দিয়ে পালাবে। নীচে নেমে দেখল, সে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে রক্তবস্ত্র পরিধান একটি মেয়ে। হাতে তার খড়্গ। বিদ্যুৎগতিতে এদিক থেকে ওদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে সে খড়্গ, মহিষের সৈন্যদের কচুকাটা করছে। মেয়েটির বাঁ-হাতে জড়ানো লাল রংয়ের মণিবন্ধ, কনুই পর্যন্ত ঢাকা। তাতে সোনালি সুতোয় শক্তিযন্ত্র আঁকা। যেমনটি পাহাড়ের শক্তি-উপাসকরা ধারণ করে। বাঁ চোখের ওপরের পুরনো ক্ষতটা নতুন করে টনটন করে উঠল। 'নোংরা পৌত্তলিক!' দাঁতে দাঁত পিষে বলল মহিষ, 'তোরা সবাই নরকে যাবি।' চারদিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত করল, তারপর খুব ধীরে ধীরে, প্রায় স্বগতোক্তির ঢঙে ফিসফিস করে বলল, 'রক্তবীজ... রক্তবীজ... কোথায় তুমি?'

দুর্গা অনুভব করল, হঠাৎ যেন আঁধার ঘনিয়ে এল পেছনদিক থেকে। চকিতে মাথা নীচু করে পাশ ফিরল, সেই গতিতেই খড়্গ ঘুরিয়ে প্রতিহত করল তরবারির আক্রমণ। যুগপৎ তিনটি তরবারির আক্রমণ। প্রচণ্ড সে আঘাতে দু-টুকরো হয়ে গেল দুর্গার খড়্গ। দুর্গা দেখল, উদ্যত তরবারি হাতে কৃতন্তসম তিনজন অসুর। প্রায় একইরকম দেখতে তাদের। একইরকম পোশাক, মাথায় একইরকম শিরস্ত্রাণ, থুতনির ওপর একইরকম চাপদাড়ি, একইরকম লোভী ক্রূর ক্ষুধিত নৃশংস দৃষ্টি। নিরস্ত্র দুর্গাকে অসহায় ভেবে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণ করল তারা তিনজন। ক'পা পিছু হটল দুর্গা। হঠাৎ ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। তীব্র আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হল দুর্গার হাতের তালু থেকে। পরমুহূর্তে দেখা গেল,আলোর তৈরি এক ভীষণাকায় ত্রিশূল আবির্ভূত হয়েছে ওর হাতে। সেই ত্রিশূলের দুই বাহু যেন দুটি তরবারি, মধ্যবাহুটি সুদীর্ঘ এক শূল। মুহূর্তে যেন রক্তস্রোতের বিস্ফোরণ হলো। আলোর ত্রিশূলের চকিত প্রহারে ছিন্নভিন্ন হলো তিন রক্তবীজ। তিনটে মুণ্ডু ছিটকে পড়ল তিনদিকে, তিনটে নিথর ধড় এলিয়ে পড়ল মাটিতে। শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এক অপরিসীম ঘৃণার স্রোত অনুভব করল মহিষ। মনে হল, অসুর-শ্রেষ্ঠত্বের রাজপথ আড়াল করে একলা দাঁড়িয়ে আছে রুধিররঞ্জিত ওই পৌত্তলিক মেয়েটি। 'তিন রক্তবীজ খুন হয়েছে, তার জায়গায় তিনশো রক্তবীজ জন্মাবে। কিন্তু তুই... তুই তো নরকে যাবি।' বিড়বিড় করতে করতে মহিষাসুর কোমরবন্ধ থেকে বার করে আনলো একটা ধাতব

গোলক। ব্রহ্মা-সম্প্রদায়ের এক বিজ্ঞানীকে উৎকোচ ও চাটুকারিতায় তুষ্ট করে এই দিব্যাস্ত্র নির্মাণ করিয়েছিল মহিষ। এ অস্ত্র ব্যবহার করে একের পর এক দেবতাকে যুদ্ধে পরাস্ত করা গেছে, এই মেয়ে তো কোন ছার। লক্ষ্য স্থির করে সে গোলক মাথার ওপর তুললো। সেই মুহূর্তেই অতর্কিতে একটা ছায়া মহিষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাঁধের ওপর চড়ে আঁকড়ে ধরল মহিষের গলা। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল মহিষের। প্রাণ বাঁচাতে সেই গোলক আততায়ীর ওপরে প্রয়োগ করল মহিষ। আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল আক্রমণকারী।

ইতস্তত পতনোন্মুখ দেহগুলোর ফাঁক দিয়ে মহিষের অপস্রিয়মাণ ছায়াটাকে দেখতে পেল দুর্গা। দেখতে পেল, মাটিতে পড়ে আছে রক্তবর্ণের এক নারীদেহ। 'তারা। শিগগির এসো।' চিৎকার করে ডাকলো দুর্গা।

সেনাপতি চিক্ষুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছে। নিহত হয়েছে অধিকাংশ অসুর সেনানী। মহিষ পালিয়েছে। কীভাবে পালিয়েছে, কেউ জানে না। কেউ বলছে, মোহনায় ওর অর্ণবপোত মোতায়েন ছিল, তাতে করেই পালিয়েছে। কেউ আবার বলছে, ব্রঙ্গার পশ্চিম সীমান্তের জঙ্গল পার হয়ে পালিয়েছে সে। শহরে মহিষের সৈন্যরা দিব্যবলের বিদ্রোহী সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বনবাসী, শ্রমিক ও মৎস্যজীবীদের জনসেনা শহরের সীমান্ত সুরক্ষিত করেছে। বিদ্রোহী নাগরিকরা ঘরে ঘরে তল্লাশি চালাচ্ছে আত্মগোপনকারী মহিষ সেনাদের সন্ধানে। ব্রঙ্গার নৌসেনা দিব্যবলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে।

একরাশ মৃতদেহের মাঝে বসে আছে রক্তস্নাতা দুর্গা। মহিষকে আক্রমণ করেছিল যে মেয়েটি, তার মাথা কোলে নিয়ে। মেয়েটির শরীর অস্বাভাবিক রকমের লাল হয়ে গেছে। মাথার চুল, ভুরু, চোখের পাতা— সব পুড়ে উঠে গেছে। 'এ এক আশ্চর্য অস্ত্র,' বলল তারা, 'শরীরের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতের বিন্যাস বদলে দিয়েছে অস্ত্রটা। ওকে বাঁচাতে পারবো কিনা, জানি না।'

'ভেবে খুব ভালো লাগছে, 'ক্ষীণকণ্ঠে বলল মেয়েটি, 'একটা ভালো কাজে জীবন দিলাম।'

'খবরদার, এরকম কথা বলবি না', বলল দুর্গা, 'তোকে আমরা বাঁচিয়ে তুলবোই।'

'তাহলে কি চলে বোন,' অতিকষ্টে হেসে বলল মেয়েটি, 'নাম আমার ছিন্নমস্তা। ধড়ে যদি মাথাটা আস্ত থাকে, তবে আমি সার্থকনামা হলাম কীভাবে?'

একটি ট্রেন চোখের নিমেষে ১৫ মিটার এবং সেকেন্ডে ২৫ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে

রেললাইনের আশেপাশে মোবাইলে ব্যস্ত থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সম্প্রতি রেললাইনে বা প্ল্যাটফর্মের ধার ঘেঁষে ফোনে কথা বলা বা মেসেজ পাঠানোর জন্য এবং চলন্ত ট্রেন থেকে বাইরে ঝুঁকে সেলফি বা গ্রুফি তোলার জন্য দুর্ঘটনায় কয়েকটি জীবনহানি ঘটেছে।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলুন

- রেললাইনে অথবা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে সেলফি/গ্রুফি তুলবেন না।
- প্ল্যাটফর্মের বা রেললাইনের ধার ঘেঁষে চলার সময় কখনোই মোবাইলে কথা বলবেন না অথবা গান শুনবেন না।
- রেললাইনে হাঁটা বা হেঁটে পারাপার করা বিপজ্জনক। এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ।
- রেললাইন এবং ট্রেনের কাছ থেকে সর্বদা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- রেলওয়ে পরিসরে স্টিল ক্যামেরা/মুভি ক্যামেরা/স্মার্টফোন ক্যামেরার মাধ্যমে যে কোনো ধরণের ফটোগ্রাফি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

আরও দায়িত্বশীল হোন, সতর্ক হোন

ট্রেনের কার্যক্রমের যে কোন অনুসন্ধানের জন্য	যে কোন অভিযোগে অথবা জরুরি চিকিৎসার জন্য	যাত্রী সুরক্ষার জন্য
ডায়াল করুন: ১৩৯	ডায়াল করুন: ১৩৮	ডায়াল করুন: ১৮২

পূর্ব রেলওয়ে
আপনার সুরক্ষাই আমাদের লক্ষ্য

Follow us on @EasternRailway www.er.indianrailways.gov.in Like us on @easternrailwayheadquarters

ছিন্নমস্তাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল দুর্গা। প্রতি প্রহরে ছিন্নমস্তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকলো। তারা তার ভেষজবিদ্যা থেকে সবরকম নিদান ব্যবহার করল, কোনও লাভ হলো না। শ্বাসকষ্ট শুরু হলো ছিন্নমস্তার।

'বোন, আমি চললাম,' বলল ছিন্নমস্তা।

'আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুই দিব্যাস্ত্রের প্রহার নিয়েছিস। যদি তুই মারা যাস, আমি তবে কীভাবে বাঁচি বলতো?' কান্নাভেজা গলায় বলল দুর্গা।

'আমি কি একটু চেষ্টা করতে পারি?' পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল। দুর্গা তাকিয়ে দেখল, দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ শুভ্রবর্ণ এক সাধক। হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটাজুট, সারা গায়ে ছাই মাখা।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল তারা, 'আপনি কি এর চিকিৎসা করতে পারবেন?'

'লোকে আমাকে বৈদ্যনাথ বলে,' বলল সাধক, 'বৈদ্যবিদ্যা কিছুটা জানা আছে আমার।'

মৃত্যুর সঙ্গে তারা ও বৈদ্যনাথ রুদ্রর যুদ্ধে হার হলো মৃত্যুর। ভোরের সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ল ছিন্নমস্তার মুখে। চোখ খুলল ছিন্নমস্তা।

'মরার ইচ্ছেটা তোর স্থগিত রইল,' বলল দুর্গা।

'হ্যাঁ,' ধীরে ধীরে বলল ছিন্নমস্তা, 'ওটা আরেকদিন করা যাবে।'

'দূর হ পোড়ারমুখী।' কপট রাগে মুখঝামটা দিতে গিয়ে হেসে ফেলল দুর্গা।

'দাদা!' বলল দিব্যবল।

দিব্যবলকে ঘরে ঢুকতে দেখে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অনঙ্গ।

'এ আমি কী শুনছি দিব্য!' বলল অনঙ্গ, 'মহাবলী মহিষাসুর নাকি ব্রঙ্গা ছেড়ে চলে গেছেন।'

'সে ছেড়ে যায়নি,' বলল দিব্যবল, 'আদ্যাশক্তি দুর্গা তাকে তাড়িয়েছেন। আমিও তাঁকে সাহায্য করেছি।'

'তাহলে আমি ঠিকই শুনেছি,' বলল অনঙ্গ, 'কী সর্বনাশ করেছ, বুঝতে পারছো কি?'

'সর্বনাশ? কার সর্বনাশ?'

'আমার সর্বনাশ! তোমার নিজের সর্বনাশ! ব্রঙ্গার সর্বনাশ! তিনি যে সাক্ষাৎ অসু! তাঁকে অপমান করেছ! আকাশ থেকে আগুন-বৃষ্টি হবে তোমার মাথার ওপর।'

'দাদা, চুপ করো।'

'শোনো দিব্য! তোমার বড় দাদা হিসেবে আমি তোমাকে আদেশ করছি। যাও, এইমাত্র গলবস্ত্র হয়ে মহাবলী মহিষাসুরকে সসম্মানে ব্রঙ্গায় ফিরিয়ে আনো। তাঁকে করজোড়ে বিনতি করো, যেন তিনি ব্রঙ্গার অবাধ্য দুর্বিনীতি প্রজাদের ক্ষমা করে দেন। তিনি যেন...'

'দাদা!' চিৎকার কলে উঠল দিব্যবল, 'কী বলছ তুমি! যে লোকটা আমাদের বাবাকে খুন করেছে, আমাদের পুরো পরিবারটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে, তোমাকে নপুংসক বানিয়েছে, দিনের পর দিন তোমার ওপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে...'

'তিনি যে অসুর প্রেরিত দূত! ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তার তিনিই তো একমাত্র প্রতিনিধি। এ শরীর তো তাঁরই দান। তিনি আমার এই নশ্বর শরীরটাকে ভালোবেসেছেন, আমি ধন্য হয়েছি।'

'ভালবাসা! এই নারকীয় অত্যাচারকে তুমি ভালবাসা বলো?'

'তাঁর ভালবাসা বোঝার ক্ষমতা তোমার নেই দিব্য! তুমি মূর্খ, অজ্ঞান। আমি তাঁকে ভালোবাসি। আমি তাঁর দাসানুদাস!'

'এসব কী বলছ দাদা!'

'ঠিকই বলছি। তাঁকে ছাড়া আমার জীবন অর্থহীন। তাঁকে তাড়িয়ে বিরাট ভুল করেছ তোমরা। এরজন্য যে কী বিরাট সর্বনাশ নেমে আসবে ব্রঙ্গার ওপর, সে বিষয়ে কোনও ধারণাই নেই তোমার। যে অসু, যে সর্বশক্তিমান, তিনি তাঁরই...'

'চুপ করো', ক্রোধে ফেটে পড়ল দিব্যবল, 'আমার ইচ্ছে করছে, এই মুহূর্তে তোমার মুণ্ডুটা এক কোপে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলি। কিন্তু না, তুমি আমার দাদা, আমি সেটা করতে পারবে না। তবে তোমাকে ছেড়ে দিতেও পারি না। আজ থেকে তোমার ঠিকানা হবে অন্ধকূপ। অন্তত যতদিন না মহিষাসুর-বধ সম্পন্ন হচ্ছে।'

'সর্বনাশ হোক তোমার!' চিৎকার করে উঠল অনঙ্গ, 'তুমি শুদ্ধু ব্রঙ্গার প্রতিটি নাগরিক নরকের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে, মৃত্যুর পর।'

'তোমার ওই নরককে ভয় পাই না আমি', বলল দিব্যবল, 'মৃত্যুর পর কী হবে, সেটা মৃত্যুর পর দেখা যাবে। তার জন্য স্বজাতিদ্রোহ করবো না আমি। কিন্তু তুমি? তোমার কী হবে? তুমি দেশদ্রোহী, স্বজাতিদ্রোহী। তোমার ইহলোকেই নরক-দর্শন

হবে। দেখি, তোমার সর্বশক্তিমান মহিষাসুর তখন তোমাকে বাঁচাতে পারে কিনা।'

গট্‌গট্‌ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল দিব্যবল। রাগে আগুন জ্বলছে মাথায়। বুকের মধ্যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। আরও কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কে জানে, সেখানেও হয়তো একই কথা শুনতে হবে।

আজ সকাল থেকে একটার পর একটা অশুভ সংবাদ আসছে। অলতু গ্রামে আশ্রয় নেওয়া বিপুল সংখ্যক অসুর গোপনে অলতু ত্যাগ করে ব্রহ্মার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা কে কোথায় গেছে, কোথায় লুকিয়ে আছে, কেউ তা জানে না।

মাতৃভক্তদের ছিন্নমুণ্ড দিয়ে রাজ্যের স্থানে স্থানে অসুর বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেছিল মহিষাসুর। পালাবদলের সঙ্গে সেইসব স্তম্ভকে ভূলুণ্ঠিত করতে শুরু করেছে মাতৃভক্তরা। তাই নিয়ে লড়াই বাধছে অসুবাদীদের সঙ্গে। অসুস্তম্ভ নাকি অসুবাদীদের ভক্তির কেন্দ্র। এ রাজ্যে অসুবাদীদের সংখ্যা কম নয় আজ। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে ব্রহ্মার স্থানে স্থানে। কী করা উচিত এখন? রাজধর্ম বলে, অপরের ভক্তিকে মর্যাদা দিতে। অসুবাদীদের ভক্তির মর্যাদা দিতে হলে দাসত্ব ও অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ ওইসব বিজয়স্তম্ভকে রক্ষা করতে হবে। নিপীড়িত মাতৃভক্তদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে। সেটা কীভাবে সম্ভব?

অসংখ্য রক্তবীজ ছড়িয়ে আছে ব্রহ্মার আনাচে-কানাচে। তারা কী ষড়যন্ত্র করছে কে জানে। তার ওপর একটু আগেই খবর এসেছে, মহিষের মহিষীও পালিয়েছে। কখন, কেউ জানে না। অন্ধকূপে পিতৃস্বসা মায়াবলীর প্রকোষ্ঠ খালি পড়ে রয়েছে।

বড় দিশাহারা বোধ হচ্ছে আজ। মা আদ্যাশক্তি, পথ দেখাও মা!

ছ'মাস পরের কথা।

মহাভারতের বিস্তীর্ণ মালভূমিতে সমবেত হয়েছে মহিষাসুরের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী। পাঁচ লক্ষ মোষের খুরের ঘর্ষণে আকাশ ধুলোয় মেঘলা হয়ে গেছে। সূর্যের মুখ দেখা যায় না। বহুক্ষণ ধরে এখানে প্রতীক্ষা করছে মহিষাসুর। দিনের দ্বিতীয় প্রহর প্রায় অতিক্রান্ত। এর মধ্যেই তো এসে পড়ার কথা তার। এখনও এসে পৌঁছালো না কেন?

With Best Compliments from -

Ganpati Laminators

&

Packagers Pvt. Ltd.

থোকা থোকা লাল-হলুদ ফুল ফুটে আছে সবুজের পটভূমি জুড়ে। বাতাসে গরম বালির গন্ধের সঙ্গে বয়ে আসছে জংলি মাটি-পাতা-ফুলের ঝাঁঝালো গন্ধ। দূরে দিগন্তরেখার কাছে সবুজ উঁচুনীচু পাহাড়ের সারি যেন দুর্লঙ্ঘ্য এক প্রাচীর রচনা করেছে। ওখানেই মধ্যভারতের মালভূমি মিশেছে ছোটনাগপুর মালভূমিতে। ওটাই ব্রঙ্গার সীমান্ত। হে অসু! যদি তুমি সর্বশক্তিমানই হবে, তবে ভূমিকম্পে বজ্রপাতে ধ্বংস করে দিচ্ছ না কেন ওদের? ওরা যারা ওই সীমানার ওপারে দাঁড়িয়ে আছে, তোমার বিজয়ের পথ আগলে?

হঠাৎ তূর্যনিনাদে কেঁপে উঠল মাটি। সবুজ পাহাড়ে জাগলো আন্দোলন। জঙ্গল ভেদ করে আবির্ভূত হল ত্রিশূলব্যূহে সজ্জিত অতিকায় অভূতপূর্ব এক সেনাবাহিনী। সে সেনাবাহিনীর দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাপক্ষী গরুড়ে আসীন হরি। তাঁর পেছনে সারিবদ্ধভাবে প্রতীক্ষারত বিষ্ণুর বাহিনী। শৃঙ্খলাপরায়ণ, যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ। তাদের শীতল দৃঢ়চেতা দৃষ্টি প্রত্যয়ের আলোয় উদ্ভাসিত। সেনাবাহিনীর বাম বাহুর নেতৃত্ব দিচ্ছেন মহাকায় এক বৃষে আসীন ত্রিশূলপাণি রুদ্র। তাঁর পেছনে সমবেত হয়েছে শিবের বাহিনী। তারা প্রেতকল্প, উগ্রতেজা, উগ্রচণ্ডা। মাথায় জটাজুট, শ্মশ্রুগুম্ফে ঢাকা তাদের মুখ। কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, ভস্মচ্ছাদিত রুধিররঞ্জিত দেহ। তাদের মুহুর্মুহু রণহুঙ্কার ও আস্ফালনে মৃত্যুর হৃদয়েও ভয়কম্প জাগে।

জম্বুদ্বীপের প্রত্যেক প্রকৃতি-উপাসক সম্প্রদায় তাদের শ্রেষ্ঠ বীরদের নিয়ে সমবেত হয়েছে বিশাল সংখ্যায়। সমুদ্রের মতো বিশাল তাদের ব্যাপ্তি। বাহিনীর মধ্যভাগ রক্ষা করছে তারা। বিচিত্র তাদের পোশাক, ততোধিক বিচিত্র তাদের অস্ত্রশস্ত্র।

ব্যূহের সম্মুখভাগ রক্ষা করছে ব্রঙ্গার সেনাবাহিনী। তাদের এক লক্ষ অতিকায় রণহস্তীর ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপে গুরুগুরু কাঁপছে ধরাধাম। হরিহরের যৌথ আহ্বানে সাড়া দিয়ে জম্বুদ্বীপের পূর্ববাহু থেকে, প্রাগজ্যোতিষের ওপার থেকে তিন লক্ষ সেনানী এসেছে এই মহারণে যোগ দিতে। সুদূর ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, বরুণ, সুমাত্রা, মহার্লিকা, যবদ্বীপ, কালীমন্থন থেকে এসেছে তারা— জম্বুদ্বীপের অপৌরুষেয় সংস্কৃতিকে সমূহ বিনাশ থেকে রক্ষা করতে। বাহন তাদের খর্বাকৃতি হস্তী। সে হস্তী অশ্বের মতো দ্রুতগামী, ক্ষুরধার বুদ্ধি তাদের। অনায়াসে পাহাড় টপকায়, অবাধে ভেদ করে ঘন বনানী। বাহিনীর অন্তভাগে দুর্ভেদ্য এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহরচনা করেছে তারা।

অভূতপূর্ব এই অতিকায় বাহিনীকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এক অসামান্য তেজস্বিনী নারী, এক অতিকায় সিংহে আরোহিণী। রক্তবর্ণের বস্ত্র পরনে, স্বর্ণরঞ্জিত রক্তবর্ণের মণিবদ্ধ হাতে জড়ানো। তাঁর পেছনে দশজন নারী-যোদ্ধা, দশ-মহাবিদ্যা। কালী, ভুবনেশ্বরী, কমলা, ভৈরবী, বগলামুখী, ষোড়শী, মাতঙ্গী, ধূমাবতী, ছিন্নমস্তা, তারা। কেউ বাঘ, কেউ সিংহ, কেউ বা নেকড়ের পিঠে আসীন। প্রত্যেকের হাতে ব্রহ্মা-সম্প্রদায় নির্মিত বিবিধ দিব্য আয়ুধ।

দুরুদুরু কাঁপছে মহিষাসুরের বুক। জীবনে এই প্রথম প্রাণের ভয় জাগলো তার বুকে। সারাজীবন পৌত্তলিকদের ঘৃণা করেছি আমি। যথেচ্ছ সম্ভোগ করেছি নারীদের, অচেতন ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার করেছি তাদের। আর আজ এক পৌত্তলিক নারীর হাতে আমার নিধন হবে?

হে অসু, তুমি কি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?

ঝাপসা চোখে মহিষাসুর দেখল, তেজপ্রভায় দশদিক উদ্ভাসিত করে তার দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় সিংহে আসীন রক্তবস্ত্র-পরিধান এক অসামান্যা তেজস্বিনী নারী। তাঁর দশ হাতে দশ দিব্যায়ুধ। ■

TRADE CENTRE (INDIA)

37, Lenin Sarani
Kolkata - 700 013

e-mail : t.c.india@vsnl.net

Fax : 91-33-2249, 8706
Ph. : 2249-8722

With Best Compliments of :

MAKAIBARI TEA
&
TRADING
COMPANY
PRIVATE LIMITED

Regd. Off. : Kishore Bhavan,
17, R. N. Mukherjee Road,
Kolkata - 700 001

তোমার সৃষ্টির পথ

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

জীবনের দিনান্তবেলায় কাছের মানুষ রাণী নির্মলকুমারী মহলানবিশের সঙ্গে একদিন উপনিষদ নিয়ে আলোচনা করছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বৃদ্ধ কবি আরাম কেদারায়। পাশে একটা মোড়া নিয়ে বসে নির্মলকুমারী। বিষয়টা ছিল উপনিষদের 'পিতা নোহসি' মন্ত্র। কেমন করে সেই মন্ত্রের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর তাঁর মেজ মেয়ে রেণুকা— বলছিলেন আত্মমগ্ন রবীন্দ্রনাথ। কবি বলতে লাগলেন, ''সেবার রাণীকে কলকাতায় আনার কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে আমাকে বললে— বাবা 'পিতা নোহসি' বলো। আমি মন্ত্রটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার শেষ নিঃশ্বাস পড়ল। ... তার বাবাই যে তার জীবনের সব ছিল। তাই মৃত্যুর হাতে যখন আত্মসমর্পণ করতে হলো, তখনও সেই বাবার হাত ধরেই সে দরজাটুকু পার হতে চেয়েছিল। ... ভগবানকেও পিতা রূপেই কল্পনা করে তাঁর হাত ধরে অজানা পথের ভয় কাটাবার চেষ্টা করেছিল। এই সম্বন্ধের চেয়ে আর কোনও সম্বন্ধ তার কাছে বড় হয়ে ওঠেনি।''

জীবনের মাঝপথে, তেষট্টি-চৌষট্টি বছর বয়সে আজীবন মজবুত স্বাস্থ্যের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ যখন প্রায়-প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, তখন যেন নিজের পরলোকগতা মেজো মেয়ের বিশ্বাসের সূত্র ধরে তিনি পৌঁছে যাচ্ছিলেন, 'পিতা নোহসি' মন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে। অজানা ভবিতব্যের অনিশ্চিত পথ পার হতে ঈশ্বরই তখন তাঁর পিতা। তিনি এসে হাত ধরলে বাকি সবকিছু কেমন সহজ, নির্ভার হয়ে যায়।

কিন্তু শেষ অবধি মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বাস আর অবলম্বনের সোজা রাস্তা তো তাঁর রাস্তা নয়। স্নেহের পাত্রী নির্মলকুমারীকে তিনি বলছেন : যেমন অসত্য না থাকলে সত্যের, অন্ধকার না থাকলে আলোর, মৃত্যু না থাকলে অমৃতের মানে নেই,

প্রশান্ত চন্দ্র ও নির্মলকুমারী মহলানবিশ

তেমনই রুদ্র না থাকলে তার প্রসন্নতারও কোনও মানে থাকে না। ... মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড় সহজ কথা নয়। প্রতিনিয়ত এর জন্য চেষ্টা করতে হয়। নিজের ছোট আমিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বড় আমির মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে সে ভারি আরাম।

ইউরোপ থেকে লাতিন আমেরিকার পথে ক্রাকোভিয়া জাহাজে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। এযাবৎ দু-একবার ছোটখাটো যেসব শরীর খারাপ হয়েছিল, এই অসুখের সঙ্গে সেসবের তেমন নেই। গভীর সমুদ্রের বুকে কাল্পনিক বিষুবরেখা, জাহাজ তা পার হয়ে চলেছে। এমন সময়ে শরীর গেল বিগড়ে। জ্বর এসে জাপটে ধরেছে দেহ। মাথা তুলতেও কষ্ট হচ্ছে। সমস্ত দিন সমস্ত রাত এক অবর্ণনীয় অস্বস্তি। বিছানায় পড়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন কবি। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছিল, স্বয়ং যমরাজের পায়ের চাপ। কীভাবে পেরোনো যায় এই দুঃসহ অনুভব— ভেবে ভেবে প্রথমদিকে কূলকিনারা পেলেন না। শেষে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে শুরু করলেন কবিতা লেখা। কেবিনের বিছানায় আধশোয়া হয়ে তিনি লিখছেন এবং আরও সব অনুভূতিমালার সঙ্গে তাঁকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মৃত্যু-অনুভব। যেন খুব কাছে এসে পড়েছে মৃত্যু। প্রাণকে বহন করার শক্তিও যেন শেষ হয়ে এসেছে। অসুস্থ শরীরে মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল দেশের হাওয়া বাতাস আর মাটির জন্য। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, এমন ব্যাকুলতা তো কাজের কথা নয়। যিনি মৃত্যুপথযাত্রী, তাঁকে ঘরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার একটা প্রথা বহুদিন ধরে স্বদেশে চালু আছে। কারণ,ঘরের ভিতরকার সমস্ত অভ্যস্ত জিনিস হচ্ছে প্রাণের বন্ধনজাল। তারা সকলে মিলে মৃত্যুর দিকে আঙুল তুলে প্রতিবাদ করতে থাকে। তাই নিজের বাঁধন আলগা করে দিয়ে মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে নেবার আনন্দটাই চলে যায়। গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরে অমৃতের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ আর হয় না।

জাহাজ থেকে অসুস্থ শরীরেই প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন রবীন্দ্রনাথ। লিখলেন : 'ক'দিন শরীর রীতিমতো খারাপ চলছিল। রাতে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কথা মনে আসছিল। ... প্রথম দুই-একদিন খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেশে ফিরে যাই। তারপর মনে হল দেশ তো জন্মের জন্য, মৃত্যুর জন্য পথ।'

কেবিনে আধশোয়া হয়ে নিজের এই গভীর উপলব্ধিকেই রূপ দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যুর আহ্বান' কবিতায় :

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে, নির্জনে,
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
গৃহহীন পথিকেরই
নৃত্যছন্দে চিরকাল বাজিতেছে ভেরী;

১৯২৪ সালের ৩রা নভেম্বর জাহাজে লেখা এই কবিতার শেষ ক'টি লাইন—

দুয়ার রহিবে খোলা; ধরিত্রীর সমুদ্র-পর্বত
কেহ ডাকিবে না কাছে, সকলেই দেখাইবে পথ।
শিয়রে নিশীথরাত্রি রহিবে নির্বাক,
মৃত্যু সে যে পথিকের ডাক।

জাহাজে যে অসুস্থতা শুরু হয়েছিল, পরে পরীক্ষা করে ডাক্তাররা বুঝতে পারেন তা আসলে ইনফ্লুয়েঞ্জা। এই রোগটিকে বড় ভয় ইউরোপ-আমেরিকার ডাক্তারদের। কবি আর্জেন্টিনা পৌঁছবার পর যখনই তাঁরা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন, বলেছেন, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ার জন্যই এতখানি দুর্বলতা। দর্শনার্থীদের সঙ্গে দেখা করা আপাতত চলবে না। শরীর একটু ভালো হলে তখন নিষেধ কিছু শিথিল করা যেতে পারে। আপাতত নিভৃতে বিশ্রাম ছাড়া গতি নেই।

আর্জেন্টিনার উপকূলে রবীন্দ্রনাথের আন্ডেজ জাহাজ পৌঁছানোর পর রবীন্দ্রনাথকে বিপুল সংবর্ধনা দেন স্থানীয় মানুষজন। বুয়েনস্ আইরেসের প্লাজা হোটেলে উঠেছিলেন অসুস্থ কবি। তত্ত্বাবধানে ছিলেন সচিব এল্‌মহার্স্ট সাহেব। এই সময়েই কবির সঙ্গে দেখা হয় তাঁর চির অনুরাগিনী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর। প্রায় দশ বছর আগে ১৯১৪ সালে আঁদ্রে জিদের ফরাসি অনুবাদে গীতাঞ্জলি পড়েছিলেন ওকাম্পো। অসুখী বিবাহ আর গোপন সম্পর্কের দ্বন্দ্বে তখন তিনি ক্ষতবিক্ষত। ভারতীয় কবির এই আশ্চর্য বই তাঁর জীবনে এক গভীর সান্ত্বনা বয়ে আনল। এর পরে ফরাসি, ইংরেজি বা স্প্যানিশ অনুবাদে যখনই রবীন্দ্রনাথের কোনও রচনা পেয়েছেন, পড়ে ফেলেছেন গোগ্রাসে। ভিতরে, নিজের অজান্তেই শুরু হয়েছিল প্রতীক্ষার প্রহর গোনা। অবশেষে সুযোগ এল, সেদিন তিনি খবর পেলেন পেরু যাবার পথে বুয়েনস্ আইরেসে এসে নেমেছেন রবীন্দ্রনাথ। এক বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে সম্ভবত ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওকাম্পো পৌঁছে যান প্লাজা হোটেলে। খবর পেয়ে হোটেলের নীচের হলঘরে তাঁদের বসানোর নির্দেশ পাঠালেন এলমহার্স্ট সাহেব। তারপর এসে একথা-সেকথার পর উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, কবির হার্টের অবস্থা ভালো নয়, ডাক্তাররা বলছেন আন্ডেস পর্বত পেরিয়ে লিমা যাওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হবে না। রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পেরুর প্রেসিডেন্ট। তাই তাঁকেও জানিয়ে দেওয়া দরকার রবীন্দ্রনাথ যেতে পারছেন না।

চুপচাপ শুনছিলেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো। হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, ডাক্তররা তো বলছেন কোনও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কিছুদিন থাকার কথা। আমি বরং একটা পুরো বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। আপনারা দুজনে সেখানে এসে থাকুন। জায়গাটার নাম সান ইসিদ্রো।

ভিক্টোরিয়া এলমহার্স্টকে যখন একথা বলছেন, তখনও তিনি

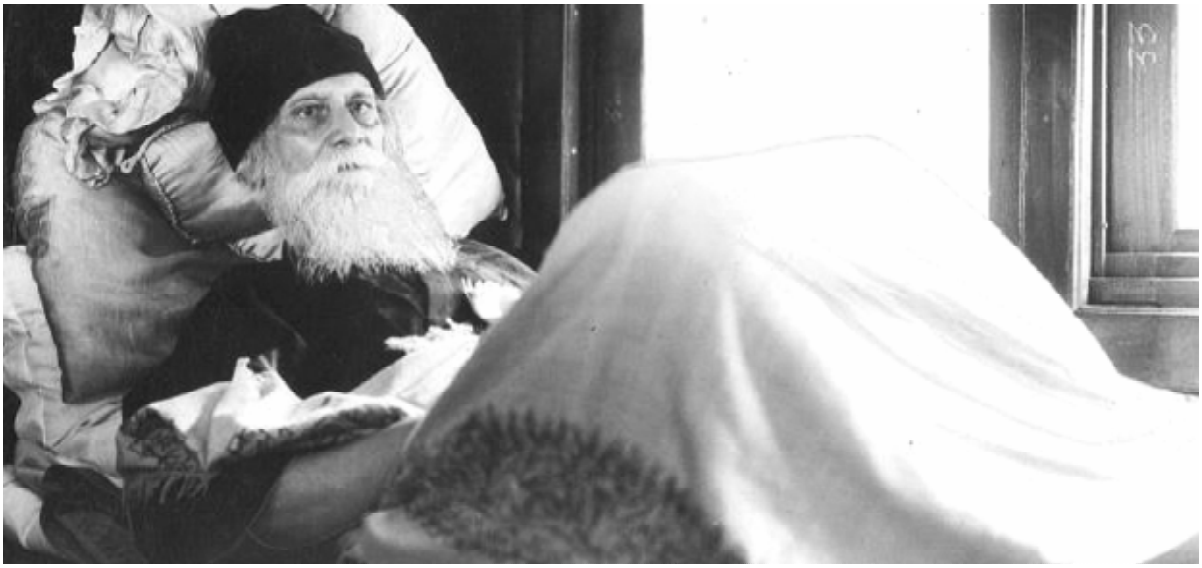

হাওড়া স্টেশনে অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ।

জানতেন না সান ইসিদ্রোয় সেই বাড়িটা তাঁর বাবা-মা ছাড়তে রাজি হবেন কিনা। কিন্তু তাঁরা ছাড়ুন না-ছাড়ুন ব্যবস্থা তিনি করবেনই। তাঁর প্রাণের কবির আরোগ্যের জন্য পৃথিবীর যে কোনও জায়গায় যেতে তৈরি ছিলেন ওকাম্পো।

এরপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম দেখা। সে এক আশ্চর্য অনুভূতি ওকাম্পোর মনে। রবীন্দ্রনাথের ঘরে ভিক্টোরিয়াকে পৌঁছে দিয়ে অন্য কাজে বেরিয়ে গেলেন এলমহার্স্ট। একটু পরে তিনি এলেন। যেন আবির্ভূত হলেন এক নীরব, সুদূর, তুলনাহীন বিনীত মানুষ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সেই অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন শ্রদ্ধেয় শঙ্খ ঘোষ : 'ঘরে তিনি এসে দাঁড়ালেন, আবার এও সত্যি যে ঘরে যেন তিনি নেই। তাঁর ধরনধারণে একটা ঔদ্ধত্যও ছিল, খানিকটা যেন লামার মতো (ছোটখাটো উটের মতো দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের প্রাণী)। লামার দিকে কেউ তাকালে ওরা যেমন তাদের তাচ্ছিল্য নিয়ে দেখে, অনেকটা সেইরকম। কিন্তু ওই ঔদ্ধত্যেরই সঙ্গে আছে এক সর্বহারী মাধুর্য।'

বাবা-মা রাজি হননি, তবু সান-ইসিদ্রোয় বাড়ি পাওয়া গেল একটা। ওকাম্পোরই এক আত্মীয়র নতুন তৈরি বাড়ি, নাম 'মিরালরিও'। মাত্র এক সপ্তাহের জন্য হাতে এসেছে। তাই সই। কবিকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া চললেন নিরিবিলি গ্রামাঞ্চলের সেই আশ্রয়ের দিকে। সমুদ্রবাতাসের প্রবল ঝাপটায় বুয়েনস্ আইরেসের রাজপথ তখন বিপর্যস্ত। পাক খেয়ে উড়ছে নতুন পাতা, শুকনো ধুলো আর ছেঁড়া কাগজের রাশি। আকাশ কোথাও হলুদ, কোথাও সীসার মতো। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন তাঁরা এসে পৌঁছলেন সান ইসিদ্রোতে, দৃশ্যপট বদলে গিয়ে কেমন সব ঠাণ্ডা, ছিমছাম। গাছের মাথায় বাতাসের দাপাদাপি অথচ ঘরের ভিতরটা শান্ত, নীরব। ঘরে ঢুকতেই ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথকে প্রায় টেনে নিয়ে এলেন প্রশস্ত বারান্দায়। দেখুন কবি এই আকাশ, সামনের ওই নদী, বসন্তের সাজে ভরা প্রান্তর। আপনাকে দেখতেই হবে। মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন রেলিংয়ের কোল ঘেঁষে। সুদূর বিদেশের এই অনাস্বাদিত প্রকৃতিও যেন কত আপনার জন।

প্রথমে ঠিক ছিল থাকবেন সাত-আটদিন। শরীর সারাতে শেষে থেকে যেতে হলো কয়েক মাস। নিশ্চুপ গ্রামাঞ্চল, উদার দিগন্ত আর দূরের নদী কবিকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকত। সঙ্গে ছিল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মরমি সান্নিধ্য। মিরালরিওতে থাকতেন না তিনি, রোজ রাতে ঘুমোতে যেতেন বাবা-মায়ের কাছে। দুপুর আর রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে দিনভর থেকে যেতেন এই বাড়িতে। আরামকেদারায় বিশ্রাম নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ, কাজের ফাঁকে ঘরে ঘুরে এসে তাঁকে দেখে যাচ্ছেন তরুণী ওকাম্পো। মাঝেমাঝে টুকটাক কথাবার্তা। বেশ কিছুদিন পর শান্তিনিকেতন থেকে ওকাম্পোকে চিঠি লিখলেন কবি, তারও কেন্দ্রস্থলে সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দা। লিখছেন : 'দেহের এই ভগ্নদশায় থেকে থেকে আমার মন চলে যায় সান ইসিদ্রোর সেই বারান্দাটিতে। মনে পড়ে সকালবেলার আলোয় ভরা বিচিত্র লাল নীল ফুলের উৎসব। আর বিরাট সেই নদীর ওপর নিরন্তর সেই রঙের খেলা, আমার নির্জন অলিন্দ থেকে অক্লান্ত সেই চেয়ে দেখা।'

মিরালরিওর শান্ত সেই ঘর আর বারান্দায় বসে এক এক করে অনেকগুলো কবিতা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পূরবী কাব্যগ্রন্থে সেগুলি সংকলিত হয়ে আছে। তারই দুটি বিশেষ কবিতায় ওকাম্পোর সেই মধুর সান্নিধ্যের স্মৃতি প্রসন্ন কৃতজ্ঞতায় :

১। হে বিদেশি ফুল, যবে আমি পুছিলাম
'কী তোমার নাম'

হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কী হবে।
আর কিছু নয়,
হাসিতে তোমার পরিচয়।
(বিদেশি ফুল)

২। প্রবাসের দিন মোর পরিপূর্ণ করি দিলে, নারী,
মাধুর্যসুধায়; কত সহজে করিলে আপনারই
দূরদেশি পথিকেরে; যেমন সহজে সন্ধ্যাকাশে
আমার অজানা তারা স্বর্গ হতে স্থির স্নিগ্ধ হাসে
আমারে করিল অভ্যর্থনা; নির্জন এ বাতায়নে
একেলা দাঁড়ায়ে যবে চাহিলাম দক্ষিণ-গগনে
ঊর্ধ্ব হতে একতানে এল প্রাণে আলোকেরই বাণী
শুনিনু গম্ভীর স্বর, 'তোমারে যে জানি মোরা জানি।
(অতিথি)

।। দুই।।

১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলায়, বয়স তখন ছিয়াত্তর, আচমকা বড় রকমের অসুস্থ হয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। কবিরাজি ভাষায় এ হলো 'বিসর্প' রোগ, অ্যালোপ্যাথরা বলেন, ইরিসিপেলাস। অসুখটির ডাক্তারি ব্যাখ্যা এরকম :

It is an infection of the upper dermis and superficial lymphatics, usually caused by beta-hemolytic group A streptococcus bacteria on scratches or otherwise infected areas.

স্ট্রেপটোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এমন হতেই পারে, সেপটিসিমিক শক-এর কবলে পড়ে যান তিনি। এই শক শুরু হয় খানিকটা অতর্কিতে। রোগী বা তাঁর পরিজনদের সচেতন হবার সুযোগ না দিয়েই। প্রায় মাসখানেক পর হেমন্তবালা দেবীকে এক চিঠিতে তিনি লিখলেন : বারান্দায় বসে সুনন্দা সুধাকান্ত আর ক্ষিতিমোহনবাবুর স্ত্রীকে মুখে মুখে বানিয়ে এক দীর্ঘ গল্প বলছিলুম। বাইরে বাদলা বাতাস, শীত শীত করছিল একটু। গল্প শেষ করে ঘরে গিয়ে আরামকেদারায় বসলুম, শরীরে কোনও কষ্ট নেই। এরই মাঝে কখন যে মূর্চ্ছা এসে আক্রমণ করল, কিছুই জানিনে। রাত ন'টার সময় সুধাকান্ত আমার খবর নিতে এসে আবিষ্কার করলে আমার অচেতন দশা। পঞ্চাশ ঘণ্টা কেটে গেছে অজ্ঞান অবস্থায়, কোনও রকম কষ্টের স্মৃতি মনে নেই।

ওই চিঠিতেই আরও লিখছেন রবীন্দ্রনাথ : কিছুকালের জন্য মৃত্যুদূত এসে আমার ছুটির পাওনা পাকা করে গিয়েছে। মনে করছি আমার ভীষ্মপর্ব শেষ হল। অনবরত তুচ্ছ দাবির শরবর্ষণ আজ থেকে ব্যর্থ হবে। — স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত এরকমই যেন চলে এই কামনা করছি।

স্যার নীলতরন সরকার আর তাঁর সহযোগী ডাক্তারদের অক্লান্ত চেষ্টায় সে যাত্রা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কবি। কিন্তু এমন এক অভাবনীয় ধাক্কা, তার উপর এনলার্জড প্রস্টেটের উপসর্গে মূত্রাশয়ের কষ্ট কবির শরীরে বড়রকমের প্রভাব ফেলে গিয়েছিল। চোখের সামনে ভেঙে পড়তে লাগল সেই অনিন্দ্যকান্তি। এতটাই যে, আয়নার সামনে দাঁড়াতেও সঙ্কোচ বোধ করতেন কবি। রাণী মহলানবিশকে এই সময়ে এক চিঠিতে লিখছেন : মৃত্যুর ধাক্কা খেয়ে কলকব্জা নড়বড়ে হয়ে গেছে। (আয়নায়) নিজের প্রতিবিম্ব দেখা বন্ধ করে অবারিত কুশ্রীতা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। নরসমাজে এরকম রূপবিকৃতি অসভ্যতা।... দেহটাকে ছেড়ে নিজের নিরাসক্ত মনটাকে নিয়ে আছি।

সত্যিই যেন অন্তিম অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। স্নানের পর ক্লান্তি এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, অনেকক্ষণ কাঁপতে থাকে দু'হাত। কানে আজকাল খুব কম শোনেন, চিনতে কষ্ট হয় পরিচিত মানুষদেরও। মস্তিষ্কের ভেতর কেমন একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব। তবু এরই মধ্যে অবিশ্রান্ত ধারায় চলতে লাগল লেখালিখি। কবিতা, একের পর এক ছড়া, প্রবন্ধ। প্রান্তিক-এর ৯ এবং ১০ নম্বর কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার মৃত্যুবোধ হঠাৎ যেন ঝলসে উঠল :

১। দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়

২। মৃত্যুদূত এসেছিল হে প্রলয়ংকর, অকস্মাৎ
তব সভা হতে। নিয়ে গেল বিরাট প্রাঙ্গনে তব;
চক্ষে দেখিলাম অন্ধকার; দেখিনি অদৃশ্য আলো
আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক
নিখিল জ্যোতির জ্যোতি; দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া
আমার আপন ছায়া।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে ধীরে ধীরে। তার উপর ১৯৪০ সাল অবধি পরপর প্রিয়জনদের মৃত্যু। একে একে চলে গেলেন জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি এফ এন্ড্রুজ, কালীমোহন ঘোষ, সুরেন ঠাকুর। অবসন্ন মনে তবু লেখার কাজ করে চলেছেন তিনি। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন গান, কবিতা, গল্প। সম্পাদনা করছেন গীতবিতান। ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের আশায় ১৯৩৮ সালে ২৫ এপ্রিল রওনা হলেন কালিম্পং। সেখানে এক

মাস থেকে মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে মংপু। সেখান থেকে আবার কালিম্পং। অসুস্থ শরীর, চেঞ্জে এসেছেন, কিন্তু লেখার কোনও বিরাম নেই। একের পর এক ভূমিষ্ঠ হচ্ছে কবিতা, যারা পরে স্থান করে নেবে সেঁজুতি এবং নবজাতক বইয়ে। চলছে সানাই এবং খাপছাড়ার কবিতা, চলছে শ্যামা নৃত্যনাট্য। সেবছর জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনে ফিরে পরের বছর এপ্রিলে আবার বেরিয়ে পড়লেন রবীন্দ্রনাথ। গন্তব্য এবারে পুরী। কয়েক সপ্তাহ সমুদ্রবাতাসের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আবার সেই মংপু। মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্যে।

সুস্থ হবার এত আকাঙ্ক্ষা, তবু শরীর যে কিছুতেই জুতে আসে না। প্রস্টেট আর ইউরিনের কষ্ট। ঠাণ্ডা লেগে মাঝেমাঝে জ্বর আসে। ইদানীং কানেও শোনেন কম।

মৈত্রেয়ী দেবী একদিন কবির পাশে এসে বললেন : আজ তো আপনার শরীরটা বিশেষ ভালো নয় দেখছি।

— এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি একমত। কলটা আজ বিগড়েছে।

— কী করা যায়?

— বিশেষ কিছুই নয়। পায়ের কাছে মোড়াটা অনায়াসে এগিয়ে দেওয়া যায়। আর যদি খুব কষ্ট না হয়, তাহলে চাদরটাকেও পায়ের ওপর চাপা দেওয়া যায়। কান তো প্রায় গেল, কিন্তু সেও সহ্য হবে, শুধু চোখটা না যায়। তাহলে এই আনন্দময় ভুবন তোমাকে কে দেখাবে?

ইরিসিপেলাসের সেই ভয়ঙ্কর শকের পর আবার তিনি বড় অসুখে পড়লেন ১৯৪০ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সেবারেও রবীন্দ্রনাথ কালিম্পংয়ে। সঙ্গে আছেন প্রতিমা দেবী, সচিব সচ্চিদানন্দ রায় আর পুরাতন ভৃত্য বনমালী। পুত্র রথীন্দ্রনাথ জামিদারি দেখতে গেছেন পূর্ববঙ্গে। কোথায় ডাক্তার, কোথায় বা হাসপাতাল। রোগী প্রায় অজ্ঞান, ইউরিন বন্ধ, ইউরেমিয়া হয় হয়। অনেক সন্ধান করে দার্জিলিংয়ের এক ইংরেজ সিভিল সার্জেনকে ধরে আনা হলো। এতবড় নামজাদা রোগী, তিনি এসে নিদান দিলেন, অপারেশনটা এখনই করে ফেলা দরকার। আজ রাতেই।

বাবামশায়ের যে অপারেশনে মত নেই, বিলক্ষণ জানতেন প্রতিমা দেবী। সাহেব ডাক্তারের হাজারো হুঁশিয়ারির পরেও অটল রইলেন তিনি। পরদিন ডা: সত্যসখা মৈত্র সদলবলে কালিম্পয়ে এসে কবিকে গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দিলেন, অনেকখানি ইউরিন হয়ে গেল। এরপর অতি কষ্টে প্রায় অচেতন রবীন্দ্রনাথকে পাহাড় থেকে শিলিগুড়ি নামিয়ে এনে ট্রেনে করে নিয়ে আসা হলো কলকাতায়। জোড়াসাঁকোয় ঢুকলেন ২৯ সেপ্টেম্বর।

রোগশয্যায় কবি। উঠতে পারেন না বড় একটা। বড় বড় ডাক্তারদের আনাগোনা বেড়ে গেল জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। আসছেন স্যার নীলরতন সরকার, আসছেন বিধান রায়। নীচু গলায়

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

পরামর্শ চলে, কী করে সুস্থ করা যায় এই সেনসিটিভ রোগীকে। নিজের হাতে লিখতে পারছেন না বলে সৃষ্টি কিন্তু মোটেই বন্ধ হয়নি রবীন্দ্রনাথের। মুখে মুখে বলে যান কবিতা। দ্রুত হাতে লিখে নেন সেবিকারা। কখনও রাণী চন্দ, কখনও প্রতিমা দেবী, কখনও বা নির্মলকুমারী। এভাবেই একদিন জন্ম দিলেন এই কবিতাটির—

ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় যাত্রার সময় বুঝি এল,
বিদায়দিনের পরে আবরণ ফেলো
অপ্রগল্‌ভ সূর্যাস্ত আভার;
সময় যাবার
শান্ত হোক, স্তব্ধ হোক, স্মরণ সভার সমারোহ
না রচুক শোকের সম্মোহ।
(আরোগ্য)

কবির সাহিত্য সচিব ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নন্দগোপাল সেনগুপ্ত স্মৃতিচারণ করেছেন রোগজীর্ণ রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কোনও এক দিনের :

শান্তিনিকেতনে তখন চলছে গরমের ছুটি। ছেলেমেয়েরা নেই, অধ্যাপকরাও অনেকেই চলে গেছেন। নীরব নিঃসঙ্গ সেই শান্তিনিকেতনে উদয়নের একতলায় শয্যাশায়ী কবি। উঠতে বসতে পারেন না, কানে খুব কম শোনেন, মানুষও চিনতে পারেন অতি কষ্টে। নন্দগোপাল পায়ের কাছে একটা মোড়া নিয়ে বসলেন। আস্তে আস্তে হাত বুলাতে লাগলেন দুই পায়ে। দেখলেন, বেশ ফুলেছে পা দুটো। কবি যেন বুঝলেন ব্যাপারটা। পাণ্ডুর মুখে দেখা দিল এক টুকরো হাসি। বললেন, 'মরণ চরণে শরণ নিয়েছে। তাকে

আর বিমুখ করব না হে।' কান্না চেপে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন নন্দগোপাল সত্যি তো, আর যে দেরি নেই!

।। তিন।।

অসুখ যেন ধাপে ধাপে আরোগ্যহীনতার দিকে এগিয়ে চলেছে। শান্তিনিকেতনে থাকুন, অথবা জোড়াসাঁকোয়— প্রতিদিনই ঘুরে ঘুরে আসছে জ্বর। কখনও ৯৮, কখনও ৯৯, প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা বেড়ে গেলে ১০০-ও পেরিয়ে যাচ্ছে শরীরের তাপমাত্রা। ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের উদয়ন বাড়িতে তাঁর চুল কেটে ছোট করে দেওয়া হয়। দীর্ঘ রোগযন্ত্রণায় পাণ্ডুর মুখ, শিথিল অবসন্ন ত্বক, মাথার সামনের দিকে টাক পড়েছে। অনেকটা যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শেষ বেলাকার আদল। ১৯৪১ সালের ৮ মে তাঁর জীবনের শেষ পঁচিশে বৈশাখও কাটল অস্থিরতায়। ভালো ঘুম হচ্ছে না। নিজে থেকেই বায়োকেমিক ওষুধ কালি ফস্ খেলেন, ওডিকোলন মাথায় দিলেন— একটু যদি স্বস্তি পাওয়া যায়। এরই দু-একদিন পর শান্তিনিকেতনে অসুস্থ কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন সস্ত্রীক বুদ্ধদেব বসু। তাঁর চোখে কবির এই রূপ যেন আশ্চর্য এক মহনীয়তায় বিস্তারিত হয়ে গেছে। বর্ণনা দিচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু : 'মুখ তাঁর শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রঙ ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনও পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামত, তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধাবিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনও অম্লান। ... এর জন্য এই বয়সের ভার আর রোগ দুঃখ ভোগের দরকার ছিল।'

হয়তো সত্যিই বলেছেন বুদ্ধদেব। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই রোগভোগ এমনই নাছোড় আর নিষ্করুণ যে ইহজন্মে তার থেকে পরিত্রাণ মিলল না। প্রস্টেটের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্যের সীমার ছাড়াচ্ছে বারবার, সারাদিন আধো ঘুম আধো জাগরণের অবস্থা। সারা রাতও। তবু জাত-স্রষ্টা বলেই হঠাৎ হঠাৎ তিনি বলে উঠতেন, লিখে নাও।

এই বয়সে তাঁর শরীরে সুপ্রা পিউবিক সিস্টোস্টমির মতো ছোট অপারেশনও করা উচিত কিনা তাই নিয়ে সেকালের দিক্‌পাল ডাক্তররা দু'দলে ভাগ হয়ে যান। অপারেশন চাইছিলেন না রবীন্দ্রনাথ, চাননি স্যার নীলরতন সরকার। কিন্তু ভীষণভাবে চাইছিলেন বিধান রায় এবং আরও কয়েকজন চিকিৎসক। টানাপোড়েনে পড়ে কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না কবির একমাত্র জীবিত সন্তান রথীন্দ্রনাথ। এইভাবেই কাটছিল দিন।

এমনই এক দিন ১৯৪১ সালের ১৩ মে। কিছুদিন আগে পেরিয়ে গেছে কবির জীবনের শেষ পঁচিশে বৈশাখ। গায়ে জ্বর আর মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে রোগশয্যায় শুয়ে তিনি। এমন ঘোর লাগা অবস্থাতেই অকস্মাৎ বলে উঠলেন :

রূপনারায়ণের কূলে জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।

সেবিকারা পাশেই ছিলেন, ছিল কাগজ কলমও। কেউ একজন লিখে নিলেন দ্রুত হাতে। এটুকু বলেই হাঁফ ধরে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের। কথা খুঁজছেন। খানিক পরে আবার বলতে শুরু করলেন :

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম / আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে / আঘাতে আঘাতে / বেদনায় বেদনায়;

শরীরে বড় কষ্ট। ক্লান্তিতে চোখ বুজছেন কবি। ঘুমিয়েও পড়লেন। হঠাৎ জেগে উঠলেন সন্ধে সোয়া ছ'টা নাগাদ। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে বলে উঠলেন বাকিটা লেখো। সেবিকা হিসাবে রাণী চন্দের ডিউটি তখন :

সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালবাসিলাম,
সে কখনও করে না বঞ্চনা
আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

কবিতাটা শেষ করে কিছুক্ষণের জন্য যেন নিঃশেষ হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে পড়লেন। জগৎ পরে জানল, তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী আবারও কি এক আশ্চর্য কবিতার জন্ম দিয়েছে।

দেখতে দেখতে আরও দু'মাস কাটল। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর ডাক্তাররা মোটামুটি বলেই দিয়েছেন অপারেশন হচ্ছেই। বিপদ হল, সেই ৪০-৪১ সালে পেনিসিলিনের মতো প্রাথমিক স্তরের অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কার হয়নি। রবীন্দ্রনাথের মতো রোগীর শরীরে অস্ত্রোপচারের ধকল কতটা সইবে, কোনওভাবে ইনফেকশন এসে পড়বে কিনা, যদি আসে কী তার প্রতিকার— এসব ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত ছিলেন না। তবু কবিকে 'রিলিফ' দেওয়ার তাগিদটা ক্রমশ এত বড় হয়ে উঠছিল যে, শেষপর্যন্ত রথীন্দ্রনাথ মত দিয়ে দিলেন। মত ছিল না স্যার নীলরতনের, যে মেডিকেল বোর্ড কবির অস্ত্রোপচারের জন্য গঠিত হলো তা থেকে সরিয়ে নিলেন নিজেকে।

২৭ জুলাই, ১৯৪১। দু'দিন আগে স্ট্রেচারে করে জোড়াসাঁকোয় আনা হয়েছে কবিকে। শান্তিনিকেতন থেকে সেই তাঁর শেষযাত্রা। হাওড়ায় ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনেই স্ট্রেচারে শোয়ানো হলো তাঁকে। পথের ধকলে এত কাহিল হয়ে পড়েছিলেন যে, বাড়ি পৌঁছেও স্ট্রেচারেই শুয়ে রইলেন। ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ঘর আগে থেকে খালি করে ফেলা হয়েছে অপারেশন হবে বলে। সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পূর্বপুরুষদের বাঁধানো ছবি। চারদিক লাইজল

দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝকমকে। কবির ঠাঁই হলো মহর্ষি ভবনের দোতলার পাথরের ঘরে। অস্ত্রোপচারের প্রস্তুতি হিসাবে আসা-যাওয়া চলছে ডাক্তারবাবুদের। ২৬ জুলাই বিকেলের দিকে আবার শরীর খারাপ। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর উঠল ১০২.৪। চাপাচুপি দিয়ে রাখার খানিকক্ষণ পর আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। পরদিন রবিবার ২৭ জুলাই ভোর হতে না হতেই ফের আবির্ভাব কবিতার!

ডিউটিতে তখন ছিলেন রাণী চন্দ। রবীন্দ্রনাথ একটু যেন অস্থির। হাতটা তুলে বললেন, কয়েকটা লাইন এসেছে মাথায়। লিখে নে। নয়তো হারিয়ে ফেলব। রানী চন্দ কাগজ-কলম নিয়ে ঝুঁকে পড়ে লিখতে লাগলেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—

থেমে গেছেন কবি। কী যেন ভাবছেন তন্ময় হয়ে। তারপর আবার বলেন—

কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।

আত্মগত ভাবে তিনি বলছেন : প্রতিবারই ভাবি ঝুলি খালি হয়ে গেল। এবার চুপচাপ থাকি। কিন্তু পারিনে। লিখে রাখ—

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

লেখা শেষ। কবির মুখে শিশুর মতো হাসি। মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছেও একের পর এক নতুন কবিতার জন্ম দিয়ে চলেছেন যিনি, তিনি কি কোনও সাধারণ মানুষ? নিজেই বলছেন, 'এটা পাগলামি না তো কি? এর কি কোনও শেষ নেই?'

শেষ বোধহয় সত্যিই নেই। ২৯ জুলাই সন্ধেবেলা রাণী মহলানবিশরা জোড়াসাঁকোয় এসে শোনেন, বিকেলবেলা নাকি আরও একটা কবিতা হয়েছে। শেষ লেখার সেই বিখ্যাত ১৪ নম্বর কবিতা—

'মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে'

সাতাত্তর বছর কেটে গেছে, রবীন্দ্রনাথ নেই। তবু তাঁকে নিয়ে আজও বিস্ময় কাটে না আপামর বাঙালির। রোগশয্যায় শুয়েও যিনি ভাবতে শেখাচ্ছেন, ভাষা জোগাচ্ছেন গোটা একটা জাতিকে। মৃত্যুর গুহা থেকে অমৃতময় আলোর দিকে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যাবেন পরম পিতা, সেই তো স্বাভাবিক। বাইশে শ্রাবণের কান্নাভেজা দুপুরে কবির হৃদ্‌স্পন্দন যখন নিভু নিভু, উষ্ণতা কমে আসছে হাত-পায়ের, বাইরের বারান্দায় বসে কারা যেন গান ধরল— কে যায় অমৃতধাম যাত্রী। জনতার কোলাহল ছাপিয়ে মন্ত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হতে লাগল—

বাবামশায়ে'র একান্ত নিজস্ব মন্ত্র—
শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।

ঋণ : প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত কুমার পাল, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, রাণী চন্দ, মৈত্রেয়ী দেবী, শঙ্খ ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী।

Kedia Fabrics

Kamal Kumar Kedia

Mfg. & Dealer of Fancy Sarees

160, Jamunalal Bazaz Street, 2nd Floor,

Kolkata-700 007 (s) 2272-5487

Mob : 9331105467

AVIMA EXPORTS (P) LTD.

Exporters of Quality Jute Goods & Rice

91A/1, Park Street, Office No - 2
Kolkata-700 016
Phone : 40050050 / 51
Fax : 2243 2659, 40050071
e-mail : info@juteonline.com

With
Best
Compliments
From-

S. K. KAMANI

KHIMJEE HUNSRAJ

Head Office : 9, Rabindra Sarani,
Kolkata - 700 073
Tel. : (033) 2235-4486 / 87 / 88
3292-4221
Fax : 2221-5638
E-mail : office@khimjee.com
Web Site : www.khimjee.com

অন্ধকারের গল্প

গোপাল চক্রবর্তী

বার দুই কলিং বেল টিপতেই জ্যাঠামশাই নিজেই দরজা খুলে দিলেন। এই সময়ে উড়িয়া ভূতনাথ ঠাকুর দেশোওয়ালি ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শান্তিনাথতলায় যায়। ঝি গঙ্গাদি একগাল পান খেয়ে নাক ডেকে ঘুমায় আর আমি জ্যাঠামশাইকে বই পড়ে শোনাই। এটাই আমার কাজ। আরও দু'একটা কাজ আমাকে করতে হয়। যেমন, জ্যাঠামশাইয়ের টালিগঞ্জের বাড়ির চারঘর ভাড়াটের ভাড়াটা প্রতি মাসের পাঁচ

তারিখে গিয়ে নিয়ে আসা। নীচের দুটো দোকানের ভাড়া নিয়ে রসিদ দেওয়া। টাকা জমা দেওয়া এবং তোলার জন্য ব্যাঙ্কে যাওয়া। আর মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিট থেকে নতুন বই কিনে আনা। আজ পাঁচ তারিখ, তাই আমি গিয়েছিলাম টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে ভাড়া তোলার জন্য।

— কী হলো, এতো দেরি হলো যে?

— রাস্তায় জ্যাম ছিল, মিছিল বেরিয়েছে।

— এই মিছিল করে করেই তো দেশটা গেল।

— এ আবার অন্য মিছিল।

আমি টাকার প্যাকেটগুলো জ্যাঠামশাইয়ের হাতে দিলাম। তিনি টাকাটা গুনে আলমারির লকারে রেখে বললেন— কী রকম মিছিল?

— বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় যারা খুন-ধর্ষণ লুণ্ঠনে অভিযুক্ত ছিল, তাদের হাসিনা সরকার বিচার শুরু করেছে। বিশেষ আদালত পাঁচ অভিযুক্তকে ফাঁসির সাজা শুনিয়েছে, তার প্রতিবাদে মুসলিম মৌলবাদীরা শহিদ মিনারে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে, চারদিক থেকে মিছিল আসছে, তাই যানজট।

— আমাদের সরকার এই সমাবেশের অনুমতি দিল?

— শুধু অনুমতি কেন, বিক্ষোভকারীদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থাও করেছে।

— শুভময়, এ কোন দেশে আছি আমরা? বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় এরা তিরিশ লক্ষ মানুষ মেরেছিল। কুড়ি লক্ষ নারীকে ধর্ষণ করেছিল। আজ তাদের শাস্তি হচ্ছে বলে এখানে প্রতিবাদ? সরকারি মদতে?

— ওরা তো স্বাধীনতার শত্রুদের শাস্তি দেবার মতো সাহস দেখিয়েছে বলুন। যা আমাদের প্রশাসন পারে না।

— কী করে পারবে বলো? ভোট যে বড় বালাই। ভোটভিখারি দল, ভোটের জন্য যে এরা সব সময় হাত জোড় করে রয়েছে। সে যে দলই হোক। যাক, তুমি কিছু খেয়ে নাও।

— আমি তো খেয়েই বেরিয়েছিলাম।

— ও, তা জলটল খেয়ে নাও।

— ঠিক আছে, নিচ্ছি। আপনি আজ কী শুনবেন? বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ শুরু করার কথা ছিল আজ।

— থাক, শুভময়। তোমার কাছে খবরটা শুনে আমার মনটা বড় অস্থির হয়ে গেল। আজ আর কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে না। আজ বরং আমি বলি, তুমি শোনো।

কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। জ্যাঠামশাই কী যেন ভাবছেন, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা। জ্যাঠামশাইয়ের নাম মণিশঙ্কর গাঙ্গুলি। বয়স আশি বছর হলেও শক্ত সমর্থ মানুষ। আমি দু'বছর এ বাড়িতে আছি। কোনওদিন জ্যাঠামশাইয়ের জ্বরজারি হতে দেখিনি। এই বয়সেও সব চুল পাকেনি। তবে দৃষ্টিটা কম, চশমাতেও কাজ হয় না। কিন্তু স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। জ্যাঠামশাই আমার দিকে মুখ তুলে তাকালেন কেমন ঝাপসা দৃষ্টিতে। বললেন, — আচ্ছা শুভময়, তুমি এতদিন এই বাড়িতে আছ, তোমার কখনও জানতে ইচ্ছে করেনি, এতবড় বাড়িতে আমি একা কেন? আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই কেন?

— জ্যাঠামশাই, এই প্রশ্নটা যে আমার মনে আসেনি তা নয়। তবে বেশি কৌতূহল হয়তো ধৃষ্টতা হবে, তাই চুপ করেই ছিলাম।

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। জ্যাঠামশাই কথা বললেন—

— এই যে বাড়িটা দেখছ, এটা একদিন জমজমাট ছিল। আজ থেকে ৬০ বছর আগে আমার বয়স তখন ২০, বি-এ পাশ করেছি। বাবা জয়শঙ্কর গাঙ্গুলি হাইকোর্টের উকিল। দাদা উমাশঙ্কর সদ্য এল এল বি পাশ করে বাবার জুনিয়র হয়েছে। বছরখানের আগে দাদার বিয়ে হয়েছে। বৌদি অসাধারণ সুন্দরী। আমার এক বোন ছিল রত্না, সেবার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। মায়ের ইচ্ছে ছিল তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বোন বায়না ধরেছে সে আরও পড়বে। বাবার ইচ্ছায় সে ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হলো। তার কলেজে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমি মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে বাবাকে রাজি করিয়ে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে তাকে ভর্তি করেছিলাম। আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে রত্না ছিল সবচাইতে মিশুকে। দিন কয়েকের মধ্যে ভিক্টোরিয়ায় অনেক বান্ধবী জুটিয়ে ফেলেছিল সে। তাদের একজন কাবেরী। কাবেরী মুখার্জি। বর্ধমানের এক জমিদারের মেয়ে। সে থাকত ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে। রত্না মাঝেমাঝে কাবেরীকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসত। কাবেরী বাড়িতে এলেই আমাদের বাড়িটা যেন হাসি-ঠাট্টা, গানে, গল্পে মুখর হয়ে উঠত। আমার রাশভারী বাবা, গোমড়ামুখো দাদা, জাঁদরেল মা, সবাই কাবেরীর কাছে সহজ সরল হয়ে উঠত। শুধুমাত্র বৌদি একটু ব্যতিক্রম ছিল। বৌদির একটু রূপের গুমোর ছিল। কিন্তু কাবেরী ছিল বৌদির থেকেও সুন্দরী। মা একদিন কাবেরীর চিবুক ধরে বলে ফেললেন—

—আমার মেয়েটাকে আমি কলেজে পাঠাতে চাইনি, এখন দেখছি মেয়ে কলেজে না গেলে আর একটা মেয়েকে আমি পেতামই না।

একদিন রত্না আমার ঘরে এসে বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে বলল— আচ্ছা ছোড়দা, কাবেরীকে তোমার কেমন লাগে?

— মন্দ না।

— পছন্দ হয় তো বল। ঘটকালি করি, বাবামায়ের নিশ্চয় আপত্তি থাকবে না।

—খুব পাকা হয়েছ না! মারবো চাটি, বুঝবি ঠেলা।
রত্না সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে মণিশঙ্করের মনের কথাটা বুছে গিয়েছিল। একদিন মা সুভদ্রা বাবা জয়শঙ্করের কাছে গিয়ে বললেন—
— এই কাবেরী মেয়েটাকে আমাদের বাড়ির ছোট বৌ করে আনা যায় না?
— কথাটা যে আমিও ভাবিনি তা নয়। আমি খবর নিয়েছি, ওরা আমাদের পাল্টি ঘর, জমিদার বংশ। তবে ছোটখোকা তো এখনও কিছু উপার্জন করে না।
— তাতে কী হয়েছে? উপার্জন না করলে ওদের খাওয়া জুটবে না নাকি?
— না, না। ব্যাপারটা তা নয়। এখনকার দিনের ছেলেমেয়ে, ওরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়।
— তা তুমি পারো না ছোটখোকার একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে?
— তা পারবো না কেন? কিন্তু তোমার ছেলে কি এখন বিয়ে করবে? সে তো এম-এ-তে ভর্তি হবে বলছে। সে তো বলেই দিয়েছে প্রফেসরি ছাড়া অন্য কোনও কাজ সে করবে না।
— যাই বলো বাপু, এ মেয়েটাকে আমি হাতছাড়া করতে পারবো না। আচ্ছা, এমন হয় না যে ওরা দুজনেই পড়াশুনা করুক, পাশ করুক, তারপর না হয় বছর— হ্যাঁ গো এম-এ পাশ দিতে কত দিন লাগে?
— তা ধরো দু'বছর। আর পাশ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তো চাকরি পাবে না। সময় লাগবে, অতদিন ওরা অপেক্ষা করবে কেন?
— করবে, করবে। আমার ছেলে ফেলনা নাকি? আমরা কাবেরীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।
— দেখো, ওরা জমিদার মানুষ। আমাদের মতো ছাপোষা ঘরে মেয়ে দিতে রাজি হবে কিনা!
— তুমিই বা কম কিসে? এনিয়ে কাবেরীর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওদের কাছে একটা পত্র লিখলে কেমন হয়?
— হাঁ, তা অবশ্য লেখা যায়।
— আমার ভয় ছিল, আমার রতনটা শ্বশুর ঘরে চলে গেলে বাড়িটার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটাও বুঝি ফাঁকা হয়ে যাবে। তার আগেই আমি কাবেরীকে এবাড়িতে নিয়ে আসব। মেয়েটার কাজকম্ম দেখেছ? সেদিন কেমন মাছের টক করে খাওয়ালো?
— হ্যাঁ, ওটা ওদের বর্ধমানের রান্নার বিশেষ পদ।
সেদিন কলেজ থেকে ফিরে রত্না সটান এসে গেল মণিশঙ্করের ঘরে, বেশ আদেশের সুরে বলল—
— ছোড়দা শোন, আগামী রোববার কোনও কাজ রাখবে না।
মণিশঙ্কর অবাক হয়ে বলল— কেন?
— শনিবার কাবেরী আমাদের বাড়িতে আসবে, ও কোনওদিন চিড়িয়াখানা দেখেনি, ওকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যেতে হবে।
— পারবো না। আমি কারও হুকুমের চাকর নই। অর্ডার করল আর আমি ছুটলাম।
— এই ছোড়দা, তুমি এমন গোঁয়ারের মতো কথা বলছ কেন? কাবেরী বাড়িতে এলে সেদিন তো বাড়ি থেকে নড়তে চাও না। কারণে অকারণে আমার ঘরে উঁকিঝুকি মারো...
মণিশঙ্কর এবার সত্যি রেগে যায়। বলে— শোন্ খুকু, তুই যা-তা বলবি না বলে দিলাম।
— হুঁ, সত্যি বললে যা তা বলা হয় না? ঠিক আছে যাবে না তো যাবে না। আমরা নিজেরাই যাবো।
রাগে গজ্‌গজ্ করতে করতে চলে গেল রত্না। শনিবার কলেজ ছুটির পর কাবেরী এল রত্নার সঙ্গে। সেদিন কংগ্রেস অফিসে একটা মিটিং থাকলেও ইচ্ছে করেই মণিশঙ্কর যায়নি। এক বন্ধু ডাকতে এসেছিল, বলেছে শরীর খারাপ। দুপুরে ঘুমোতেও পারেনি খোলা জানালা দিয়ে বারবার গেটের দিকে তাকাচ্ছিল। বিকেলের দিকে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল গেটের সামনে। গাড়ি থেকে নামল রত্না আর কাবেরী। মা এগিয়ে গিয়ে নিয়ে এলেন। রত্নার ঘরে ব্যাগটা রেখে কাবেরী সোজা চলে এল মণিশঙ্করের ঘরে। মণিশঙ্কর তখন শুয়ে শুয়ে একটা ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়ছিল। কাবেরী ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। দু'হাত কোমরে রেখে ছদ্ম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল— এই যে মশাই, রতন আপনাকে বলেছিল রবিবার দিন আমাদের চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। আপনি বলেছেন, আপনি কারও হুকুমের চাকর নন। কি, বলেছেন কিনা?
— আমি, কই না তো। আমি আবার কবে এই কথা বললাম। রত্না বলেছে বুঝি? মিথ্যে কথা বলেছে, ও না ভীষণ মিথ্যা কথা বলে। ওর কোনও কথা বিশ্বাস করবেন না। মিথ্যেবাদী একটা।
এতক্ষণ হয়তো আড়ালে ছিল রত্না। এবার সামনে এসে বলল— কে মিথ্যেবাদী?
— না, মানে ঐ...
— বলো, বলো, কে মিথ্যেবাদী?
— না, না। মিথ্যেবাদী কেউ না। ওই একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে আর কী। চলো আমরা অপোশ করে নিই।
— কাল সকাল ন'টার মধ্যে রেডি হয়ে থাকবেন। দ্বিতীয়বার যেন বলতে না হয়।
কাবেরী যেমন এসেছিল, তেমনি চলে গেল। রত্না বেরিয়ে যাওয়ার সময় মণিশঙ্কর হাত ধরে থামাল। বলল— তুই আমাকে এভাবে ফাঁসিয়ে দিলি?
— দাঁড়াও না, সবে তো শুরু।

বলেই ছুটে বেরিয়ে গেল রত্না। পরদিন সবাই হৈহৈ করে চিড়িয়াখানায় গেল। বৌদির প্রথমে যাওয়ার কথা থাকলেও যাবার সময় প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো। তাই যাওয়া হলো না। রত্না মুখ টিপে হাসল। কাবেরী জোর করে নিয়ে গেল মা-কে। সেদিন রাতে কাবেরী বলল— মেসোমশাই, বাবা-মা দুজনেই বলেছেন আপনি আর মাসীমাকে আমাদের বাড়ি যাবার জন্য, কবে যাবেন বলুন?

জয়শঙ্কর বললেন— দেখছো তো মা, আমার ছুটি কোথায়? ছুটির দিনেই কাজ বেশি। তুমি বাবা মাকে আমার হয়ে বলো, উনারা যেন দয়া করে একবার আসেন। এবাড়িতে পায়ের ধুলো দেন। আমি বরং একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি।

কাবেরী বলল— বাবা বলছিলেন হাইকোর্টে একটা মামলার জন্য আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। বাবা আপনার নাম শুনেছেন।

— তাহলে তো ভালোই হয়, রথ দেখা কলা বেচা দুটো একসঙ্গে হয়ে যাবে।

বাড়ির ছাদের মণিশঙ্করের ছোট একটা বাগান আছে। টবে ছোট ছোট গাছ সব, বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, গোলাপ। মণিশঙ্কর গাছের পরিচর্যা করে আর রোজ রাতে সেই বাগানে কিছুক্ষণ বসে। তারপর শুতে যাওয়া। সেই রাতেও একা বসেছিল মণিশঙ্কর। বিকেলে কাবেরী এসেছে রত্নার সঙ্গে হোস্টেল থেকে। সন্ধ্যায় ইতিহাসের পড়া বুঝতে গিয়ে মণিশঙ্করের সঙ্গে কিছুক্ষণ তর্ক করল। খাওয়ার আগে মায়ের ঘরে বসে মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প। মায়ের ঘরে রত্নার মতোই অবাধ অধিকার কায়েম করে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। খাওয়ার পর বাবার ঘরে। আমরা ভাই-বোনেরা বাবাকে ছোটবেলা থেকেই ভয় করে এসেছি। কাছে ঘেঁষার সাহস করিনি। সেখানে কাবেরীর ছিল অবাধ গতি। একদিন বাবার জন্য একটা পাইপ এনে তাতে তৈরি তামাক পুরে, বাবার ঠোঁটে লাগিয়ে বলল— মেসোমশাই এখন থেকে এটা, ওই বুড়োদের মতো গড়গড়া আর চলবে না।

— এই বয়সে আবার এসব কেন মা? আর আমি তো বুড়োই—

— নো, নো। ইউ আর এভারগ্রিন মেসোমশাই।

— দূর পাগলি।

বাবা রত্নার সঙ্গেও এতটা সহজ কোনওদিন হননি। পেছনে কাদের মৃদু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মণিশঙ্কর জানে নিশ্চয় রত্না আর কাবেরী। ঠিক মণিশঙ্করের পেছনে এসে দাঁড়াল ওরা।

কাবেরী বলল— ওঃ কি মিষ্টি গন্ধ। এটা কী ফুল রে?

— আমি নাম জানি না। ছোড়দা জানে।

— বলতে পারছেন না এটা কী ফুল?

— দুটো ফুল এখন গন্ধ ছড়াচ্ছে, একটা বেল আর একটা গন্ধরাজ।

কেউ কোনও কথা বলে না। পাশের গাছের ডালে একটা 'বউ কথা কও' অবিরাম ডেকে চলেছে। রত্না বলল— তুই একটু দাঁড়া কাবেরী, আমার বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খেয়ে আসছি।

— চল আমিও যাচ্ছি।

— আরে বাবা দু'মিনিট দাঁড়া না, ঘরে গুমোট।

কাবেরীকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রত্না দ্রুত চলে গেল। মণিশঙ্কর বলল— কী ভয় করছে?

— সে তো আপনারই করার কথা। আমাকে দেখলে তো আপনার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায়।

— কে বলল?

— আমি দেখেই বুঝতে পারি।

— সব বুঝতে পারেন?

— হ্যাঁ।

— তাহলে বলুন দেখি আমি মনে মনে এখন কী ভাবছি?

— এ তো খুব সোজা। আপনি ভাবছেন এই আপদটা এখান থেকে গেলে বাঁচি।

— ছাই বুঝেছেন।

— এই শুনুন, আপনি আমাকে, আপনি আজ্ঞে করবেন না তো। ভালো লাগে না।

— ঠিক আছে, তাহলে তুমিও আমাকে তুমি বলবে।

— বলবো, ধীরে ধীরে।

— কাবেরী।

— কী?

মণিশঙ্কর আবেগে কাবেরীর হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল— তুমি আসবে তো আমার ঘরে? বলো—

— তুমি ডাকলেই আসব।

— শুধু আমি নই, আমাদের বাড়ির সবাই চাইছে তুমি আমাদের বাড়িতে বউ হয়ে এসো।

সিঁড়ি দিয়ে ধুপধাপ শব্দ করে উঠে আসছে রত্না। ওরা দুজন সরে গেল।

রত্না বলল— খুব তাড়াতাড়ি এসে পড়েছি বলো?

— দাঁড়াও তোমার পাকামো বের করছি।

— জানো ছোড়দা, কাবেরী খুব ভালো গান করতে পারে, রবীন্দ্র সঙ্গীত।

— নাগো।

— গাও না একটা গান।

— গা নারে।

কাবেরী গাইল— খুব ধীরে ধীরে...
আজি জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে...

অ্যাডভোকেট জয়শঙ্কর গাঙ্গুলির চিঠি পেয়ে বর্ধমানের জমিদার বিনোদ বিহারী মুখার্জি গাড়ি নিয়ে সটান চলে এলেন মানিকতলায়। সঙ্গে স্ত্রী সুধাময়ী, কন্যা কাবেরী। রবিবার, কোর্ট নেই তবে চেম্বারে মক্কেলের ভিড়। তবুও ফাঁকে ফাঁকে উঠে এসেছেন উকিলবাবু। অতিথি

আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি নেই। এক সময়ে পাইপ টানতে টানতে উকিলবাবু এলেন সব মক্কেল বিদায় করে।
বললেন— মেয়ের কাণ্ড দেখুন। আমাকে হুঁকো ছাড়িয়ে পাইপ ধরিয়ে দিয়েছে।
— আমি তো ভেবে পাচ্ছিলাম না এই পাইপ দিয়ে ও করবেটা কী? আমাদের ম্যানেজারকে দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের সাহেবের দোকান থেকে পাইপটা কিনিয়েছে। তবে আমি কোনও প্রশ্ন করিনি। কারণ আমার মেয়ের উপর আমার বিশ্বাস আছে। আমি জানি, ও যা করবে ঠিক কাজই করবে।
বৈঠকখানার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল মণিশঙ্কর, উকিলবাবু ডাকলেন— মণি, একবার শুনে যাও।
মণিশঙ্কর এলে উকিলবাবু বললেন— এ আমার ছোট ছেলে মণিশঙ্কর। এবার বি-এ পাশ করল।
— হ্যাঁ, ওর সাথে আলাপ হয়েছে। ও ইতিহাস নিয়ে এম-এ পড়তে চায় শুনে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমাদের সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে, ইতিহাস বিকৃত হচ্ছে, এসব রক্ষা করা দরকার। আমার অল্প বয়সে বাবা চলে গেলেন, জমিদারির হাল ধরতে গিয়ে পড়াশুনায় বেশি এগুতে পারিনি। তাই যারা পড়াশুনা করে তাদের দেখলে ভালো লাগে। আমার ইচ্ছে আমার মেয়েটাও পড়াশুনা করুক, যতটা করতে চায়।
— মণি, তুমি বিকেলে মাকে নিয়ে উনাদের টালিগঞ্জে তোমার দাদামশাইয়ের বাড়ি থেকে ঘুরিয়ে আনবে। রত্না আর কাবেরীকেও নিয়ে যেও।
— আচ্ছা বাবা, আমি এখন আসি।
— হ্যাঁ, এসো।
— কিন্তু উকিলবাবু আমাকে তো বিকেলে ফিরতে হবে।
— তা বললে কি হয়, আসা নিজের ইচ্ছায়, যাওয়া পরের ইচ্ছায়।
জমিদারবাবু আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।
— কী বলছেন উকিলবাবু, প্রার্থনা আমার কাছে?
— হ্যাঁ, আমি এবং আমার স্ত্রী, আমাদের দুজনের ইচ্ছে আপনার মেয়েটা আমাদের ঘরের বৌ হয়ে আসুক, ওরা যেরকম পড়াশুনা করছে করুক, কথা যদি পাকা হয়ে যায়, তবে বিবাহ কিছুদিন পরে হলেও ক্ষতি কী? দুজনে পড়াশুনা শেষ

করুক।
— দেখুন উকিলবাবু, এতো অতি উত্তম প্রস্তাব। আপনারা যদি আমার মেয়েকে বাড়ির বৌ হিসাবে গ্রহণ করেন, সেটা তো আমার মেয়ের সৌভাগ্য। আপনার মেয়ের মতো একটা মেয়েকে বৌ হিসেবে পাওয়া আমাদেরও ভাগ্য।
সেদিনই টালিগঞ্জে মণিশঙ্করের দাদামশাইয়ের বাড়িতে পাকা কথা হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের একমাত্র মেয়ে মণিশঙ্করের মা। নাতি-নাতনীদের প্রতি তার অপার স্নেহ। কাবেরীকে নাতবৌ হিসাবে তাঁর খুব পছন্দ। উকিল জয়শঙ্করের ইচ্ছে ছিল কাবেরী তাদের বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ুক, কিন্তু বিনোদবিহারী বললেন পড়াশুনাটা কলেজের হোস্টেলে থেকেই করুক। দাদামশাইও তাঁকে সমর্থন করলেন। কাবেরী ভিক্টোরিয়ার হোস্টেলেই থাকলো। সপ্তাহান্তে কোনওদিন বর্ধমানে, কোনওদিন মানিকতলায় আসে। এক একবার মণিশঙ্কর সঙ্গে করে নিয়ে যায় বর্ধমানে, ফেরার পথে সঙ্গে নিয়ে আসে।
ভূতনাথ এসে বলল— বাবু চা দেব?
জ্যাঠামশাই বললেন— না রে, আর শোন, না ডাকলে এ ঘরে কেউ আসবে না।
ভূতনাথ চলে গেল, জ্যাঠামশাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে শুরু করলে— ১৯৪৬ সাল। মুসলিম লিগ যে কোনও মূল্যে দেশ ভাগ করে পাকিস্তান আদায়ের জন্য বদ্ধপরিকর। কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগের সমর্থক। নেহরুজী যেভাবেই হোক স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লালায়িত। বাংলায় তখন সুরাবর্দির শাসন। মুসলমানরা যেভাবে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুঙ্কার দিচ্ছে, তাতে হিন্দুরা সর্বদাই আতঙ্কিত। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশনের আগে বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলিতে মুসলিম লিগের নেতারা উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে দাঙ্গাকারীদের সংগঠিত করতে লাগল। ভয় ত্যাগ করে দাঙ্গাকারীরা যাতে উজ্জীবিত হয়, সেই জন্য তাদের বলা হল বাংলায় এখন সুরাবর্দির মুসলিম লিগ সরকার। পাকিস্তান আদায়ের জন্য এখন দাঙ্গা, খুন, জখম, নারী ধর্ষণ, লুঠতরাজ যাই করা হোক না কেন তার জন্য কোনও শাস্তি হবে না। বরং পাকিস্তান হাসিল হলে দাঙ্গাকারীদের পুরস্কৃত করা হবে।
তারপর কিছুদিন ধরে বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ধর্মতলা, পার্কসার্কাস, এন্টালি প্রভৃতি এলাকার মুসলমান গুন্ডাদের নতুন অস্ত্র সংগ্রহ এবং পুরোনো অস্ত্রে শান দিতে দেখা গেছে। বাংলার মুসলিম লিগ সরকারের চাল সংগ্রহের অন্যতম এজেন্ট ইস্পাহানি তার ব্যবসায় ব্যবহৃত লরিগুলি মুসলিম লিগ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহারের জন্য দেয়। এসব লরির জন্য কলকাতার মেয়র ওসমান, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দিরা পেট্রলের ঢালাও কুপন ইস্যু করে, তাছাড়াও এইসব লরিতে মুসলিম লিগের পতাকা লাগিয়ে বৌবাজার ও সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের পেট্রলপাম্প থেকে জোর করে পেট্রল ভরে নেয়।
১৫ আগস্ট সকালে টালিগঞ্জ থেকে খবর এল, মণিশঙ্করের দাদামশাই খুব অসুস্থ। বাবা মণিশঙ্করকে পাঠালেন দাদামশাইয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়েছিল দাদামশাইয়ের, ডাক্তার দেখে ওষুধ লিখে দিলেন। সেই ওষুধ সময়মত ঘড়ি ধরে খাওয়াতে হবে। দিদিমা ভরসা পাননি, তাই মণিশঙ্করকে রাতে আসতে দেননি।
এদিকে মুসলমান মহল্লাগুলিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা হলো। যাতায়াত এবং লুটপাটের জন্য সরকারি মদতে গাড়ির ব্যবস্থা হলো। কলকাতার গুন্ডবাহিনী ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে নৌকায় করে দাঙ্গাকারীরা এসে গঙ্গার ঘাটে আস্তানা তৈরি করে। তিন সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতির পর এলো সেই কালো দিন— ১৬ আগস্ট। মুসলিম লিগের ডাকা 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে হাওড়া ব্রিজ পার হয়ে দলে দলে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অবাঙালী মুসলিম গুন্ডাবাহিনী এসে মিশে গেল চৌরঙ্গী চিৎপুরে অপেক্ষমাণ ঘাতকবাহিনীর সঙ্গে। ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগ ডেকেছিল হরতাল। সরকারি ছুটি দিয়েছিল সুরাবর্দির সরকার। উদ্দেশ্য মুসলমানরা যাতে নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে পারে। মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির গুন্ডাদের উপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু নিধনের ভার দেওয়া হলো। রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমানদের ভার দেওয়া হলো মানিকতলা থেকে শিয়ালদহ বৌবাজার কলেজ স্ট্রিট এলাকার হিন্দু সংহারের।
সরকারি ছুটি, কোর্ট নেই, উকিল জয়শঙ্কর মুখার্জি চেম্বারে বসে একটা জটিল কেসের কাগজপত্র দেখছেন। পাশের টেবিলে উমাশঙ্কর, জয়শঙ্কর বললেন— বড় খোকা, তুমি আজ বিকেলে একবার দাদামশাইয়ের কাছ থেকে ঘুরে এসো। আজ তো আবার লিগ বন্ধ ডেকেছে, দেখো যদি গাড়িঘোড়া চলে মাকেও নিয়ে যেও।
— আচ্ছা বাবা।
— দাদামশায়ের শরীর ভালো থাকলে মণিকে চলে আসতে বলো।
ঠাকুরঘর থেকে শাঁখের শব্দ আসছে, মায়ের পূজা শেষ। এমন সময় ছুটতে ছুটতে আসে ভীত সন্ত্রস্ত মালি, বলল—

বাবু, অগুনতি মানুষ, সবার হাতে টাঙ্গি, তলোয়ার। রাজাবাজারের মুসলমান সব। বড় রাস্তার ধারে লাহাবাবুদের বাড়িতে আগুন দিয়েছে। শশীবাবুদের বাড়ি জ্বলছে, হিন্দুদের বেছে বেছে মারছে। কী হবে বাবু?

— কিছু হবে না, তুই গেটে তালা লাগিয়ে ঘরে থাক। আজ আর বাগানের কাজ করতে হবে না।

মালি তালা লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার আগেই একদল মানুষ 'নারায়ে তকদির, আল্লা হু আকবর', 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান', 'মালাউনের রক্ত চাই' এসব ধ্বনি দিতে দিতে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। মালি বাধা দিতে গিয়েছিল। ঘাতকদের একজন তার পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে মালি।

চিৎকার শুনে জয়শঙ্কর আর উমাশঙ্কর বাইরে বেরিয়ে আসে, তাদের দেখে উন্মত্ত জনতা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর। প্রচণ্ড আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দুটি মানুষকে। দোতলার এক ঘরে গানের রেওয়াজ করছিল উমাশঙ্করের স্ত্রী উর্মিলা। তানপুরা ছুঁড়ে ফেলে তাকে টেনে হিঁচড়ে লরিতে তোলে গুন্ডারা। অবস্থা কিছুটা আঁচ করতে পেরে নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়েছিল রত্না। গুন্ডারা দরজা ভেঙে তাকেও টেনে নিয়ে লরিতে তোলে। ততক্ষণে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন সুভদ্রা, স্বামী-পুত্রের ছিন্নভিন্ন শরীর দেখে তিনি মুর্ছিত হয়ে পড়েন। তারপর শুরু হয় লুটপাট। বনেদি বাড়ির দামি দামি জিনিসপত্রগুলি নিয়ে তুলল লরিতে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রাণচঞ্চল বাড়িটাকে শ্মশানে পরিণত করে উল্লসিত ঘাতকবাহিনী চলল অন্য শিকারের সন্ধানে। মণিশঙ্কর এসব ঘটনার কিছুই জানে না। সকালে কয়েকবার বের হতে চেয়েছে, কিন্তু তখন দাঙ্গার খবর সারা কলকাতায় ছড়িয়ে গেছে। পথের বিপদ অনুমান করে দাদামশাই আর দিদিমা তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয়নি।

১৬ আগস্ট সকাল থেকে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে সুরাবর্দি, সেরিফ খান, লাল মিয়া, ওসমান গণির মতো মুসলিম লিগের নেতারা পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে দাঙ্গা পরিচালনা করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠল লাশের পাহাড়। ১৬ আগস্ট ময়দানে মনুমেন্টের নিচে বিশাল মুসলিম সমাবেশ হলো। সেই সমাবেশে বক্তারা এমন উত্তেজক বক্তৃতা দিল যা শুনে সমাবেশ ফেরত জনতা দ্বিগুণ উৎসাহে তাণ্ডব শুরু করল। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠনের মহোৎসব শুরু হলো। হাজার হাজার যুবতীকে অপহরণ করা হয়েছে, যাদের অনেকেরই শেষপর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি। যতটা পেরেছে হিন্দুদের মূল্যবান জিনিস লুঠ করেছে।

দ্বিতীয় দিনে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলো। কারণ আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে হিন্দুরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলল। পাশে পেল কলকাতায় বসবাসকারী শিখদের। মানিকতলার মোটর পার্টসের ব্যবসায়ী অরোরা পরিবারের সঙ্গে গাঙ্গুলি পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। এই পরিবারের ছেলে হরপ্রীত মণিশঙ্করের ছেলেবেলার বন্ধু সহপাঠী। ১৭ আগস্ট সকালে অনেক বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে সাইকেলে চেপে হরপ্রীত হাজির হলো টালিগঞ্জে মণিশঙ্করের দাদামশায়ের বাড়িতে। এ বাড়িতে মণিশঙ্করের সঙ্গে বহুবার এসেছে হরপ্রীত। সকালে বিধ্বস্ত হরপ্রীতকে দেখে সবাই অবাক। হরপ্রীত বলল— জলদি ঘর চল মণি।

মণিশঙ্কর বলল— কী হয়েছে, ওদিকের খবর কী?

— সব গিয়ে জানতে পারবি, চল।

দাদামশাই বললেন— ওদের বাড়ির সব ঠিক আছে তো? তোমাদের বাড়ি?

— হ্যাঁ দাদাজী, ওইসব ঠিকই আছে।

কথাটা হরপ্রীতকে ঢোক গিলে বলতে হলো। কারণ এই মুহূর্তে সত্য ঘটনাটা বললে এদের সামলানো দায় হবে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। এখানে ওখানে পড়ে লাশ। মাঝে মাঝে ছুটে যাচ্ছে দু-একটি পুলিশের গাড়ি। মুসলমান মহল্লাগুলিকে এড়িয়ে অনেকটা ঘুরপথে হরপ্রীত মণিশঙ্করকে নিয়ে পৌছাল মানিকতলায়। বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে প্রথমে নজের আসে মালির ছিন্নভিন্ন লাশ বীভৎস, চোখ দুটি কিসে খুবলে নিয়েছে। আর্তনাদ করে ওঠে মণিশঙ্কর।

— একি এ যে আমাদের মালি দাদা।

— হ্যাঁ, চলো। অন্দর চলো।

ততক্ষণে এসে গেছে হরপ্রীতের পিতাজী আর চাচাজী। ওদের চোখেমুখে উদ্বেগ। হরপ্রীতের পিতাজী মণিশঙ্করের পিঠে হাত রেখে বললেন— ঘাবড়াও মত্ বেটা, আগে আরভি বহোত্ গজব হ্যায়।

বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে দেখল বারান্দায় পাশাপাশি পড়ে আছে বাবা আর দাদার দেহ। আর সামলানো গেল না মণিশঙ্করকে। ঝাঁপিয়ে পড়লো দেহদুটির উপর। আর্তনাদ শুনে বেরিয়ে আসেন মা সুভদ্রা, চুল আলুথালু চোখ দুটি রক্তজবার মতো লাল। বলেন— এই কে রে তোরা, চিৎকার করছিস? ওদের ঘুম ভেঙে যাবে না! চুপ কর, চুপ কর।

মণিশঙ্কর মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে— মা, মাগো এসব কি হলো মা। মা গো—

হরপ্রীতের মা, চাচি এবাড়িতেই ছিল। তারা মাকে ধরে ভিতরে নিয়ে যায়। হরপ্রীতের বাবা চাচারা অল্প সময়ের মধ্যে দেহগুলি সৎকারের ব্যবস্থা করে ফেলেন। মণিশঙ্কর বলে— আমার বোন

আর রত্না, বৌদি ওরা কোথায়?
হরপ্রীতের চাচা বলেন— ওদের খোঁজ আমরা জানি না। শুনেছি ওদের গুন্ডারা তুলে নিয়ে গেছে। দুঃস্বপ্নের সেই দিনটিও কাটল। হরপ্রীতের পরিবার সবসময় কাছে কাছেই ছিল। পরদিন পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক, এলাকায় শিখ আর হিন্দুরা একজোট হয়ে প্রতিরোধে নেমেছে। এবার শুরু হলো বৌদি আর রত্নার খোঁজ। পাড়ার অনেক হিন্দু আর শিখ মিলে সব সম্ভাব্য স্থানে খোঁজ করা হলো। কিন্তু কোথাও ওদের পাওয়া গেল না। মণিশঙ্কর সবাইকে নিয়ে গেল ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে। কিন্তু ওখানে একটা মেয়েও নেই। কোথায় গেল কাবেরী? হঠাৎ মণিশঙ্করের নজর পড়ল রাস্তার দিকের দোতলার জানলায়। জানালা থেকে চারটি মেয়ের মৃতদেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে যাতে রাস্তার লোক এই নৃশংস বীভৎসতা প্রত্যক্ষ করতে পারে। মণিশঙ্কর এগিয়ে গেল জানালার দিকে। একি! দ্বিতীয় জন যে কাবেরী।
মণিশঙ্কর চিৎকার করে উঠল— কাবেরী।
বর্ধমান থেকে কাবেরীর বাবা আর বাড়ির লোকজনও ততক্ষণে এসে গেছে। মণিশঙ্করদের বাড়িতে কাউকে না পেয়ে কলেজের হোস্টেলে চলে এসেছে। হরপ্রীত কাবেরীর দেহটা নামাবার ব্যবস্থা করল। দেহে ততক্ষণে পচন ধরে গেছে। একমাত্র মেয়ের মৃতদেহ আঁকড়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন জমিদার বিনোদবিহারী। গাড়ি করে কাবেরীর দেহ বাড়িতে নিয়ে গেলেন জমিদারবাবু। সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও বৌদি আর রত্নার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। একদিন রাজাবাজার দিয়ে যাচ্ছে মণিশঙ্কর আর হরপ্রীত। দাঙ্গার পর থেকে হরপ্রীত সবসময় নিজেদের পারিবারিক পিস্তলটি সঙ্গে রাখে। হঠাৎ মণিশঙ্করের নজরে আসে রাস্তার ধারে মাংসের দোকনে। সেখানে মাংস ঝোলানোর হুকের সঙ্গে ঝুলছে কয়েকটি উলঙ্গ মেয়ের মৃতদেহ। দুজনে এগিয়ে গেল সেদিকে। না অন্য মেয়েদের দেহ। বহুদিন খোঁজ করেও বৌদি আর রত্নার কোনও খোঁজ পায়নি মণিশঙ্কর। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। মা উন্মাদ, টালিগঞ্জের বাড়িতে দাদামশাই দিদিমার কাছে থাকতেন। দেশ ভাগ হলো।
মণিশঙ্কর আবার পড়াশুনা শুরু করলেন। এম-এ পাশ করে কলেজে চাকরি। তারপর অবসর।
গঙ্গা ঝি ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা দিয়ে এসে বলল— দাদাবাবু, আলো জ্বালিয়ে দেব?
মণিশঙ্কর বললেন— না, অন্ধকার থাক। অন্ধকার ভালো লাগছে। ■

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor, Room No. 3-A)

2, Ganesh Chandra Avenue

Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply® BRAND

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable, PVC Tape,
Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of an experience light-up and unfold a thousand petals.

Shashi Industries

Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, Fourth Floor, Room No.4,

Kolkata - 700 001

Phone : 2243 1722 / 1447, Fax No. 033 2243 3922

E-mail : aksadt_saboo@yahoo.co.in

Leading Raw Meterial Supplier to Paper Mills :

Bamboo, Hardwood, Bamboo Chips and other Raw Materials for Paper Mills.

Pan No. AACHA0716 M

রহস্য উপন্যাস

অবেক্ষণ

শেখর সেনগুপ্ত

দীপ পাণিগ্রাহীর হাতের তালুতে আঁকা কলকাতা ও তার সংলগ্ন এলাকার ভূগোল, সংস্কৃতি ও জীবনযাপনের ধরন-ধারণ। সে এখানে যেমন ধীর পদক্ষেপে চলতে পারে, তেমনি প্রয়োজনে হন্তদন্ত হয়ে একরকম উড়ানও দিতে পারে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে। শুদ্ধ কথ্য বাংলা তো বটেই, কিছু গ্রামাঞ্চলিক বচনেও সে অপরিচিতকে পরিচিত করতে, ভাবনাকে ভাগ করে নিতে সক্ষম। আবার সুযোগ পেলে রকে বসে গেঁজাতে আজও ওস্তাদ।

কারণ একটাই— তার বাল্য ও যৌবনের একাংশ বৃহত্তর কলকাতার রাজারহাট লাগোয়া নারায়ণপুর শহরতলিতে অতিবাহিত হয়েছে। বাবা অঘোরনাথ পাণিগ্রাহী ছিলেন সরকারি চাকুরে— নারায়ণপুরের সাব পোস্টমাস্টার। নীতিনিষ্ঠ মানুষ, কমবয়সিদের প্রেম-কেলির নামে বেলেল্লাপনা একদম সহ্য করতে পারতেন না। তাই দীপের বড় বোন সুজাতা যখন এক দলিত যুবকের গলায় মালা ঝুলিয়ে দেয়, প্রৌঢ় অঘোরনাথ তা নিয়ে অনেক টানাহ্যাঁচড়া করেছেন। পরে অবশ্য প্রমাণিত হল যে, তাঁর আচরণ ও অভিব্যক্তিতে ছিল কিছু কপট অভিমানও। দলিত জামাতাকে তিনি কম আশীর্বাদ করেননি। এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বলেছিলেন, 'হোক না দলিত, জামাই আমাদের উচ্চশিক্ষিত। তার চেয়েও বড় কথা, খাঁটি হিন্দু পরিবারের ছেলে। সুজাতার মাও এটাই বলে থাকে।'

অঘোরনাথের বাসনা ছিল, কলকাতার উপকণ্ঠে একটি ভদ্রাসন নির্মাণ করবেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধ অপূর্ণ থেকে যায় তিনটি কারণে— প্রথমত, চিরদিন সততার সঙ্গে কাজ করে যাওয়ায় ও ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচে কার্পণ্য না থাকায় অর্থাভাব ছিল জীবনের শেষ দিন অবধি। দ্বিতীয়ত, এরাজ্যের রাজনীতি ও প্রশাসনে নিত্য এমন সমস্ত হটব্রেকিং নিউজ তৈরি হয় যে, ছা-পোষা রাজনীতি-নিরপেক্ষ নাগরিকরা তেমন সামলে সুমলে নিজেদের দিনকাল কাটাতে পারবেন বলে মনে ভরসা পান না। তৃতীয়ত, চাকরি থেকে অবসর নেবার দেড় বছরের মধ্যে প্রথমে অঘোরনাথ, পরে তাঁর স্ত্রীও ইহকাল ত্যাগ করেন। নিষ্ঠা ও সততার ধকল সকলে ঠিক সমানভাবে সামলাতে পারেন না। হাকডাক নড়াচড়া করতে করতেই পরমায়ু শেষ।

স্বভাবতই দীপ পাণিগ্রাহীর পড়াশোনা কলকাতাতে। খুব মেধাবী না হলেও পরিশ্রমী। মুখস্ত করবার ক্ষমতা ঈর্ষণীয়। বইপত্তর নিয়ে অপরিসীম ব্যস্ততা হেতু স্যাঙাতদের সংখ্যা কম। এর পুরস্কারও সে পেয়েছে। অর্থনীতিতে অনার্স এবং এম-এ দুটোতেই প্রথমশ্রেণী। তারপর যেদিন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার হয়ে ঢোকে, সেদিন একটু উগ্র মেজাজের দীপও আহ্লাদে আটখানা হয়ে ফরাসি পারফিউম গায়ে ঢেলে ভুবনেশ্বরের ইতিউতি ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু কলকাতা ছেড়ে ভুবনেশ্বরে কেন— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আরও কিছু বৃত্তান্তকে টেনে আনতে হয়। ঘটনাটা হল এই যে, প্রথমে বাবা, পরে মা ভিন্ন ভুবনে প্রস্থান করবার পর দীপ নারায়ণপুর ত্যাগ করে এবং তার বংশগত শিকড়ের খোঁজ করতে করতে চলে যায় ওড়িশার ঢেঙ্কানালে, — যেখানে একটা বহু পুরনো নিবাসে তার কাকারা, কাকিরা, খুড়তুতো ভাইবোনেরা এক হরিঘোষের গোয়াল বানিয়ে রেখেছে। সেখান থেকেই ব্যাঙ্কের ভুবনেশ্বর সার্কেলের ক্যান্ডিডেট হিসেবে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় এবং বাজিমাত করে।

নয় নয় করে প্রায় দু'যুগ আগের কথা। খুব শিগগির দিনগুলি অতীত হয়ে গেল। চাকরির শর্তানুযায়ী প্রথম দু-বছর সারা ভারত চষে বেড়াতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের যত রকমের কাজ, সব কটাতেই পারঙ্গম হবার দায়। ঝড়ের গতিতে টাকা গোনা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রশিল্প ও কৃষিতে ঋণ দেবার সাত সতেরো। কাজ করাতেই দীপের রোমাঞ্চ। ডাকাবুকো টাইপের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হিসেবে নাম ছড়ায়। তারপর যেন আপন অধিকারবোধেই স্থান করে নেয় ব্যাঙ্কের ইন্সপেকশান ডিপার্টমেন্টে। এটা বুঝি তার সার্ভিস কেরিয়ারে এক ধুন্ধুমার বাঁকবদল। অনেকের সঙ্গে বনিবনা না হলেও ব্যাঙ্কের স্বার্থরক্ষার্থে তার অবদানকে ম্যানেজমেন্ট স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। দীপ এখন একজন জবরদস্ত ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর। অন্য অনেক রাজ্য কভার করার পর সদ্য পা রেখেছে বেঙ্গল সার্কেলে। লক্ষ্য, তিনটি বিশেষভাবে চিহ্নিত মাঝারি মাপের ব্রাঞ্চের কাজ-কারবার খুঁটিয়ে দেখা। প্রথমটি পশ্চিম বর্ধমান জেলার কোলবেল্ট এরিয়ার ব্রাঞ্চ লাউদহ, দ্বিতীয়টি বাঁকুড়ার মেজিয়া, তৃতীয়টি সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর। প্রথম দুটির ইন্সপেকশন সমাপ্ত। এবার তৃতীয়টির দিকে চলেছে দীপ পাণিগ্রাহী।

লোকাল হেড অফিসের আয়তন, বৈভব, গাম্ভীর্য লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে মানসিকভাবে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন। দীপ সুউচ্চ সোপানের শেষ বাঁকে পা রেখে বাইরের দিকে মিনিট দুয়েক তাকিয়েছিল। অদূরে বাবুঘাট, মিলেনিয়াম পার্ক,

আবর্জনাবাহী গঙ্গায় রোদ্দুরের ঝিকিমিকি, একাধিক টালমাটাল নৌকা, মাঝারি মাপের একটি নিশ্চল সওদাগরি জাহাজকেও অস্পষ্টভাবে শনাক্ত করা যায়। রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের অসহনীয় তাপ-উত্তাপ নিয়ে মাইকিং স্লোগান, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলির ভূমিগ্রাসে আর কোনও টালবাহানা নেই, অনেক পুরনো কারখানার জমিতে শতকোটি টাকার হাইরাইজিং, মোড়ে মোড়ে নানা চেহারার শপিং মল, সূর্য ডোবার আগেই নগরজুড়ে যেন দীপাবলি, মাথায় হেলমেট না রেখে মুখ থেকে মদের গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ঝড়বেগে বাইক ছোটানো এখন নব জমানার অভ্যেস...। সব মিলিয়ে দীপের মনে হল, কলকাতা আর ঠিক কলকাতাতে নেই।
আকাশ-পাতাল না হোক ফারাকটা নজরে আসে। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে আরম্ভ করে ডালহৌসি ছুঁয়ে স্ট্র্যান্ডরোড অবধি তার নজর ছিল সন্ধানী। ভালো লাগেনি মাইলের পর মাইল বিরাট বিরাট রাজনৈতিক কাটআউট ও স্তুতির বহর।

যাই হোক, ব্যাঙ্কের লোকাল হেড অফিসের কাজটা চটজলদি সেরে ফেলল দীপ। প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। সাগরদ্বীপের রুদ্রনগর আর ঢিলছোঁড়া দূরত্বে নয়। লোকাল হেড অফিসের এক সিনিয়র অফিসার হিসেব করে দেখালেন, স্ট্র্যান্ডরোড থেকে যাত্রা শুরু করে সাগরদ্বীপে পৌঁছতে দীপ পাণিগ্রাহীর সময় লাগবে মেরেকেটে আড়াই ঘণ্টা থেকে তিন ঘণ্টা। সুতরাং দীপ যখন রুদ্রনগর ব্রাঞ্চে পা রাখবে তখন ব্রাঞ্চের পিক আওয়ারস। কাস্টোমারদের ভিড় ও কর্মীদের তথা আধিকারিকদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। দীপ ইচ্ছে করলে তার অবেক্ষণকর্মকে অনেক রাত অবধি টেনে নিয়ে যেতে পারবে প্রথম দিনেই। আর সে যতক্ষণ ব্রাঞ্চে থাকবে, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সমেত সকল অফিসার ব্রাঞ্চ ছেড়ে বের হতেও পারবে না। সেই অমোঘ সুবিধাটাও তো রয়েছে— ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী তার জীবনের একটা বড় অংশ কলকাতাতেই কাটিয়েছে; বাংলার যে কোনও প্রান্তে এখনও সে যেন রণপা লাগিয়ে চক্কর কেটে আসতে পারে। বাংলায় কথা বলায় ও লেখায় তাকে প্রায় তুখোড়ই বলা যায়। দীপ নিজেও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, যদিও জীবনে এই প্রথম সে সাগরদ্বীপে পা রাখতে চলেছে। শুধুমাত্র বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সে সাগরদ্বীপকে দেখেছে। মকর সংক্রান্তি। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ও সাধু-সন্তদের চমকপ্রদ সমাবেশ। এতদিনে অফিসের দৌলতে সেই পুণ্যতীর্থে তার দাপুটে পদার্পণ ঘটতে চলেছে।

ব্যাঙ্কের গাড়ি, যা তাকে পৌঁছে দেবে স্বপ্নালোকের সাগরদ্বীপের প্রবেশমুখে। পথ একটু ফাঁকা পেয়েই তিরবেগে ছুটছে। কলকাতার বুকে এখন অনেক উড়ালপুল। তবুও জ্যামের কবল থেকে রেহাই মেলা দায়। রকমারি আওয়াজ। গাড়ি যখন দাঁড়িয়ে পড়ে, দীপের ফুরসত মেলে চারদিকটা জরিপ করার। ফুটপাথগুলিতে হকার ও পথিকদের ভিড় ক্রমাগত ঘন হচ্ছে। ওরই মধ্যে তিনটি মোড়ে জোরালো স্ট্রিট কর্নার। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে বিরোধী দলগুলির ক্ষোভ ফেটে পড়ছে। দীপের ভয়, এখনই আবার পুলিশের সঙ্গে মারপিট শুরু না হয়ে যায়। তখন আলাদা কোনও ঘুরপথের সন্ধান করতে হবে অকুস্থলে পৌঁছে যাবার জন্য। হয়তো অনেকটা সময় ক্ষয়ে যাবে তাতে। এতটা পথ এল, অথচ কোথাও একটা কৃষ্ণচূড়া বা শিউলি গাছ নজরে এল না। দীপের খারাপ লাগছে।

কিন্তু ডায়মন্ডহারবারে পৌঁছে যেতেই পারিপার্শ্বিক রম্যতা বেড়ে যায়। একাধিক কৃষ্ণচূড়া আর শিউলি গাছ দৃষ্টিকে টেনে নেয়। দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করে এখানকার গঙ্গা— যা ক্রমশ প্রসারিত উচ্ছ্বসিত হতে হতে সাগর ছুঁই ছুঁই। দীপের ঘন চুলে ভেজা বাতাসের হিল্লোল। দীপ চাইছে, ফি বছর সে যেন এখানে আসতে পারে। কোনও অফিসিয়াল ডিউটিতে নয়, এখানকার প্রাকৃতিক সম্ভারকে আরও বিভোর হয়ে উপভোগ করতে। মধ্যবয়স অবধি যে পুরুষ অকৃতদার, অতীত ও প্রকৃতির সঙ্গে তার সহাবস্থান তুলনায় নিবিড়ই হয়ে থাকে।

নারীর সাহচর্য কালেভদ্রে জুটলেও বন্ধন বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে অনেক সময় নিজের অবচেতন মনে অকল্পনীয় কিছু স্বপ্ন এসে হানা দেয়। নিভৃতির ফসল সেই সব ছবি বাস্তবের দীপকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ফেলতে চায়। কিন্তু পারে না।

লট নম্বর আটে এসে থামল গাড়ি।

ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'স্যার, গাড়ি আর যাবে না। আপনাকে এখানেই নামতে হবে। ওই দেখুন, লোকেরা লাইন দিয়ে লঞ্চে ওঠার টিকিট কাটছে। আপনাকেও কাটতে হবে। তারপর জেটি ধরে লঞ্চে উঠবেন। ওপারে কচুবেড়িয়া। জিপ, স্যাটল কার, বাস, ভ্যান রিক্সা যা হোক একটাতে চেপে নেমে পড়বেন রুদ্রনগরে। সাগরদ্বীপের শহর। সেখানেই আমাদের ব্রাঞ্চ।

এবার বলুন, আমি আবার কবে কখন এখানে আসব আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে! ড্রাইভার বেশ বাক্যবাগিশ। এক লপ্তে অতগুলি কথা বলে গেল। দৃষ্টিতে শীতলতা। অনুমান, এ লোক নিজের পাওনা-গণ্ডা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আবার আষ্টেপৃষ্ঠে রয়েছে দায়িত্ববোধও।

দীপ গম্ভীর গলায় জানিয়ে দেয়, 'আমি হেড অফিসে যা জানাবার, জানাব। দরকার হলে তাঁরা আবার আপনাকে পাঠাবেন। নিন, এটা রাখুন।'

দীপের হাত থেকে সবুজ রঙ পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিল ড্রাইভার। কপালে ঠেকায়। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। গাড়ি ঘুরিয়ে সে মুহূর্তে অদৃশ্য।

Saraogi Udyog Private Limited

Importer & Merchants for Coal and Coke

21, Hemant Basu Sarani "Centre Point" Suit No. 212

2nd Floor, Kolkata - 700 001

Fax : +91-33-22435334, +91-33-22138782

Phone : +91-33-22481333 / 0674, +91-33-2213 8779/80/81

Email : saraogiudyog@eth.net

www.saraogiudyog.com

With Best Compliments From

A Well Wisher

S. N, Kejriwal

দীপের দুই কাঁধ জুড়ে একটা বড় ব্যাগ। ব্রিফকেস তার অপছন্দ। সে এমন ব্যাগ টেনে বেড়ায়, যার মধ্যে নিজস্ব সব কিছুই ঠাসাঠাসি অবস্থায়। ল্যাপটপ, ট্যুরডায়েরি, তিন সেট জামা-প্যান্ট, গুচ্ছের দরকারি কাগজপত্র, ব্রাশ ও পেস্ট, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, চুলের তেল এবং মদকতাময় দামি সেন্ট। ওই ব্যাগ কাঁধে ওঠা মানেই দীপ পাণিগ্রাহী মুহূর্তে এক রোবটে রূপান্তরিত— দয়া, মায়া, প্রেমপ্রীতি ইত্যাদির কুহক আর পাত্তা পাবে না। ক্রমাগত অভিজ্ঞতায় শান দিতে দিতে দীপ আজ এই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই সুযোগ করে নেবার কৌশল আজ তার করায়ত্ত। এই সময়ে তার মোবাইলের ইনবক্স মেসেজ কতটা পুষ্ট হল, তা নিয়ে মাথাব্যথা নাস্তি। ফেসবুকে বা হোয়াটস্ অ্যাপে কে রিপ্লাই চাইছে, কেয়ার করে না। সেই লড়াকু দীপ এখন জেটিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমাণ উল্টোদিক থেকে আসা যাত্রীবাহী স্টিমারের জন্য। অচিরেই দেখতে পেল লম্বা লঞ্চটা দ্রুত এগিয়ে আসছে জেটির দিকে। প্রতীক্ষারত যাত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়ে। নৈঃশব্দ্য বলতে কিছু নেই। নির্বিকার থাকবার ভানও কেউ করছে না। এই সময়ে ভারী পাষাণও নড়েচড়ে ওঠে। একমাত্র দীপই এই ব্যস্ত সময়ে তার মোবাইলটা বের করে কয়েকটা বোতাম টিপল জেটির কাঠ-কাঠামোয় ভর দিয়ে।

'হ্যালো, আপনিই কী কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চের মিস্টার হরেন গুছাইত?'

'হ্যাঁ। আপনি কে?'

'আমি ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী বলছি।'

'ও স্যার আপনি— আপনি এখন কোথা থেকে বলছেন?

কোথায় গেলে আমি আপনার সঙ্গে মিট করতে পারব, স্যার...?'

'আমি রুদ্রনগর ব্রাঞ্চে ঢুকে যাব আধঘণ্টা থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিটের মধ্যে। আপনি সোজা ওখানেই চলে আসুন। আপনি না আসা অবধি আমি কাজ শুরু করতে পারব না।'

'আমি এখুনি কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চ থেকে রওনা দিচ্ছি ডেপুটেশনের চিঠিটা নিয়ে। আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

লঞ্চ থেকে যারা বেরিয়ে যাবার, চলে গেল সারিবদ্ধভাবে। তবে শূন্যস্থান যারা ভরাট করবে, তাদের তাড়াটা বেশি। টিকিটচেকার খুব হুঁশিয়ার। উইথআউট টিকিট একটি মশাকেও গলতে দেবে না। ক্রমে দেখা গেল, যাত্রীরা যেন সব একটি একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য। যে যেখানে পারছে, নিজেকে গুঁজে দিচ্ছে। কারুর বিরক্তি বা উষ্মা নেই। অধিকাংশ সজীব। দুটি-একটি গম্ভীর অথবা বিমর্ষ মুখাবয়র।

দীপের পছন্দ ডেকের রেলিং লাগোয়া বেঞ্চের যে কোনও একটি স্থান। সে ওরকম একটি ঠাঁই জোগাড়ও করে নেয়। সাগরমুখী গঙ্গার আছাড়ি-পিছাড়ি দেখবার এই সুযোগ তার মতো ঘুরন চরকি লোকের কাছেও দুর্লভ। ওই রূপ দেখতে দেখতে সে বিভোর। পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে একেবারেই ভাবছে না। অদ্ভুত একাকীত্বের বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে সে।

ইন্সপেকশন করার চক্করে ভারতের কাঁহা কাঁহা মুলুকে ঢু মেরেছে সে। পরিবার বলতে তো কিছু নেই। যেখানে যায়, সেটাই তার নিজভূমি হয়ে ওঠে কয়েকদিনের জন্য। তবে সবকিছু দ্রুততার সঙ্গে সামলে-সুমলে এভাবে জলযানে জুত করে বসে থাকবার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম। হয়তো একদিন পোর্টব্লেয়ার ব্রাঞ্চে যাবার নির্দেশ আসবে। সেদিন সে প্লেনের পরিবর্তে জাহাজে গিয়েই উঠবে। সাক্ষাৎ সমুদ্রের হাতছানিকে উপেক্ষা করার মতো বুড়বক সে নয়।

তবে যেখানেই যাক, অফিস তাকে সাধ্যানুসারে সুবিধা দেবার চেষ্টা করে। থ্রি-স্টার হোটেলে ওঠার পারমিশন আছে। মোটা অঙ্কের হল্টিং অ্যালাউন্স। ব্যাঙ্কের স্থানীয় কোনও শাখা থেকে এক বা একাধিক ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্টকে ডেপুট করা হবে ইন্সপেকশনের কাজে সাহায্য করার জন্য। যেমন এখানে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে হরেন গুছাইতকে। যদিও দীপ ও হরেন পরস্পরের কাছে অপরিচিত। জোনাল অফিস জানিয়েছে কর্মী হিসেবে গুছাইত নাকি অনন্য— ঝড়ের বেগে টাইপ করতে পারে। নোট গোনায় তুখোড়... সবচেয়ে বড় কথা, পাঁচটার পর আরও কিছুক্ষণ কাজ করতে হলেও ওভারটাইমের জন্য ঝুলোঝুলি করে না। ব্যাঙ্কের এই পদে যে ক্ষমতা ও প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস, দীপের কাছে তা উপভোগ্য। অচেনা ভূখণ্ড, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের ভুলভ্রান্তি, এমনকী মারাত্মক দুর্নীতিকেও অপ্রকাশ্য রাখতে কত রকমের চাপ, রাজনীতি ও মস্তানিও আসতে পারে মনোবল তথা নিরাপত্তাকে চূর্ণ করতে— এইসব অসুবিধাগুলি অতিবাস্তব। দীপ এ অবধি এরকম পরিস্থিতিতে না পড়লেও মানসিক দিক থেকে সে প্রস্তুত। তার মানসিক গঠন আলাদা ও মৌলিক। তার বিশ্বাস, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে যদি নিষ্কলুষ রাখা সম্ভব হয়, সার্বিকভাবে ভারতের জনগণ নিরুদ্বেগে, শান্তিতে এবং আনন্দের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। আবর্জনাবাহী

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দীপ তার বাবার শেখানো একটি স্তোত্র অনুচ্চ স্বরে উচ্চারণ করে—

সর্বেষাং মঙ্গলাং ভূয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ ভবেৎ।।

নদীর অফুরন্ত উচ্ছ্বাস প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। যাত্রার প্রারম্ভে খুব কেঁপেছিল লঞ্চটি। তারপর এর প্রশান্তি গভীর থেকে গভীরতর। কত কী নিয়ে কল কল খল খল প্রবাহ। দীপ দেখল, কামিনীফুলের একটি মালাও ছুটছে। ওই মালায় কী বশীকরণের মন্ত্র লেখা আছে? যে দেখবে, সেই বশ মানবে এই নদীর! ওই মালাটার দিকে তাকিয়ে থাকবার সময়ই অকস্মাৎ দীপের স্মৃতিতে সপাটে ঘাই মারল তার হারিয়ে যাওয়া দক্ষিণী বান্ধবী বিদ্যাশ্রী পট্টাভিরমণ। পরক্ষণে দীপ নিজেকে শাসায়, ওই স্মৃতি আর নয়। ব্যর্থ প্রেমের প্ল্যাকার্ডটাকে সে এবার একেবারে উপড়ে ফেলতে চায়। বয়স প্রৌঢ়ত্বের গোড়ায় এসেছে। আসুক। দীপ এবার লম্বা ছুটি নিয়ে বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবেই। নিজেকে নিয়ে এভাবে লোফালুফি খেলবার অধিকার কী তার সত্যি রয়েছে?

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে মধ্যবয়সী দীপ পাণিগ্রাহী যখন এইসব অন্তর্লীন ভাবনায় বুঁদ, তার পাশের শীর্ণকায় লোকটি নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গিয়ে চেপে ধরল রেলিংটাকে। আর সেই সুযোগে কে একজন বসে পড়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে। এর বপুটি আবার বৃহৎ। আতরের ঘ্রাণ পর্যাপ্ত। দুই হাত সে ওপরের দিকে এমনভাবে তোলে যেন আড়মোড়া ভাঙছে।

দীপ ঘুরে লোকটার মুখের দিকে তাকায়।

লোকটাও দেখল তাকে।

প্রকৃতই মুখোমুখি।

ক্রমে পরতে পরতে বিস্ময়— যা দু-জনকেই হিড় হিড় করে টানতে টানতে এনে দাঁড় করায় একটা পুরনো সময়দীর্ণ প্ল্যাটফর্মের ওপর।

তোলপাড় করার মতো কিছু নয়। আবার অস্বস্তিতে আক্রান্তও হতে হচ্ছে না। তুলকালাম ঘটনার স্মৃতি নেই। কিন্তু সেই পিছনের সময়টাকে একেবারে খড়কুটো ভেবে নস্যাৎ করাটাও অমানবিক। স্মৃতি যতই গুরুত্বহীন হোক, তাকে পাংশু বলা যাবে না। বুকে মধ্যে ঢাকঢোল বাজছে।

মুখ খুলল দুজনে প্রায় একই সময়ে।

'তুই! দীপ!'

'তুই তো সেই আব্বাসউদ্দিন।'

মাথার ওপর মেঘমুক্ত নীলাকাশ। তলায় অক্লান্ত বেগবতী গঙ্গা। এই বিশাল স্বর্গীয় পরিবেশে তালেবর বলতে কেউ নেই। সকলেই ছোট ছোট খোলামকুচি মাত্র। তবুও তারা দু'জন দু'জনকে প্রথম নজরেই চিনতে পারল, সময়ের ব্যবধান কম না হওয়া সত্ত্বেও। পৃথিবীটা যে আয়তনে ছোটই, এটা যেন তারই এক অভ্রান্ত প্রমাণ। বাস্তব হল এই যে, দীপ পাণিগ্রাহী ও আব্বাসউদ্দিনের মধ্যে কোনওকালেই প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তারা কোনও ঘটনাকে কেন্দ্র করে কদাপি চূড়ান্ত সহমর্মিতা দেখায়নি। ঘনিষ্ঠতা এমনও ছিল না যে কফি হাউসে ঢুকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসত অথবা হাত ধরাধরি করে রাজপথে গলিপথে হাঁটতে হাঁটতে সুন্দরীদের নিয়ে হরেক কিসিমের মত বিনিময় করত। মিল কেবল একটাই— তারা দু'জনই ছিল সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র এবং ছাত্র ইউনিয়নের সুতো টানাটানিকে কেন্দ্র করে তারা একজন অপরজনকে চিনত। সবমিলিয়ে এইক্ষণে তারা পরস্পরকে যেভাবে শনাক্তকরণ করতে পারল, সেটা কমবেশি অপ্রত্যাশিত।

ওই দিনগুলিতে কলেজে আব্বাসউদ্দিনের একটা বিশেষ পরিচিতি ছিল। সে খুব সম্পন্ন মুসলিম পরিবারের ছেলে। বড়বাজারে তাদের যেমন জামা-কাপড়ের দোকান আছে, তেমনি রয়েছে একটি ঝলমলে জুয়েলারি শপও। প্রতিবছর হজযাত্রীদের তালিকায় আব্বাসের আব্বাজানের নাম থাকবেই। দক্ষিণ কলকাতায় একটি মসজিদ নির্মাণে ওই পরিবারের তরফ থেকে ডোনেশন এসেছিল একুশ লক্ষ টাকা— যার পঞ্চাশ শতাংশ টাকা আয়করে রেহাই দিয়েছিল সরকার।

দীপের তখন তেমন পরিচিতি ছিল না। ভালো ছাত্র, কিন্তু কোনও নামি প্রফেসরকে পাকড়ে যে মূল্যবান 'নোট' হাতাবে, সেই আর্থিক চাওয়া-পাওয়া ছিল তার নাগালের বাইরে।

বাবা সাধারণ পোস্টমাস্টার। ছেলে ও মেয়েকে নতুন পোশাক কিনে দিতে পারলে বাড়িতে নেমে আসত রূপকথার আবহ। কিছু খণ্ড খণ্ড মুহূর্ত তো মনে আসবেই। একদিন কলেজে খবর এল, বৈদ্যুতিক তারের মহাজটিলতাহেতু বড়বাজারের একাংশে আগুন লেগেছে। খবর পাওয়া মাত্র উদ্বেগের বুদবুদ নিয়ে আব্বাস যখন পড়ি কী মরি ছুট

লাগিয়েছে, দীপ তার সাথী হয়েছিল। আগুন অচিরে নিয়ন্ত্রণে আসে। সেই একদিনই পরিস্থিতি তাদের কিছুটা ঘনিষ্ঠ করে। পরবর্তী দিনগুলির রসালাপ হাসাহাসি স্মৃতি নিতান্ত ধোঁয়াশাময়।

হাতে হাত মিলেছে। একজন অন্যজনকে যে প্রথম নজরেই চিনতে পেরেছে, হতচকিত হয়নি, এ এক বড় আশ্বাস। নচেৎ সময়ের ঘূর্ণি ঝাপটায় দৈহিক পরিবর্তন অনস্বীকার্য। সেদিনের বদহজমের ভুক্তভোগী শীর্ণকায় দীপ এখন এক ঝকঝকে বলিষ্ঠ পুরুষ। পোশাকের বাহারে সাহেবিয়ানা। গাঙ্গেয় বাতাসের দাপটে নীল টাই পতাকা হয়ে উড়তে চায়। চশমার ওপর বাড়তি কালো কাঁচ বুঝতে দেয় না লোকটির আদত অভিব্যক্তি। পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটাঘাঁটি করার তার আদৌ কোনও তাগিত আছে কিনা বোঝা দায়।

অন্যদিকে ঘি রঙা পাঞ্জাবি, ধবধবে পাজামা, নাগরাই জুতোতে শোভিত আব্বাসউদ্দিন লম্বা-চওড়া থলথলে মাংস-চর্বিতে ঠাসা এক পৃথুল দেহকাণ্ড। দেখলেই মালুম হয়, লোকটা মালদার। চোখে চশমা না থাকায় দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ চাতুর্য ও বেপরোয়া ভাব লক্ষণীয়। ছাত্রজীবনের সেই বলশালী ও দ্রুতগামী আব্বাস যেন এ নয়। তখন তো তার শরীর থেকে বের হতো ঘামের গন্ধ। এখন আতর-সুবাস ভুর ভুর। এবং মাথায় টাকঢাকা ওই একখানা ঢাউস ফেজ টুপি। সাদা টুপিতে সোনালি সুতোয় গাঁথা গুটিকয়েক উর্দু হরফ। সম্ভবত বিশ্বনবির কোনও বাণী।

'আমি ভাবতেই পারছি না, সাগরদ্বীপে যাবার পথে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তাও আবার নদীর বুকে।'

উচ্ছাসের প্রথম লহর বেরিয়ে আসে দীপের গলা দিয়ে।

'আমি তো এই পথের প্রায় নিয়মিত যাত্রী। তোর দেখা মেলাটা অকল্পনীয়। খোদা মেহেরবান।'

আব্বাসের কথাগুলি অধিক পরিশীলিত।

এরপর প্রথম প্রশ্নটাও এল আব্বাসের কাছ থেকেই— 'যাবি কোথায়? কপিলমুনির আশ্রম? মকর সংক্রান্তিতে আসতে সাহস হয়নি বোধহয়! চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবার ভয়!'

দীপ সশব্দে হেসে ওঠে, 'আশ্রমে তো আলবত যাবো। তবে আগমনের আদত কারণটা পার্সোনাল নয়, পুরো অফিসিয়াল।'

'মানে?'

'আরে তোর পুরানা দোস্ত দীপ পাণিগ্রাহী এখন পদমর্যাদায় একজন ব্যাঙ্ক ইন্সপেক্টর। সারা ভারত চষে বেড়াই ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চগুলি ঠিক ঠিক কানুন মোতাবেক কাজ কারবার করছে কিনা তা বাজিয়ে দেখতে। অনেক রকমের যানবাহনে চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে

উঠেছি। ভ্যানরিক্সা থেকে আরম্ভ করে ঘোড়া অবধি। তবে লঞ্চের সাওয়ারি হয়ে একটা বড় দ্বীপে পা রাখবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

মনের মতো শব্দ সাজিয়ে টানা বলে গেল দ্বীপ।

দীপের কথা মন দিয়ে শুনলো আব্বাস। কিছু ভাবান্তরের ছায়া যেন দেখা গেল তার মাংসল মুখের অভিব্যক্তিতে।

দীপ থামলে সে বলতে শুরু করে, 'তার মানে তুই বেশ দাদাগিরি দেখাবার সুযোগ পাস। আমার নসিবে আবার সেটা নেই। আল্লাহ তালার যেমন মর্জি। বাপের কারবারটাকে আড়াই গুণ বাড়িয়েছি। ছিল জামাকাপড় আর অলঙ্কার। এখন তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইট, সিমেন্ট, বালি, লোহা। লোকেরা আঙুল তুলে বলে, সিন্ডিকেটের পাণ্ডা। বলুক। নেতারা তো খুশি— মাল পাচ্ছে। এই রুদ্রনগরেও আমার একটা জুয়েলারির বড় দোকান আছে। ঈমান জুয়েলার্স। গহনার একমাত্র দোকান। অল ডিজাইনস্ আর নিউ অ্যান্ড সেকেন্ড টু নান। তবে বুক বাজিয়ে বলবার মতো বিক্রিবাটা নেই। তবে ভবিষ্যতে হবে। সি-এম স্বয়ং বলেছেন, আর বছর কয়েকের মধ্যে সাগর একটা বন্দর হয়ে উঠবে।'

দীপ গলা খাঁকারি দেয়, 'সোনা রূপা হিরে জহরত। শতকরা নিরানব্বুই জন মহিলার অব্যক্ত বাসনা। আমাদের লোকশিক্ষাতেও এই বাসনার বহু উপমা। অর্থাৎ তুই এখন একজন যথার্থ ধনী লোক। কোটি টাকা তোর হাতের ময়লা। তাই না রে?'

আব্বাসউদ্দিনের নিঃশ্বাস জোরালো হয়। হাসি হাসি মুখের থলথলে চামড়া কাঁপে। পরক্ষণেই কপালে ভাঁজ, 'তুই কী এখন রুদ্রনগরের ব্যাঙ্কটাতে ঢুকবি?'

'ঠিক ধরেছিস।'

আব্বাসের পরবর্তী জিজ্ঞাসা একটু বুঝি বিদ্‌ঘুটে, 'কী দেখবি ওই ব্রাঞ্চের?'

'বলতে গেলে সে এক বিরাট ফিরিস্তি। তাই বলতেও চাই না। আমি বিয়ে করিনি। করলে, স্ত্রীকেও বলতাম না। কেবল এইটুকু বলছি, তিন দিনের মধ্যে ওই ব্রাঞ্চের সব কিছুকে আমি আতস কাঁচের তলায় এনে ফেলবো। আচ্ছা, তোর কী ওই ব্রাঞ্চে কোনও অ্যাকাউন্ট আছে?'

'আছে। ব্রাঞ্চের হেড কেশিয়ার সুশীল চক্রবর্তী আমার জিগরি দোস্ত। খুব ভালো মানুষ। কাজেরও। চল, আজ তোর সঙ্গেই ব্রাঞ্চে একবার ঢুকবো। আপত্তি আছে?'

'আপত্তি জানাবার এক্তিয়ার আমার নেই। বিকজ ইউ আর এ ভ্যালুড কাস্টোমার দেয়ার।'

আব্বাসউদ্দিন ফেজ টুপিটাকে একবার ঘুরিয়ে নেয় তার মাথায়। লঞ্চ কচুবেড়িয়ার জেটিতে ঢুকছে।

রাজ্য জুড়ে পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে যে অশান্তির দাবানল, কচুবেড়িয়াও সেখানে শান্তির রূপকথা হয়ে উঠতে পারে না। একটি রাজনৈতিক দলের ডাকা ছয়ঘণ্টার বন্‌ধকে কেন্দ্র করে এখানেও ছুটকো অশান্তি। পুলিশ-প্রশাসন-ক্ষমতাসীন দলের ক্যাডার বাহিনীর তৎপরতা অপরিসীম। দোকানপাট অফিস সব খোলা। তবুও ওইরকম চাপ সামলে কচুবেড়িয়ায় যাতায়াত ব্যবস্থায় আজ স্পষ্টত ছন্নছাড়া ভাব। স্ট্যান্ডে একটিও বাস নেই, ট্রেকার নেই, জিপ নেই, রিক্সা নেই, থাকবার মধ্যে গুটিকয়েক ভ্যান। তীব্র অনিচ্ছাকে কাটিয়ে তারা নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়েছে ক্রাইসিসের সুযোগ নিয়ে বাড়তি কামাবার লোভে। আজ রেট হাই। অথচ ওদের এড়িয়ে যাবে, এরকম মজবুত লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে। ভ্যান ভাড়া নেবার জন্য যারা এগিয়েছে, আব্বাসউদ্দিন তাদের সকলের চেয়ে আলাদা। তার প্রতি ভ্যান চালকদের আগ্রহ দেখলে বোঝা যায়, এখানে এই মুহূর্তে অবিকল তার মতো আকর্ষক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় কেউ নেই।

আব্বাস একটা গোটা ভ্যান ভাড়া করল। সওয়ারি মাত্র দু'জন— সে নিজে এবং তার কলেজ জীবনের দোস্ত দীপ পাণিগ্রাহী।

ভ্যান চলেছে একটা বাগানবাড়ির লম্বা দেওয়াল ঘেঁষে। কয়েক মিনিটের মধ্যে লোকেশনের দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসে। গ্রামীণ ছোঁওয়া আর নেই। দু'দিকেই শহুরে পাষাণভার। পথে প্রচুর ছেঁড়া পোস্টার। বাতাসে বারুদের গন্ধ। ভ্যানে জুত করে বসেছে দীপ। কিছুটা পথ অতিক্রম করার পর শুরু হল দু'জনের মধ্যকার ফিসফিসানি।

আব্বাস : ব্যাটা, তুই শাদি করিসনি কেন?

দীপ : মনমতো যাকে পেয়েছিলাম সে ফস্‌কে গেল। তারপর একটাও মানানসই পাত্রী পেলাম না। এবার তুই নিজের কথা বল। হারেমে তোর বিবির সংখ্যা কত?

আব্বাস : গত মাসেও তিন ছিল। এমাসে সংখ্যাটা কমে হয়েছে দুই।

দীপ : শূন্যতা পূরণ করে ফেল।

আব্বাস : তোড়জোড় চলছে।

দীপ : আর ছানাপোনা?

আব্বাস : আপাতত দশ।

দীপ : বাহ্ বাহ্। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো— এ যেন মুজিবের সেই ডাক।

আব্বাসের চোখে ধূসরতা নামে। রুদ্রনগরে নাগরিক ছাপ পর্যাপ্ত। আবার মাঝেমাঝে পথের দু'পাশে এমন কিছু সবুজেরও বিস্তার— যা নবাগন্তুকদের কাছে বিলক্ষণ দৃষ্টিনন্দন।

ব্যাঙ্ক ব্রাঞ্চ বিল্ডিং উচ্চতায় ও প্রস্থে যথেষ্ট। গেটে দারোয়ান আব্বাসকে দেখে গদগদ, সজোরে বুট ঠুকে সেলাম সারে। দীপের ভ্রূকুঞ্চন। আব্বাসের কাছ থেকে ব্যাটা নিশ্চয় মাঝে মধ্যে কিছু পেয়ে থাকে।

'আগে চল, আমার বন্ধু সুশীল চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব। পদমর্যাদায় খাজাঞ্চিবাবু।'

আব্বাস দীপের একখানা হাত ধরে টানে।

হাত ছাড়িয়ে দীপ গম্ভীর গলায় জানায়, 'না। তাতে প্রোটোকল ব্রেক করা হবে। তুই গিয়ে তোর বন্ধুর কাছে বসতে পারিস। আমি ঢুকবো ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বারে। আর তখন থেকেই ব্রাঞ্চের সমস্ত কিছু চলে আসবে আমার হাতে। জাস্ট ফর অনলি থ্রি ডেজ।'

আব্বাসের চোখের মণি নাচে কৌতুকে অথবা পুরনো বন্ধুর অফিসিয়াল স্ট্যাটাসকে উপলব্ধি করে।

ব্রাঞ্চের ভেতরটা অনেকখানি লম্বালম্বি। কাউন্টারের সংখ্যা পনেরো। কোনওটির সামনে গ্রাহকদের লম্বা লাইন। কোনওটাতে সামান্য কয়েকজন গ্রাহক আলোচনারত আধিকারিকের সঙ্গে। প্রত্যেকের সামনে কম্পিউটার। দৃষ্টি তাদের অন্তর্মুখী।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের চেম্বার মোটামুটি উন্মুক্ত, যদিও স্টিল গ্রে পর্দা ঝুলছে। দীপ ঢুকে দেখল, চেম্বারে ম্যানেজার একা। নবীন বয়সি। হয়তো দীপের মতো প্রবেশনারি অফিসার। গায়ের রঙ যেন পাকা জাম। মাথার চুল কুচকুচে, ঢেউ তোলা। নির্মেদ দেহ কাঠামো। চশমার আড়অলে স্নিগ্ধ নজর। টেবিলের ওপর নেম প্লেট— শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি।

দীপ তার পরিচয়পত্র ও অফিসিয়াল লেটারটি পেশ করতেই শাখা ব্যবস্থাপক সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ায়, 'স্যার, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।'

গরম কফি উপাদেয়। পাকোড়াগুলি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ নাও হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতই সুস্বাদু।

গোটা ব্রাঞ্চ প্রেমিসেস ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে দীপকে। ঠিক এই সময়ই চলে এলো ডেপুটেড ক্লার্ক-টাইপিস্ট হরেন গুছাইত। মাঝবয়সী। তামাটে বর্ণ। গাট্টাগোট্টা। কাঁচাপাকা হিটলারি গোঁফ। আপন অভিজ্ঞতায় এই লোকটা বুঝেছে, ব্যাঙ্কিং সার্ভিসে প্রমোশন নিলে অনেক রকম ঝামেলা ফেস করতে হয়। যত্রতত্র বদলি, নানা দায়-দায়িত্ব। ক্লার্ক হয়ে থাকলে বেতন মোটামুটি ভালোই, দশটা-পাঁচটা ডিউটি, স্ত্রীর মুখ ঝামটা কম, শাকরেদদের কাঁধে হাত রেখে চুটিয়ে ইউনিয়নও করা যায়। গুছাইত ক্লার্কই থেকে যেতে বদ্ধপরিকর চাকরির বাকি দিনগুলিতে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পাণিগ্রাহী ও গুছাইতকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখায়। শেষমেষ হেড খাজাঞ্চির নাতিবৃহৎ চেম্বার।

খাজাঞ্চি সাহেবের মুখোমুখি তখনও বসে রয়েছে আব্বাস। হেড কেশিয়ার সুশীল চক্রবর্তীকে দেখলে মনে হবে, দু-এক বছরের মধ্যে তাঁকে অবসর নিতে হবে। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। দীর্ঘ চর্বিবহুল দেহ।

ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টর ঢুকেছে— এ বার্তা নির্ঘাত পেয়ে গিয়েছে আব্বাসের কাছ থেকে। ইন্সপেক্টরটি আবার আব্বাসের ছাত্রজীবনের বন্ধু— বার্তা হিসাবে এটা নিশ্চয় তার কাছে স্বস্তিদায়ক।

তবুও ইন্সপেক্টর মানেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সমীহ করতেই হয়। এদের রিপোর্ট কখন কতটা ভীষণাকৃতি হয়ে উঠতে পারে, ঈশ্বর ছাড়া আর কারোর পক্ষে জানা অসম্ভব। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ফিরে গিয়েছে তার চেম্বারে। যাবার আগে ব্রাঞ্চের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ চাবিগুলি তুলে দিয়েছে ইন্সপেক্টরের হাতে। এটাই দস্তুর ব্যাঙ্কিং রুলসে।

অকুস্থলে তখনও উপস্থিত আব্বাস। পরিচয়পর্ব সমাপ্ত হবার পরও সে যেন খানিক দোলাচলে— দীপের দেখভালে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে, কোনও অসুবিধা বা অনিষ্টের সম্ভাবনা না থাকে, ...এই সবও সুনিশ্চিত করতে চায় সে।

দীপ মুচকি হেসে আব্বাসকে বলে, 'তুই তো অংশত এখানকারই লোক। বিশাল ব্যবসা। ভ্যালুড কাস্টোমার। আনাচে-কানাচে কোথায় কী আছে, সব তোর নখদর্পণে। রুদ্রনগরে তিনদিন তিন রাত কোথায় থাকবো, সেই হদিশ আমি তোর কাছ থেকেই নেব।'

দীপের কথায় পরিবেশ কিছুটা অন্তত লঘু হয়। আব্বাস তার টুপিটাকে আর একবার ঘোরায়। তারপর নাগাড়ে বলে যায়, 'আমি এখানে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আর একবার আসবো। অধমের এই দ্বীপে কেবল দোকান নয়, একটি বাসযোগ্য নিবাসও রয়েছে। আমি আমার বন্ধুকে ওই বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থাকতে দেব না। দ্য রুম ইজ প্রপারলি ফারনিশড্। টিভি আছে, এ-সি আছে। এই ব্রাঞ্চ থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে। আমার কথা আপাতত শেষ। ঠিক সময়ে চলে আসবো।'

নাগরায় মৃদু শব্দ তুলে বেরিয়ে যায় আব্বাসউদ্দিন।

LAUREL

With Best Wishes From-

PRAKASH-PRAMOD BAID

Laurel Securities Private Limited

(Member of National Stock Exchange of India Ltd.)

LAUREL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED

(Investment Advisor Mutual Fund Distributor)

JAIN BAID & COMPANY

(Chartered Accountants)

909-910, Diamond Heritage, 16, Strand Road, 9th Floor, Kolkata - 700001

Phone No. 66153334-39, Fax No. 66153341, Email ID - prakash_laurel@yahoo.com

এই হলো ব্যাঙ্কের ভল্ট। প্রতীকী কুবের এখানে ঘুমিয়ে আছেন। বাইরের মহিমণ্ডল, জল-বাতাস এখানকার কুবেরীয় উপনিবেশে কোনও চাঞ্চল্য আনতে পারে না। বাইরে যত টাকা পয়সার লেনদেন হয়, এই কেল্লার ধনভাণ্ডারের কাছে তা নস্যি। দীপ গুনে দেখল, ভেতরে মোট তেরটি নামি কোম্পানির বিশেষ মাপের আলমারি সারবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। প্রতিটিতে একশ চুয়াল্লিশ ধারা নিশ্চিত জারি রয়েছে। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ও হেড কেশিয়ারের যুগ্ম চাবি-স্পর্শ ছাড়া এর একটিও তার মুখকে হাঁ করবে না। বাইরে মহতী প্রীতি কিংবা উল্লাস সোৎসাহে যে বাতাবরণই নির্মাণ করুক না কেন, এ বরফ অন্দমহলে তার কোনও অনুরণন থাকে না। প্রধানমন্ত্রী, বিত্তমন্ত্রী তাঁদের বাগ্মিতায় যতই 'ডিজিটাল ডিজিটাল' রব তুলুন, ভল্ট তার গাম্ভীর্য অটুট রাখবে।

তেরোটি আলমারির মধ্যে নয়টিতে শুধুই টাকার গাঁটরি। বাকি চারটিতে গিজগিজ করছে গোল্ড লোনের ব্যাগ, নানা কিসিমের ফাইলপত্তর, ডকুমেন্টস আরও কত কী! এমন রেকর্ডও আছে, যাদের বহু বছর ধরে সামনাসামনি এনে ফেলা হয়নি। তবে পোকা-মাকড় ইত্যাদি দুষ্কৃতীদের দূর করতে সপ্তাহে অন্তত একবার কীটনাশক স্প্রে করা হয় দৃশ্যত অবহেলা ভরে।

নোটের প্যাকেট তৈরি করা হয় ডিনোমিনেশন ওয়াইজ। প্রতিটি প্যাকেটে নোটের সংখ্যা একশো। প্যাকেটগুলি আবার দু-রকমের। ইস্যুয়েবেল এবং নন-ইস্যুয়েবেল। ইস্যুয়েবেল প্যাকেটের নোটগুলি মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, কিছু প্যাকেট একেবারে নতুন ঝকঝকে। নন-ইস্যুয়েবেল প্যাকেটগুলিতে শুধুই রদ্দি নোট— ছেঁড়া, ফাটা, তাপ্পি দেওয়া। বছরে দু-তিনবার ওই রদ্দি নোটের প্যাকেটগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেইগুলিকে সব পুড়িয়ে ছাই করে। ইত্যাকার কর্মচক্রে কোনও গলতি বা বেগড়বাই ইন্সপেক্টরের নজরে এলে রিপোর্টে তার প্রতিফলন ঘটবেই। যাদের হাত নুলো, তারা ব্যাঙ্কে কেশিয়ার হবার হকদার নয়। সুশীল চক্রবর্তীর হাতের আঙুলটি টেবা টেবা। ওই আঙ্গুলে কিন্তু ঝড়ের গতিতে নোট গোনা সম্ভব নয়। ঝড়ের গতিতে নোট গোনা কাকে বলে, সেটা দেখালো হরেন গুছাইত। দীপ সব প্যাকেট গোনোলা না। অধিকাংশ প্যাকেট গোনা হলো মেশিনে। একেবারে নির্ভুল। দীপ হেড খাজাঞ্চির দিকে তাকিয়ে

জানতে চায়, 'ক্যাশ ইজ ফাইন। নাউ গোল্ড লোন। গোল্ড লোন নিয়মিত দেওয়া হয়?'

'আগে গোল্ড লোন দেওয়া হোত না। চ্যাটার্জিসাহেব এসে চালু করলেন।'

'গোল্ড লোন অ্যাকাউন্টের সংখ্যা কত?'

'তিরানব্বুইটি।'

'বলেন কী! আড়াই মাসে নাইনটি থ্রি গোল্ড লোন! বাহ্‌বা পাবার যোগ্য। হেড খাজাঞ্চি হিসেবে আপনার পারফরমেন্স তো দারুণ।'

সুশীল চক্রবর্তী বিনয়ে মাথা নীচু করে বলে, 'আমরা পুরনো লোক। ব্যাঙ্কই আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। ব্রাঞ্চটাকে প্রফিটে আনবার চেষ্টা করেছি। অন্য অ্যাডভান্সের স্কোপ যখন কম, তখন গোল্ড লোনের দিকেই নজর দিতে হল। আগের ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে আমি বোঝাতে পারিনি। চ্যাটার্জিসাহেব বুঝলেন।'

'বেশ। লোন দিলেন যে সমস্ত গহনা বন্ধক রেখে, তাদের সোনার পিউরিটি কী আপনিই নির্ণয় করেছেন, নাকি কোনও রেজিস্টার্ড গোল্ডস্মিথকে দিয়ে করিয়েছেন ইন্টারেস্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট করে?'

সুশীল চক্রবর্তী জানায়, 'সোনা কতটা খাঁটি তা আমি কষ্টিপাথরে ঘষে মোটামুটি বের করতে পারি, স্যার। কিন্তু এখানে আমি এই কাজটাকে নিখুঁত করার জন্য স্থানীয় একজন দক্ষ স্যাঁকরার সাহায্য নিয়েছি। তিনি যে সোনার দোকানের কর্মী, সেই দোকানের স্ট্যাম্প সমেত তাঁর সার্টিফিকেট রয়েছে প্রতিটি গোল্ড লোনের ডকুমেন্ট।'

'কোথায় কাজ করেন ওই গোল্ডস্মিথ?'

'স্যার, আপনারই বাল্যবন্ধু আব্বাসউদ্দিনের জুয়েলারি শপে সব সময় কাজ করে চলেছেন। হাতের কাজ অতি চমৎকার। নাম তার রামপ্রসাদ কর্মকার।'

'কাল আমি গোল্ড লোনের ব্যাগগুলিকে খুলবো। প্রতিটি ডকুমেন্ট চেক করবো। তারপর পরশু দিন কয়েকজন লোনির বাড়িতেও যাবে আপনাকে সঙ্গে নিয়ে।'

'এ নিয়ে আপনি বেশি ভাববেন না, স্যার। এভরি থিং ইজ ইন অর্ডার।'

'একজন ইন্সপেক্টরকে তার ডিউটি করে যেতেই হয়। রাইট আর রঙ পরের কথা।'

দীপের গলায় কাঠিন্য বিলক্ষণ।

এই প্রথম সুশীল চক্রবর্তী বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্রাঞ্চ ইন্সপেক্টরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

আরও কিছু কাজ সারতে সারতে বেলা ঢলে পড়ে। ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটায় দারোয়ানের উল্লসিত স্বর ভেসে আসে, 'সেলাম, হুজুর, আব্বাস সাহেব।'

আব্বাসউদ্দিন এসে দাঁড়ায়।

দোস্তকে নিয়ে এবার সে বের হবে।

রুদ্রনগরের শহুরে চরিত্রের কাছে সাগরদ্বীপের আর সকল এলাকা ম্লান। ক্ষণিকের জন্য মনে হতে পারে বুঝি গড়িয়ায় পৌঁছে গেলাম। এ কারণেই রুদ্রনগরকে বলা হয় সাগরের রাজধানী। তবে ভোরে পাখির ডাক অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়। সামুদ্রিক নোনা বাতাসে শরীর অন্যরকম অনুভূতিতে আক্রান্তও হয়। সবক'টা রাজনৈতিক দলের কার্যালয় গড়ে উঠেছে, পার্টি অফিসে বসে বুড়োরা চুটিয়ে টিভি দেখে। কিন্তু সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে ওঠায় প্রতিটি দলের তরুণ ব্রিগেডকে চেনা গেল, যদিও এখানে এখনও সুধী নাগরিক সমাজের নাভিশ্বাস ওঠেনি। উঠবে তো নির্ঘাত। প্রকৃতির দ্বিধাগ্রস্ততা কেটেছে। চারদিন আগে কালবৈশাখী প্রথম ঝাপটা মেরেছে। সবুদ, প্রসাধনী দ্রব্যের বিজ্ঞাপন অতিকায় হোর্ডিংটা বাঁধনচ্যুত অবস্থায় ঝুলছে।

চারপাশটা জরিপ করতে করতে আব্বাসের সঙ্গে প্রায় পা মিলিয়ে চলেছে দীপ। এই সেই পথ— মকর সংক্রান্তিতে যা ছিল ভিড়ে ভিড়াক্কার। কাতারে কাতারে পুণ্যার্থী হিন্দুরা চলেছে কপিলমুনির আশ্রমের দিকে। আজ এই প্রায় শুনশান পরিমণ্ডলে সন্ধ্যা নামবার কিছুক্ষণের মধ্যেই দীপ পাণিগ্রাহী সেই তীর্থে পৌঁছে যেতে পারবে বলে মনে করছে। যাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্থানীয় আশ্রমেও। নিজের সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার নিরিখে দীপ মনে করে, বিপন্ন ও আর্তের সেবায় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ যেভাবে নিজেকে প্রায় মিশিয়ে দেয়, ভারতের আর কোনও সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা তার ধারেকাছে আসতে পারে না।

পরপর অনেকগুলি দোকান পার হবার পর আব্বাস দীপকে এনে দাঁড় করালো তার জুয়েলারি শপের সামনে। বিশাল ঝলমলে সাইনবোর্ড 'ঈমান জুয়েলার্স'। সাজসজ্জায়, পরিচ্ছন্নতায় চমৎকৃত হবার কারণ থাকলেও পাটোয়ারি বুদ্ধি নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। কারণ এখানে ওই অপূর্ব তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল অলঙ্কার কিনবার মতো খদ্দের কি আছে? হয়তো আছে। অথবা ভবিষ্যতে কর্তার অভীষ্টপূরণ ঘটবেই। নিশ্চিত সাগরদ্বীপে অলঙ্কারের দোকানরূপে ঈমান জুয়েলার্সই তখন হবে

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দীপের কথায় রগড়, 'তোর তো এখানে মনোপলি বিজনেস।'

'নো ডাউট অফ ইট।'

'বেচাকেনা কেমন?'

'টুকটাক। আংটি, রিং, বড়জোর সরু চেন। শাদির সময়ে বালা-চূড়ের বরাত আসে।'

'তাহলে তোর পোষাচ্ছে কীভাবে?'

'আমি কিছুটা ব্যতিক্রমী। ভিন্ন জাতের ব্যবসায়ী। নজর ভবিষ্যতের দিকে। কোরআন বলছে, তোমার নিকট রসুল আসবে। সে তোমাকে বিপদে পড়তে দেবে না। আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তিনি সাগরে বন্দর গড়বেন। সেই বন্দর যেদিন গড়ে উঠবে, আমি লাভের কড়ি গুনতে শুরু করব।'

'তুই খুব আশাবাদী ও ধার্মিক বুঝলাম। কিন্তু এখানে আসিস তো সপ্তাহে দু-দিন কী তিনদিন। কোটি টাকার মাল। সামলায়টা কে?'

'ওই— ওই যে আমার বিশ্বস্ত শিরোমণি। একাধারে শিল্পী, ডিজাইনার, অন্যদিকে বিশ্বস্ত কর্মচারী।'

আব্বাস যার দিকে আঙুল তুলল, তার দেহ ও অভিব্যক্তিতে কিছু ব্যতিক্রম আছে। সে খুব লম্বা, দৈহিক কাঠামোয় মেদ-মজ্জা কম, তামাটে রঙ, মাথার পাতলা চুলে কিন্তু রঙ মাখার চিহ্ন, চোখ কুঁচকে থাকে, দেখলে মনে হবে ভাবনায় ভারাক্রান্ত। ধারেপাশে নজর কম, ছিমছাম পরিবেশে শিল্পকর্মে মগ্ন থাকাতেই হয়তো অভ্যস্ত। বাড়তি কথায় নেই, উঠে দাঁড়ায়, সামান্য সৌজন্য দেখিয়ে হাত তোলে কপালে।

আব্বাসউদ্দিনের কিন্তু লম্বা গুণকীর্তন, 'রামপ্রসাদ কর্মকার। জাত স্বর্ণ শিল্পী। নিত্য নতুন ডিজাইনের জন্ম দেয়। সততার সঙ্গে কাজ করে। কূট-কাচালিতে থাকে না। এখানকারই লোক। এ জেম অফ সাগর-সোসাইটি।'

মালিকের ইশারার অপেক্ষা না করেই রামপ্রসাদ কোনও একটা স্টল থেকে চা ও বিস্কুট নিয়ে এলো। বোঝা গেল, মালিকের উপস্থিতিতেও ক্যাশবাক্সে তার অবাধ প্রবেশাধিকার। ক্যাশ থেকে একমুঠো টাকা নিজের পকেটে চালান দিয়ে দীপকে নিয়ে আবার পথে নামে আব্বাস। আরও খানিক এগিয়ে যাবার পর পশ্চিমে বাঁক নেয়। তারপরই আব্বাসের ছবির মতো 'সাগরনিবাস'। নাতিবৃহৎ একতলা হলেও নয়নাভিরাম। সামনে চিলতে বাগান। পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পানের চাষ। সেখানে আবার একটি ছোট্ট চালাঘর। আব্বাস আঙুল তুলে বললে, 'ওটা হালিমার সংসার। সব দেখাশোনা করে এখানকার। প্রয়োজনে ডাকবি, যা দরকার। ব্যবস্থা করে দেবে মেয়েটা। আশঙ্কার কারণ নেই। আমি ওকে বলে দিয়ে যাবো।'

দীপের পিঠে বন্ধুর মৃদু করাঘাত।

দীপের জন্য যে ঘরখানা খুলে দেওয়া হলো, সেটা যেন এক শেখের বিলাসবহুল তাঁবু। দেওয়ালে ঝুলন্ত চাঁদ-তারা সমেত মক্কার মসজিদ, মস্ত সোফা, যৎপরোনাস্তি সুখদায়ী শয্যা, অ্যাটাচ বাথ ও টয়লেট, ছবিতে আব্বাজানের হাত ধরে বালক আব্বাস, ফ্ল্যাট টিভি, দেওয়ালে এ-সি মেশিন, ঝুলছে সিলিং ফ্যান। পরিবেশে আরও মাধুর্য আনে বাইরে রকমারি পাখির ডাক। দীপ কম-বেশি মুগ্ধ। কৃতজ্ঞও। আব্বাস হাত বাড়ায়, 'হ্যাভ এ পিসফুল অ্যান্ড ড্রিমফুল হ্যাপি নাইট। আমাকে এখুনি যেতে হবে। না হলে লাস্ট লঞ্চ ধরতে পারব না।'

দীপ তার শিক্ষানবিশি পর্বেই তালিম পেয়েছে, কীভাবে নিজেকে কিছুটা আড়ালে রেখেও কেজো পৃথিবীর অপরিচিত ভূখণ্ডকেও আনন্দলাভের ছোট ছোট মুহূর্ত গড়ে নেওয়া যায়। বিড়ম্বনার মধ্যেও থাকতে পারে সাফল্যের বীজ; তবে বাগাড়ম্বর অবশ্যই একটি বদ দোষ— যা দীপ পাণিগ্রাহী এখনও ঠিক ত্যাগ করতে পারেনি।

ব্রাঞ্চ ইন্সপেকশনে যাওয়া মানেই নিজের ওপর একটা শক্ত আবরণ রাখা। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সমেত সকলেই সতত ব্যস্ত তাঁর ব্যক্তিগত তুষ্টিকে সার্থক করতে। এবিষয়ে নাগরিক চেতনার সঙ্গে মফস্‌সল, এমনকী গ্রামেরও দৃষ্টিভঙ্গির কোনও প্রভেদ নেই। তাই যার ছুঁৎমার্গ নেই, তাকে এই কাজে না রাখাটাই বিধেয়। ইন্সপেক্টররা যদি তাঁদের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতো, বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীরা এভাবে জাত অপরাধীর শিরোপা আদায়ে সমর্থ হতো না। মিডিয়াও এভাবে সাড়া তোলার বহু আগেই একাধিক জনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব হতো।

দীপ পাণিগ্রাহী তাই সুবিধা নেবার প্রলোভন থেকে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা বরাবর করে এসেছে। কিন্তু এই প্রথম সে নিজের ওপর বিরক্ত। তবে কী উচিত হয়েছে আব্বাসের বাগানবাড়িতে বিনে পয়সায় তিনটি রাত কাটাতে সম্মত হওয়া? হতে পারে আব্বাস তার কলেজ জীবনের বন্ধু, কিন্তু সে তো আবার ব্যাঙ্কের ভ্যালুড কাস্টোমার! তাহলে?

দীপ ভাবে কাজের দুনিয়ায় সে যথাসাধ্য কঠিন, কিছুটা

KALI PIGMENTS PVT. LTD.

Manufacturers of Red Lead, Litharge & Lead Sub-Oxide

1/4C, Khagendra Chatterjee Road
Kolkata - 700 002, W.B. India
Mobile : 98367 98663, Email : rinku_kej@yahoo.com
E-mail : kamal.kishore64@yahoo.com

D. S. ENGINEERS & CONSULTANTS
73, Bentick Street, 1st Floor, Kolkata - 700 001
M : 9331741971, Ph, - 033 40648081,
www.silverlinetyres.com e-mail : sdhanania@gmail.com

CYCLE & VAN
TYRES TUBES & RIMS

অসামাজিকও। কারোর বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে সিগারেট নেয় না। দামি ওয়াইনের ব্যবস্থাপনা দেখলে হামলে পড়ে না। তবে একটু পেটুক। বিশেষত, এক-আধটা মিষ্টি পেলে হাত গুটাতে পারে না। যেমন তার রমণীপ্রীতিও লক্ষণীয়। মেয়েদের সঙ্গে কথা বলায় উৎসাহ। হয়তো এটা তার ব্যর্থ প্রেমের প্রতিক্রিয়া। যেন সে তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা বিদ্যাশ্রী পট্টাভিরমণকে ঈর্ষাকাতর করতে চাইছে। একসঙ্গে ব্যাঙ্কে অফিসার হয়ে ঢুকেছিল। প্রেম হয়েছিল। পরে সেই দক্ষিণী কন্যা জনৈক প্রবাসী ডাক্তারের ঘরনি হয়ে চাকরি ছেড়ে সেই যে পাড়ি দিল লন্ডনে, আর ফিরে আসেনি। দীপ ভোলেনি। ব্যথাটা থেকে থেকে ফিরে আসে।

কপাটে তালা ঝুলিয়ে পথে নামে। আগে যাবে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। তারপর কপিলমুনির আশ্রম। তারপর সোজা সমুদ্রতট। ফিরে এসে বসবে ল্যাপটপ নিয়ে। কিছু ইনফরমেশনকে ট্রান্সমিট করা আবশ্যক।

অনেকখানি পথ পায়ে হাঁটল সে। যা দেখছে, সবই অনেকদিন স্মৃতির ফোকাসে থাকবে। গুটিকয়েক ছবিও তোলে মোবাইল ক্যামেরায়। শেষমেশ উঠে বসে একটি রিক্সাভ্যানে। ভ্যান অতিক্রম করছে কালীবাজার। এখানেও ব্যাঙ্কের একটি মিনি ব্রাঞ্চ আছে। গুছাইত এতক্ষণে নিশ্চয় কাকদ্বীপে ফিরে গেছে। কাল বেলা দশটার আগে ফিরে আসবে।

এখন অবধি মনে হচ্ছে এ ব্রাঞ্চে জটিলতা কম। ভালো রেটিং তার কাছ থেকে পেতেই পারে। ভ্রূকুটির কারণ একমাত্র ওই গুচ্ছের গোল্ড লোন— তিরানব্বুইটা গোল্ড লোন আড়াই মাসে! এক একটা লোন অ্যামাউন্ট মিনিমাম পঁচাশি হাজার, ম্যাক্সিমাম তিন লাখ! সাগর দ্বীপে সোনার খনি!

যেহেতু একটা লোনেরও বয়স তিন মাস পার হয়নি, সুদ বা ইন্সটলমেন্টের প্রশ্নও ওঠে না। লোন নিল কারা? সকলেই কি এই দ্বীপের বাসিন্দা? সবকটাকে খুঁটিয়ে দেখতে বদ্ধপরিকর দীপ।

আবার সবকটা অলঙ্কারের পিউরুটি নাকি ভেরিফাই করেছে আব্বাসের কর্মচারী রামপ্রসাদ কর্মকার। আব্বাসের নামটা না জড়ানো থাকলেই ভালো হয়। ক্যাশ অফিসার আবার ওর দোস্ত। অস্বস্তি বাড়ছে।

প্রায় হাঁটি হাঁটি পায়ে সিংহদুয়ার দিয়ে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে প্রবেশ করে দীপ। কয়েকজন মহারাজকে ঘিরে স্নিগ্ধতা ও ব্যস্ততা। স্বামী প্রণবানন্দজীর মর্মর মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা জানায় দীপ। হুন্ডিতে পাঁচশো টাকার একটি নোট গুঁজে দেয়। প্রসাদ ও আশীর্বাদি ফুল নিয়ে ফিরে আসে।

পরবর্তী গন্তব্য কপিলমুনির মন্দির। এই প্রথম দীপ

এখানে এসেছে। এখন আরতির সময়। জমায়েত নামমাত্র। মুনিকে প্রণাম জানিয়ে চলল সে এবার অদূরবর্তী সমুদ্রে। এখন সাগরের চিত্ত প্রশান্ত। আধখানা চাঁদের আলো নোনা জলে ঝিকিমিকি। অনেক দূরে ফুটকি ফুটকি আলো— সম্ভবত কোনও জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। হাত দিয়ে খানিক সমুদ্রের জল তুলে নিজের মাথা ভেজায় দীপ।

সব মিলিয়ে খুশি দীপ। কাছাকাছি একটি হোটেলে ঢুকে রুটি তরকারি ডিমের কারি দিয়ে রাতের আহার সেরে নিল। তারপর একটা সিগারেট ধরায়। সারা দিনে সে তিনটির বেশি সিগারেট খায় না। এটা তার দ্বিতীয়।

একটা ট্রেকার আসছে। হাত তুলে দীপ ওটাকে থামায়।

পাখিরা পোকারা একচোট বাকবিতণ্ডা চালিয়ে সকলে হঠাৎই নিশ্চুপ। নির্জনতা ঘন হয়। অথচ ল্যাপটপ খুললেও কাজ ততটা এগোয়নি। টিভির দিকে তাকানো মানে মনের বিতৃষ্ণাকে দ্বিগুণ করা। এ রাজ্যের খবর এখন দ্বি-বিধ— প্রথমত, পঞ্চায়েতের ভোট নিয়ে যদুবংশের চেলারা যে হারে প্রায় অবাধে হিংস্রতা চালাচ্ছে, তাতে গণতন্ত্রের শ্মশানযাত্রা। দ্বিতীয়ত, এখানে-ওখানে নারী নির্যাতন সমেত এমন সমস্ত অপরাধ ও কেচ্ছা যে মধ্যবিত্তের হাত-পা সমেত গোটা শরীর কেমন শিথিল হয়ে আসে।

আগামীকাল তার জন্য কী কী বরাদ্দ রয়েছে, ভাবতে ভাবতে আয়নার সামনে দাঁড়ায় দীপ। চোখের চাউনিতে টুকরো টুকরো ভাব এনে মজা পায়। কাজ ও কর্তব্যের মোড়কে ঢাকা এই মানুষটার মন সময় সময় যে কীরকম করে ওঠে, কেউ তার হদিশ রাখে না।

রাতের বয়স এমন কিছু নয়। চারদিকে মধ্যরাতের শুনশান পরিবেশ। অচেনা আবহ। ঠিক এই সময়ে একটি নারীমূর্তি দীপের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে সন্তর্পণে। ছন্দবদ্ধভাবে প্রতিটি পদক্ষেপে তার কোমর এমনভাবে দোলে যেন একটি রিভলভিং চেয়ারের সিকিভাগ পরিক্রমা, ঠিক বুঝি চৌথুপি বাক্সের বিজ্ঞাপনে শরীর দেখানো এক বনলতা সেন। দর্শকের বোধবুদ্ধি বিবেচনা শক্তিকে চিবিয়ে খাবার জন্য কোম্পানির কার্যকরী আয়ুধ।

দরজায় টোকা দেবার আগে সে মনে মনে কী যেন হিসেব করে। তারপর —। তারপর টোকার শব্দ পেয়ে দীপ দরজা খোলে। একেবারে মুখোমুখি। বিস্ময়ের খপ্পরে পড়ে দীপ কয়েক সেকেন্ড নীরব থাকে। এরপর প্রশ্ন করে, 'তুমি?'

উত্তর এল সুরেলা গলায় হেঁয়ালি না রেখে, 'আমি হালিমা খাতুন। মনিব ফোনে আপনার কথা বললেন। আপনার যা যা দরকার, সব আমাকে বলতে পারেন। রাত তো হয়েছে। যদি বলেন, কাছাকাছি হোটেল থেকে খানা এনে দিতে পারি।'

'আমি খেয়ে এসেছি। তুমি বরং টেবিলের ওপর এক গেলাস জল ঢাকা দিয়ে রেখে যাও।'

এবার হালিমার কিন্তু হরিণগতি। দশ গোনার মধ্যে নিজের চালাঘর থেকে জলভর্তি একটি কাচের জগ এনে রাখল টেবিলের ওপর। জগটা ঢেকে রেখে সে ঘুরে তাকায় দীপের মুখের দিকে। মুখে সেই দুর্জ্ঞেয় হাসি, দেহে সেই সমস্ত বিভঙ্গ— যারা ফন্দি-ফিকির খোঁজে এবং পেয়েও যায় বহাল তবিয়তে। এক ধরনের গ্যাসচেম্বার। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবার কৌশল করায়ত্ত। তারপর মুরগিটার যে কী দশা হতে পারে, ঈশ্বর জানেন। মুহূর্তে দুঁদে ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহীর মনে কতগুলি প্রশ্ন কিলবিলিয়ে ওঠে। এই বস্তু কি আব্বাসউদ্দিনের পোষা জীব— যাকে যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করা যায়, নাকি ওই চালাঘরে ওর নিজস্ব মরদও থাকে! গোটা বাগানের পরিচর্যা কি এই সুন্দরীর পক্ষে সম্ভব? রাতে বনবাসিনীর অমন রূপচর্চা! চোখে সুর্মা, ঠোঁটে রং, মুখে পাউডার, পরনে ঝিলিক শাড়ি!

কৌতূহলে আধিক্য থাকলেও দীপ নিজেকে সংযত করে রাখে, 'হালিমা তুমি এখন আসতে পারো। দরকার হলে ডাকবো।'

ফ্লুরোসেন্ট আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে হাল্কা আলোয় ফিরে যায় হালিমা। দীপের অনুসরণকারী দৃষ্টি পলকহীন অবস্থায় থাকে প্রায় মিনিটখানেক।

আজকের আব্বাস সম্পর্কে দীপ একেবারে অনবহিত। হারেমে দুই বিবি, দশটি সন্তান। আবার তার রুদ্রনগরের বাগানবাড়িতে অমন এক খুবসুরত পরিচারিকা! আব্বাসের পিছুটানটা কোন দিকে? নিভাঁজ সুন্দর শয্যায় নিজেকে সঁপে দেয় দীপ। যেন আল্পসের চূড়া থেকে অবসাদ নেমে আসছে। তবুও শয়নমাত্রই নিদ্রাকবলিত হতে পারে না সে। হালকা ঘুমে স্বপ্ন এলো। সেই তার দক্ষিণী প্রেমিকা বিদ্যাশ্রী। দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটছে কোভালম সি বিচ ধরে। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। কিন্তু হু-হু বাতাস। হঠাৎ সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় বিদ্যা। পিছনে ফিরেও তাকায় না। মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে সমুদ্রে বিন্দুটি হয়ে। ঘুমের মধ্যে কঁকিয়ে ওঠে দীপ।

সেই যে ঘুম ভাঙলো, আর দু-চোখের পাতা এক হলো

না। নিরালম্ব শূন্যতায় কিছুক্ষণ ভাসমান থাকে দীপ। তারপরই কানে আসে রিন্ রিন্ হাসির আওয়াজ। বরাবরই গোয়েন্দাসুলভ কৌতূহল তার। বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। জানালার পর্দা সরিয়ে পশ্চিমদিকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। আধখানা চাঁদের আলোও এখন যথেষ্ট জোরালো। দীপ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এক উত্তেজক লুকোচুরি খেলা। শাড়ি ছেড়ে সালোয়ার কামিজ পরে হালিমা খাতুন পানবনের এ কোণ থেকে সে-কোণ ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর তাকে নাগালের মধ্যে পাবার জন্য দীর্ঘদেহী এক পুরুষও ছুটছে তার পিছু পিছু। লুঙ্গি হাঁটুর ওপর গোটানো, চুল এলোমেলো, একবার চশমাটার প্রায় স্থানচ্যুত হবার অবস্থা। লম্বা দুই হাত সমানে বাতাস কাটে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দীপ উচ্চারণ করে, 'রামপ্রসাদ কর্মকার।' সাগরে আব্বাসের ডান হাত।

শেষমেষ হালিমা স্বেচ্ছায় ধরা দেয়।

কর্মকার তাকে দুহাতে তুলে ধরে সোহাগে গদগদ। চালঘরের দুর্বল কপাটটাকে একরকম লাথি মেরে খোলে। ভেতরে ঢোকে দু'জনে।

গ্রাহক পরিষেবা শুরু হতে তখনও কম করে পনেরো-কুড়ি মিনিট বাকি রয়েছে। দীপ পাণিগ্রাহীর পিঠের ওপরে সেটে থাকা ব্যাগটা আজ কিন্তু ফেঁপে ফুলে আছে। কারণ, আজই প্রথম বেলার ঠা ঠা রোদে দাঁড়িয়ে হকারদের কাছ থেকে বেশ কয়েকখানা বাংলা সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কিনে ব্যাগে ঠেসেছে। পরে নিশ্চিন্ত মনে পড়া যাবে। কাছাকাছি কোনও এক অনুষ্ঠান থেকে মাইকে ভেসে আসছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাংলা গান খুব পছন্দ দীপের। সুযোগ ও সময় পেলে এরকম প্রোগ্রামে যেতে সে এক পায়ে খাড়া।

পৌনে দশটায় ব্রাঞ্চে ঢুকেছিল দীপ। আর এখন তার কালো ডায়ালের রেডিয়াম ঘড়িতে প্রায় বিকেল পাঁচটা। সারাটা দিন ভল্টের মধ্যে দীপ যেন ঝড়ের আবহ তুলেছিল। তার মগজের গঠন যে অতটা ঋজু হতে পারে, এরা নিশ্চয় বুঝে উঠতে পারেনি। একদম বাতেলা নয়, কথা যা বলেছে তার আশি শতাংশ ইংরেজি। আর সব কটা ব্যাখ্যাই সোজা ঢুকে গেছে Banking Regulation Acts এবং Book of Instructions এ। যার বা যাদের উদ্দেশ্যে বলা, তারা তো ভড়কে যাবেই। ভল্টের মধ্যে একটা বড় টেবিলের তিনদিকে তিনজন। ইন্সপেক্টর দীপ পাণিগ্রাহী, হেড খাজাঞ্চি সুশীল চক্রবর্তী, কাকদ্বীপ ব্রাঞ্চ থেকে আসা ডেপুটেড ক্লার্ক-কাম-ক্যাশিয়ার হরেন গুছাইত। দীপকে বাদ দিলে বাকি দু'জন হতভম্ব। এখনও টেবিলের ওপর গোল্ড লোনের ডকুমেন্টগুলি যে অবস্থায় রয়েছে, তা যেন এক পাড়-ভাঙা নদী— অপরাধীরা বাস্তবিকই সেখানে হাবুডুবু খেতে বাধ্য। তিরানব্বুইটা গোল্ড লোনের প্রতিটি অলঙ্কারের ওজন দীপ নিজের হাতে নির্ণয় করেছে। অদ্ভুত এক দৃষ্টান্ত— প্রতিটি গহনা মিনে করা বালা। যেন একই পরিবার থেকে এসেছে তারা। যেন একটিমাত্র পরিবারের তিরানব্বুই জন সদস্য সদস্যা এসে সোনা বন্ধক রেখে মোটা টাকার ঋণ নিয়ে গেছে। বিরলদের মধ্যে এটা হল এক নম্বর বিরল দৃষ্টান্ত।

এক বালতি জল আনিয়ে পেতলের পাল্লায় প্রতিটি বালাকে সুতো দিয়ে বেঁধে ওজন কষেছে দীপ নিজের হাতে, কারোর সাহায্য না নিয়ে। উত্তেজনায় তার দুই চোখ জ্বলছিল। ওয়াটার ওয়েটের এই থিওরির জনক সেই আদি সুসভ্য দেশ গ্রিসের মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিস। ইউরেকা, ইউরেকা, ইউরেকা। Wax and water have the same specific gravity। প্রত্যেকটি ওজনে বিস্তর গলতি ধরা পড়ে। তৃতীয় বিরল নির্ণয় হল, একটা বালাতেও নির্ভেজাল সোনার অস্তিত্ব নেই। নিজের ব্যাগ থেকে একটা বড়সড় টাচস্টোন অর্থাৎ কষ্টিপাথর বের করে দীপ। তখন তার চোখে-মুখে ভরভরন্ত আদিম হিংস্রতা। একটা একটা করে বালা ওই পাথরে ঘঁষলো। তামাটে দাগ ফুটে ওঠে পাথরে। সেই দাগের ওপর সামান্য কার্বোলিক অ্যাসিড ঢালে দীপ। মুহূর্তে প্রতিটি দাগ মুছে যায়। ধোঁয়ার রেখাগুলি এঁকেবেঁকে ঘুরতে থাকে তিন কুশীলবকে ঘিরে। দীপকে তখন মনে হচ্ছে যেন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবিষ্ট লক্ষ্মণ। মেঘনাদ বধে বদ্ধপরিকর। একবার কেবল উচ্চারণ করে, 'ঈশ্বর! একটা বালাও সোনার নয়। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।'

এরপর ডকুমেন্টস্।

কী অদ্ভুত! তিরানব্বুই জন লোনিকেই লোন ডকুমেন্টে ইন্ট্রডিউস করে দিয়েছেন একজনই মহামানব। তিনি জনাব আব্বাসউদ্দিন মণ্ডল। এবং তিরানব্বুই জন লোনির মধ্যে একজনও হিন্দু নেই। সব ক'জনই ইসলামে আশ্রিত। দীপ বাজি ধরে বলতে পারে, এই সবকটা নাম ও তাদের পরিচিতি ফিকটিসাস। ব্যাঙ্ক নিশ্চয় পরে এই সত্যটাকেও টেনে বের করবে।

এরপর পিউরুটি ভেরিফিকেশনের প্রসঙ্গ। প্রতিটি লোনের অলঙ্কারকে খাঁটি সোনা হিসেবে সার্টিফিকেট করেছে

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ—

Usha Kamal

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947

Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.
Authorised Dealer of

KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014

With Best Compliments From :

Wadhwana

"Park Center"
24, Park Street,
Kolkata - 700016
Phone :2229-8411/1031/4352
Fax : 91 33 2229-0492
e-mail : wadhwana@vsnl.com

বাবু রামপ্রসাদ কর্মকার। সে কে? সে আব্বাসের জুয়েলারি শপের ম্যানেজার। তার নর্মসহচরী— না থাক, সেই বৃত্তান্ত একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। ...আমি এবার যাবতীয় তথ্য ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে জানিয়ে সোজা ছুটবো লোক্যাল হেড অফিসে। পুলিশ আসবে, দারোগা আসবে, আসবে ব্যাঙ্কের ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্টের দক্ষ আধিকারিক। মিডিয়াও ঠিক গন্ধ পেয়ে যাবে। বিখ্যাত হয়ে উঠবে ব্যাঙ্কের রুদ্রনগর শাখা। ফোকাস এসে পড়বে তিন ব্যক্তিত্বের উপর— ধনী ব্যবসায়ী জনাব আব্বাসউদ্দিন মণ্ডল, হেড ক্যাশিয়ার বাবু সুশীল চক্রবর্তী, অলঙ্কার শিল্পী ও স্বর্ণ বিশেষজ্ঞ বাবু রামপ্রসাদ কর্মকার। তবে শপথ নিয়ে বলছি, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আমার নামকে আড়ালেই রাখতে। বিড় বিড় করতে করতে হরেন গুছাইতের সাহায্যে গোল্ড লোনের ব্যাগ ও ডকুমেন্টগুলিকে দুটো আলমারিতে ঢুকিয়ে সিল করে দিল দীপ।

সুশীল চক্রবর্তী কিন্তু ঠাঁয় বসে আছে। একদম পাথরের মূর্তি। অন্যমনস্ক মানুষও অতটা নিথর হয় না। অবশ্য দেশের ব্যাঙ্কিং ফিল্ডে এরকম পাথুরে ব্যক্তিত্বদের সংখ্যা বাড়ছে। একজনকেও কিন্তু একাকিত্বের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। শাখা-প্রশাখায় এরা ক্রমে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে। এখনও সময় আছে, অঙ্কুরে এদের চিহ্নিত করতে না পারলে সর্বনাশ আগামী প্রজন্মের।

দীপ আলমারি দুটো বন্ধ করে সুশীল চক্রবর্তীর ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কত টাকায় রফা হয়েছিল, সুশীলবাবু? এখনও তো আপনার প্রায় আড়াই বছর চাকরি বাকি ছিল। এত বছর সুনামের সঙ্গে চাকরি করার পর এরকম পদস্খলন! আব্বাসের টাকা আছে। অনেক বছর দরে আইনি লড়াই করবে। আপনি? আপনার কী হবে? নিন, উঠুন, আমিই এখন নিজের হাতে ভল্ট বন্ধ করে ব্রাঞ্চ ম্যানেজারকে চাবিগুলি দিয়ে যাবে গুছাইতকে সাক্ষী রেখে। আপনি তখন বলা বাহুল্য আপনার গডফাদারকে সবিস্তারে সব জানাবেন।'

হরেন গুছাইতের কাঁধে হাত রেখে শাখা প্রবন্ধকের ঘরে প্রবেশ করল দীপ পাণিগ্রাহী

পড়তি বেলার লঞ্চে ভিড় একটু বেশি। লঞ্চে ওঠার আগে সিগারেট ধরিয়েছিল দীপ। তিন নম্বর সিগারেট অর্থাৎ আজকের কোটা শেষ। দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করতে পারলে এই মায়াবী নেশাটাকেও ত্যাগ করতে হবে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে পিছনে ফেলে জলযানে উঠে পড়ে সে এবং আজও একটা পছন্দসই জায়গা পেয়ে গেল। হেড অফিসকে অনুরোধ করেছে গাড়ি না পাঠাতে। এখন আবার মোবাইলটাকে জীবিত অবস্থায় আনে। তার বিশ্বাস, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার এর রিংটোন বেজে উঠবে। নদীর বাতাসে আজ বড় কমনীয়তা। একা থাকার স্বাধীনতাকে আনন্দের সঙ্গে অনেক বছর সে উপভোগ করেছে। আর নয়। বয়স অনেক হলেও হয়তো এখনও পারিবারিক স্পেসে নিজের ঠাঁই গড়ে নিতে পারবে।

আসবার সময় সে বাড়ির চাবি দিতে গিয়েছিল হালিমার চালাঘরে। অস্বচ্ছ গুহা থেকে যেন বেরিয়ে এলো মনোহারিণী। পুনরায় বেশ পরিবর্তন। সাদা নাইটি, লম্বা স্লিম, বাঁকা বিনুনি, মদালসার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এবারও বিপদ এড়াতে পেরেছে দীপ।

'চাবিটা দিয়ে গেলাম। তোমার মনিবকে জানিও। আমি আর এখানে থাকছি না।'

অনুমান অভ্রান্ত। মোবাইলটা বেজে ওঠে।

'হ্যালো।'

'আমি আব্বাস বলছি।'

'বেশ।'

'সব শুনলাম।'

'তাহলে আর বেশি কথার দরকার নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল।'

'তুই এখন কোথায়?'

'মাঝ নদীতে।'

'যাচ্ছিস কোথায়?'

'আমাদের হেড অফিসে।'

'হেড অফিস না গিয়ে আমার বড়বাজারের দোকানে চলে আয়, বুড়বক।'

'কোন দুঃখে?'

'দু-পকেট ভরতি টাকা। রাতে হালিমা।'

'বাহ্! আর কিছু হবে না?'

'আয়, মুখোমুখি কথা হবে।'

'দেখ, বাংলা ভাষাটা আমি খুব ভালো জানি না। তবে সেখানে শবরীর প্রতীক্ষা বলে একটা কথা আছে। তুই মাইরি শবরীর ওই প্রতীক্ষার নতুন নজির হয়ে থাক।'

'তোর এ তেজ থাকবে না। তোকে ঘায়েল করার অস্ত্র হতে পারে ওই হালিমাই।'

'সে গুড়েও বালি। আমি রুদ্রনগর থানায় আগাম যা জানাবার, জানিয়ে এসেছি।'

'থানা! হাসালি। থানা আমার পকেটে।'

'ওই পকেট খালি হয়ে যাবে রে। ফর ইওর ইনফরমেশন, সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের শীর্ষে আসীন এখন অনুত্তম চৌধুরী। নাম শুনেছিস? চৌধুরীদা আমাকে স্নেহ করেন। সব সংক্ষেপে শুনেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মুহূর্ত গুনে যা।'

'শা—'

মোবাইলের সুইচ অফ করে দীপ।

লঞ্চ লট নং এইটের জেটিতে ভিড়ছে।

With Best Compliments From-

A Well Wisher

রেনেসাঁর ভূমিতে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

Don't tell me, how educated you are, tell me how much you have travelled.

– Confucious

ক'বছর আগে কলকাতা বইমেলার ফোকাল থিম হয়েছিল ইতালি। সে দেশের প্যাভিলিয়নের বুকলেট পেয়ে মনে হল, আর বিলম্ব নয়। জুৎসই সঙ্গী আর মনের মত বিমান সংস্থার সন্ধানে যখন দিন কাটছে ঠিক তখনই সমাপতনের মত ঘটে গেল দুই যুবকের একই দিনে আগমন। শিলিগুড়ির শিক্ষক রাজীব ঘোষ রায় ও বন্ধুপুত্র বার্লিনবাসী তমোনাশ পাল। প্রথমজন এয়ার ইন্ডিয়ার সুলভ টিকিট ও দ্বিতীয়জন আমাদের নির্ঘণ্ট মেনে প্রতিটি শহরের ডেরা ও ট্রেন টিকিটের ব্যবস্থা করার কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে পালন করল। কলকাতায় তখন গ্রীষ্ম মধ্যগগনে। ইউরোপে Shoulder Season.

মিউনিখ থেকে পাদুয়ায় পৌঁছলাম দুপুর বারোটায়। স্টেশন থেকে বাইরে এসে দেখি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। নির্জন রাজপথে ট্রামলাইনে স্থানে স্থানে জল জমে। স্টেশনের স্থাপত্যে অনাড়ম্বর করিন্থিয়ম শৈলীর মধ্যে প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। মধ্যাহ্নের পাদুয়া। কেমন ঝিমধরা ভাব। লোকজন গাড়িঘোড়া তেমন নেই – কেবল কিছু আফ্রিকান তরুণ ভবঘুরের মত ইতস্তত দলবদ্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইতালি সম্পর্কে নানা কথা শোনা। ফলে সতর্কতার মাত্রা বাড়ে। স্টেশনের দক্ষিণ প্রান্তে প্রধান গেট দিয়ে বেরিয়ে ওভারব্রিজ টপকে উত্তর প্রান্তে এসে একই রকম জনবিরল পল্লীতে বাগানে সাজানো হস্টেল বি. বি. উইলিয়ম। বেল বাজাতে এসে গেট খুলল মালকিন চীনা তরুণী।

প্রাগ বা মিউনিখের তুলনায় শ্রীহীন ছোট ঘরটি আমাদের দেশের যে কোনও তীর্থস্থানের দু'কামরার ধর্মশালার সমগোত্রীয় বলা যায়। তবে ড্রইং কাম ডাইনিং রুমটি স্মারকে আসবাবে ও সৌন্দর্যে নজরকাড়া।

পাদুয়ায় পদার্পণ করে সর্বত্র এক পল্লী প্রকৃতির ছোঁয়া অনুভব করছি। এক নির্ভেজাল গ্রাম্য পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে যুগ যুগ ধরে অমলিন এই ঐতিহাসিক নগরী। আজও সে সেক্সপিয়র বর্ণিত প্লেসেন্ট গার্ডেন। নিজের দেশে চেনা শহরতলী এমনকি গ্রামাঞ্চলেও ডাহুক ডাকা বাগান, বেনেবৌ এর ডাক, পুষ্করিণীতে পানকৌড়ির ডুব বা কালো হয়ে আসা দিঘীর জল দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসী নগরায়নের দাপটে। সেখানে পাদুয়ার মত শহর যেন কষ্ট কল্পনা। আজও সে মধ্যযুগের প্রকৃতিকে ধরে রেখেছে।

গেটস্ অব প্যারাডাইস, ডুয়োমো, ফ্লোরেন্স।

অজানা অচেনা শহরে মুক্ত ভেলার মত ভ্রমণের মজাই আলাদা। ভারতীয় রেস্টুরেন্টে মেনুর দাম দেখে বেরিয়ে হঠাৎ এক বাঙালি শেফকে আবিষ্কার করি। মাথায় ছোট, বহরে বড় বাঙালি সন্তান চিনতে আমার কখনোই ভুল হয় না। ছেলেটি বাংলাদেশের বাঙালি। নিজেই প্রস্তাব দিল এবং পরিবেশন করল চিকেন কাবাব পিৎজা। দাম, মান ও পরিমাণ সবকিছুই পরম তৃপ্তিদায়ক।

ভ্রমণ সূচি বানাবার সময় পাদুয়া শহর নির্বাচনের পিছনে একটাই যুক্তি ছিল, কাছাকাছি অন্য শহরে থেকে ভেনিস দর্শন। সুতরাং ২৪ মাইল দূরে পাদুয়াই ভালো। এ শহরে এসে বোঝা গেল গুপ্ত যোগীর মত পর্যটনের আলোকবৃত্তের বাইরে থাকা পাদুয়াকে দর্শন না করলে কালচারাল ট্যুরিস্ট হিসেবে নিজেকে ভেবে নেওয়া শ্লাঘাটা অবশ্যই ধাক্কা খেত।

লে মার্কেভেনাসি, পিয়াৎসি গ্যারিবল্ডি, পিয়াৎসি কাভুর একের পর এক পেরিয়ে চলি। স্কুল জীবনের পাঠ্যে এই নামগুলির সঙ্গে নামমাত্র পরিচয় হয়েছিল। পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এক অনির্বচনীয় অনুভূতির শিকার হই, যেমনটি হয়েছিলাম কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে গিয়ে। এই পথেই একদিন হেঁটেছিলেন কোপার্নিকাস, যেখানে আমি আজ দাঁড়িয়ে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতালির দ্বিতীয় ও বিশ্বে ষষ্ঠ প্রাচীনতম একথা জানা ছিল। এখানে ১৫৯২তে গণিতের অধ্যাপক ছিলেন গ্যালেলিও, ছাত্র হিসেবে গৌরবময় উপস্থিতি ঘটেছিল কোপার্নিকাসের। বিশ্বে প্রথম মহিলা এখান থেকে ডিগ্রী

লাভ করে। ফ্যাব্রিসিয়াস বিশ্বের প্রথম অপারেশন থিয়েটার বানান। রক্ত সঞ্চালন তত্ত্বের উদ্ভাবক ইউলিয়ম হার্ভে থেকে স্তাঁধাল কতো প্রতিভা ধন্য করেছে এখানকার জ্ঞানপীঠকে।

পায়ে পায়ে এসে যাই জার্ডিনি ডেলোরিনা। এক টুকরো পারিজাত উদ্যান যেন। প্রাচীন রোমান এ্যাম্ফি থিয়েটারের কিছু চিহ্ন ছড়ানো ছিটোনো। এই উদ্যানই সম্প্রসারিত হয়েছে বিশ্বে প্রাচীনতম বটানিক্যাল গার্ডেনে।

অনেকের মতে পাদুয়ার ইতালিয়রাই নাকি সৌন্দর্যে সেরা। তার সঙ্গে মিশেছে অসম্ভব সাজানো গোছানো শহর। দু'ধারে পঞ্চদশ, ষোড়শ শতকের চওড়া পাথরের পাঁচিলে গড়া বিল্ডিং, সেই সঙ্গে সযত্নে রাখা করিডোর, আর্কেড, কলাম, পথিক-বান্ধব ও সাইকেল ফ্রেন্ডলী কবল্ড রোড।

ভিয়া রোমায় এসে মনে হল আনন্দময় পায়ে চলা পথ এমনই হওয়া উচিত। কিছুটা উজিয়ে এসে যায় পালাজ্জো ডেল্লা রাগিওনি। ১২১৯ সালে বানানো স্তম্ভহীন এমন বিশাল কক্ষ ইউরোপে নাকি দ্বিতীয়টি নেই। পঞ্চদশ শতকে এর চার দেওয়াল তিনশোর বেশি ফ্রেস্কো দিয়ে সাজানো হয়েছে।

সমগ্র পাদুয়াই সন্ত অ্যান্থনিময়। পর্তুগালের লিসবনে জন্মানো এই মহাত্মা খ্রিস্টের প্রচারে এসে একাকার হয়ে গেছেন এই শহরের সাথে। কোন অতীতে ১২২০ সালে প্রতিষ্ঠিত এক চার্চ ও সংলগ্ন কাম্পোনিল অভিভূত করে। সুউচ্চ টাওয়ারের শীর্ষে দণ্ডায়মান এ্যান্থনির মূর্তি যেন পড়ন্ত সূর্যের আলোয় স্নান করছে। দূর থেকে এই ব্যাসিলিকার বাইজান্টাইন স্থাপত্যের গোম্বুজকে প্রথমে মসজিদ বলে ভ্রম হয়েছিল।

পাদুয়ার মূল আকর্ষণ ১২৩১-এ নির্মিত বৃহৎ ব্যাসিলিকাটি। এটিও সন্ত এ্যান্থনির স্মৃতিতে নির্মিত। শত চার্চের প্রাগ দর্শনের পর দেখার দৃষ্টি ইতিমধ্যেই কিছুটা প্রস্তুত হয়ে গেছে। তাই রোমানেস্ক, গথিক, বাইজান্টাইন, রেণেসাঁ ও বারোক স্থাপত্যের মিলিত সৌন্দর্য নতুনত্বের স্বাদে মুগ্ধ করল। পবিত্রতায় এই ব্যাসিলিকা খ্রিস্ট দুনিয়ায় জেরুজালেমের সমগোত্রীয়। গ্যেটের ফাউস্টে মার্থে যখন মেফিস্টোফিলিসের কাছে জানতে চেয়েছিল তার স্বামী কোথায় আছে মেফিস্টোফিলিস বলেছিল তিনি পাদুয়ায় সন্ত এ্যান্থনির কাছে এক পবিত্রস্থানে সমাধিস্থ রয়েছেন। এক অতিন্দ্রীয় অনুভূতির জন্যই বোধ হয় এই সব প্রার্থনাস্থলকে চার্জড প্লেস বলে।

সকালে ব্রেকফাস্টের আসরে আলাপ হল সিয়েনা থেকে আসা এক ইতালীয় কাপলের সাথে। আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় লুককার বদলে নিজেদের শহর সিয়েনায় যেতে অনুরোধ করে জানালো, প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্বাদ পেতে গেলে সিয়েনা যেতেই হবে। ওরাও ভেনিস যাবে। আহারান্তে বলল, 'ভেনিসে দেখা হবে।' অনেকটা ইহুদিদের বিদায় কালের সম্ভাষণ, নেক্সট ইয়ার ইন জেরুজালেম, এর মত শোনালো।

রামেশ্বরমের পথে সমান্তরাল বাসের ব্রিজকে সঙ্গী করে ট্রেন যেমন সমুদ্র সেতু অতিক্রম করে সেই ভাবে ভেনিসে ট্রেন ঢুকলো। স্টেশন থেকে বাইরে আসতেই যেন অপেক্ষমাণ গ্র্যান্ড ক্যানেল করমর্দন করে বললো 'ওয়েলকাম টু ভেনিস'।

মধ্যযুগে রেশম সড়কের শুরু এই ভেনিস থেকে, শেষ বলা হয় চট্টগ্রামে। মধ্যিখানে যোজকের কাজ করেছে বিশাল চীন। বাংলার মসলিন বাগদাদ চীন হয়ে রোমে পৌঁছত এই ভেনিস হয়ে। ষোড়শ শতকে বিশ্বের এক নম্বর নগরীর মর্যাদার শিরোপা পেয়েছিল এই ভেনিস। আজকের ভেনিস কেবলই ট্যুরিস্টের নগরী। ৫৫০০০ স্থায়ী বাসিন্দার ভেনিসে দৈনিক ৬০০০০ পর্যটক সমাগম হয়। তাই স্থানীয় পৌর প্রশাসন যার পর নাই চিন্তিত। মেয়র লুইগিব্রুগনারো পর্যটকের সংখ্যায় রাশ টানতে চাইছেন। ইতিমধ্যেই বাড়ি বা দোকানঘরের হাত বদলে নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে। শব্দদূষণ কমাতে কবল্ড রোডে হুইল্ড লাগেজ নিষিদ্ধ। ভেনিসে অটোমোবাইল নেই। ভেনিস নাকি প্রতিবছর কয়েক সেন্টিমিটার বসে যাচ্ছে। একশো সতেরো ছোট বড় দ্বীপ সমন্বয়ে গড়া ভেনিসে নিকাশী ব্যবস্থাও তেমন নেই। সব বর্জ্যর গন্তব্য এই এ্যাড্রিয়াটিক।

এত কিছু সত্বেও এ্যানিগম্যাটিক ভেনিস আজও একটা মিথ। বিশ্বের মোস্ট রোমান্টিক ডেস্টিনেশন। পর্যটকের সংখ্যা অন্তত সে কথাই বলবে। গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারেই দু'হাত দিয়ে ধরে রাখা এক মস্ত গৃহ-র অলঙ্করণ চোখে পড়ার মত। হাতে ম্যাপ নেই। উদ্দেশ্যহীন জিপসীর মত 'ফলো দ্য মব' আপ্তবাক্যটা মেনে ব্রিজ অতিক্রম করে ঢুকে পড়ি হাজার পর্যটকের ভিড়ে ভেনিসের বড়াল পাড়া কিংবা নিমু গোস্বামী লেনে। সঙ্কীর্ণ গলি, দু'ধারে সাজানো বিপণী। হোটেলের সিঁড়ি। কোথায় চলেছি জানি না। এ যেন নবমীর ভিড়ে কলকাতায় ঠাকুর দেখার জনসমাগম। সারা দুনিয়ার মানুষজন তাদের ভাষায়, চেহারায়, গায়ের রঙে, আচরণে এক চলমান বর্ণময় কোলাজ যেন।

চলার পথে এসে যায় এক অতি প্রাচীন ধ্যানগম্ভীর চার্চ। বাঁক নিতেই বিস্ময় - সেই চিরপরিচিত সরু ক্যানেল। তারই গায়ে তিন চার তলার ইমারতের পলেস্তারা খসা পাঁচিল। কাশ্মীর শ্রীনগরের প্রাচীন অংশ ঝিলমের শাখা খালে এমন দৃশ্য নজরে পড়েছিল। পাঁচ ছয় ফুট চওড়া এমন খালের ওপর নাকি সমগ্র ভেনিসে হাজার খানেক ব্রিজ আছে। খালে ট্যুরিস্ট নিয়ে চলেছে গন্ডোলা।

পুল পেরিয়ে এ-খাল, ও-খাল ও তার তীরবর্তী পরিচ্ছন্ন পাথুরে পথ পরিক্রমার পর হঠাৎ নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিখ্যাত রিয়াল্টো ব্রিজের মাথায়। তলায় একের পর এক তীব্র বেগে দলবদ্ধ ভাবে রোয়িং করে চলেছে নানা বর্ণের রোয়িং বোট। তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার পর্যটক। দু'ধারে রয়েছে উঁচু উঁচু বাড়ি, বেশ কিছু প্রাসাদ। এদের অনেকগুলোই বিখ্যাত ধনীদের, যাদের কারো কারো বয়স নাকি ৯০০ বছর। মুখোশ থেকে কানের দুল, টি-শার্ট থেকে কিউরিও নিয়ে সারি সারি দোকানে বাংলাদেশী বিক্রেতা। চলন্ত ভেপোরেতো থেকে পর্যটকদের উৎসাহ যোগানো চিৎকার। ভেনিসের এ-এক অপূর্ব মোহিনী রূপ। ভেপোরেতো হল এ-শহরের যাত্রীবহনকারী বেসরকারি জলযান।

ভেনিস

এক সরু খালের ছোট্ট ব্রিজ অতিক্রম করে অপেক্ষাকৃত নির্জন গলির সুউচ্চ ইমারত ঘেঁষা পাথরের বেঞ্চে বসে পড়ি। বিশ্রাম ও জাবর কাটার উপযুক্ত স্থান বলা যায়। সঙ্গী কেনাকাটায় ব্যস্ত। আমি ওই রসে বঞ্চিত। স্বভাবতই মন দর্শন-সন্ধানী হয়। কবে কোন পঞ্চম শতাব্দীতে এড্রিয়াটিকের উত্তর থেকে কিছু মানুষ বর্বর জাতিদের আক্রমণে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই জলাভূমিতে বসতিস্থাপন করেছিল। কোচিনের উইলিংডনের মত ভেনিসে মানুষের তৈরি একটি মাত্র দ্বীপ আছে, যেটা বর্তমানে পার্কিং লট।

এখানে জলের ওপর নির্মিত বাড়িগুলো নাকি লার্চ গাছের গুঁড়ি পুঁতে বানানো, যে গাছ জলে লোহার মত শক্ত থাকে আর রোদে শুকোলেই ভঙ্গুর হয়। এই শহরেও পিয়াৎসার ছড়াছড়ি। সমুদ্রের জোয়ারে জলে নিমজ্জিত স্যান মার্কো পিয়াৎসাতে সর্বদাই উৎসবের মেজাজ। এখানে পিজন ফিডিং না করলে জীবনই বৃথা যেন। ব্যাসিলিকায় হেলেনিস্টিক শিল্পধারা। এই শহর ১২০৪-এ ক্রুসেডের নেতৃত্ব দিয়েছিল। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভেনিসের গৌরব বিশ্বজোড়া, যার সলতে পাকানোর অধ্যায়টি শুরু হয়েছিল সেই দশম শতাব্দীতে। তার প্রমাণ পালাৎসা ডুকলের ৩২৪ ফুট উঁচু কম্পানিলটি। ফ্লোরেন্সে যেমন মেদিচি পরিবার, ভেনিসে তেমন ডজেসরা। সেই সপ্তম শতাব্দী থেকে ১৭৯৭ তে নেপোলিয়নের ভেনিস অধিকার পর্যন্ত ছিল তাদের শাসন। এই সময়কালেই ভেনিস তার গরীমার উত্তুঙ্গ শিখরে ওঠে। ফ্লোরেন্সের মতো এখানেও আবির্ভাব ঘটে অসংখ্য শিল্পীর। জর্জিয়োনি, বেল্লিনি, টিনটোরেটোর মতো শিল্পীদের চিত্র এখানকার নানা মিউজিয়ামকে সমৃদ্ধ করেছে।

ক্যানালের পাড়ধরে হেঁটে চোখে পড়ে দূরে ছোট্ট এক দ্বীপ, চার্চ ও সংলগ্ন টাওয়ার। স্বভাবতই এক বিবাগী ভাবনায় সংক্রামিত হই। ইউরোপের তিনটি দেশ সমুদ্র শাসনে চমক দিয়েছে বিশ্বকে। এরা হল পর্তুগাল, ইতালি আর হল্যান্ড। ভবঘুরে চূড়ামণি মার্কো পোলো (১২৫৪-১৩২৪) এই শহরের ভূমিপুত্র।

১২৬০ সনে দুই ভেনিসীয় বণিক ভ্রাতা মাফেও ও নিক্কিলো পোলো ভলগা ধরে সারাই যায়। পথে গৃহযুদ্ধে আটকে গিয়ে আরও পূবে চিন চলে যায় তারা। তিন বছর বুখারাতে হুলাগু খানের কাছে ভি.আই.পি. মর্যাদায় অবস্থানের পর মোঙ্গল রাষ্ট্রদূতের অনুরোধে বুখারা ছেড়ে তারা সমরখন্দ, কাশগড় হয়ে ও গোবি অতিক্রম করে অবশেষে ১২৬৬ তে পিকিং (অধুনা বেজিং) পৌঁছায়। চিনে তখন ইউয়ান সাম্রাজ্য (১২৬৪-১৩৬৮)। কুবলাই খান দুই ভাইকে পোপের কাছ থেকে একশ জন খ্রিস্টান বিজ্ঞানী আনার অনুরোধ করেন। সেই সঙ্গে সোনার প্লেটে পাশপোর্ট সমেত ঘোড়া ও প্রহরী দেন। অবশেষে ১২৬৯ সালে তারা ভেনিসে ফেরে।

দ্বিতীয়বার মার্কো পোলোর বয়স যখন পনেরো এই দুই ভাই কিশোর মার্কোকে নিয়ে পুনরায় যাত্রা করে। এবার তারা আর্মেনিয়া, পারস্য, পামির, আফগানিস্তান হয়ে হর্মুজ প্রণালী ও তাকলামাকান ধরে চিনে পৌঁছায়। এ যাত্রায় কুবলাই খান মার্কোকে ভারতে ও ব্রহ্মদেশে পাঠান। তরুণ পোলোই পামির গ্রন্থির নামকরণ করেন। চিনের যেসব বস্তু পোলোকে অভিভূত করে তার মধ্যে এ্যাসবেস্টস ও কয়লা অন্যতম। তিনি মোঙ্গলদের শাসনাধীন চীনে প্রথম কাগজের নোটও দেখেন।

১২৯৫ সালে দেশে ফিরে মার্কোপোলো আর এক নগর-রাষ্ট্র জেনোয়ার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ভেনিসের হয়ে এক বহুদাঁড়ের যুদ্ধ নৌকা নিয়ে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বন্দি হন। বন্দি অবস্থায় পিসা-র এক সহবন্দী রুস্তি চেল্লোর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। চেল্লো ছিল রোমান্টিক লেখক।

পোলো বন্দি দশায় বন্ধু চেল্লোকে তাঁর বিশাল ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বললে চেল্লো তাকে সাহিত্যে রূপ দেয়।

ইতালির অন্য কিছু শহরের মত ভেনিসের সঙ্গেও সেক্সপিয়ার জড়িয়ে আছেন। তাঁর ৩৭টি নাটকের এক তৃতীয়াংশেরই পটভূমি ইতালি। কোন কোন পন্ডিত নাকি বিশ্বাস করেন সেক্সপিয়ার আদতে ছিলেন ইতালিয়। আরো স্পষ্ট করে বললে সিসিলীয়। তাঁর বাবা ছিলেন কেলভিন পন্থী। তাই প্রথমে ভেনেটো ও পরে তাঁরা ইংল্যান্ডে যান। ভেনেটোর পটভূমিতে রচিত নাটকগুলো হল পাদুয়ায় টেমিং অফ দ্য শ্রু। ভেরোনায় রোমিও-জুলিয়েট ও টু জেন্টলমেন অফ ভেরোনা। ভেনিসে মার্চেন্ট অফ ভেনিস এবং ওথেলো। ১৫৯৬-৯৮ এই সময়কালে তাঁর মার্চেন্ট অফ ভেনিস রচিত। এমনটা বলা হয়ে থাকে যে তাঁর ইতালির পটভূমিতে সৃষ্ট সব নাটকের মধ্যে ভেনিসই অবয়বে সব চেয়ে কম পাল্টেছে। সে যুগের ক্যানেল, গন্ডোলা, চার্চ, জুইস ঘেট্টো, বিয়েলটো ব্রীজ সব কিছু আজও বর্তমান। কেবল রিয়েল্টো তখন ছিল কাঠের।

সে যুগে ইহুদিরা বিশেষ নির্বাচিত এলাকায় (বর্তমানে স্টেশন এর সমীপবর্তী ফাউন্ড্রি) ঘেটোতে বাস করত। ঘেটো শব্দটা নাকি ভেনিসীয় গেটোর অপভ্রংশ যার অর্থ ফাউন্ড্রি। সেক্সপিয়রের যুগে এ-শহরের ইহুদিরা এই ঘেটোতে ১৫১৬ থেকে বাস করতে বাধ্য হত। সেখানেই শাইলক তার পরমাসুন্দরী কন্যা জেসিকাকে নিয়ে থেকেছে। প্রতি সূর্যাস্তে খ্রিস্টান প্রহরীর পাহাড়ায় বন্ধ হত ধাতব গেট। আবার সূর্যোদয়ের পর তারা যে যার কাজে যেত। শাইলকের সময়ে ভেনিসে ইহুদির সংখ্যা ছিল ৫০০০ (বর্তমানে নাকি ২০০০ এর মতো) সেকালে স্থান সংকুলানের জন্য সাততলা পর্যন্ত বানানো হত ঘেটোর আবাসন। এদের অনেকগুলোই আজও অভিজাত মর্যাদা নিয়ে অবস্থান করছে। বর্তমানে অবশ্য স্থানীয় ইহুদিরা আর জ্যুইস ডিস্ট্রিক্টে বাস করে না।

দিনের শেষে ট্রেনে পাদুয়া ফেরার পথে মনে হল ভেনিস সম্পর্কে চার্লি চ্যাপলিন যথার্থই বলেছেন, I like Venice better when tourists are there, because they give warmth and vitality to what could easily be a graveyard without them. এই প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অভিনেতাটি আটবার ভেনিস ভ্রমণ করেন। কেন কি জানি আমার দ্বিতীয়বার ভেনিস আসার ইচ্ছে হচ্ছে না। মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের সঙ্গে বয়সের এক জোরালো সম্পর্ক থাকে। সেটাই বোধ হয় কারণ।

If Itely were Monalisa, the Florence would be her smile. শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কোনও এক সাংবাদিক একবার প্রশ্ন করেছিলেন ইউরোপের কোন শহর সার্বিক বিচারে তাঁর সবচেয়ে পছন্দের? উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী নাকি বলেছিলেন ফ্লোরেন্স। এটা কে না জানে মধ্য ইতালির তাসকানি অঞ্চল প্রকৃতি ও সংস্কৃতি দুই দিক দিয়েই ভ্রমণপ্রিয় মানুষের কাছে অপ্রতিরোধ্য হাতছানি। ঢেউ খেলানো প্রাকৃতিক পরিবেশে উত্তরের এ্যালপাইন শীতলতা আর দক্ষিণ ইতালির উষ্ণতার কোনটারই আধিক্য এখানে নেই। জলপাই, আঙুর, দিগন্তপ্রসারি বাগিচা, চার্চ, নির্জন ক্যাসেল আর সবুজ ভেদ করা ছবির মত রাস্তায় দ্রুত ধাবমান যান দেখতে দেখতে ফ্লোরেন্সে এলাম দুপুর বারোটায়।

স্টেশন থেকে মিনিট আষ্টেক হাঁটাপথে সরু পাথর বিছানো সরণির ওপর আমাদের আস্তানা। দুটো চারতলা বাড়ির মাঝে গায়ে গায়ে সাটা ইউরোপের পরিচিত তিনতলা টের‍্যাসড বিল্ডিং। সরু ফুটপাথ লাগোয়া গ্রাউন্ড ফ্লোরেই লম্বা ঘর। ফোনে যোগাযোগ করলে একটুক্ষণের মধ্যেই হাসতে হাসতে হাজির ইতালীয় মালকিন। ঠিক যেন সত্তর দশকের হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী ফরিদা জালাল।

গেট খুলতেই মনে হল যেন ঢুকে পড়লাম ষোড়শ শতকে। তিনদিকে পাথরের দেওয়াল মাথার ওপরে বিশাল বিশাল কাঠের গুড়ির জয়েস্টের ওপর বিছানো কাঠের পাটাতনের সিলিং। সাজানো কিচেন, চার ওভেনের গ্যাস। ফ্লাক্সে চা, কফি, চিনি, কাপবার্ডে রান্নার সরঞ্জাম।

স্ট্যান্ডিং ফ্যান দেখিয়ে মজা করে মেয়েটি বলল, 'ইয়োর এয়ারকন্ডিশনার।' ফ্লোরেন্সের ট্যুরিস্ট ম্যাপ দিয়ে কেবল মাত্র তিনদিনের ঘর ভাড়ার ওপর ধার্য ট্যাক্সটুকু নিয়ে জানালো বাকি টাকা ওর দাদা নেবে। সে এখন ছুটি কাটাতে অন্য শহরে গেছে। প্রাণোচ্ছল মেয়েটি তার ইংরেজি বলার অক্ষমতার জন্য বার বার দুঃখ প্রকাশ করছে। তার বারো আনা ইটালিয়ান আর চারআনা ইংরেজি বুঝতে আমাদেরও কম মেহনত করতে হচ্ছে না। তাই কথোপকথন চালানো গেল না বেশিক্ষণ।

বিশ্বের মানচিত্রে ইতালি-বাভারিয়া-বোহেমিয়া যখন ছিল নবজাগরণের কেন্দ্র তখন ফ্লোরেন্স ছিল ইতালির রেনেসাঁর ধাত্রীগৃহ। এই নগরীর জন্য আমরা মাত্র তিনরাত দিয়েছি। দ্রষ্টব্যের বিচারে এটা কিছুই নয়। আমাদের হস্টেলের খুবই কাছে উফিজি চত্বর। চা বানিয়ে স্নান ও সংলগ্ন রেস্তোঁরায় ব্রেকফাস্ট সেরে সোজা পৌঁছে যাই উফিজি গ্যালারি। এই সকালেই টিকিটের জন্য দীর্ঘ লাইন। ইউ আকারের ঐতিহাসিক ভবনের সামনে বয়ে চলেছে আর্নো রিভার। নদীর ওপর কিছু দূরে ঐতিহাসিক সেতু। গ্রাউন্ড ফ্লোরে সারি সারি প্রতিটি স্তম্ভের সম্মুখে বিখ্যাত ব্যক্তির মর্মর মূর্তি। অনেকেই অগ্রিম ই-টিকিট কিনে এসেছে ভ্রমণে সময় সংক্ষেপ করতে। আমরা তাদের দলে নেই। এক প্রৌঢ়া ভিখারিণী শিল্পভুক দর্শকদের কাছে নীরবে যাঞ্চারতা। রূপে-লাবণ্যে-পোশাকে যদিও তিনি অপরূপা।

এক আর্জেন্টিনীয় যুগলের পিছনে দঁড়িয়ে গেলাম। ল্যাটিনো ইটালিয়ান উফিজি শব্দের অর্থ অফিস। বিখ্যাত মেদিচি পরিবারের দপ্তরখানাই আজকের উফিজি গ্যালারি। বিশ্বে সর্বাধিক দর্শক আকর্ষণকারি আর্ট গ্যালারিগুলির একটি এই রত্নাকর সংগ্রহশালাটি। সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছে এখানে ২০১৬ তে ২০ লক্ষ পর্যটক এসেছিল।

ইতালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে রোমুলাস অগস্টাসের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ইতালির অনেকাংশের দখল নেয়। নবম

শতকে ফরাসী শার্ল মেইনের মৃত্যুর পর দুর্বল ইতালিতে একাধিক নগর রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে। এদের মধ্যে জেনোয়া, পিসা, ভেনিস, সিয়ানা, ফ্লোরেন্স ছিল অন্যতম। এদের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ, হিংসাত্মক ঘটনা ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তবুও ক্যাথলিক চার্চ এর বিস্তার ও সৃজনশীল শিল্পের বিকাশ ও চর্চা এতটুকু থামেনি। ইতালির এই সৃষ্টিশীলতা সম্পর্কে কোথায় যেন পড়েছিলাম এক তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য। কথাটা মোটামুটি এই রকম, [In Italy], they had warfares, terrors, murders and bloodshed but they produced Michael Angelo, Leonardo Da Vinchi and the Renaissance and in Switzerland they had 500 years of democracy and peace and what did they produce? A Cuckoo Clock.'

কথাটা প্রনিধানযোগ্য সমাজে অনাহার, সংকট, উত্তেজনা সংঘর্ষ থাকলেই বোধ হয় সৃষ্টিশীলতা জাগে। গ্রেট বেঙ্গল ফেমিন, গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও তার পরে পরেই বিশ্বে বৃহত্তম গণপ্রচরণ (Human migration), এমন কী ষাট সত্তরের উত্তাল সময়েও আমাদের হতভাগ্য বাংলায় সৃষ্টিশীলতার বন্যা বয়েছিল। পরবর্তীকালে নিস্তরঙ্গ বঙ্গজীবনে চলছে অন্তহীন সৃষ্টিহীনতা।

সেই যুগে এই মেদিচি পরিবার ফ্লোরেন্সের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করত। কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতা বা নগরের শাসনই নয়, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি সর্বক্ষেত্রেই পৃষ্ঠপোষকতার এক অনবদ্য নজির রেখেছিল এই পরিবার। ১৩৯৭ খ্রিস্টাব্দে জিওভান্নি দ্য মেদিচি পোপের কোর্টের ব্যাঙ্কার নিযুক্ত হলে এই ফ্লোরেন্সকেই তার প্রধান কেন্দ্র বানিয়াছিলেন।

১৪২৯ খ্রিস্টাব্দে জিওভান্নির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কোসিনো দ্য মেদিচি পিতার ব্যাঙ্ক ব্যবসার হাল ধরেন। মানবতাবাদী, প্রজ্ঞাবান কোসিনোর বয়স তখন ৪০ বছর। তিনি উদারহস্তে শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ১৪৬৪ তে তিনি মারা যান। এই সময়কালে কোসিনো উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও শিল্পচর্চায় ছয়লক্ষ স্বর্ণ ফ্লোরিন খরচ করেন। যেটা উল্লেখ্য তা হল পিতার থেকে তিনি নাকি একলক্ষ আশি হাজার স্বর্ণ ফ্লোরিন পেয়েছিলেন।

কোসিনোর পুত্র মাত্র পাঁচ বছর ফ্লোরেন্স শাসন করেন। তারপর স্থলাভিষিক্ত হন পৌত্র লোরেঞ্জা দ্য মেদিচি, যিনি সঙ্গত কারণেই ম্যাগনিফিসেন্টে লোরেঞ্জো নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সময়ে (১৪৬৯-১৪৯২) ফ্লোরেন্স ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। তাঁর অন্যতম কীর্তি হল সেখানে অনভিজাতদের স্বাধীনতা।

দুঃখের বিষয়, এই ম্যাগনিফিসো লোরেঞ্জার মৃত্যুর পরেই ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে চার পুরুষের মেদিচি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। তারা ফ্লোরেন্স ত্যাগে বাধ্য হয়। এর অন্যতম কারণ জিরোলামো ম্যাভোনারোলা নামে এক ফ্যানাটিক পুরোহিতের অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক উত্থান।

বিশ্ব ইতিহাসে মেদিচি পরিবারের মতো শিল্পের পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় কেউ আছে কিনা সন্দেহ। বিত্ত, বিদ্যা ও উদ্যোগের এমন সুষম সমাবেশ ও বেনজির পরম্পরার সঙ্গে পরবর্তীকালে ভ্যাটিকানের সামিল হওয়ার ঘটনা ইতালির প্রাচীন ভূমিতে ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছিল। পঞ্চদশ শতকে রেনেসাঁর এই বুদ্ধিমুক্তির সলতে পাকানোর অধ্যায়টা রচিত হয়েছিল আড়াইশো বছর আগে। তাতে ফ্লোরেন্সের সঙ্গে শামিল হয়েছিল পাদুয়া, পিসা, সিয়ানা, প্রাগের মতো শহরগুলোও। ভারতে সে সময় চলছে অন্ধকার সুলতানি যুগ।

দেখতে দেখতে লাইনে একটা ঘন্টা কেটে গেল। প্রবেশ করলাম বিশ্ববিখ্যাত গ্যালারিতে যার পত্তন হয় কোন ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে। এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন লরেঞ্জোর বংশধর প্রথম কোসিনো ১৫৬০-এ। তিনতলার বিশাল সৌধের দুটো তলা জুড়ে যা সংগ্রহ তা দেখতে কয়েক দিন লাগার কথা। তিনতলার ৪৫টা ঘরে মেদিচিদের যা কিছু মূল্যবান সংগ্রহ রাখা।

পারীর ল্যুভেরে যেমন মোনালিসা এখানে তেমন ভেনাস। আবক্ষ মোনালিসাকে দর্শন করেছিলাম অপ্রত্যাশিত ঘরের আলো আঁধারিতে। ছবি তোলায় ছিল প্রহরীর বাধা। এখানে পূর্ণাবয়ব বত্তিচেল্লির বার্থ অফ ভেনাসকে পাওয়া গেল আলোকিত প্রশস্ত ঘরে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ভাবে। ছবি তোলায়ও কোন বাধা নেই। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি একাকার যেন। ঘর ভর্তি বত্তিচেল্লি। এটি সংগ্রহশালার সবচেয়ে আলোচিত ও বিখ্যাত শিল্প কর্ম হলেও তাঁর মোট ২৭টি ছবি রয়েছে এখানে। তার মধ্যে বিখ্যাত এই ভেনাস ছাড়া আছে আলেগরি অফ স্প্রিং ছবিটিও।

বার্থ অফ ভেনাস ছবিটি প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবীর জন্ম মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছে। সাইপ্রাস দ্বীপে ফেনিল সমুদ্রজাত ঝিনুকটি উন্মুক্ত

উফিজির শিল্পকর্ম।

With the best Compliments from :

Phone : 2237-5919
2237-2090
2237-2822
Fax : 2237-0269
E-mail : kolkata@allindatpt.com
Web-site : www.allindiatpt.com

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY
AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
ALL INDIA PACKERS & MOVERS

H.O. : 28, BLACK BURN LANE,
KOLKATA-700 012

Time Guaranteed delivery. Transporters for all over India, Marine type ISO Container trucks available. Bank-approved specialists in ODC Cargoes by heavy duty Trucks & Trailers. Specialists in packing of household goods & Transpotation. Branches & Association all over India.

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

মনমোহন চৌধুরী

করেছিল ভেনাসকে। বসন্তের সাগরবেলায় নগ্ন ভেনাসকে স্বাগত জানাচ্ছে পুষ্পগুচ্ছ। লোরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের ভাই লোরেঞ্জো পিয়েরফ্রান্সেসকো দ্য মেদিচি এই ছবিটি এই প্রাসাদে আনে। বত্তিচল্লির এই অসামান্য শিল্পকর্মটি ১৪৮৩-৮৫ সময়কালে নির্মিত। এছাড়া অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আর একটি বত্তিচেল্লি ছবি হল ক্যালোমনি অফ এ্যাপেলস। এখানেও পূর্ণাঙ্গ মূর্তির দীর্ঘ কেশদামের নগ্ন সুন্দরী উপস্থিত।

বত্তিচেল্লির সময়ে অন্যতম সেরা সুন্দরী ছিলেন বিখ্যাত আমেরিগো ভেসপুচির পরিবারের সদস্যা সিমোনেটা ভেসপুচি। তিনি ছিলেন লোরেঞ্জোর ভ্রাতা জুলিয়ানোর প্রণয়িনী। জুলিয়ানো ফ্লোরেন্সের ক্যাথিড্রালে নিহত হন। পোর্ট অফ ভেনিসের সমুদ্রকূলে সিমোনেটা বাস করতেন। বত্তিচেল্লির ভেনাস ও অন্য অনেক ছবির প্রধান নারীমুখ নাকি সিমোনেটাকে ভেবে অঙ্কিত। মাইকেল এঞ্জেলোর মত বত্তিচেল্লিও ছিলেন অবিবাহিত। যে মহান শিল্পী তাঁর শিল্পগুণে যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ শিল্পপ্রেমীকে মুগ্ধ করে চলেছেন সেই বত্তিচেল্লিই জীবনের শেষ দশ বছর কাটিয়েছেন অসীম নিঃসঙ্গতায়।

উফিজিতে অন্যতম আলোচিত চিত্র হল কাভারাজিওর মেদুসা। বৃত্তাকার ক্যানভাসে এই ছবিতেও গ্রীক পুরাণ উপস্থিত। এথেনার মন্দিরে পসেইডনের সাথে যৌনাচারের অপরাধে সেকালের অপরূপা মানবী মেদুসা দেবীর অভিশাপে বিষধর সর্পমণ্ডিত কেশদাম সজ্জিত হয়ে এক ভয়াবহ গুণসম্পন্ন হন। অভিশাপের কারণে যে মানুষের সাথেই তার দৃষ্টি বিনিময় হবে সে স্তম্ভিত পাথর হয়ে যাবে। হেরোডোটাসের মতে মেদুসা নাকি লিবিয়ায় বাস করত। তারা ছিল তিন বোন। অন্যরা স্থেনো এবং ইউরালে ছিল অমর। মেদুসার শিরশ্ছেদ করে পারসিয়াস নাকি সেই মুন্ডুর মূর্তি দেখিয়ে সকলকে পাথর বানাতো। গ্রীক পুরাণে যোদ্ধার ঢালে মেদুসার ছবি রাখার চলও ছিল। অন্তঃসত্তা মেদুসার মৃত্যু হলে জন্ম হয় পেগাসাস নামের এক অশ্ব আর এক স্বর্ণ তরবারির।

উফিজিতে না এলে জানাই হতো না সে যুগে কতো শিল্পীই না রেনেসাঁয় অংশ নিয়েছিল। এমনই একজন লিপ্পি। তাঁর একাধিক শিল্পকর্ম অবাক হওয়ার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয়। ডেভিড নির্মাতার একমাত্র পেন্টিং দ্য হোলি ফ্যামিলি (ডোনি টোন্ডো) এই সংগ্রহশালায় রাখা। হেলেনিস্টিক স্কাল্পচারের অনুসারি এই সৃষ্টি।

এখানে ১৫ নম্বর কক্ষ বিখ্যাত রেনেসাঁসের অন্যতম স্থপতি দ্য ভিঞ্চির জন্য। দ্য ভিঞ্চির ছবি রোমে দেখবো। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত লাস্ট সাপার মিলানে আছে। এই যাত্রায় মিলান আমাদের ভ্রমণচিত্রে না থাকায় সে ছবি দেখার সৌভাগ্য হবে না। তাঁর ছবির সংগ্রহ ইতালির বাইরেই বেশি। পারীর ল্যুভেরে আছে তাঁর সেরা ছবিগুলি। লন্ডনে আছে দুটো। এগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এবার তাঁর নিজের শহরে দ্য ভিঞ্চিকে দেখার পালা।

জন্ম ফ্লোরেন্সে হলেও উঠতি বয়সে মিলানে গিয়ে কুড়ি বছর কাটান লিওনার্দো। উফিজিতে ব্যাপটিজম অফ ক্রাইস্ট ছবিটি তাঁর গুরুর সঙ্গে যৌথ সৃষ্টি বলা হয়। ১৪৭৫ সালে এটি শেষ হয়। এটি দ্য ভিঞ্চির গুরু আঁদ্রে দ্য ভেরোক্কিওর সৃষ্টি। একদল পর্যটককে নিয়ে

লাওকুন, ভ্যাটিকান মিউজিয়াম।

আসা এক ইংরেজিভাষী গাইডের বর্ণনা থেকে জানলাম অনেক কলাবেত্তা মনে করেন ছবির বাঁ দিকের দেবশিশুর মূর্তি ও যিশুর মূর্তিও নাকি দ্য ভিঞ্চির আঁকা। উনানসিয়েসান ও অ্যাডোরেসন অফ ম্যাগি দ্য ভিঞ্চির একার আঁকা। দুটিই তাঁর প্রথম দিকের সৃষ্টি।

চিত্তাকর্ষক চিত্রগুলির মধ্যে পারমিজিয়ানিনোর ম্যাডোনার উল্লেখ না করলে শিল্প ও শিল্পী দুই এর প্রতিই অবিচার হবে। ইউরোপীয় চিত্রকলায় ইতালীয় রেনেসাঁ যুগে ম্যানারিজম শিল্প আন্দোলনে প্রভাবিত এই শিল্পীর এক সাহসী মাস্টারপিস বলা যায় এটিকে। দীর্ঘ গ্রীবার এই ম্যাডোনা সংগ্রহশালার নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী সংযোজন।

বিখ্যাত উফিজির শিল্প সংগ্রহে ঠাসা করিডোর ধরে হাঁটা অবশ্যই এক বিরল সৌভাগ্য। প্রতিটি সংগ্রহই যেন মেদুসা আক্রান্ত করে। স্তম্ভিত পাথর হতে হয়। এমনই এক শিল্পকর্মে ঠাসা ট্রিবুনা ডেগালি কক্ষে এসে প্রায় দিশাহারা হই। কাকে ছেড়ে কাকে দেখি! মল্লযোদ্ধারত বীরদের নানা ভঙ্গীর একাধিক মূর্তি থেকে টিটিয়ানের ভেনাস অফ উর্বিনোর মত ভাস্কর্যগুলো দিয়েই নাকি উফিৎসির পত্তন। এগুলো ছিল ফ্রানসিসকোর ব্যক্তিগত সংগ্রহ।

একের পর এক শিল্পকর্মে কানায় কানায় রোমাঞ্চিত হতে হতে তৃপ্তিবোধের মাত্রা যখন হারাবো হারাবো তখনই হঠাৎ এসে দাঁড়ালাম এক প্রসস্থ কক্ষের কেন্দ্রে শায়িতা Sleeping Ariadne এর সামনে। লাগোয়া তথ্য জানাচ্ছে এশিয়ো প্রস্তরে নির্মিত এটি দ্বিতীয় শতাব্দীর। শিল্পী হিসেবে নাম পাচ্ছি Arte Romana, সময়কাল অজ্ঞাত। প্রাগ আর ভ্যাটিকান মিউজিয়ামেও এর প্রতিমূর্তি আছে। অনেকে এটি ক্লিওপেট্রার মূর্তি ভাবে। ভাস্কর্যটির কেবল দেহ আর বিছানার অংশ বিশেষ আসল। অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপিত। ষোড়শ শতকে নির্মিত মাথা ৫৬নং ঘরে রাখা। সেটির প্রতিস্থাপন ঘটায় অষ্টাদশ শতকের শিল্পী ফ্রানসেসকো কারাডোরি।

এই উফিজির অন্য একটি রুদ্ধশ্বাসে দর্শনীয় শিল্পকর্ম হল বান্দিনেল্লির লাওকুন অ্যান্ড হিজ সন্স। হেলেনীয় ভাস্কর্যে প্রভাবিত কাজটি ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে রোমে মাটি খুঁড়ে পাওয়া। প্লিনির লেখায়

এটির উল্লেখ আছে। সফোক্লিস ও ভার্জিল উভয়েই লাওকুনকে ট্রয়ের পুরোহিত বলেছেন, যদিও হোমারের লেখায় লাওকুনের ঘটনা নেই। এটি অনেকটা বাল্মীকির রামায়ণে অনুল্লেখিত অনেক ঘটনার মত। ভার্জিল তাঁর এনিড কাব্যে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এই প্রজ্ঞাবান পুরোহিত ট্রয়ের ঘোড়া নগরীর মধ্যে নিয়ে যাওয়ার বিরোধিতা করে বর্শার আঘাতে বিদ্ধ করলে দুইপুত্র সমেত প্রাণ হারান। এখানেও বিষধর সাপের মূর্তিগুলোকে বেস্টন করে থাকা লক্ষণীয়।

এক সময় এই প্রাচীন ও বিশ্ববিখ্যাত সংগ্রহশালার শেষাংশে এসে উপস্থিত হই। বোঝা গেল মহাভোজের শেষ পদ এখনো বাকি। সেফ ল্যান্ডিং এর পর দাঁড়িয়ে থাকা বিমানের ক্রুর মত দণ্ডায়মান এক ভাস্কর্য। বিষয় বস্তু, হারকিউলিস ও নেসাসের লড়াই। অশ্ব-মানবের রক্তেই হারকিউলিসের মৃত্যু হওয়ার কাহিনি গ্রীক পুরাণে আছে। তাকে ঘিরে এই শিল্পকর্মটি ভুবন বিদিত। রাখাও হয়েছে উপযুক্ত স্থানে দর্শকমাত্রই এটি দেখে উফিজি ছাড়তে বাধ্য। পাশেই exit গেট।

বাইরে যেতেই খোলা-ছাদ রেস্তোরাঁয় নীল আকাশ। রোদে ঝলমল প্রকৃতি। পাশেই রাজকীয় মহিমায় দাঁড়িয়ে ভেসিও প্রাসাদ, পালাৎজো ভেসিও। অসামান্য তার স্থাপত্য সৌন্দর্য। এই প্রাসাদের অভিজাত সৌন্দর্যকে যেটি চূড়ান্ত পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছে তা হল একটি অতি উচ্চ আয়তকার মিনার যার পোশাকি নাম কাম্পানিল বা বেল টাওয়ার। ইতালিতে বড়ো চার্চ বা ক্যাথিড্রালের সঙ্গে সাধারণত একটি কাম্পানিল থাকবেই। এই টাওয়ার সকালে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েও দেখেছি। কিন্তু উফিজির ত্রিতলের কাফেটেরিয়ার ছাদে হঠাৎ এসে পৃথিবীর নানান দেশের আর্ট লাভারদের সমাবেশে দাঁড়িয়ে এত সামনে থেকে তাকে অবলোকন করে অভিভূত হতে হয়। অনেকটাই সময় লাগল ধাতস্ত হতে যে আমি ফ্লোরেন্সের ভূমিতে ভেসিও প্রাসাদের বেল টাওয়ারের ঘড়িতে দেখছি বারোটা বাজে। লোকে এই স্বর্গীয় অতি জাগতিক অনুভূতির প্রতিটি ভগ্নাংশ সেকেন্ডকে ঐহিক ভাবে অনুভব না করে সেলফিতে ব্যস্ত। ইউরোপে প্রথম প্রবাসে ওয়েষ্ট মিনস্টার স্টেশন থেকে বেড়িয়েই বিগবেন দেখেও অনুরূপ অনুভূতি হয়েছিল। তবে আজকের অবস্থা অনেক অনেক বেশি স্পর্শকাতরতায় ভরা।

গত তিন-চার ঘণ্টা ধরে এই সংগ্রহশালায় রাখা শিল্পের সুনামির সঙ্গে যুঝতে গিয়ে মস্তিষ্কের ধারণ ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছি সেই উপলব্ধিটা জানার জন্য এই অসাধারণ কাফেটেরিয়াটার গুরুত্ব অসীম। কবি হলে এই মুহূর্তটাকে নিয়ে কোন কালজয়ী কাব্য সৃষ্টি করা যেত। কুকিস আর কাপুচিনো হাতে নিয়ে মনে হল এই অবস্থাটারই কি নাম 'ফ্লোরেন্স সিনড্রোম?' উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক স্তাঁধাল কি উফিজি দেখেই এমন সাময়িক ভাবে মানসিক ভারসাম্যহীনতা, বাহ্যজ্ঞান হারানো বা অস্বস্তিকর মাথা ঘোরার কথা বলেছিলেন? এবিষয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেন একস্থানে বিপুল সংখ্যায় সুন্দর এবং শিল্পবস্তুর সমাবেশ প্রত্যক্ষ করলে অনেক মানুষই এহেন অবস্থার শিকার হয়। রক্তচাপও নাকি বেড়ে যায়। তাই এই অবস্থার অন্য নাম স্তাঁধাল সিনড্রোম।

কফিতে চুমুক দিয়ে ভাবতে থাকি। মেদিচিদের তিনশো বছর পরে কলকাতায় ঠাকুর পরিবারও হয়তো মেদিচি হতে পারত। প্রিন্স দ্বারকানাথ কিছুটা হলেও জিওভান্নি হয়েছিলেন কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কোসিনো মেদিচি হতে পারলেন না। বাবাকে লুকিয়ে হেদুয়ায় ঘর ভাড়া করে ব্রহ্মর স্বরূপ নিয়ে মেতে থাকলেন। মহর্ষি হওয়ার পর প্রজানিপীড়ক পরিচিতি পেলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে অধ্যায়কে অনেকে বাংলার রেনেসাঁস বলে থাকে তা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আমাদের বোধ হয় একটা ভারতীয় ভ্যাটিকানের প্রয়োজন ছিল।

এক সময় বুঝলাম দামি ওয়াইনের প্রভাব ফিকে হওয়ার মত আমার ফ্লোরেন্স তথা স্তাঁধাল এফেক্টও কাটতে চলেছে।

পাদুয়া, ভেনিস, সিয়ানা কিংবা ফ্লোরেন্স প্রতিটি শহরই যেন কলেবরে ঠিক ততটুকুই, যতটুকু প্রয়োজন। এমনকি বডিমাস ইন্ডেক্সের মত শহরগুলোর আয়তন জনসংখ্যার অনুপাত যদি কষা যায় তাহলেও হয়তো বাঞ্ছিত সংখ্যা মিলবে। পর্যটকদের বাদ দিলে স্থায়ী নাগরিকের সংখ্যা বোধ হয় সেই ষোড়শ শতকেই রয়েছে। পায়ে পায়ে এ্যাকাডেমিয়াতে এসে সেটাই মনে হল। অনেকেই সময়াভাবে সিনোরিয়া চত্বরে ডেভিডকে দেখে ঘরে ফেরে। আমরা তাদের দলে নেই। তাই ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অন্যদের দেখে কুইক বোহেমিয়ান লাঞ্চ সারি।

উফিৎসির তুলনায় অ্যাকাদেমিয়ার আয়তন ও সংগ্রহ সংখ্যায় কম হলেও ভারে নয়। আকাদেমিয়া মূলত এঞ্জেলোময়। হল অফ দ্য কলোসাসে বার্তোলিনির আরনিনা জিয়ানবলোগনার রেপ অফ দ্য সাবাইন এর প্লাস্টার কাস্ট মডেল দেখে বাঁক নিয়ে লম্বা হল ঘরে ঢুকেই চমকে যাই। দূরে হাল্কা নীলাভ আলোতে উদ্ভাসিত শ্বেতশুভ্র দণ্ডায়মান ডেভিড। দীর্ঘ কক্ষের দু'পার্শ্বে একের পর এক এঞ্জেলোর অসম্পূর্ণ নানা বয়সী শ্লেভ পুরুষের অনিবাচ্য ভাস্কর্য। এগিয়ে চলি এই পৃথিবীর সর্বাধিক নরনারী যে পুরুষটির দর্শন প্রার্থী তার দিকে। সর্বাঙ্গে কৈশোরের মিহিলাবণ্য নিয়ে দণ্ডয়মান ডেভিড। পাঁচশো বছরেও তার অতুলন যৌবনে এতটুকু টোল খায়নি। প্রাণভরে দর্শন করি। ল্যুভেরের অপরিসর কক্ষের মোনালিসার মত নেই কোন প্রহরীর তাড়া। ধন্য ইতালি, ধন্য তার নবজাগরণ। যে মেয়েটিকে একটু আগে টিকিটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে বার্গার খেতে দেখেছি, কিছুটা ব্যবধানে এককোণে দাঁড়িয়ে সে নির্নিমেশে দেখছে দিব্যকান্তির ডেভিডকে। কেবল কি সে একা?

'বিস্মিত নিমেষহত বিশ্ব চরণে বিনত, লক্ষশত ভক্তচিত বাক্যহারা।

মনে হল ডেভিড আর একলব্য যেন একাকার। বয়সের দিক দিয়েতো বটেই, হয়তো বীরত্বেও। একজন তার শক্তি ও দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পেয়েছে (অন্য ভাবে বললে বাইবেলের কাহিনি সে সুযোগ দিয়েছে) অন্যজন তা পায়নি। হিব্রু বাইবেলে ডেভিডের কাহিনী এই রকম - ইজরেইলের পশ্চিমে প্যালেস্টাইন। দীর্ঘ দিন ধরে তাদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক। গোলায়াথ নামের এক দীর্ঘদেহী ফিলিস্তিনী ইজরেইলীদের আক্রমণ করত। সম্মুখ সমরে ইজরেইলের

সুশিক্ষিত সৈন্যরা পেরে উঠত না। অবশেষে পিতার আদেশে ডেভিড তার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়া দুই দাদার খোঁজ নিতে গেলে গোলিয়াথের মুখোমুখি হয়। ইজরেইলের রাজা ডেভিডকে অস্ত্র সাহায্য ও ব্যবহারের কথা বললে ডেভিড উন্নত অস্ত্র চালনায় তার অক্ষমতা জানিয়ে গুলতি ও পাঁচটি ছোট পাথর খণ্ড নিয়ে গোলায়াথকে পরাভূত ও ধরাশায়ী করে তার তরবারির সাহায্যে মুণ্ডচ্ছেদ করে।

এঞ্জেলোর ডেভিড নির্মাণের ইতিহাসটি কম আগ্রহোদ্দীপক নয়। ভেরোকিওর ওয়ার্কশপে এঞ্জেলোর তখন শিক্ষানবিশির জীবন কাটছে। বেশ কিছুদিন ধরেই সামনের বাগানে পড়েছিল এক বিশাল প্রস্তরখণ্ড। শিল্পী ফিসোল ১৮ ফুট লম্বা পাথরটি আনিয়েছিলেন এক দৈত্যর মূর্তি গড়বেন বলে। কিন্তু কাজ বেশিদূর এগোয়নি। অগস্তিনো দুচ্চিও এবং আন্তোনিও রোসোল্লিনোর মত ভাস্কর শিল্পীরাও বাটালির কিছু দাগ রেখে বিরত থাকেন। বছর দশ পড়ে থাকা এই প্রস্তরখণ্ডকে নিয়ে তিনবছরের চেষ্টায় (১৫০১-১৫০৪) ২৬ বছরের মাইকেল এঞ্জেলো বুয়োনায়টি আপ্তবাক্যটি সত্য প্রমাণ করলেন One man's trash being another's treasure. পৃথিবী পেল ডেভিডকে।

ফ্লোরেন্সের দুই মহান ভূমিপুত্র দ্য ভিঞ্চি আর এঞ্জেলো। এঞ্জেলোর শুরুটা হয়েছিল চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। শুরু করেন শিক্ষানবিশি গিরলানডাইয়োর কাছে। পিতা চেয়েছিলেন ছেলে ব্যবসা করে অর্থ করুক। কিন্তু প্রতিভা তার পথ খুঁজে নেবেই। চিত্রশিল্পী থেকে ভাস্কর্যশিল্পে এঞ্জেলোর আগ্রহ জহুরির দৃষ্টি নিয়ে আবিষ্কার করেন লরেনজো মেদিচি। আমূল পাল্টে যায় এঞ্জেলোর জীবন। ১৫০৪ সালে ডেভিড জনসমক্ষে উন্মোচিত হলে সাড়া পড়ে গেল চারদিকে। ফ্লোরেন্স ছাড়িয়ে সারা ইতালিতে তখন এঞ্জেলো এক ফেনোমেনন।

ষোড়শ শতকে গড়া ৫.১৭ মিটার এর এই নগ্ন পূর্ণাবয়ব পুরুষের মূর্তি দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল আরও অতীতে নবম শতকে গড়া ১৬৭.৫ মিটারের আর এক পুরুষ মূর্তির কথা। ডেভিডের সৃষ্টিকর্তাকে আমরা জেনেছি। কিন্তু এই মূর্তির কারিগর বা কারিগররা হয়তো মনে করতো শিল্পই শেষ কথা শিল্পী নয়। আমরা ভারতবর্ষ থেকে আসা মানুষ। তাই নিজেরই দেশের শ্রবনবেলগোলার গোমতেশ্বরকে স্মরণ করি।

ডেভিডের প্রথম দর্শন পাই পঁচিশ ফুট দূর থেকে। বহুবলী গোমতেশ্বরকে চোখে পড়েছিল চোদ্দ কিলোমিটার দূর থেকে। পড়ে থাকা পাথরখণ্ড থেকে ছ'টনের ডেভিডের জন্ম। অন্যদিকে একটা গোটা পাহাড়কে ব্যবহার করে ডেভিডের সাতশো বছর আগে সৃষ্টি হয় ৮০ টনের বহুবলীর। চরিত্রদুটির মধ্যেও অদ্ভুত মিল। দু'জনেরই পুরুষকার থেকে দেবত্বে উত্তরণ। ইক্ষাকু বংশের প্রথম তীর্থঙ্কর রাজা ঋষভনাথ তথা আদিনাথের দুই পুত্র ভরত ও বহুবলী। বহুবলীর ছিল বহুমুখী প্রতিভা। চিকিৎসাবিদ্যা, ধনুবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা থেকে দুর্মূল্য রত্নচর্চা পর্যন্ত। পিতা ঋষভনাথ বৃদ্ধ বয়সে সন্ন্যাস নিয়ে দুইপুত্র সহ একশো ব্যক্তিকে তাঁর সাম্রাজ্য বন্টন করলে ভরত পান অযোধ্যা ও বহুবলী পান দক্ষিণ ভারত। কিন্তু ভরতের রাজ্য ক্ষুধায় পরাজিত হয়ে ৯৮জন বশ্যতা স্বীকার করলে বহুবলীকে কোন যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারেন না ভরত। পরে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতার অবসান ঘটিয়ে বহুবলী এক জায়গায় দণ্ডমান থেকে অনশনের মাধ্যমে কঠিন সাধনা শুরু করেন। এক বছর অবিচল নির্বিকল্প সমাধিকালে তাঁর হাতে পায়ে তৃণলতা জড়িয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ভ্রাতা ভরত এসে ক্ষমাপ্রার্থী হন।

কী বিস্ময়কর মিল! ডেভিড আর বহুবলী একাকার। দু'জনেই নিরাবরণ। বলা হয়ে থাকে গ্রিকেরাই প্রথম বীরত্বের সঙ্গে নিরাবরণ পৌরুষের কল্পনা করেছিল। তারই প্রমাণ ভাস্কর্যে পুরুষের নগ্নমূর্তি। সেযুগে গ্রিসে ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষণ হত নগ্নাবস্থায়। যৌন উত্তেজনা ছিল দুর্বলতার লক্ষণ। তাই পুরুষাঙ্গ সবক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র। Gymnasium শব্দটাও এসেছে প্রাচীন গ্রীক শব্দ Gymnos থেকে, যার অর্থ নগ্ন। দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা ভারতবর্ষেও গ্রীক প্রভাবের ফল। তাই বহুবলী গোমতেশ্বরকেও পাওয়া শিল্পীর কল্পনায় নগ্ন অবস্থায়। ২০০৭ এর ৩১ জুলাই টাইমস অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে গৃহীত এস. এ. এস. জনমতে বিশ্বে বৃহত্তম মনোলিথিক স্কাল্পচার হিসেবে গোমতেশ্বরের এই মূর্তিটি ভারতের সপ্ত আশ্চর্যের প্রথম স্থান পায়।

রোমান ফোরাম

মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করতে যে সকল স্থান কালজয়ী ভূমিকা নিয়েছে সেসব জায়গায় উপস্থিত হলে মনের মধ্যে একরকমের শিহরণ জাগে। ফ্লোরেন্সের মুখ্য ক্যাথিড্রাল সান্টা মারিয়া ডেল ফিয়োরের গিবার্ট সৃষ্ট অবিশ্বাস্য কারুকার্যময় ব্রোঞ্জের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তেমন রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। ১৪০০ থেকে ১৪২৪ সালের মধ্যে নির্মিত এই বিশ্ববিখ্যাত দ্বারটি। সমগ্র দরজাটিতে রিলিফ ভাস্কর্যে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে খ্রিস্টজন্মের নানা কাহিনি। এটি Gates of paradise নামে পরিচিত। মাইকেল এঞ্জেলো মুগ্ধ হয়ে এই নামকরণ করেন। অনেকের মতে এই দ্বার দিয়েই রেনেসাঁসের শুরু।

ডুয়োমো নামে পরিচিত এই

With Best Compliments From -

W&L

Willowood Chemicals Private Limited

A World-class (B+G+7 Stored) office building, in the heart of the central business district, on 27, Bentinck Street, Kolkata- 700 001

By

M K GROUP

Contact no. 033-32901999

www.mkpoint.in

অসাধারণ ক্যাথিড্রালটি ফ্লোরেন্সে রোমান ক্যাথলিকদের মাদার চার্চ। ব্যাসিলিকা হিসেবে রোমানেস্ক রীতিতে আদিতে নির্মিত এই সৌধে পরবর্তীকালে (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) গথিক ও আরও পরে (চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতকে) লেগেছিল রেনেসাঁ শৈলীর ছোঁয়া। সুবিশাল লাল-নীল-সবুজ ও শ্বেতশুভ্র পাথরের এমন অফুরন্ত কারুকার্যের অলঙ্করণ বিশ্বে বিরল। বিশাল অষ্টকোণা কাপোলাটি (গম্বুজ) ইঞ্জিনীয়ারিং মার্ভেল। এই রেনেসাঁ মাস্টার পিসটির মূল স্থপতি সিয়েনা শহরের ফিলিপ্পো ব্রুনেলেস্টি। এই ডুয়োমো নির্মাণ শুরু ১২৯৬ সালে ও সম্পূর্ণ হয় ১৪৩৬-এ। রোমের প্যানথিয়নের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটি নির্মিত। বিশাল গম্বুজটি যাতে বিপুল পাথরের ওজনের জন্য ভেঙে না পড়ে শিল্পী তাই তার তলে অপেক্ষাকৃত ছোট ধাতব কাপোলা গড়েন। প্রাসাদ, রাজপথ, নিকাশি ব্যবস্থায় বিশ্বকে পথ দেখানো ইতালির স্বর্ণযুগের শুরুই এই কাপোলার মধ্য দিয়ে। ডুয়োমো প্রসঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলো রোমের সেন্ট পিটার গোম্বুজ নির্মাণে হাত লাগাতে গিয়ে বলেছিলেন, 'I go to build a greater dome but not fairer one.'

কেবলমাত্র স্থাপত্যের নিরিখে এই অনুপম সৌধটিকে বিচার করলে নিতান্তই অবিচার হবে। এর অভ্যন্তরের কারুকার্য, ৭২০ বছর সময়কালের অসামান্য পাথরের ভাস্কর্য ও সর্বোপরি অসংখ্য ফ্রেস্কোর সমাবেশ এই হর্ম্যকে মহিমান্বিত করেছে। ১৪৬৯ সালে গম্বুজের শীর্ষে গিল্ট করা তাম্রগোলক এবং ক্রুশ জুড়ে দিয়েছিলেন ভেরোক্কিও। উচ্চতা ৩৭৫ ফুট। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এই সব বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ শিল্পীরা নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, বিশেষ করে ৩৭০০০ টন পাথর আর ৪০ লক্ষ ইট তোলার জন্য। বেশ কিছু স্কেচ এঁকেছিলেন দ্য ভিঞ্চি স্বয়ং। অভ্যন্তরীণ গ্যালারির পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন অনেকের সাথে মাইকেল এঞ্জেলোও। যথার্থভাবেই তা ছিল সৃষ্টি সুখের উল্লাস। তাম্র গোলকটি ১৬০০ সালের ১৭ই জুলাই বজ্রাঘাতে ভেঙে গেলে দু'বছর পর নতুন ও বৃহত্তর গোলক বসানো হয়।

নবজাগরণের এই অমূল্য রত্নটিকে যথাযথ ভাবে চাক্ষুষ করতে গেলে অভ্যন্তরের ৪৬৩টি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। টিকিট আগে থেকে কেটে না রাখায় এ যাত্রায় আমরা সেই সৌভাগ্য সুখ থেকে বঞ্চিত হলাম। বাইরে থেকেই রেনেসাঁর এই আইকনিক সিম্বলটিকে চাক্ষুষ করে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল।

ফ্লোরেন্সের কোন দ্রষ্টব্যই একে অপরের থেকে বেশি দূরে নয়। এশহরে যে মিউজিয়াম, চিত্রকলা, শিল্পসংগ্রহালয়ের সংখ্যা কতো তা বলা কঠিন। পুরো শহরটাই একটা খোলা জাদুঘর যেন। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় একটা ধারণা চালু আছে, বিশ্বের ৬০ শতাংশ শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম নাকি ইতালিতে এবং তার অর্ধেক নাকি ফ্লোরেন্সে। এই উক্তি সমালোচনার ঊর্ধ্বে না হলেও ফ্লোরেন্স তার দাবিদার হতেই পারে।

নিষিদ্ধ অটোমোবাইলের পাথুরে রাস্তায় বিচরণরত সারা বিশ্বের শিল্পভুক নরনারী। বিশেষ করে চোখে পড়ে জাপানী পর্যটকের দল। চিনাদের সংখ্যাও কম নয়। বিশ্ব পর্যটকের এহেন সমাবেশে এমন অংশগ্রহণ সেই সব দেশের সমৃদ্ধি সূচিত করে। চোখে পড়লো কিছু ভারতীয়ও। এক একটা দলকে নানাভাষী গাইড হাতে ধরে থাকা স্টিকে পতাকা নিয়ে চলেছে দ্রষ্টব্য থেকে দ্রষ্টব্যে। তাকে ঘিরে বাধ্য ছাত্রর মত চলেছে অনুগত অতিথিরা। কেউ গাইডের মনোযোগী শ্রোতা, কেউ দেখছে পথের দৃশ্য। একদম পিছিয়ে পড়া অশক্ত আথ্রাইটিস আক্রান্ত স্থূলাঙ্গিনীদের অবস্থা চোখে পড়ার মত। তারই মাঝে ভাগ্য বদলানোর পাথর বা অন্যান্য স্মারক বিক্রির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে রঙচঙে জালেবা পরিহিত সেনেগাল, গাম্বিয়া প্রভৃতি আফ্রিকান দেশ থেকে আসা কৃষ্ণাঙ্গরা। বাঙলাদেশি যুবকরা স্যুভেনীর ঠাসা কিয়স্ক নিয়ে বসে।

আমাদের লক্ষ্য সেনোরিয়া। বোঝাই যাচ্ছে ভুল রাস্তায় চলেছি। তাহোক ক্ষতি নেই। হঠাৎ বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে থেমে পড়ি এক রহস্যময়ী চবুতরায় এসে। কোথায় যেন পড়েছিলাম যেহেতু বাইরে লাইন নেই তাই কেবল উফিজি আর অ্যাকাদেমিয়া ছাড়া অন্যরা ফ্লোরেন্সে অদর্শনীয় ভাবা মূঢ়তার নামান্তর। একটা ছোট্ট দলকে এক ইংরেজি ভাষী গাইড বলছে ইউ হ্যাভ নট এক্সপেরিয়েন্সড দ্য ম্যানারিস্ট মুভমেন্ট আনটিল ইউ হ্যাভ সীন দিস চ্যাপেল। চার্চের নাম সান্টা ফেলিসিটা। এটি পেন্টার্মোস চ্যাপেল নামেও বিখ্যাত। সিরীয় গ্রীক বনিকদের হাতে নির্মিত ফ্লোরেন্সের প্রাচীনতম চার্চ ভাবা হয় এটিকে। জন্মকাল দ্বিতীয় শতক। এই ছোট্ট, অনাড়ম্বর, লাজুক, মুখচোরা চার্চটিকে বাইরে থেকে দেখলে বোঝা কঠিন যে এর অভ্যন্তরে পেন্টার্মোর (১৪৯৪-১৫৫৭) ফ্লোরেন্টাইন ম্যানারিজমের সর্বোত্তম কাজগুলো ঝুলছে।

ছবির এই শহরে আসার আগে কলকাতায় পণ্ডিত প্রশাসক প্রয়াত অশোক মিত্র মহাশয়ের লেখা 'ছবি কাকে বলে' বইটি পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে সহজে শিল্পবেত্তা বানিয়ে তোলা। কিন্তু বিষয়ের জটিলতা ও সেই সঙ্গে ক্লাসিক ধর্মী লেখার মর্ম সহজে উদ্ধার করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিই। অশোক মিত্র বা নারায়ণ সান্যাল হওয়া সহজ নয়। ফলে ফ্লোরেন্টাইন আর্ট এর কতটুকু অন্তরস্থ করা গেল সে চিন্তা থেকেই যায়।

পাশেই পিয়াৎসা সান্টা ট্রিনিটা। সংলগ্ন চার্চটিতে অবাধ ও নিঃশুল্ক প্রবেশাধিকার। অবশেষে পৌঁছলাম সিনোরিয়া চত্বরে। এই চত্বর সম্পর্কে বলা হয়, ফ্লোরেন্সে এসে এই চত্বর না দেখে যে চলে গেছে তাকে আবার ফিরে আসতে হবে। ১৪০০ সাল থেকেই এই চত্বরটি ফ্লোরেন্সের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। পুরো নাম পিয়াৎজা দেল্লা সিনোরিয়া। এই ধরণের পিয়াৎজা বা চত্বর ইতালির সব প্রাচীন শহরেরই অপরিহার্য অঙ্গ। মধ্যযুগের নগর রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান শহরেই এমন জমায়েতের স্থানে ছিল কেবল সমাজের উঁচু তলার লোকেদের প্রবেশাধিকার। তাদের জন্য প্রচলিত ছিল গণতন্ত্র। এখনো পর্যটনের মরশুম তুঙ্গে ওঠেনি তবুও ঢল নেমেছে দর্শনার্থীর। একটি ফলক জানাচ্ছে ১৪৯৮ সালে সমাজ সংস্কারক ধর্ম প্রচারক স্যাভোনারোলাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল এখানে। মাত্র ক'দিন আগে দেখে আসা প্রাগের চার্লস স্কোয়ারের জন হুসের কথা মনে পড়ল।

এই ঐতিহাসিক চত্বরকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক উচ্চমানের স্থাপত্য ভাস্কর্য। রয়েছে অনন্য সুষমা নিয়ে ভেসিও প্রাসাদ,

বিখ্যাত ল্যানজি মিউজিয়াম। যে অসাধারণ ভাস্কর্যটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখতে হয় সেটি হল ভাস্কর জিয়ামবোলোনার, 'রেপ অব দ্য স্যাবাইন উইমেন'। শিল্পকর্মটির গতিশীলতা, ছন্দময়তা, গোড়া থেকে শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত এর অনবদ্য সংস্থিতি (কম্পোজিশন) অভিভূত করে। অনেক শিল্পবেত্তার মতে ডেভিডের সঙ্গে এটিও সমান মর্যাদার দাবিদার। এটিও একখণ্ড পাথর কেটে সৃষ্ট। ভাস্কর্যটিতে দেখা যাচ্ছে একটি পুরুষ একটি নারীকে হাত দিয়ে উপরে তুলে আছে। দ্বিতীয় জন একপায়ে ভর দিয়ে নিচু হয়ে।

এই শিল্পকর্মটির বিষয়বস্তু রোম পত্তনের সমকালীন ইতিহাসকে রূপায়িত করেছে। রোম দখলের পর বহিরাগত রোমানরা বংশবৃদ্ধির জন্য দলবদ্ধভাবে নারী অপহরণ করতো। রেপ শব্দটা ল্যাটিন র‍্যাপটিও (Raptio) থেকে নেওয়া হলেও যৌনতামুক্ত করতে আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি কিডন্যাপিং শব্দটা চালু করেছে। এই ভাস্কর্য ছাড়া আরও একজন বেনভেনুতো সেলিনি ও তার পারসিউস এই জাদুঘরকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে।

ভেসিও প্রাসাদের বিশালত্বর সাথে মানানসই সমুদ্রর দেবতা নেপচুন। ফোয়ারায় ও গতিশীল অশ্বপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান মহাকায় নেপচুন শিল্পকর্মটিও অসামান্য ধ্রুপদি সৌন্দর্য নিয়ে এই চত্বরে দণ্ডায়মান। এখানে নেপচুনের শিল্পী আম্মানাতি আর অন্যান্য দেবতা ও অশ্বের ভাস্কর জিয়ামবোলোনা।

এই অবিস্মরণীয় পিয়াৎজাকে আরো বর্ণময় করে তুলেছে পর পর কটি ভাস্কর্য। শ্বেত পাথরের আশ্চর্য সুন্দর এই মূর্তিগুলি হল ডেভিড (অনুকল্প) এবং বন্দিনেলিসের হারকিউলিস।

সকাল নটা থেকে ক্যাথলিক ইতালির শিল্প গোগ্রাসে গিলে চলেছি। এবার থামতে হবে। লম্বা দিন এখন এখানে। তৃষ্ণা মিটছে বিয়ার ক্যানে। এবার জুৎসই ইটারির খোঁজে হাঁটা। অবশেষে বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্ট্রিটফুড কোর্টে কফি কুকিস খেয়ে বাসে রওনা হলাম আর্নো নদীর দক্ষিণ পাড়ে পিয়াৎসেল মাইকেল এঞ্জেলোতে। একশো মিটার উঁচু এই হিলকটি থেকে নদী ও সমগ্র ফ্লোরেন্সকে দেখা এক অসামান্য প্রাপ্তি। পাহাড়ি টাসকানির নিসর্গে অপরূপ ফ্লোরেন্স তার বিশ্ববিখ্যাত লাল ডুয়োমোকে কেন্দ্র করে অবস্থান করছে। এখানেও রয়েছে ডেভিডের অনুকল্প। মূর্তির তলে চারদিকে দিবা-রাত্রি ঊষা ও গোধূলির চারটি মূর্তি। সবটাই এঞ্জেলোর কল্পনায় বানানো। গোধূলির কনে দেখা আলোয় আর্নো চিকচিক করছে। ফ্লোরেন্সকে বিদায় জানানোর সত্যি এ এক উপযুক্ত লগ্ন। মার্ক টোয়েন কি এখানে দাঁড়িয়েই বলেছিলেন 'To see the sun sink down, drowned on his pink and purple and golden floods, and overhelm Florence with tides of colour and turn the solid city to a city of dreams.'

ব্রেড, বাটার, দুধ, ডিম, লেটুস ইত্যাদি কিনে ঘরে ফিরতে হবে। সঙ্গী রন্ধনে পটু। আগেই দেখে নেওয়া হয়েছে ঘরে চিনি, কফি, সয়াবিন অয়েল ও মশলা মজুত আছে।

ভরপেট ব্রেকফাস্ট সেরে ও সেই সঙ্গে ফয়েল প্যাকে ড্রাই লাঞ্চ নিয়ে সোজা স্টেশন। পিসা তিন ঘণ্টার পথ। স্টেশন ছাড়তেই ধরা দেয় অলিভকুঞ্জ, কিয়ান্তি ওয়াইনের দ্রাক্ষাক্ষেত্র শোভিত ইতালির স্বর্গোদ্যান তাসকানি। প্রকৃতি এখানে দরাজ হাতে কেবল নিসর্গই বিলোয়নি, এই মাটিতেই লালিত হয়েছে দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলো, দান্তে, বোকাচ্চিও পেট্রার্কের মত শিল্পী লেখকেরা। আমরা চলেছি পিসা, গ্যালেলিও যে শহরের ভূমিপুত্র।

স্টেশন থেকে দু'কিলোমিটার দূরত্বে এক এবং অদ্বিতীয় পিসার টাওয়ার। কেমন ঝিম ধরা শহরের ছবি। বন্ধ বাজারের দোকানপাট। কিউরিও শপে বাঙলাদেশের বিক্রেতা। শহরের মধ্যেই গ্রাম্য প্রকৃতির ইতস্তত উপস্থিতি। এক সময় এসে গেল রিভার আর্নো। দু'পাড় বাঁধানো নদী-সংলগ্ন রাজপথ। ফ্লোরেন্সে প্রথম পরিচয় আর্নোর সঙ্গে। নদীকে এই পিসাতে অনেক বেশি সুন্দরী লাগলো। ফ্লোরেন্সের নাগরিক বৈভবে এই নদী যেন তার লাবণ্যপ্রভা প্রদর্শনের সুযোগ পায়নি। বলতেই হবে পিসা আর আর্নো দুজনেই এখানে একে অপরের পরিপুরক। নদী তার সর্বস্ব নিয়ে মিশে যাবে নিকট সমুদ্রে। হঠাৎই দূর থেকে চোখে পড়ে দণ্ডায়মান হেলানো টাওয়ার। এই কাম্পেনিল বা বেলটাওয়ারটির খ্যাতি রোমের কলোসিয়ামকেও যেন ছাড়িয়ে যায়।

ট্যুরিষ্ট লিটারেচারে বলা ছিল লুক্কা দেখে সেখান থেকে বিকেলে পিসা দেখার কথা। আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনাও ছিল তাই। কিন্তু লুক্কার বদলে সিয়েনাকে যুক্ত করায় মধ্যাহ্নের পিসাকে দেখতে হলো। ফ্লোরেন্সের মতো এখানেও ক্যাথেড্রাল, ব্যাপিস্ট্রি ও বেলটাওয়ার নিয়ে রোমানেস্ক রীতিতে গড়ে উঠেছে এক বিস্তৃত সবুজের মাঝে একাদশ-দ্বাদশ শতকের এই ক্যাথিড্রাল অব দ্য অ্যাসাম্পশন মেরী। অতিসূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা এই ব্যাপিস্ট্রিটি। তিন খ্যাতকীর্তি শিল্পী এর নির্মাতা। মূল বাস্তুকার ছিলেন বুশচেটো, সম্মুখ ভাগের অলঙ্করণের শিল্পী বেইনাল্ডো এবং অভ্যন্তরের প্রস্তর অলংকরণের দ্বায়িত্বে ছিলেন গুলিয়েলমো। এদের সমাধিও এখানে। মূলদ্বারের দুটি পাল্লায় ব্রোঞ্জের কাজ বিস্ময়াবিষ্ট করে। ফ্লোরেন্সের ডুয়োমোর মত শহরের কেন্দ্রে না হওয়ায় পিসার এই ত্রিস্তরীয় ক্যাথিড্রালকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পিসার টাওয়ারের শৈলী আয়তক্ষেত্রাকারের বদলে গোলাকার। রয়েছে ছোট ছোট গোল আর্চ আর কলাম। টাওয়ারে ২৯৪ ধাপ সিঁড়ি আছে। নির্মানের পর চোদ্দফুট হেলে হাজার বছর ধরে অবস্থান করছে এটি, যাকে ছাড়া পিসা শহর অর্থহীন। এর মাথা থেকেই গ্যালেলিও কামানের গোলা ও বুলেট ফেলে প্রমাণ করেছিলেন যে হালকা ও ভারী বস্তুর পড়ন্ত গতি এক। বিজ্ঞানের প্রগতিতে পালক জুড়লেও তাঁকে খোয়াতে হয়েছিল পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদটি।

লিনিং টাওয়ারকে বাদ দিলে পিসা পর্যটনের অন্যান্য আকর্ষণে দীন বলা চলে। টাওয়ার দর্শন সেরে আমরা এক তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলাম— ভূমধ্যসাগর দেখতে হবে। কাছেই লিওরিয়ান সাগর তীরে বীচ মেরিনা। প্রায় চার কিলোমিটার ভুল পথ পায়ে হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে আসার সুফল হল পিসার গ্রাম্য অথচ আধুনিক প্রকৃতির সাথে পরিচিত হওয়া।

মেরিনাকে তেমন জনপ্রিয় বিচ বলে মনে হল না। মধ্যাহ্নের আলস্য নিয়ে বিশ্রাম করছে যেন ছোটখাটো মৎস্য বন্দরটি। বোল্ডার আর ধাতব লকগেটে সশব্দে প্রতিহত হচ্ছে ভূমধ্যসাগরের এক একটি ঢেউ। নির্জন সাগরবেলায় স্নান সেরে উঠে আসছে এক প্রৌঢ় দম্পতি। এছাড়া ট্যুরিস্ট বলতে আমরাই কেবল দেখতে এসেছি পিসার এই মেরিনাকে। তেমন কোন দোকানপাটও চোখে পড়লো না। সময় নষ্ট না করে বাসে ফিরি স্টেশনে। সেখান থেকে সিয়েনা যখন এলাম বিকেল পাঁচটা।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই সিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়। সোজা ঢুকে প্রথমেই এক সুদর্শন মধ্যবয়সী পুরুষের দেখা পেলাম। কার্যালয়ে বসে কাজে ব্যস্ত ছিলেন ভদ্রলোক। বললাম, আমাদের হাতে তিনঘন্টা সময় আছে। ভারত থেকে এসেছি। এই সময়টুকুতে আপনি আমাদের সিয়েনার কোন দ্রষ্টব্য দেখতে বলবেন? অল্পক্ষণ ভেবেই ভদ্রলোক বললেন পিয়েজ্জা দেল ক্যাম্পো দেখতে। সেই সঙ্গে পথও বাতলে দিলেন।

নির্দিধায় ভদ্রলোকের কথামত হাঁটা লাগালাম। অভিজাত এলাকার সুপরিচ্ছন্ন রাস্তা ক্রমশ এক পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠেছে। দু'ধারে প্রাসাদোপম অট্টালিকার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া। অনেকটা যাওয়ার পর দূরে শহরের স্কাইলাইন দেখে বোঝা গেল অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। পথচারী স্থানীয় লোকেদের কাছে দেল কাম্পোর পথ নির্দেশ নিয়ে জানা গেল স্টেশন থেকে তার দূরত্ব ছ'কিলোমিটার। ক্রমশ আমরা ওল্ড টাউনে এসে গেলাম। মিলে যেতে লাগল পাদুয়ার দম্পতিটির বলা মেডিয়েভাল রোমান পারিপার্শ্বের বর্ণনা। যে কোন নগরীর প্রকৃত পরিচয় পেতে গেলে তার পুরনো অংশে যেতেই হবে। এক চৌরাস্তার কোণে দুই শিশুর নেকড়ের স্তন্যপানের ভাস্কর্য। কথিত আছে রোমুলাস ভাইয়েরা নাকি এক মা নেকড়ের মাতৃত্বে বড় হয়ে রোমের পত্তন করে। মনে মনে ভাবি এ ঘটনা কেবল ইতালি কেন আমাদের দেশেও বুলন্দসর শহরে ১৮৯৫ সালে দানা সেনেচারকে ইংরেজ অভিযাত্রীরা নেকড়ের বাৎসল্য থেকে উদ্ধার করেছিল। কিপলিঙ এর মুগলিকেই বা ভুলি কী করে?

অবশেষে এসে যাই সিয়েনা শহরের প্রাণকেন্দ্রে। পেয়ে যাই আর্জেন্টিনীয় সেই তরুণ-তরুণীটিকে যাদের পিছনে কাল উফিজির লাইনে দীর্ঘ সময় দঁড়িয়েছিলাম। ওরাই দেখিয়ে দিল পিয়াজ্জার পথ। মনে মনে ইউনিভার্সিটির লোকটির সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ করলাম। এই অসাধারণ মুক্তাঙ্গনটি কেবল সিয়েনা বা ইতালিই নয় সমগ্র মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম সেরা বলে বিবেচিত। এর অত্যুচ্চ টাওয়ার ও তার ভাস্কর্যময় সংস্থিতির ভুবনজোড়া খ্যাতি। মনে মনে লুক্কাকে হারানোর জন্য খেদ ছিল। এই মুহূর্তে পিয়াজ্জা দেল কাম্পো। তার

লেখক দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

বিশাল লাল ইটের বাঁধানো চত্বর ও এক প্রান্তে আকাশ ছোঁয়া বেল টাওয়ারের ঔদ্ধত্য নিয়ে জানিয়ে দিল সিয়েনা কেন সে যুগে এক শক্তিশালী নগর রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়েছিল।

এ যেন বিশ্বের বৃহত্তম শানবাঁধানো সিটিসেন্টার তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের মিনি সংস্করণ। ভিড় যতই হোক কখনোই তা পর্যটকের স্বাচ্ছন্দে বিঘ্ন ঘটাবে না। এক উপভোগ্য ঢালে চারদিক থেকে মাছের কাঁটার আকারে গড়ে ওঠা এই উন্মুক্ত চবুতরাটি ১৩০০ শতকের আগে চারদিকে পাহাড়ি ঢালের মিলিত বিন্দু ছিল। গড়ে উঠেছিল বাজার। ১৩৪৯-এ এটি বাঁধানো হয়। এর নয়টি শ্রেণীর বিন্যাস বুঝতে গেলে সুউচ্চ টাওয়ারে উঠতে হবে। এই বিশাল অঙ্গনকে ঘিরে রেঁস্তোরা, পানশালার ছড়াছড়ি। একপ্রান্তে ভাস্কর্যমণ্ডিত ফোয়ারার মকরমুখে পানীয় জলের ব্যবস্থা। পায়রার ঝাঁকে শিশুদের আনন্দময় কোলাহল। যুবতীর কোলে যুবকের মাথা রেখে শুয়ে থাকা দেখলে মনে হতেই পারে ভেরোনার অলিন্দ ছেড়ে সদ্য আসা রোমিও জুলিয়েট। বয়স্ক চরণিকের পানীয় হাতে চিন্তামগ্ন অবস্থান সব মিলিয়ে যেন এক মধ্যযুগীয় কার্নিভালের ছোঁয়া। এই পিয়াজ্জা থেকে এগারোটি সঙ্কীর্ণ পাথুরে পথ বিচ্ছুরিত হয়েছে শহরের মধ্যে। প্রতিটি পথের দু'পাশে মধ্যযুগের রোমান সাম্রাজ্য যেন থেমে আছে। ইচ্ছে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটাই। কিন্তু উপায় নেই। আহ্নিক গতির গর্ভে ফিরতে

With best compliments from: -

PIONEER PAPER CO.

(Quality Ex-Book Manufacturer with latest technology & Exporter)

REGD OFFICE & WORKS:

74, BELIAGHATA MAIN ROAD
KOLKATA-700 010
PHONE: 2370-4152, FAX: 91-33-2373-2596

Email: pioneerpaperco@gmail.com

Visit Our Website: - www.pioneerpaper.co

শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

বেনারসী, সিল্ক, তাঁত শড়ীর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রিয় গোপাল বিষয়ী ®

স্থাপিত - ১৮৬২

বড়বাজার ঃ ৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট (খেংড়াপট্টী), কোলকাতা - ৭,

ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৪০২, ২২৬৮-২৮৩৩

২০৮, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা - ৭, ফোন ঃ ২২৬৮ ৬৫০৮

গড়িয়াহাট ঃ ১১৩/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে,

কোলকাতা - ৭০০ ০২৯, ফোন ঃ ২৪৬৫-৮২৪৬

এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই

হবে ফ্লোরেন্সের আবাসে।

ফ্লোরেন্স রেলস্টেশনে যখন নামলাম রাত দশটা বেজে পনেরো। স্টেশন সংলগ্ন সুপার মার্কেট বন্ধ হয়ে গেছে। ফ্রিজে দুধ, ডিম থাকলেও ব্রেড কিনতে হবে। হস্টেলের কাছেই খোলা পেলাম একটা দোকান। কী করে জানি না দোকানিদের ইংরেজি উচ্চারণে হিন্দি-উর্দুর ছোঁয়া অনুভূত হল। ঠিক তাই, কথায় কথায় জানা গেল দশাশয়ী দোকানি দুইভাই পাকিস্তান থেকে আসা। নিমেষে কথাবার্তায় এসে গেল হিন্দি। ভারতীয় পেয়ে তারাও বেজায় খুশি। জানালো ইন্ডিয়ান ট্যুরিস্টদের কাছে তাদের দোকান সব সময় একটা বড়ো ডেরা। ব্রেডের সাথে দু'বোতল জল বিনা পয়সায় দিয়ে দিল দুইভাই। এহেন অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। লন্ডনে সেই পাকিস্তানি ট্যাক্সি ড্রাইভারের আমার থেকে কেবল ভারতীয় বলে এক পাউন্ড কম ভাড়া নেওয়ার কথা, 'এক টুকরো ইউরোপে' লিখেছি। বিদেশে এহেন অভিজ্ঞতা এক অন্যধরনের সুখানুভূতি আনে।

Oh Rome ! My Country ! City of the soul.

– Lord Byron

মধ্যযুগের এই ইউরোপীয় নবজাগরণকে কয়েকশো বছরের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। দৈবলব্ধ ছিল না এই রেনেসাঁ। এমন নয় যে ১৫০০ শতকের এক ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজের তৈরি বালিঘড়ির (hour glass) দিকে তাকিয়ে লিওনার্দ বলে উঠলেন, কী আশ্চর্য রেনেসাঁস এসে গেছে। পারসি গণিতজ্ঞ আল খোয়ারিজিমি (৭৮০-৮৫০) আবিষ্কৃত আলগরিদম এর মতো মধ্য এশিও আবিষ্কারগুলিও ইউরোপিয় রেনেসাঁসে জ্বালানি জুগিয়েছে। অন্যদিকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগার পুড়িয়েছে ধর্মান্ধ খ্রিস্টান জিলাট। প্লেটোর আকাদেমি বন্ধ করে দেয় রোম সম্রাট জাস্টিনিয়ান। আকাদেমির নেস্টরিয় গ্রিক পণ্ডিতরাই বৌদ্ধ সাসানিয় রাজা প্রথম শাপুরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইরানের গোন্দেশাপুরে তৈরি করে মেডিকেল কলেজ। অন্য ধর্ম বিদ্বেষী পাপাল যুগের বিজ্ঞান বিরোধিতা গ্যালেলিওর যুগেও শক্তিশালী ছিল।

আমরা এই রেনেসাঁর গর্ভগৃহ থেকে রোমে এসেছিলাম ৯ জুনের উষ্ণ মধ্যাহ্নে। আইফোন জানাচ্ছে রোমের টার্মিনি স্টেশন থেকে পিয়াজা ডি কাপ্রিও চার কিলোমিটার দূরে। সেখানেই আমাদের যেতে হবে। রোমের টার্মিনি, ভিড়ে, জৌলুসে, আকারে আকর্ষণে অবশ্যই লন্ডন পারীর সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাতে পারে। মেপে নীচুস্বরে কথা বলা পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের তুলনায় কোলাহল এখানে অনেকটাই বেশি। জনশ্রুতি এরকম ঃ ইউরোপের ভূগোল যত পুবমুখি হয় শহরের কোলাহল তত বাড়ে। আমাদের ভারতবর্ষেও সেটা প্রমাণিত। পৃথিবীর কোন মেট্রো স্টেশনে তারস্বরে টিভি চলে না। কলকাতায় চলে। শব্দদূষণের বিপজ্জনক মাত্রা ছাড়ানো ব্যস্ত রাস্তার চার মাথার মোড়ে স্থূল উদ্ভট চিন্তা প্রসূত রবীন্দ্র সঙ্গীতের আদিখ্যেতা সর্বশেষ সংযোজন। মুম্বই, দিল্লী, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই এমনকী ভুবনেশ্বর থেকেও এলে কলকাতাকে তাই নাদব্রহ্মের কেন্দ্র মনে হয়।

রোমযাত্রী মাত্রই পকেটমারের আতঙ্কে ভোগে। আমরাও তার ব্যতিক্রমে নেই। স্বভাবতই সতর্কতা বাড়ে। কবল্‌ড রোডে শব্দ তুলে ধাবিত হই হুইল্ড লাগেজ নিয়ে গন্তব্যের দিকে। দু'ধারে চলে যাচ্ছে একের পর এক প্রাসাদোপম হর্ম্য। পার হচ্ছি এক একটা স্কোয়্যার ও সরণিগ্রন্থি। এক সময় উপস্থিত হই চিত্তাকর্ষক প্রাসাদের সামনে। এর আগে এমন রাজকীয় বিশালত্বের দাবিদার কোনো শ্বেতপাথরের প্রাসাদ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অবশ্যই এটি রোমের সেরা দশ দ্রষ্টব্যের একটা হবে। এহেন শহরকে প্রথম দর্শনজনিত এক আত্মহারা প্রগল্‌ভতা অনেককেই গ্রাস করে ও সেই সঙ্গে এক ধরনের স্যাডিজম্ দেয়। কজনেরই বা অন্নদাশঙ্করের মত বলার সৌভাগ্য হয়, 'এ শহরতো আমারই। তাই তার আবরণ ধীরে ধীরে খুলবো' (উক্তিটি লন্ডনকে নিয়ে করা)। বিশ্বের চিরন্তন নগরী রোমকে মাত্র চারদিনের জন্য পাবো। তার মধ্যেই যতটা সম্ভব তার সৌন্দর্যের সন্ধান করতে হবে। তাই তার গোপন অঙ্গে তিলের সন্ধানের প্রশ্নই আসে না। তবে বহিরাঙ্গের জ্যোতির ছটার ছিটেফোঁটা ইতিমধ্যেই পেয়ে গেলাম যখন অতিক্রম করলাম পিয়াজ্জা ভেনেসিয়া। একে একে এ শহর যেন নিজেই নিজেকে মেলে ধরে জানাচ্ছে কেন অনেকে তাকে ইউরোপের সবচেয়ে 'ম্যাগনিফিসেন্ট' শহর বলে।

A heady mix of haunting ruins, awe inspiring art and vibrant street life এর শহর রোম। এসে যায় পিয়াজা ডি ক্যাপ্রিও। পিয়াজ্জা জুড়ে বাজার বসেছে। মশলা থেকে সব্জি, ছবি, পোষাক, চিজ, পাস্তা, ফুল কী নেই। বিক্রেতাদের অনেকেই বাঙলাদেশি টানে বাংলা বলছে। ঢুকে পড়ি কয়েকটা পাথুরে ইমারতের মাঝখানের সরু গলির মধ্যে। যেন বাগবাজারের কোন রাস্তা। পৌঁছে যাই গ্রীন ফ্লাওয়ার গেস্ট হাউসের সামনে। এটাই হবে আমাদের রোমের ভদ্রাসন। গেট বন্ধ। ফোন করলে এক মহিলা কণ্ঠ জানালো এক্ষুণি সে আসছে। তার আসতে বিলম্ব হওয়ায় পাশের ইটারির তরুণী ডেকে তার দোকানে বসালো। আমাদের চোখেমুখে ফ্লোরেন্স থেকে আসার ও গরমের ক্লান্তি স্পষ্ট। দু'জনে দু'ক্যান বিয়ার পান করছি এমন সময় ছোট্ট ফুটফুটে কন্যাকে নিয়ে এসে গেট খুলে স্বাগত জানালো ছোট্টখাট্য তার মা। পরনে সাদা সর্টস আর গোলাপী স্যান্ডো গেঞ্জীর ল্যাটিন মহিলাটি পেরু থেকে আসা। দেখলে আর্লি টিনএজার বলে ভ্রম হবে। সোফায় বসিয়ে সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল ঘর প্রস্তুত করতে। আমাদের ব্যবস্থা হল বেসমেন্টে অর্থাৎ মাটির তলায়। ঘরটা বেশ বড়। পাথরের দেওয়াল। ওঠার সিঁড়ির তলায় অপরিসর টয়লেট। পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি নেই। জানালো স্নানের জন্য গ্রাউন্ড ফ্লোরের বড় ওয়াশরুম ব্যবহার করতে পারবো। কিচেন ও চা কফির আয়োজনও সেখানেই।

ইতালি নাকি ভূকম্প প্রবণ দেশ। ক'মাস আগে রোমেও মৃদু ভূকম্পের খবর কাগজে বেরিয়েছিল। সেই শহরেই ভূগর্ভে বাস করতে হবে। তেমন কিছু ঘটলে আমাদের খবর কেউ পাবে না। তা হোক, রোম প্রবাসের রোমাঞ্চে এ-এক নতুন মাত্রা জোগাবে।

কলকাতায় আমাদের যাত্রা শুরুর আগে রোমকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি পর্যটন পরিকল্পনা করেছি। ইউ টিউবে একাধিক ভিডিও থেকে গিবনের ডিক্লাইন অ্যান্ড ফল্ অফ দ্য রোমান এম্পায়ার কিছুই বাদ

যায়নি। রোম মানুষকে পাগল করে দেয়। এত তার সম্পদ, কোনটা কখন দেখবো, কোনটা বাদ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, এসব নিয়েই দিনের পর দিন কেটেছে।

ট্যুরিস্টের সুবিধার জন্য রোমকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। ইম্পিরিয়াল, মনুমেন্টাল আর রেলিজিয়াস বা ভ্যাটিকান। আমাদের অবস্থান থেকে দুটো দ্রষ্টব্য একেবারেই কাছে। এগুলো হল প্যানথিয়ন আর পিয়াৎসা নভোনা। এ-শহরে কিছু শব্দ সহজেই জানা হয়ে যায়, যেমন বড় সরণি হল ভিয়া। চারিদিক বড়ো সৌধে ঘেরা মিলনক্ষেত্র হল পিয়াৎসা। একই ভাবে পালাৎসো অর্থ প্রাসাদ।

প্যানথিয়ন দিয়েই শুরু করলাম আমাদের আনুষ্ঠানিক 'রোমান হলিডে' উদ্‌যাপন। এটি প্রাচীন রোমের এক বিস্ময়। এ-নগরীর প্রাচীনতম মনুমেন্ট যা আদিতে ছিল রোমান দেবতাদের দেবালয়। খ্রিঃপূঃ ২৭ সালে অগাস্টাসের সেনাধ্যক্ষ অ্যাগ্রিপা এটি নির্মাণ করেন। আমাদের দেশে আবিষ্কৃত মনুষ্য নির্মিত প্রাচীনতম প্রস্তর স্থাপত্যটি হল সাঁচির স্তূপ (৩০০ খ্রিঃপূঃ)। আশি খ্রিস্টাব্দে প্যানথিয়ান আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ডোমিটিয়ান পুনরায় নির্মাণ করেন। পরে ১১০ খ্রিস্টাব্দে বজ্রাঘাতে পুনরায় আহত পবিত্র উপাসনালয়টি ১২০ সালে গ্রিক স্থপতি দামাস্কাসের সাহায্য নিয়ে হাড্রিয়ান গড়ে তোলেন।

গোলাকার এই মন্দিরটির সামনের পোর্টিকোকে দু'সারিতে বারোটি করিন্থিয়ান কলাম ধরে আছে। ওপরে রয়েছে ত্রিকোণ পেডামেন্ট। তার তলায় ল্যাটিনে লেখা, M. AGRIPPA. L. F. COS. TERTIUM, যার অর্থ It was built by Marces Agrippa in his third consulate. মুগ্ধ মাইকেল এ্যাঞ্জেলো প্যানথিয়ন দেখে বলেছিলেন It looks more like the work of angels, not human. সত্যিই এর একাধারে সামঞ্জস্য, সমন্বয়, বিজ্ঞান ভাবনায় সর্বার্থসাধক সৌন্দর্য যুগে যুগে মানুষকে মুগ্ধ করে চলেছে। অবাক করা সেই সময়কার তৈরি ব্রোঞ্জের দরজাটি এখনো প্যানথিয়নের মূল প্রবেশদ্বার।

প্যানথিয়নের সামনেই রয়েছে একটি ইজিপসিয়ান ওবেলিস্ক। ভ্যাটিকানের সেন্ট পিটার্সের চেয়েও বড় এখানকার ডোম তথা গোম্বুজটি ১৩০০ বছর ধরে বিশ্বে বৃহত্তম ছিল। আজও এটি বৃহত্তম স্তম্ভহীন গম্বুজ। এই মন্দিরের মেঝে থেকে শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব আর গোলাকার ডোমের ব্যাস অভিন্ন। দুটিই ৪৩.৫ মিটার। গম্বুজের বেধ উপর দিকে ক্রমশ কমেছে। প্যানথিয়নের অন্যতম আকর্ষণীয় অংশটি হল ছত্রাকার সিলিং এর মধ্যস্থ ফাঁকা গোলাকার জায়গাটা। এটিই হলের ভিতর আলো ও বাতাস ঢোকার একমাত্র পথ। জল পড়লে মেঝের ঢালে মুহূর্তকালে অপসৃত হয়। প্রতিবছর ২১ এপ্রিল দুপুর বারোটায় সূর্যালোক ব্রোঞ্জ কপাটের গ্রিল ভেদ করে সমগ্র প্রাঙ্গণকে আলোকিত করে। এই দিনটি রোমের প্রতিষ্ঠা দিবসও।

ভিতরের গোলাকার হল ঘরটি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে সাজানো। স্তম্ভ ঘেরা রয়েছে সাতটি কুলুঙ্গিতে। অতীতে এগুলোতে নানান রোমান দেবদেবীর মূর্তি ছিল। পোপের শাসনকালে এটি মেরিকে উৎসর্গীত চার্চে পরিণত করা হয়। এই ধরণের প্রয়াসে ইতালির সাথে আমাদেরও মিল আছে। সম্প্রতি পুনা কেন্দ্রীক অষ্ট বিনায়ক দর্শনে গিয়ে দেখলাম নেলাদ্রি পাহাড়ে ১৮টি বৌদ্ধ গুহার বুদ্ধদেবকেও গণপতি মোরিয়া বাপ্পার জন্য চলে যেতে হয়েছে।

প্যানথিয়নে কোন প্রবেশমূল্য নেই। এর পবিত্রতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্বর প্রতি এখানকার নগরপালিকা ও সরকার যারপরনাই সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল। চিত্রকর রাফায়েল ও ভিক্টর ইমানুয়েলের মত ঐতিহাসিক পুরুষকে তারা এখানেই সমাধিস্থ করেছে। সাঁচি বা মাউন্ট আবুর দিলওয়ারার মত প্যানথিয়ন দর্শনও বোধ ও চিন্তার ঐশ্বর্যকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করে। অনেকে বলে গ্রিসের পার্থেননও এমন অনুভূতি দেয়। এটা বলতেই হবে ইতিহাস এবং স্থাপত্যে অনাগ্রহী মানুষের রোম দেখা অনুচিত।

রোম দর্শনের প্রাথমিক ধাক্কা নানা চিন্তার জন্ম দেয়। পণ্ডিতেরা বলেন পৃথিবী নিজেই তো পৃথিবীর প্রতি ইউরোপের দান। কারণ পৃথিবী ইউরোপের আবিষ্কার। পৃথিবী আবিষ্কারের নেশায় তাড়িত কেউ হল না রোমকদের মতো। আমাদের অবস্থা তো আরো করুণ। গুপ্ত যুগের পর যেন কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল বেদ উপনিষদই নয়, নালন্দা, পাহাড়পুর, বিক্রমশীলা ছিল কোন সপ্তম শতকে। ইউরোপ তখন কোথায়? কথায় আছে When Greece was in its glory, Germans and saxons were hunting wild boar. গ্রিসের সঙ্গে ভারতকেও যোগ করা যায়। মধ্যযুগের শুরুতে যখন বক্তিয়ার খিলজী নালন্দা পাহাড়পুর ধ্বংস করছে তখন বোলোগনা পাদুয়ার জন্ম হচ্ছে। অনেক পরে ইউরোপ এসে কলকাতাকে এথেন্স বানাবার চেষ্টা করলেও স্বাধীনোত্তর কালে বক্তিয়ার খিলজীর নব অবতাররা ইংরেজী ও নবপ্রযুক্তির বিরোধিতা করে ইতিহাসের ঘড়ির কাঁটাকে বিপরীত পথে চালিত করল। পৃথিবীর আকার আকৃতি গতি ও অবস্থান ইউরোপই আমাদের জানালো। আমরা মেতে থাকলাম পরলোকের নাড়ি নক্ষত্র নিয়ে।

প্যানথিয়ন থেকে পিয়াৎসা নভোনা বেশি দূরে নয় তবুও ওই স্থানটি বিকেলের জন্য রেখে চললাম অন্য পথে। রোমে দ্রষ্টব্যস্থানের ছড়াছড়ি। মাসখানেক কাটালেও সব দেখা কঠিন। সর্বোপরি শহরের যে বৃত্তের মধ্যে এগুলো অবস্থিত সেটা গোবিন্দপুর-কলিকাতা-সুতানুটির মিলিত আয়তনের চেয়ে কিছুটা ছোটই হবে। তাই পায়ে হেঁটেই রোমকে আবিষ্কার করা ভালো। এ শহরের মতো চোখ কান মন খোলা রেখে বেড়ানোর সুখ কোথায়? রোমের অগুন্তি প্রাসাদের অনেকগুলিই এখনো ব্যক্তি মালিকানায় আছে যারা কখনো না কখনো এই ঐতিহাসিক নগরীর কোন না কোন শাসকের বংশধর। এগুলো বড়ো একটা পাঠকের আইটিনারিতে থাকে না। এসে গেলাম সেই বিখ্যাত প্রাসাদের সামনে, আগের দিন আসার পথে যেটা দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলাম। এটি ভিক্টর ইমানুয়েলের স্মৃতিতে নির্মিত। পায়ে হেঁটে রোমে ঘুরলে এই প্রাসাদ আর পিয়াৎসা ভেনেসিয়া বার বার ছুঁতে হয়। কাছেই পালাৎসো ভেনেসিয়া। এখান থেকেই মুসোলিনী ভাষণ দিতেন। হঠাৎ রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। ১৯২৫ ও ১৯২৬-এ দু'বার তিনি ইতালি ভ্রমণ করেন। প্রথমবার মিলানে বক্তৃতা সফর ছিল। দ্বিতীয়বার খোদ রোমে তিনি ছিলেন স্বয়ং মুসোলিনীর রাজ-অতিথি হয়ে। স্বৈরশাসক শান্তিনিকেতনে দুই প্রতিনিধির হাত দিয়ে কিছু

মূল্যবান বই পাঠিয়ে কবিকে রোম সফরের আমন্ত্রণ পাঠান। ৩০মে থেকে ২২ জুন, ১৯২৬ কবি এই সফরে নেপলস হয়ে বিশেষ ট্রেনে রোমে যান। রোমের সেরা হোটেলে তিনি ১৪ দিন অবস্থান করেন। তাঁর সাথে পরের জাহাজে রওনা হয়ে মিলিত হন সস্ত্রীক অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ। রানিমা-র (নির্মল কুমারী মহলানবিশ) কাছে আমি শুনেছি কবি কেমন ভাবে নজরবন্দি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সপরিবারে রথিঠাকুর। অধ্যাপক কার্লো মরমিচি রোমে রবীন্দ্রনাথের পুরো দায়িত্ব নিয়ে নেন। কাউকে কাছে ঘেঁষতে দেন নি। এমনটাই হয়েছিল এযুগে মারাদোনার সঙ্গে প্রয়াত জ্যোতি বসুর সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে। একটি দম্পতি ছাড়া কোন সাংবাদিকেরও প্রবেশাধিকার ছিল না।

মুসোলিনীর উপস্থিতিতে কবিকে এক বিশাল প্রেক্ষাগৃহে সংবর্ধনার অনুষ্ঠানে পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার দর্শক সমাগম হয়। কবি তাঁর ভাষণে বলেন যে ভূমিতে শেলী, কিট্স, বায়রন, ব্রাউনিং এর মত প্রতিভা সমৃদ্ধ করেছে সেখানে আসতে পেরে তিনি ধন্য। পরদিন সংবাদপত্রে এই ভাষণকে ইতালীয় ভাষায় মুসোলিনীর স্তুতির কাজে পরিবেশিত হওয়ার ঘটনা প্রশান্তচন্দ্রের নজর কাড়লে কবির দেশে ফেরার ব্যবস্থা নাকি দ্রুত করা হয়। এই কারণেই কবির রোম দর্শন অসম্পূর্ণ ও ফ্লোরেন্স অদেখা থেকে যায়।

ভিক্টর ইমানুয়েলকে ডানহাতে রেখে রোমের প্রধান রাজপথ ভিয়া ইম্পিরিয়ালি ধরে পূর্বদিকে কয়েক কদম এগিয়েই দূরে চোখে পড়ল কলোসিয়ম। বিশাল চওড়া এ-রাজপথ যেন জানিয়ে দিচ্ছে সেই বহু কথিত বাক্যটিকে অল রোডস লিড টু রোম।

চলার পথে এসে যায় বৃত্তাকার এক সুউচ্চ মনুমেন্টাল ইমারত। দেখেই মনে হয় অতিপ্রাচীন স্থাপত্য। সামনেই ছোট্ট টুলে বসে নিবিষ্ট চিত্তে বেহালা বাদনরত এক শিল্পী। সামনে তার খোলা ভায়োলিন বক্সে কিছু খুচরো কয়েন। তার থেকে কিছুটা ব্যবধানে একমনে ছবি আঁকছে একজন। তার কাছে এই প্রাচীন দুর্গ সদৃশ বিল্ডিংটির পরিচয় জানতে চাইলে শিল্পী বলল ক্যাসেল সন্ত এ্যাঞ্জেলো। তার পরেই লোকটি প্রশ্ন করল 'ফ্রম ইণ্ডিয়া'?

চমকে উঠি। প্রৌঢ়ত্ব যাই যাই, সুঠাম স্বাস্থ্য, এক গাল শ্বেতশুভ্র গোঁফ দাড়ি ও বিরল কেশ, অবিকল সত্তরের দশকের প্রতিবেশী শিল্পী প্রকাশ কর্মকার। পরিচয় হল, একদা জম্মুর বাসিন্দা সর্দার সিং। ২৬ বছর ধরে ইতালিতে ছবি আঁকছে। রাত আটটায় কলোসিয়ামের পাশে চারটে ফ্লাশ লাইট নিয়ে বসে। তার ভাষায়, ইতালিতে সবাই যেভাবে জীবনটা উদ্‌যাপন করে আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি। কোন ভয় নেই। এখানে সব কিছু খোলা মনে মেনে নেয় সকলে।

সামনে বয়ে চলেছে নদী টাইবার। রাস্তা থেকে অনেক নিচে নদীর কিছুটা ওপরে সারিসারি রেস্তোঁরা, ছবির স্টল। ঢুকে যাই ক্যাসেলে। টিকিট কম নয়, মাথাপিছু চোদ্দ ইউরো, ভারতীয় মুদ্রায় ১০০৮ টাকা। বৃত্তাকার পথে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠি। সম্রাট হাড্রিয়ান ১২৩ খ্রিষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে এটি দুর্গ ও এই ক্যাসেলে রূপান্তরিত হয়। একদা রোমের উচ্চতম এই বিল্ডিং ৪১০ সালে ভিসিগথদের দখলে গেলে কারাগারে পরিণত হয়। বর্তমানে মিউজিয়াম। এর নির্মাণ শৈলী থেকে প্রাচীন রোমের স্থাপত্য সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়। শীর্ষদেশ শহরের এক অসাধারণ দৃশ্য উপহার দিল। তিনশো ষাট ডিগ্রী কোণে বিহঙ্গ দৃশ্যে নদীর দু'দিকে রোমের অসংখ্য হর্ম্য, গীর্জাচূড়ো, পথঘাট ও সর্বোপরি ভ্যাটিকানে সেন্ট পিটার্সসের গম্বুজ ধরা দেয়। অন্যদিকে প্যালেটাইন আর ক্যাপিটোলাইন পাহাড় দুটি নিসর্গসহ দৃশ্যগোচর হয়। বিখ্যাত ইটালিয়ান চলচ্চিত্র 'এ্যাঞ্জেলস এ্যান্ড ডেমনসের' দৃশ্যগ্রহণ হয় এই ক্যাসেল কাম মিউজিয়ামে। কতো শত বছর ধরে ঘটনায় ঠাসা টাইম ক্যাপসুল হয়ে অবস্থান করছে এই ক্যাসেল সন্ত অ্যাঞ্জেলো।

ক্যাসেল দর্শন সেরে উত্তরে এগিয়ে চলি। রোম প্রবাসের সবচেয়ে স্পর্শকাতর মুহূর্ত বলা চলে। একটি শহরের একই অঙ্গে এতো রূপ রোম না দেখলে বোঝা কঠিন। প্রাচীন রোম, পোপের রোম, আধুনিক যুগে মুসোলিনীর রোম ছাড়াও রেনেসাঁস, বারোক রোম। আবার ফেলিনি, মালদিনির রোমকেইবা ভুলি কি করে। আসলে রোম আমাদের এতোই চেনা যে এশহরের আনাচে কানাচে ঘুরলে এক 'deja vu' অনুভূতি দেখা দিতে বাধ্য।

রোমের অন্যতম প্রধান রাস্তা ভিয়া ডেই ফোরি ইম্পিরিয়ালির ওপর পর পর ট্যুরিষ্ট স্পটগুলি সাজানো। রাস্তাটি পুবে কলোসিয়াম থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমে ভিক্টর ইমানুয়েল স্মৃতিসৌধে মিশেছে। মাঝে রয়েছে ক্যাসেল শীর্ষে সন্ত অ্যাঞ্জেলো এবং ক্যাথারিনার মতো দৃষ্টিনন্দন ভাস্কর্য।

এসে যায় রোমান ফোরাম। শহরের মধ্যস্থলে তিন পাহাড়ে ঘেরা একদা জলাভূমিতে গড়ে ওঠে এই বিশাল অঞ্চলটি। শতাব্দীর পর শতাব্দী দিগ্বিজয়ীর শোভাযাত্রা থেকে বক্তৃতার মঞ্চ, অপরাধীর বিচার থেকে গ্ল্যাডিয়েটরের শৌর্য-নৈপুণ্য। মন্দির, দোকানপাট, বাজারসহ এই ফোরামই ছিল রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও প্রসাশনিক ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল। এখানে আসার আগে এর বিশালত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। রোম আর তার ফোরাম সমার্থক।

রাজপথে দাঁড়িয়ে দূর থেকে ফোরামকে ভাঙা পাথরের স্তূপের বেশি কিছুই মনে হয় না। বিশাল বিশাল স্তম্ভ, আংশিক ভাঙা পেডামেন্ট, মন্দিরের গম্বুজ ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ দেখে ফোরামকে বোঝা যায় না। এর প্রকৃত রসাস্বাদ করতে গেলে কয়েকদিন কেটে যাবে। এখানকার প্রতিটি পাথরে হাজার হাজার বছরের ইতিহাস মিশে আছে। ফোরি ইম্পিরিয়ালির প্রবেশ স্বারে জুলিয়াস সিজারের পূর্ণবয়ব প্রস্তরমূর্তি।

দু'হাজার বছর আগে এখানে ঘটেছিল এক ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ড। এখানকার এ্যাসেম্বলি হলের মুখে পরাক্রমশালী রোমান নায়ক জুলিয়াস সিজারকে হত্যা করেছিল তেইশ জন সেনেটর। প্রিয় অভিজাত ব্রুটাশকে উদ্দেশ্য করে মৃত্যুকালীন সিজারের শেষ উক্তি Et too Brute রোমের সেই উত্তাল সময়কে নাটকের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন মহাকবি সেক্সপিয়র। ফোরাম মানেই সিজার, সিজার মানেই ফোরাম।

সিজার (খ্রিঃপূঃ ১০২-'৪৪) ছিলেন বহু গুণের অধিকারী-বুদ্ধিমান, সাহিত্য-প্রেমী, বাগ্মী। সম্ভ্রান্তবংশীয় হয়েও

শারদীয়ার শুভ মুহূর্তে সকলকে জানাই প্রীতি,
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

With Best Compliments from :

C. S. SALES (INDIA)
PVT. LTD.

18, Amratala Street, 1st Floor
Kolkata - 700 001

প্লেবিয়ান বা সাধারণ মানুষের পক্ষে বক্তব্য রাখতেন। চল্লিশোর্ধ সিজার গল অভিযানে নিজেকে ইতিহাসের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন কোনরকম পেশাগত প্রশিক্ষণ ছাড়া।

সেনাপতি হিসেবে পম্পেও ছিলেন অসাধারণ। সিজার গিয়েছিলেন পশ্চিমে, পম্পে গিয়েছিলেন পুবে। সিরিয়া ও পারস্য জয় তাঁরই সাফল্য। সিজারের অনুপস্থিতিতে পম্পে যখন একাধিপত্য কায়েমে তৎপর তখনই গল বিজয় সেরে সিজার ফেরেন। সে সময় নিয়ম ছিল বিদেশ থেকে যুদ্ধ শেষে যোদ্ধা উত্তরে রুবিকন নদী পর্যন্ত আসতে পারবে। রোমে ঢোকা নির্ভর করতো সম্রাটের ইচ্ছার ওপর। সিজার এই নিয়ম না মেনে পম্পের সেনাদলকে পরাস্ত করলে পম্পে গ্রিসে পলায়ন করে। সিজার সেখানেও তাকে পরাজিত করলে পম্পে মিশরে গেলে সিজার সেখানে ধাওয়া করে পম্পেকে হত্যা করেন। সেটা খ্রিঃপূঃ ৪৮ সাল। পরবর্তী অধ্যায়-মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা-সিজার প্রণয় পর্ব। তাঁদের পুত্র ছিলেন টলেমি সিজার। সিজার হয়ে উঠলেন রোমের অবিসংবাদী নেতা, তাঁর ভাষায় Veni, Vidi, Vici, এলাম দেখলাম জয় করলাম। ইউরোপের ইতিহাসে সিজার শব্দর জনপ্রিয়তা যুগে যুগে লক্ষ্য করা গেছে। রাশিয়ায় Czar, জার্মানীর Kaiser শব্দগুলোর উৎসই Caesar.

সিজারের মৃত্যুর পর রোমের রিপাবলিকে গৃহযুদ্ধ চলে কিছুকাল। অবশেষে ক্ষমতায় আসেন অক্টাভিয়ান বা অগাস্টাস (খ্রিঃপূঃ ৬৩-১৪)। রোম সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাসে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে বর্ণময়। প্রাচীন রোমান কবি ও লেখক ভার্জিল, হোরেস, লিভি ও ওভিড সকলেই তাঁর সমসাময়িক। অগাস্টাস জীবন সায়াহ্নে বলতেন, 'পেয়েছিলাম ইটের রোম রেখে গেলাম মার্বেলের রোম।' তাঁর রাজত্বকালেই ঘটেছিল আর এক যুগান্তকারী ঘটনা যা সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করেছিল। বেথলেহেমে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন মানবপুত্র। তাঁর জ্যোতির ছটা সর্বাধিক আলোকিত করেছিল যে ভূখণ্ডকে গত পক্ষকাল সেই ক্যাথলিক বিশ্বের সুধারস আকণ্ঠ পান করে চলেছি আমরা দু'জন।

ফিরে আসি ফোরামে। অগাস্টাসের মার্বেল খচিত রোমের কঙ্কালের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে সেনেটের ভগ্নস্তূপ। প্রাচীন কমিটিয়াম। সেখানে রয়েছে রোমুলাসের সমাধি। সেনেটের ঠিক পাশেই আশ্চর্য সুন্দর অবস্থায় অবস্থান করছে বিজয়তোরণ। আসিরিয়া আর মেসোপটেমিয়ায় পার্থিয়ানদের বিরুদ্ধে সম্রাট সেপটিমিয়াসের যুদ্ধ জয়ের স্মারক। নির্মিত ২০৩ খ্রিষ্টাব্দে।

তোরণটির পাশেই উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো ঐতিহাসিক রোস্ট্রা। ফোরামের বক্তৃতা দেওয়ার জায়গা। মন চলে গেল সেই কলেজ জীবনে। ইংরেজির ক্লাসে জুলিয়াস সিজার পড়াচ্ছেন আর.পি.এস. (অধ্যাপক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত) – পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করা সিজারের উক্তি, 'Cassius has a lean and hungry look, He thinks too much. Such men are dangerous. ....He is a great observer and he looks quite through the deeds of men. He loves no plays. As thou dost, Anthony, He hears no music, Seldom he smiles.' মনে পড়ে মার্ক অ্যান্টনির বিখ্যাত ভাষণ কিংবা ব্রুটাশের মুখে Not that I loved Caesar less, but I loved Rome more.

রোস্ট্রা কেবল বক্তৃতার জায়গাই ছিল না। এখানে টাঙানো হতো নানা সরকারি বিজ্ঞপ্তি। সিজার হত্যার পর এখানেই টাঙানো হয়েছিল হত্যাকারীদের নামের তালিকা যেখানে ছিল বাগ্মী ও পণ্ডিত সিসেরোর নাম। সিসেরোকে মার্ক অ্যান্টনির নির্দেশে হত্যা করে তাঁর মাথা ও ডানহাত কেটে এই রোস্ট্রাতে টানিয়ে রাখা হয়েছিল। অ্যান্টনির প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিসেরো কলম ধরেছিলেন। এটা তারই পুরস্কার। জুলিয়াস সিজার বা রোমের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি যুগে যুগে দেশে দেশে ঘটে চলেছে। এই ইতালিতে যেমন মুসলিনীর মৃতদেহকে গুলিবিদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। তেমনই ঘটেছে চীনে অতিসম্প্রতি কারাবন্দি নোবেল জয়ী লেখক লিউ জিয়াবাওয়ের মৃত্যু, যা সলঝেনিৎসিন রচিত ক্যানসার ওয়ার্ডের বাস্তবায়ন বলা যায়। ঝিয়াবাও ও সিসেরোর মতো বলেছিলেন, The mentality of enmity can poison a nation's spirit.

ফোরাম যেন তার ইতিহাসকে সিন্দুক থেকে একটা একটা করে উন্মুক্ত করছে। হাতে ফোরামের চিত্র সম্বলিত তথ্য মিলিয়ে আবিষ্কার করি টেম্পল অফ স্যাটার্নকে, যা আজ সেনেটের দিকে মুখ চাওয়া একসার আয়নিক থাম মাত্র। এর বয়স এথেন্সের পার্থেননের কাছাকাছি। ক্ষমতায় এসে সিজার এই মন্দির থেকে নাকি পনেরো হাজার সোনার বার, তিরিশ হাজার রূপোর বার ও তিনশো কোটি মুদ্রা লুঠ করে দেশের আর্থিক অবস্থাকে সামাল দেন। দেবস্থানে সোনা বা মুদ্রা সবদেশেই সঞ্চিত হয়। ভারতবর্ষও ব্যতিক্রম নয়। কেবল জানা যায়নি গজনীর মামুদ বার বার সোমনাথের সম্পদ লুণ্ঠন করে কোন অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্য এনেছিল। এযুগে অনেক ব্যাঙ্কের লোগোতেও এই ভেসপেসিয়ান তথা টেম্পল অফ স্যাটার্নের ছবি মেলে।

এই ফোরামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আর এক শাসকের নাম। সেটি হল ক্যালিগুলা, যাঁর রাজত্বকাল মাত্র চার বছরের (৩৭-৪১ খ্রিস্টাব্দ)। তার পাগলামোর জুড়িমেলা ভার। তিনি ব্যাসিলিকার ছাদ থেকে সোনা রুপোর মুদ্রা ছুঁড়ে আনন্দ পেতেন। সেই মুদ্রা কুড়োতে গিয়ে নাকি ৩২ জন পুরুষ ও ২৪৭ জন নারী প্রাণ হারায়। একবার তিনি একটি ঘোড়াকে রোমের কনসাল পদে বসান। জীবিতকালেই নিজের পুজোর জন্য একাধিক মন্দির নির্মাণ করেন। রাজপ্রাসাদের সৈনিকদের হাতে ক্যালিগুলার মৃত্যু হয়।

ক্যালিগুলার পর রোমে ক্ষমতায় আসেন ক্লডিয়াস (৪১-৫৪ খৃঃ) তারপর নিরো (৫৪-৬৮ খৃঃ)। অন্ধ খ্রিস্ট বিরোধী নিরো নামটির সঙ্গে নিষ্ঠুরতা সমার্থক। সম্রাট আকবরের মতো অল্প বয়সে ক্ষমতায় বসলে তার বিমাতাই নাকি রোমের কার্যকর কর্ত্রী ছিলেন। পরে নিরো সেই ধাত্রীকেই হত্যা করেন। অপরিণত নিরোর ক্ষেত্রে বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁর শিক্ষক সেনেকা। নিরো ৬৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিস ভ্রমণে যান। গ্রিকরা ছাড়া কেউ সেই সময় প্রাচীন অলিম্পিকের আসরে অংশ নিতে পারতো না। তবুও তিনি অংশ নেন এবং সব ইভেন্টেই তাঁকে বিজয়ী ঘোষণা করার কারণে পরের বছরেই গ্রিসের স্বাধীনতা ঘোষণা

করেন। তিনি কুটনীতি, বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী ছিলেন। এমনকি অভিনেতা, কবি, যন্ত্রী ও রথ চালকের ভূমিকায় অংশ নিতেন। তাঁর শাসনকালে রোমের অগ্নিকান্ড ও সেই সময় তাঁর বেহালা বাদনের কথা কার না জানা। এই অগ্নিকাণ্ডের প্রশ্নে একমত হলেও তাতে নিরোর ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। ৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮-১৯ জুলাই প্রথমে সার্কাস ম্যাক্সিমাসে আগুন লাগে এবং সাতদিন ধরে অগ্নিকাণ্ড চলে। ভয়াবহ এই অগ্নিকান্ডে অসংখ্য গৃহ, নাগরিক বসতি, মন্দির ভস্মীভূত হয়। প্লিনি (অগ্রজ)। স্যুয়েটোনিয়াস এবং ক্যাসিয়াস ডিয়োর মতো ঐতিহাসিকরা এই ঘটনার জন্য নিরোকে অভিযুক্ত করে বলেন ঐ সময় তিনি মঞ্চ অভিনেতার পোষাকে Sack of Ilium সঙ্গীত গেয়েছিলেন। এটি গ্রিক ভাষায় হারিয়ে যাওয়া এক মহাকাব্য যা পদ্যে গাওয়া হত। ঐ অগ্নিকান্ডের প্রাচীনতম ও প্রধান ঐতিহাসিক সূত্র হিসেবে টাসিয়াসকে ভাবা হয়। টাসিয়াসের মতে নিরো তখন অকুস্থলে ছিলেনই না, ছিলেন অ্যান্টিয়ামে। আগুনের সংবাদ পেয়ে তিনি রোমে ফিরে এসে ত্রাণকার্যে লেগে যান। নিজের প্রাসাদ খুলে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন দেন। পরবর্তীকালে তিনি নতুন প্রসাদ গড়েন। টাসিয়াস বলেছেন নিরো বিশ্বাস করতেন এটা খ্রিস্টানদের কাজ। খ্রিস্টানদের প্রতি তাঁর নিষ্ঠুরতা ছিল মাত্রাছাড়া। হিংস্র পশুর মুখে ফেলে, ক্রুশে ঝুলিয়ে এমনকী জীবন্ত দগ্ধ করে নিরো তাদের হত্যা করতেন। অগ্নিকাণ্ডের কারণ যাই হোক, জনতার রোষকে প্রতিহত করতে না পেরে নিরো আত্মহত্যা করেন।

নিরোর পর রোমে ভেসপেসিয়ান, টাইটাস, ট্রাজান হেড্রিয়ান প্রমুখ শাসক ক্ষমতায় আসেন। অবশেষে কনস্ট্যানটিনের শাসনকালে (৩২৪-৩৩৭) রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্ম রাজধর্মের মর্যাদা পায়। সেই সঙ্গে বিশাল সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হলে বাইজান্টিয়ামে গড়ে ওঠে দ্বিতীয় রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পতন হয় রোমের।

খ্রীঃপূঃ ৭৫৩ তে একটি গ্রামে যে রোমের পত্তন হয়েছিল ৭২৩ বছর পর তার বর্ণময় ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটলেও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য রমরমিয়ে চলেছিল বহু দিন। অবশেষে তাকে ১৪৯৩ তে অটোমান তুর্কের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়।

প্রজাতান্ত্রিক রোমের প্রতীক ফোরাম থেকে কয়েক পা গেলেই রোমানদের আদিম বিনোদন ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক কলোসিয়াম। ভিয়া ইম্পিরিয়ালি সোজা পূর্ব দিকে এসে এখানেই শেষ হয়েছে। স্কুল জীবন থেকে ছবিতে এই ইমারতের সঙ্গে পরিচিত। তবুও চিনের প্রাচীর, পারীর আইফেল বা আগ্রার তাজের মত অভিভূত না হয়ে থাকা যায় না।

রোমান স্থপতিদের অসাধারণ কীর্তি এই কলোসিয়ামের বাইরের গঠন অভূতপূর্ব। চারতলা এ্যাম্ফি থিয়েটারটির তিনতলা থাম ও আর্চের সমন্বয়ে তৈরি। একতলার থামগুলি ডোরিক, দোতলায় আয়োনিক আর তিনতলায় করিন্থিয়ম থাম। চতুর্থ তলায় আর্চ নেই, শুধুই থাম আর ইঁটের গাঁথনি। যে কলোসিয়ামের বাহিরাঙ্গের এত আকর্ষণীয় রূপ তার ভিতরে যে কী ভয়ংকর দৃশ্য চলতো তা কল্পনা করা কঠিন।

নিষ্ঠুর সম্রাট নিরো তাঁর স্বর্ণ প্রাসাদ নির্মাণকালে সন্নিহিত অংশে যে বিশাল কৃত্রিম জলাশয় বানিয়েছিলেন ভেসপেসিয়ান সেই জলাশয় বুজিয়ে ৭০ খ্রিস্টাব্দে এই ফ্লেভিয়ান অ্যাম্ফি থিয়েটারের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। এটা অনেকটা লাসা দখলের পর গ্রেট পোতালা প্রাসাদের দক্ষিণে অবস্থিত বিশাল জলাশয় বুজিয়ে মাও জে দঙের লাসা স্কোয়্যার বানানোর মত।

ভেসপেসিয়ান ছিলেন বুদ্ধিমান সম্রাট। অত্যাচারী নিরো জামানার পর দশলক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়া রোমের জনগণের মধ্যে জীবন জীবিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ। পরজীবী অর্থনীতিতে কাজের খুবই অভাব। সম্রাট জনগণকে তুষ্ট করতে খেলা, মেলা, সার্কাস প্রভৃতি আয়োজন করলেন। সেই সঙ্গে হাত দিলেন এই বিশাল অ্যাম্ফিথিয়েটার নির্মাণকার্যে। ভেসপেসিয়ান অবশ্য এই কাজ শেষ করতে পারেননি। তাঁর পুত্র টাইটাসের শাসনকালে ৮০ খ্রিস্টাব্দে এটির উদ্বোধন হয়। অষ্টম শতক থেকে যা কলোসিয়াম নামে পরিচিত।

কলোসিয়াম যখন আমরা দেখতে এসেছি ঘড়িতে তখন দুপুর দুটো। প্রখর রোদের তেজে দাঁড়ানো দায়। এর বিশালত্ব থেকেই কলোসাস শব্দের জন্ম। পাশেই একটা হিলকের মতো জায়গায় নামমাত্র গাছের ছাওয়ায় রোদ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে কলোসিয়াম সংলগ্ন পারিপার্শ্ব অবলোকন করছি। টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকার ইচ্ছে করলো না। অনেকের মতো আমারও ধারণা ছিল কলোসিয়াম বৃত্তাকার ইডেন উদ্যান হবে। ট্যুরিষ্ট লিটারেচারে দেখলাম একদা কাঠের মেঝের ওপর গড়া এই আদিম বিনোদন কেন্দ্রের অ্যারেনা নানান স্তরের আসনে সমৃদ্ধ। তাই আর মনো জগতের ধারণাকে আহত করার ইচ্ছে হল না।

উপবৃত্তাকার এই এ্যাম্ফিথিয়েটারটি নির্মিত হয় ট্রেভারটিন নামের লাইমস্টোন ইঁট আর কংক্রিট দিয়ে। ইতালিয়রাই নাকি প্রথম কংক্রিটের ব্যবহার করে। এখানে ৭০০০০ দর্শকের বসার ব্যবস্থা ছিল। আমাদের বইমেলার মতো প্রবেশ ছিল অবাধ। গ্যালারিতে বসার ব্যবস্থায় রোমের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন ছিল পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত আসনে। সবার সামনে বসতো সেনেটররা। তারপর সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা। এভাবে সবার পিছনে ছিল সাধারণের অধিকার। চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের ট্র্যাপ ডোরের মত কায়দায় পশুদের আনা হত। তাদের মধ্যে ছিল সিংহ, লেপার্ড, হাতি, হায়না, গণ্ডার, ভল্লুক, জলহস্তি এমনকী উটপাখি পর্যন্ত। ইতিহাস জানাচ্ছে যখন একজন তিন সভ্যর পরিবারের রোমে গড়ে দৈনিক খরচ ছিল ছয় সেস্টারটি (মুদ্রা একক) তখন এই পশু বিনোদনের মাধ্যমে নরহত্যার খরচ ছিল গড়ে দেড় লক্ষ। অনুষ্ঠান হতো তিনটি পর্যায়ে। সকালে নানা সুর যন্ত্রানুষঙ্গে দু'জন রেফারি ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে গ্ল্যাডিয়েটররা ঢুকতো। এদের অনেকেই থাকতো মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত। শুরু হতো পশুদের সাথে লড়াই। অপরাধীরা ভূগর্ভে বেশ কিছুদিন থেকে প্রস্তুতি নিত। তারপর মুক্ত বাতাসের অ্যারেনায় আসত।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় প্রাণদন্ডে দণ্ডিতদের শাস্তি কার্যকর হতো। তারা পশুযুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকারি ছিল না। অপরাহ্নে হতো গ্ল্যাডিয়েটরদের সম্মুখ সমর। সেখানে নানাস্তরে হিটে অংশ নিয়ে

চূড়ান্ত স্তরে উঠতে হত। কখনো কখনো রোমানদের সাথে গলেদের যুদ্ধের অনুকরণ ছিল এই বিনোদনের মাধ্যম।

মনে মনে ভাবি, বান্দোয়ানের জঙ্গলে পায়ে ছুরি বেঁধে মোরগ লড়াইকে স্যাভেজ ইনস্‌টিক্ট বললে কলোসিয়ামের বিনোদনকে কী বলবো? মানুষ বোধ হয় আজও এক পাও এগোয়নি নইলে এ যুগে আউসভিস্ট, হিরোসিমা, পলপট, তিয়েন আন মেন ঘটবে কেন? মানুষের সভ্য হওয়াটা সত্যিই বহু শতাব্দীর রেনেসাঁ মনীষীর কাজ।

পথে গ্ল্যাডিয়েটরের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু লোক। পয়সার বিনিময়ে হাতে টিনের তলোয়ার, মেদুসার ছবিসহ ঢাল আর মাথায় সেকুটর মুখোশ পড়ে ছবি তোলার জন্য দাঁড়াবে। কেউবা কেবলই দীর্ঘ দেহী ভঙ্গিতে নীরবে বসে। সামনে রাখা কৌটো।

ইম্পিরিয়াল রোম ছেড়ে মনুমেন্টাল রোমের পথে অগ্রসর হই। লক্ষ্য ট্রেভি ফাউন্টেন। যৌবনে কপোত-কপোতি স্প্যানিশ স্টেপে আড্ডা দেবে না কিংবা ট্রেভিফাউন্টেনে কয়েন ফেলবে না ইউরোপে তা অনেকের কাছে অচিন্তনীয়। শহরের প্রধান গোয়েন্দা দপ্তরের গায়ে বেশ কিছু সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছে গেলাম ঝর্ণাতলিতে। ট্রেভি ফাউন্টেনের অবস্থান পিয়াৎসা ভেনেসিয়ার উত্তর-পূর্বে।

একেবারে কলকাতার ম্যাঙ্গো লেন – লায়ন্স রেঞ্জের মতো অঞ্চল। মাঝে মাঝে মনে হয় এদের যা কিছু কালজয়ী সৃষ্টি সবই শহরে। আমাদের ক্ষেত্রে খাজুরাহো, অজন্তা, সাঁচি বা শ্রবণবেলগোলারা সব ফার ফ্রম ম্যাডিং ক্রাউড। এমন এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে ট্রেভি ফাউন্টেনকে পাবো রোমান হলিডে দেখে মনে হয়নি। এক প্রাসাদের দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো নেপচুন, অসমতল ঢালে রয়েছে তার দুই রথ চালক। দুটি সমুদ্র – ঘোড়ার দৃপ্তভঙ্গি। পাহাড়ি প্রাসাদের গা বেয়ে জল জমছে এক ছোট জলাধারে। ধারে বেঞ্চ পাতা। ভ্রমণার্থীর ভিড়ে সুস্থভাবে দাঁড়ানো যায় না। এই শোলডার সিজনেই যদি এই হয়, পিক সিজনে না জানি কী হবে? দেওয়ালটিও নানা মূর্তি শোভিত। এই চিত্তাকর্ষক শিল্পটির রূপকার নিকোলো স্যালভি ও ব্রাচি। অনেকের সন্দেহ ফোয়ারাটির পরিকল্পনাকার বার্নিনি। যেই করুক, এটি দেখে মোহিত হতেই হয়। চারিদিকে এক উৎসবের মেজাজ। অনেকেই দেখছি জলের দিকে পিছন ফিরে পয়সা ফেলছে। তিনবার ফেললে নাকি আবার রোমে আসা হয়। সংস্কারটির জন্মদাতা/দাত্রী কে জানতে ইচ্ছে করে। ট্রেভি ফাউন্টেনে সন্ধ্যার পর এই পয়সা সংগ্রহে কোন টেন্ডার ডাকা হয় কিনা কে জানে।

ফাউন্টেনের উত্তরেই স্প্যানিশ স্টেপ। ভ্যাটিকানের স্প্যানিশ রাজদূতের বাসস্থান এখানে তাই এই নাম। সিঁড়ি উঠে, গিয়ে মিশেছে এক চার্চে। এখানকার ক্রুশ থেকে সদ্য নামানো ক্রাইস্টের প্রস্তর মূর্তিটি অসাধারণ। পাত্র পাত্রীদের শারীরিক ভাষা, অঙ্গের ভঙ্গি যেন জীবন্ত। এমন বিষয়কে নিয়ে গড়া মূর্তি এ পর্যন্ত যতো দেখেছি নিঃসন্দেহে বলতে পারি এটাই সেরা। চার্চ প্রাঙ্গণ থেকে স্প্যানিশ স্টেপের অপূর্ব দৃশ্য। শুনেছি এখানেই কোথাও নাকি কাফে 'গ্রেকো' অবস্থিত যেখানে একদা গ্যেটে, শপাঁ, রোসিনি থেকে কানোভা, হাগনারের মত প্রতিভারা নিয়মিত মিলিত হতো। আছে শেলি ও কিটসের সমাধিও। দুঃখের বিষয় এগুলো অদেখাই থেকে গেল।

পিয়াৎসা নভোনা। আয়তক্ষেত্রাকার এই মুক্তাঙ্গনটি অতীতে ডমিশিয়ানের স্টেডিয়াম ছিল। নাগরিকেরা জমা হতো নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা দেখতে। তিনটি ফোয়ারা এই স্থানটিকে রাতারাতি খ্যাতি এনে দেয়। তার মধ্যে মধ্যমণিটি রাজকীয় মর্যাদার দাবিদার। ফোয়ারা তিনটিই বারোক ভাস্কর্যের আদর্শে তৈরি। বারোক শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল গতি, ছন্দ ও অলংকরণের আধিক্য। রেনেসাঁ শিল্পে এসবের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকে। মাঝের ফোয়ারাটি বার্নিনির অসামান্য সৃষ্টি। এর নাম ফাউন্টেন অব রিভারস। এই ফোয়ারার

KALPATARU AGROFOREST ENTERPRISES (P) LTD.

(Leading Raw materials supplier to the Paper & Rayon Mills in India)

Head Office

22, Stephen House (II nd Floor)
56E, Hemanta Basu Sarani (Old 4E, B.B.D. Bagh)
Kolkata - 700001
Phone : 033-22430156 / 22485101 / 22311182
Fax : 033-22101238
E-mail : Kalptaru@cal.vsnl.net.in

Branch Office

"Panchvati",
2/517, Vijay Khand Gomti Nagar
Lucknow - 226010
Uttar Pradesh
Phone : 3021536

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group

UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD

AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.

RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People

HINDALCO INDUSTRIES LIMITED | AN ISO 9002 COMPANY HINDAL ALUMINIUM LIMITED | NALCO Aluminium Sheet Coil | ALOM Aluminium Extruded Section

503, **Kamalalaya Centre,** 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA
Fax : +91-33-2215 0455, 4050 3400
E-mail : alloy@cal3.vsnl.net.in **Website : www.alloyindia.com**
info@alloyindia.com

চারটি মুখ চার মহাদেশের চারটি নদীকে মর্যাদা দিয়েছে। এগুলি ইউরোপের ডানিউব, আফ্রিকার নীল, এশিয়ার গঙ্গা আর দুই আমেরিকার রিও ডি লা প্লেটা। অন্য দুটি হল ফাউন্টেন অব নেপচুন আর ফাউন্টেন অব মুর।

গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ও সূর্যের অস্তাভা স্তিমিত হওয়ার সাথে সাথে নভোনা তার রূপের মাধুরি বিচ্ছুরিত করে। ওপেন এয়ার রেস্তোঁরার রঙীন জমায়েত, ইজেল নিয়ে শিল্পীর ব্যস্ততা, চেলো ভায়োলিনের সুর মাধুর্য, মাউথপিস নিয়ে রক শিল্পীর নাচ, ফোয়ারার জলের শব্দ, প্রেমিক-প্রেমিকার ঘনিষ্ঠতা সব মিলিয়ে এক স্বপ্নের পরিবেশ। একথা বলতেই হয় At Navona Sunset brings unexpected magic. এই পিয়াৎসা যেন পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়োর বৃহত্তর সংস্করণ। নভোনা আর 'আমাদের' পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়ো যেন এপাড়া ওপাড়া। 'আমাদের' শব্দটা আপনা থেকেই এসে যায়। রোমকে কি নিজের ভেবে নিয়েছি? ক্ষতি কী? সারভেনতেস তো বলেছে When thou art at Rome, do as thy do at Rome.

নভোনার উৎসবয়তা কানায় কানায় পান করে আমরা ঘরের পথে। পিয়াৎসা ডি ক্যাপ্রিয়ো থেকে যে সংকীর্ণ পাথর বিছোনো গলিপথগুলো বেরিয়েছে তারই একটিতে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আমাদের বাসা। একটি ছেলে হাঁটু মুড়ে বসে স্পিরিট দিয়ে অদ্ভুত এক দক্ষতায় ছবি আঁকছে। পরনে গেঞ্জি, জিনস, মাথায় ক্যাপ, পায়ে স্পোর্টস স্যু। অতি দ্রুত মোটা কাগজে একের পর এক এঁকে চলেছে রোমের নানান দৃশ্য। কলোসিয়াম, পাহাড়ি নিসর্গে ঝরনা, চাঁদনি রাতে কোনো প্রাসাদ বা ব্যাসিলিকা। তাকে ঘিরে পর্যটকের জটলা। একটা ছবি শেষ হলে তারা করতালিতে অভিনন্দিত করছে শিল্পীকে। বিক্রিও হচ্ছে দশ বারো ইউরোতে এক একটা ছবি। শিল্প ছেড়ে শিল্পীকে জানার আগ্রহ বাড়ে। জানতে চাই তার উৎসভূমি। উত্তর পেলাম বাংলাদেশ। নাম শিখন আহমেদ। আবেগতাড়িত হয়ে জড়িয়ে ধরলাম। এখানেই আয়ত্ত করেছে এই শিল্পকে। নিজে থেকেই বলল, 'আপনাকে আমি একটা ছবি গিফ্‌ট করবো, কাল আসেন এই সময়।'

ফ্রেশ হয়ে রাত ন'টায় ইউসুফের দোকানে ডিনার সারতে যাই। সামনেই তার ফাস্টফুড কাম স্টেশনারি দোকান। ইউসুফ বাংলাদেশি। বছর আটেক রোমে আছে। কাজ চালানোর মত ইটালিয়ান জানে। সকালেই আলাপ হয়েছে। রমজান মাস চলছে বলে সন্ধ্যার পর এক বাংলাদেশি ক্যাটারার ওর মত বাঙালিদের দোকানে দোকানে ভাত, ডাল, সবজি, মাছ দিয়ে যায়। একথা শুনেই অর্ডার দিয়েছি। প্রায় পনেরো দিন পর পেটে ভাত পড়বে।

কাউন্টার ছেড়ে ইউসুফ দোকানের অভ্যন্তরে এসে গল্পে মাতে, তখন কাউন্টার সামলায় তার বন্ধুর ভাগনা বাবলু। বছর পনেরোর কিশোর, তিনবছর বয়স বাড়িয়ে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে চলে এসেছে। পড়াশোনাটা ছুতো। নিজেই বলে মেয়াদ শেষে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণ দেখিয়ে আছে। বাবলুর স্বপ্ন এখান থেকে জাপানে যাবে। সেখানেও নাকি ওর জামাইবাবুর ব্যবসা আছে। ভিসা বানাতেই তার প্রথম কলকাতা দেখা। মনে মনে ভাবি সঙ্গী রাজীবকে এক মাসের ট্যুরিস্ট ভিসা পেতে কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি অথচ বাবলুরা কতো সহজেই ইতালীয় হয়ে যায়।

ইউসুফের দোকানে কাজী নজরুলের ছবি। নজরুলকে সে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করে। সেই সঙ্গে ক্ষোভের সঙ্গে বলে ২৫ ডিসেম্বরে এখানে নাকি গির্জায় লোকে যতো না যায় তার চেয়ে বেশি মাতে পিয়াৎসার ফুর্তিতে। প্রসঙ্গত জানালো কাল উৎসবের আবহ তৈরি হবে আমাদের এই পিয়াৎসায়, কারণ কাল শনিবার।

It is impossible to believe in God
like it's impossible not to believe in him.
Voltaire

আজ গোটা দিনটা দেবো ভ্যাটিকানকে, রাতটা কাটাবো পিয়াৎসার ফিয়েস্টায়, কারণ অদ্য শেষ রজনী। নিজেদেরই ভুলে অনেকটা দক্ষিণে গিয়ে নদীর পশ্চিম পাড় বরাবর রাস্তা ধরে উত্তর দিকে হাঁটতে থাকি। লাভের মধ্যে টাইবারকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া গেল।

চিনারের মত প্রবীণ বৃক্ষের পরিকল্পিত সৌন্দর্যায়নের চিহ্ন পুরো রাস্তা জুড়ে। নদীকে ডান হাতে রেখে গাছের ছায়ায় অনেকটা পথ হেঁটে পন্টে উম্বেতো সেতু। এই নদীতীরবর্তী পথটুকু ছাড়া রোম নগরীতে তেমন সবুজ চোখে পড়লো না। ভার্গেস উদ্যানকে বাদ দিলে পাথরে মোড়া এ নগরীর আনাচে কানাচে একটাই গাছ, তার নাম স্টোন পাইন বা মাসরুম পাইন। লম্বা নিষ্পত্র কাণ্ডের মাথায় অনেক ওপরে ছাতার মত পাতার সমাবেশ।

কিছুটা গিয়ে সমীপবর্তী হই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম রাষ্ট্র ভ্যাটিকানের। সুউচ্চ পাঁচিলে ঘেরা ১০০ একরের দেশ ভ্যাটিকান। শাসক একজনই, তিনি হলেন সমগ্র ক্যাথলিক বিশ্বের পোপ। দেশের সর্বশেষ জনগণনায় দেশের জনসংখ্যা ৫৯৪ জন। যার মধ্যে যাজক ৩০৭ জন এবং সুইস গার্ডের সংখ্যা ১০৯। এদেশের জন্য রয়েছে পৃথক পতাকা, ডাকটিকিট, জাতীয় সঙ্গীত। মনের মধ্যে চিনচিনে টেনশন, না জানি কত লম্বা লাইন পড়বে। অবশেষে দাঁড়িয়ে গেলাম টেইল এন্ডে। কিছু সময় অন্তর বুকে ঝোলানো পরিচয় জ্ঞাপক কার্ড নিয়ে হাজির হচ্ছে বাংলাদেশের যুবকেরা। বাড়তি কিছু খরচ করলে স্থানীয় ট্যুর কোম্পানির মাধ্যমে সহযেই ভ্যাটিকানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেবে।

ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল পোপের দেশে প্রবেশ করতে। পাগান যুগে রোমান নেক্রোপলিসের ওপর গড়ে উঠেছে ষোড়শ শতকের গোড়ায় এই ভ্যাটিকান। এখানেই ছিল নিরোর বাগান। ৬৪ খ্রিস্টাব্দে আরো অনেকের সঙ্গে সেন্ট পিটারকে উল্টোনো ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় এখানেই। পরবর্তীকালে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের হাতে পত্তন হয় ভ্যাটিকান মিউজিয়ামের।

বিমানবন্দরের ব্যস্ত লাউঞ্জের মতো ভ্যাটিকান গ্যালারির মূল প্রবেশ দ্বারে প্রবেশ করা মাত্রই এক পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় দর্শনার্থীকে যেতে হয়। তার অন্যথার কোন উপায় নেই। এখানে প্রবেশের আগে এই সংগ্রহশালার বিশালত্ব সম্পর্কে গড়ে ওঠা ধারণা প্রবলভাবে ধাক্কা

খেল। ল্যুভের, ব্রিটিশ মিউজিয়াম বা উফিজি দেখা সত্ত্বেও বলতেই হয় ভ্যাটিকান ভ্যাটিকানই।

এখানে সর্বমোট ৫৪টি গ্যালারি আছে। যার অন্যতম হল সিসটিন চ্যাপেল। বছরে ৬০ লক্ষর বেশি দর্শক সমাগম হয়েছে এখানে ২০১৬ তে। এক ব্রোশিওরে বলা আছে এই সংগ্রহশালাটি পরিদর্শনের সেরা উপায় হলো সব দেখার চেষ্টা না করা। কারণ, প্রদর্শন পথের সর্বমোট দৈর্ঘ্য হল সাত কিলোমিটার। তাই প্রথমেই ঠিক করে নেওয়া ভালো কী কী বিশেষ করে দেখতে চাই। বর্তমান আন্তর্জাল মাধ্যম এ বিষয়ে মস্ত বড়ো সহায়। সব কিছু দেখা এক মাসেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। আমরা তেমন ভাবেই প্রস্তুত হয়ে প্রবেশ করলাম।

প্রথম দিকের কক্ষগুলোতে প্রাচীন গ্রিস ও রোমের অমূল্য সব ভাস্কর্য প্রদর্শিত। বহু বিলুপ্ত গ্রিক ভাস্কর্যের রোমান প্রতিমূর্তির মধ্যে বেঁচে থেকেছে ইতিহাস। এমন একটি শিল্পকর্ম হল লাওকুন। উফিৎসিতেও এই শিল্পকর্ম দেখেছি। জানুয়ারি ১৪, ১৫০৬ সালে এটি রোমের এক দ্রাক্ষাকুঞ্জে মাটির তলায় পাওয়া গেলে গুলিয়ানো এবং মাইকেল এঞ্জেলোকে ডেকে তাদের কথামত পোপ সেই ভাইনইয়ার্ড কিনে নেন। এই শিল্পকর্মটি দিয়েই এই সংগ্রহশালার যাত্রাশুরু।

এখানকার অ্যাপোলো ডেল বেলভেডেরের গ্রিক ভাস্কর্যটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। অ্যাপোলো একজন তিরন্দাজি দেবতা হিসেবে গ্রিস ও রোমে সমান ভাবেই পূজিত ছিল। এক নিখুঁত পুরুষ মূর্তির মর্যাদা পেয়েছে এটি শিল্পবেত্তাদের কাছ থেকে। সম্রাট নেপোলিয়নের অত্যন্ত প্রিয় ভাস্কর্য ছিল এটি।

এই মিউজিয়ামের অন্যতম প্রধান গর্বের হল মিশরীয় কক্ষটি। অসংখ্য প্রস্তর ভাস্কর্যর সাথে একের পর এক মমির সমাবেশ স্তম্ভিত করে দেয়।

গ্রিক ভাস্কর্যের হলটি অতীতে পোপের প্রধান অতিথি আপ্যায়নে ব্যবহৃত হত। সেখান থেকে টেপস্ট্রি হলের অপার্থিব সৌন্দর্য ধরা দেয়। দর্শন পথে আপনা থেকেই এখানে দর্শনার্থীকে আসতে হবে। এখানকার থ্রি-ডাইমেনশনাল চিত্রগুলো মোহিত করে। রেজারেকশান অব ক্রাইষ্ট শিল্পকর্মটি পশম, সিল্ক, সোনা ও রুপোর সমন্বয়ে গড়া। এরকম অসংখ্য চিত্র বছরের পর বছর ধরে শিল্পীরা গড়েছে। দর্শক যতক্ষণ এই কক্ষে এগোবে মোনালিসার মত জেসাসও তার দিকেই তাকিয়ে থাকবে। ফ্লেমিশ টেপস্ট্রির এই অলঙ্করণের অনেকগুলোই রাফায়েলের ছাত্রদের সৃষ্টি। এক একটি চিত্রের ব্যাপ্তি ও সোনালি রঙের বিচ্ছুরণ যেন সোনার চাঁদোয়া বিছিয়ে রেখেছে সুদীর্ঘ হলটির অর্ধবৃত্তকার সিলিঙে।

ট্যাপস্ট্রি হল ছেড়ে প্রবিষ্ট হই ম্যাপস গ্যালারিতে। একই রকম অতিকায় এক একটি প্রাচীন মানচিত্র দেওয়াল জুড়ে আঁকা। বেশিরভাগই ইতালি ও রোম সাম্রাজ্যের। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ইতালিয় সন্ন্যাসী ইগনাজিও দান্তির নিখুঁত ও নিপুণ সৃষ্টি এগুলি। স্পষ্ট দৃশ্যমান পর্বত শ্রেণী থেকে সমুদ্রের নৌকো পর্যন্ত।

একটি কক্ষে মুখোমুখি হই সেই গ্রিকো-রোমান হেলেনিস্টিক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য 'ফেডেলে'র সাথে। ইতালিয় ভাষায় 'ফেডেলিনো'। এখানে একটি বালক পা থেকে কাঁটা তুলছে। ফ্লোরেন্স এবং ল্যুভেরেও এটি দেখা যায়। রয়েছে রঁদ্যার দ্য থিংকার।

এক সময় এসে উপস্থিত হই অক্টাগোনাল কোর্টইয়ার্ডের খোলা আকাশে। চারদিকে নীরব ভাস্কর্যের সমাবেশ। দু'দণ্ড জিরোনোর এহেন শিল্প সমারোহ যেন পরিকল্পনা করেই বানানো। তা না হলে সিস্টিন চ্যাপেল পরিদর্শনের জন্য মন ও চোখ প্রস্তুত হবে না।

এর পরেই যে দ্রষ্টব্যটি অভিভূত করে সেটি হল সালা রোটান্ডার বিশাল বৃত্তাকার বেসিন। এটি নিরোর স্বর্ণ প্রাসাদে ছিল। চল্লিশ ফুট পরিধির এই পাত্রটি Porphyry Basin নামে খ্যাত। এটি Igneous Rock দিয়ে তৈরি। যা কিনা লাভা শীতল করে বানানো। এই পাথর যেমন শক্ত তেমনই কাটা কঠিন এবং অবিশ্বাস্য রকম ভারী। এহেন বস্তুটি সুদূর মিশর থেকে আনার ও বানানোর মেহনত আক্ষরিক ভাবেই হারকিউলিসের কর্ম। এটির অন্য আর এক রহস্য হলো এর রঙ, যাকে গ্রিক ভাষায় পার্পল বলা হয়।

এর পর কিছু আধুনিক পেইন্টিং দেখে সংকীর্ণ পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করলাম বিস্ময় ও সম্ভ্রম জাগানো সিস্টিন চ্যাপেলের ঐশ্বর্যের খনি রাফায়েল রুমে। এখানে এসে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসকে মনে পড়ে। জুলিয়াস দ্বিতীয় (কার্যকাল ১৫০৩-১৫১৩) শিল্প সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি সেন্ট পিটার্স গির্জার জন্য স্থপতি ব্রামান্তে (১৪৪৪-১৫১৪), সিস্টিন চ্যাপেল আঁকার জন্য মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৬৪) এবং ভ্যাটিকান লাইব্রেরির (স্ট্যাঞ্জা দেল্লা সেগ্নাচুরা) চারটি দেওয়াল অলঙ্কৃত করার জন্য রাফায়েলকে (১৪৮৩-১৫২০) দায়িত্ব দেন।

দেওয়াল চিত্রের বিষয় অনুসারে ঘরগুলির নামকরণ করা হয়েছে। অভিভূত, বিহ্বল, বিভ্রান্ত ট্যুরিস্টদের মধ্যে একজন হয়ে রাফায়েল রুমে ঢুকে কালচার শকে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হই। বিশাল বিশাল দেওয়াল জোড়া বিষয় ভিত্তিক শিল্পকর্মগুলো দেখে মনে পড়ল অজন্তা দর্শনের কথা। এই ভ্যাটিকানের চেয়ে ১২০০ বছর আগের অজন্তাও ইউরোপের আবিষ্কার। রাফায়েল, অ্যাঞ্জেলোরা অজন্তা-ইলোরা দেখলে বিশ্বের শিল্প সভ্যতা কী আকার নিতো কে জানে?

চিত্রগুলোর ভয়ংকর রকম জোরালো আবেদন বাস্তবকে ভুলিয়ে দেয়। প্রতিটি চিত্র দেখলেও নিরিক্ষণ করলাম দুটি চিত্র। একটি ট্রান্সফিগারেশন, অন্যটি স্কুল অব এথেন্স। বিশ্ববিখ্যাত ও বহু আলোচিত শিল্পকর্ম দুটি বাকরুদ্ধ করে দেয়। ট্রান্সফিগারেশান কাজটি মৃত্যুর আগে রাফায়েলের শেষ সৃষ্টি। ম্যাথুর বাণীকে ভিত্তি করে এটি বানানো। হাল্কা রঙে উপরের অংশে জেসাসকে স্বাগত জানাচ্ছে এলিজা ও মোজেস। নিচে গাঢ় রঙে পৃথিবীর মানুষজন। বামদিকে নয়জন শিষ্য, যাঁরা পাহাড়ে আরোহণ করেননি। নীল পোশাকের মানুষটি সম্ভবত ম্যাথু। চিত্রটির একঅংশ স্বর্গীয় শোভায় মণ্ডিত অন্য অংশে পার্থিব দৃশ্য বর্ণিত। চিত্রশিল্পের ভাষায় বলা হয় এই চিত্রটি ১৫০০ শতাব্দীর হাই রেনেসাঁ ও ১৬০০ শতকের বারোক কীর্তির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। দু'পাশে রাফায়েলেরই আঁকা দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট শিল্পকর্মের মাঝে এই বিখ্যাত চিত্রটির উজ্জ্বল উপস্থিতিই নাকি অ্যাঞ্জেলোকে তাঁর লাস্ট জাজমেন্ট সৃষ্টিতে

অনুপ্রাণিত করে।

দ্য স্কুল অব এথেন্স ছবিটি সিগনেচুরার পূর্ব দেওয়াল জুড়ে আঁকা। দুশো ইঞ্চি বাই দুশো ইঞ্চি মাপের এই ফ্রেস্কো সৃষ্টির সময়কাল ১৫০৯-১৫১১ খ্রিস্টাব্দ। ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মাইকেল অ্যাঞ্জেলো তখন ব্যস্ত সিস্টিন চ্যাপেলে। কেবল পোপ নয়, যুগ যুগ ধরে এই মেধাবী ছবিটি শিল্প রসিকদের তারিফ পেয়ে এসেছে। ছবিতে অর্ধবৃত্তাকার কৌণিক আর্চের মাঝ বরাবর তর্করত অবস্থায় আগুয়ান গ্রিসের দুই মহান দার্শনীক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। সকলেই জানেন তাদের সম্পর্ক গুরু-শিষ্যের। পিছনে মাথায় বাঁদিকে কোণাকুনি অবস্থানে অ্যাপোলো ও ডানদিকে এথেনা। প্লেটোর হাতে স্বরচিত Timaeus আর অ্যারিস্টটলের হাতে নিকোমাচিয়েন (Ethics)। ইতালিতে এই দুই দার্শনিকের দর্শন নিয়ে চর্চা নতুন করে প্রাণ পেয়েছিল। কোসিনো দ্য মেদিচি (১৩৮৯-১৪৬৪) ফ্লোরেন্সে মার্সিলিও ফিকিনোকে (১৪৩৩-১৪৯৯) প্লেটোনিক একাডেমির দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অন্যদিকে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিয়েত্রো পম্পোনাজি (১৪৬২-১৫২৫) এরিস্টটল চর্চাকে আকর্ষণীয় উচ্চতায় নিয়ে যান। সুতরাং সঙ্গত কারণেই রাফায়েল এই দু'জনকে এই চিত্রে মধ্যমণি করেছেন।

প্লেটোর ডানদিকে অর্থাৎ ছবির বাঁদিকে সক্রেটিশ একদল লোককে কিছু বোঝাছে। তার নিচের জায়গায় মাটিতে বসে বই খুলে মগ্ন পিথাগোরাস। যে মানুষটি দাঁড়িয়ে হাতে কাগজ নিয়ে পিথাগোরাসকে দেখছেন তিনি হচ্ছেন দার্শনীক এপিকিউরাস, যাঁকে আনন্দের প্রথম তাত্ত্বিক ভাষ্যকার বলা হয়। ছবিটির ডানদিকে স্লেটে জ্যামিতির ছবি এঁকে বোঝাচ্ছেন ইউক্লিড। তাঁরই পিছনে হাতে গ্লোব নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে টলেমি। ছবিটির মাঝখানে সিঁড়ির উপর পা ছড়িয়ে বসে রয়েছেন সিনিসিজিমের উদ্ভাবক দার্শনিক ডায়োজেনেস।

এতজন জ্ঞানীর ছবি ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে একটা দেওয়ালে ফুটিয়ে তুলেছেন কিন্তু দমবন্ধ করা পরিবেশ তৈরি হয়নি। কারণ চরিত্রগুলি হাঁটে, আলোচনা করে, উত্তেজিত হয়, গা এলিয়ে দেয়, উঁকি মারে, লেখে। তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য, রঙ, দাঁড়ানোর ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি সব আলাদা। সর্বোপরি এই ৪৩ জন একটি শতকের নন। এঁরা নানা ঘরানারও। কেউ সফিস্ট, কেউ স্টোয়িক, কেউ স্কেপটিক, কেউ সিনিক, কেউ বা এথিস্ট।

এর আগে কোনও একটা ছবির জন্য এতটা সময় দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। রেনেসাঁর প্রখ্যাত হিউম্যানিস্ট ভাষ্যকার ফ্রাঞ্চেস্কো ফাইলেলহো (১৩৯৮-১৪৮১) যথার্থই বলেছিলেন, গ্রিসের মৃত্যু হয়নি। তার আত্মা রেনেসাঁসের ইতালিতে নতুন করে জেগে উঠেছে।

সিস্টিন চ্যাপেলের অন্য যে কক্ষটি সর্বাধিক দর্শক আকর্ষণ করে যাকে বাদ দিয়ে এই সংগ্রহশালা অর্থহীন সেটি হল মাইকেল অ্যাঞ্জেলো কক্ষ। জনসমাগম ল্যুভেরের মোনালিসার কক্ষটির সঙ্গে তুলনীয়। অন্য আর একটি বিষয়ে মিল হল এখানেই একমাত্র ক্যামেরা নিষিদ্ধ। দীপ্ত শিল্পকলা অন্তরের দেহলিতে যত খুশি ধরে রাখো। প্রহরী সতর্ক। তারই মধ্যে চেষ্টার শেষ নেই। সমগ্র সিলিং জোড়া বাইবেলের কাহিনি বর্ণিত। তার মধ্যমণি ক্রিয়েশন অব আদম। গুণমানে জনপ্রিয়তায় এই পৃথিবীতে যার জুড়িমেলা ভার। সুঠাম যুবা আদমের প্রসারিত হাত ঈশ্বরের প্রসারিত হাতের স্পর্শাকাঙ্খায় কাতর। ঈশ্বর এখানে একা নন। তাঁর আগলে রাখা কন্যাই কি ইভ? প্রতিটি দর্শক উর্ধ্বমুখ। এই সৃষ্টি অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। যথার্থই তা আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রায় ২১ মিটার উঁচুতে আঁকা এই চিত্রের প্রতিটি অংশ সহজেই দৃশ্যমান। কী অসামান্য বৈজ্ঞানিক মনীষা এই সৃষ্টিশীলতায় কাজ করেছে। বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। চিত্র বিশেষজ্ঞরা ঈশ্বরের মুখাবয়বে পোপের ছায়া খুঁজে পায়। একই ব্যক্তি যিনি ফ্লোরেন্সে ডেভিডের কারিগর এখানে তিনিই আদমের রূপকার। এক জায়গায় তার হাতে বাটালি হাতুড়ির আঘাত অন্যত্র তুলির পেলব স্পর্শ। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। শ্রদ্ধায় স্মরণে আসে আমাদের রামকিঙ্কর বেজ ও দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে। এরাও ছিলেন বাটালি ও তুলিতে সব্যসাচী।

এই বিশাল শিল্পকর্মটি শেষ করতে অ্যাঞ্জেলোর চার বছর সময় লেগেছিল। এতদিন ধরে মাচানে শুয়ে যে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় তিনি তাঁর শিল্পসত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তাকে সুপার হিউম্যান ছাড়া ভাবা যায় না। ঠাট্টা করে তিনি নাকি বলেছিলেন, চার বছর ধরে তাঁর সঙ্গী-সাথী ছিল শুধু দেওয়ালের ব্যস্ত মাকড়সারা। মাঝে মাঝেই পোপ গিয়ে অধৈর্য হয়ে জানতে চাইতেন কবে শেষ হবে? শেষের দিকে পোপের আচরণে ক্ষুব্ধ অ্যাঞ্জেলো ঘরে ফিরে ফ্লোরেন্স যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। তখন ক্ষমাপ্রার্থী পোপ দূতের মাধ্যমে কিছু অর্থ পাঠিয়ে দেন। অ্যাঞ্জেলো পোপকে ক্ষমা করেন, অর্থও গ্রহণ করেন, কিন্তু ফ্লোরেন্সের পথেও পাড়ি দেন।

চ্যাপেলের পিছনের দেওয়ালে রয়েছে এই বিরল প্রতিভার আর এক বিস্ময়কর সৃষ্টি লাস্ট জাজমেন্ট। এই চ্যাপেলের অন্য দেওয়ালগুলিও অন্যান্য কালজয়ী শিল্পীদের আঁকা ফ্রেসকো শোভিত। সেখানে বত্তিচেল্লি, সিনোরেল্লি, এঞ্জেলোর প্রথম শিক্ষক গিরলানডাইয়ো, র‍্যাফেলের শিক্ষক পেরুগিনো কে নেই?

ভ্যাটিকান মিউজিয়াম আর সিস্টিন চ্যাপেল দর্শনান্তে বাইরে এসে চমকের শেষ পদটি যেন অপেক্ষা করছিল। সেটা বিখ্যাত ভ্যাটিকানের সিঁড়ি। বৃত্তকার পথে এক শঙ্কুর আকৃতিতে নেমে গেছে। চোখ জুড়োনো পরিকল্পনায় নান্দনিক ছোঁয়া স্পষ্ট।

এসে দাঁড়াই সেন্ট পিটার ব্যাসিলিকার বিখ্যাত চত্বর পিয়াৎসা স্যান পিয়েত্রোতে। পাথুরে চত্বরটি ঘিরে রয়েছে থামের সারি। মাথার উপরে খর তপনের অগ্নিবানে বিদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হল ব্যাসিলিকায় ঢোকার লাইনে। এগারো বছর ধরে অসাধারণ পরিশ্রমে এটি গড়ে তোলেন বার্নিনি। কলামগুলির মাথায় একশো চল্লিশ জন সেন্টের মূর্তি। কলোনেড ঘেরা চত্বরে ইস্টারে, খ্রিস্টমাসে লক্ষ লোকের সমাবেশ ঘটে। চত্বরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে এক বিশাল ইজিপসিয়ান ওবেলিস্ক। রোমান সাম্রাজ্যে সর্বত্রই গ্রিস ও মিশরের দান চোখে পড়ার মতো। ক্যালিগুলা ৪০ খ্রিস্টাব্দে এটি আনেন। ১৫৮৬ তে এখানে লাল গ্রানাইটের এই বস্তুটিকে আনতে আটশো শ্রমিক ও একশো পঞ্চাশটি ঘোড়া লেগেছিল। থামগুলো যেখানে শেষ হয়েছে

সেখানেই জগদ্বিখ্যাত ব্যাসিলিকাটি দাঁড়িয়ে।

কষ্টকর সোয়াঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে যখন এই অনুপম শিল্পমন্দিরটিতে ঢুকলাম তখন এটি বন্ধ হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। লাইনে দণ্ডায়মান অনেকেই ঢুকতে পারেনি। ইতালির পাঁচ শ্রেষ্ঠ রেনেসাঁস শিল্পী ব্রামান্টে, র‍্যাফেল, পেরুৎসি, স্যাঙ্গালো ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলো এটি নির্মাণে নিযুক্ত হন ও কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রয়াত হন। অবশেষে শেষ হয় ১৬৬২ তে।

ব্যাসিলিকাটির সম্মুখে প্যানথিয়নের অনুকরণে রয়েছে আটটি থাম। ঢুকেই এক করিডোর। হলটির জাঁকজমকপূর্ণ রূপ চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

আমাদের অশেষ দুর্ভাগ্য, মাইকেল এঞ্জেলোর অন্যতম সেরা 'পিয়েটা' দেখা হল না। পিয়েটার অর্থ মৃত পুত্রের দেহ কোলে মা মেরীর শোকপ্রকাশ। এখানে দেখা হল কর্নাচিনির তৈরি শার্লম্যান ও বেশ কিছু মূর্তি। সেন্ট পিটারের শায়িত প্রতিরূপ। সমাধির উপর ব্রোঞ্জের চাঁদোয়া। লাল কাঠের অপূর্ব কারুকার্যময় স্তম্ভ।

সারাদিন ধরে মিউজিয়াম ও সিসটিন চ্যাপেল দর্শনের পর আমাদের শিল্প সৌকর্য গ্রহণ করার ক্ষমতাও তলানিতে পৌঁচেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শারীরিক ক্লান্তিতে এ এক নতুন স্তাঁধাল এফেক্টে তখন দু'জনেই আক্রান্ত। এই অস্বস্তিকর অনুভূতিকে আমি 'ভ্যাটিকান এফেক্ট' আখ্যা দিতে চাই। এখন আর কিছু না, চাই কোনো স্ট্রিট সাইড কাফেতে রিফ্রেশ হওয়া।

ভ্যাটিকান ছেড়ে আবার রোমে চলে আসি। ভিয়া কাভুর-এ এক জুতসই পথিপার্শ্বস্থ কাফেতে বসে ট্রাপিজিনো আর কাপুচিনো নিয়ে পরম তৃপ্তিতে দেখতে থাকি রোমের স্যাটারডে ইভনিং ফিভার। ভ্যাটিকান দর্শন করলে পোপেদের ভূমিকা সম্পর্কে আগ্রহ জাগতে বাধ্য। সমগ্র ইতালির ইতিহাসে পোপতন্ত্রের পুনরুত্থান ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, যেটা ১৪০০ থেকে ১৪৮৪ তে ঘটেছে। পঞ্চদশ শতকের শুরুতে রোম ছিল দীর্ঘ অবক্ষয়ের শেষ প্রান্তে। একদা বিস্ময় উদ্রেগকারী হর্ম্য, প্রাসাদ, সরকারি দপ্তর সব কিছুই ছিল ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলাকীর্ণ। আজকের রোমের যে কোন রাজপথে দাঁড়িয়ে তাকে কষ্ট কল্পনা বলে মনে হয়। যথার্থই রোম এক হিস্টোরিক্যাল পাওয়ার হাউস।

১৪২০ তে পোপ পঞ্চম মার্টিনের হাত ধরে পাপাল যুগ যখন নতুন করে ফিরে এল তখন উত্তর ইতালির নগর রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় রোম অনেক অনুন্নত। ১৪৪৭-এ টাসকানির পুরোহিত পোপ পঞ্চম নিকোলাস এর কর্মযজ্ঞে প্রভূত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন কোসিনো দ্য মেদিচি। নিকোলাসই প্রথম ভ্যাটিকান গ্রন্থাগার গঠন ও উচ্চমানের পঠন পাঠন শুরু করেন। ১৪৫৩ তে কনস্টানটিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতদের হাতে রক্ষা পাওয়া ও মালিকানাহীন প্রচুর বই নিকোলাস কিনে নেন। মাত্র আট বছরে এই পোপ প্রায় অসাধ্য সাধন করেন।

আবার পোপ চতুর্থ নিকসাসের সময় (১৪৭১) স্বজনপোষণ নতুন মাত্রা পায়। ভাইপো ভাগ্নারা এমনকি অবৈধ সন্তানেরাও পোপ হতে থাকে। এই চতুর্থ সিক্সাসের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য বৈপরিত্যও লক্ষ্য করা যায়। একদিকে তিনি মেদিচি পরিবারের এক সভ্যকে হত্যা করার চক্রান্তে যুক্ত হন, আবার তিনিই রোমের রাস্তাঘাট প্রশস্ত, আধুনিক, এমনকি বিশ্ববিখ্যাত ক্রিস্টিন চ্যাপেল নির্মাণের সূচনা করেন।

ঘরে ফেরার পথে দেখা গেল আমাদের পাড়ার পিয়াজা উইক এণ্ড কার্নিভালের আয়োজন চলছে। শিখন আমেদ তার দু'দুটো ছবি আমার জন্য রেখে দিয়েছে। টাকা কিছুতেই নেবে না। অনেক কষ্টে রাজি করানো গেল। দেখা হল এক সিরিয়ান যুবকের সঙ্গে। সকালেই তার দোকান থেকে দু'জোড়া দুল কিনেছি। অংশগ্রহণকারী থেকে পর্যটক উভয়েরই সংখ্যা আজ অনেক বেশি। সমগ্র ইউরোপ জুড়েই দেখলাম তারবাদ্য হিসেবে ভায়োলিন অসম্ভব জনপ্রিয়। কোনও কোনও শিল্পী নিজেদের সিডিও বিক্রি করছে। ফোয়ারার পাশে সুন্দর বসার আয়োজন। একেবারে পাশেই দুই কিশোর কিশোরী বিশ্রম্ভালাপে নিমগ্ন। আমরা ব্যস্ত বিশ্রামে। বড়ো জানতে ইচ্ছে করে এদের কি পরীক্ষায় A++ কিংবা অনার্স পাওয়ার চাপ আছে? এদের ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বা টেট পরীক্ষায় কি তৈলাক্ত বাঁশে বানরের ওঠানামা নিয়ে ভাবতে হয়, নাকি সহজেই অন্তত কোনও পাবে বিয়ারের মগ ভরার কাজ বাঁধা। পরক্ষণেই ভাবি এসব গবেষণা করে ভ্রমণের মানে হয় না। এ যেন ক্যাম্প ফায়ারের পরিবেশ। ইউসুফ ভাই বাবলুর হাত দিয়ে এক কার্টন ক্যান বিয়ার পাঠিয়ে দিয়েছে। নবজাগরণের ভূখণ্ড দর্শন আজ আমাদের সমে এসে থেমেছে। স্বভাবতই দুজনের মধ্যে এক সাফল্যের আনন্দ। ইচ্ছে করছে গলা ছেড়ে শুরু করি মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর 'ক্ষতি কী না হয় আজ...' কিংবা কিশোরকুমারের 'হাল ক্যায়সা হ্যায় জনাবকা।' বলা যায় না শ'খানেক ইউরো মিলে যেতেও পারে। চরিত্রের সঙ্গে না মিললে রবিঠাকুরের শরণাপন্ন হব। উনিতো বলেছেন তাঁর স্বভাবের দোষ এবং গুণ দুটোই ছিল সামঞ্জস্যহীনতা। তেমন বেচাল হলে অ্যাম্বুলেন্সতো আছেই। প্রতি উইক এন্ডেই স্থানীয় প্রশাসন সতর্কতা অবলম্বন করে অ্যাম্বুলেন্স তৈরি রাখে। তবুও ইমোশানকে রিজনের বল্গায় বাধঁতেই হয়। রাত কাটলেই বিমান ধরতে হবে।

একপক্ষকাল ধরে এই ইউরোপ আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা জীবনে অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাকবে। সাত বছর আগে ঢাকা চট্টগ্রাম দিয়ে যে যাত্রা শুরু, চীনের রেশম সড়কের এক বড়ো অংশে বিচরণ করার পর মার্কোপোলোর ভেনিস ছুঁয়ে রোমে এসে আজ তার সমাপ্তি। বিমানে যখন ইস্তাম্বুল, দামাস্কাস, বাগদাদ, তাব্রিজ বা পেশোয়ারের ওপর দিয়ে দিল্লি ফিরবো তখন বারবার মনে হবে এই সফরের মত স্বচ্ছন্দে, নিরাপদে যদি ওই শহরগুলোকেও দেখার সুযোগ পেতাম কি ভালোই না হতো।

ইউরোপের যে ভূখন্ডকে এই ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে তার নিসর্গ, ইতিহাস, শিল্প, সংগীত, মানুষ সব কিছুই আকর্ষণীয়। অনেক কিছুই দেখা হলো না, বিশেষ করে মিউনিখের ইংলিশ গার্ডেন এবং ইতালির পম্পেই। ইতালিকে জানতে হলে সময় নিয়ে ঘুরতে হয়, নয়তো ফিরে আসতে হয় বারে বারে। কিন্তু আমার কি দ্বিতীয় বার রোম দেখা হবে। আমিতো ট্রেভি ফাউন্টেনে কয়েন ফেলিনি।

প্রথম বিদুর

সন্দীপ চক্রবর্তী

দরজার পাল্লাদুটো যে বেজায় ভারী সেটা দূর থেকেই বোঝা যায়। ফ্রেমের ইঞ্চিছয়েক ওপরে লেখা 'শ্রীশ্রী কালিকাদেব্যৈঃ নমঃ'। ডানদিকের পাল্লার ওপর অপেক্ষাকৃত শহুরে চেহারার নেমপ্লেট। তাতে বাড়ির নাম লেখা— নারায়ণকুটীর। গ্রাম ও পোস্ট : গঙ্গাধরপুর, জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।

খোকনদা বলল, 'চৌকাঠটা একটু উঁচু। সাবধানে আসিস।'

ভেতরে বিশাল উঠোন। একধারে চারটে ধানের গোলা। আশ্চর্যের ব্যাপার প্রতিটি গোলায় ওই একই কথা লেখা— শ্রীশ্রী কালিকাদেব্যৈঃ

নমঃ। কৌতূহল হলো। বললাম, 'সব জায়গায় কালী ঠাকুরের নাম কেন খোকনদা?'

'আমরা তো মায়ের সেবায়েত। তাই সর্বত্র মায়ের নাম।'

বিদুর নেমপ্লেটটা মন দিয়ে দেখছিল। খোকনদার দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের একটা কালীমন্দির ছিল না?'

'ছিল কী রে! এখনও আছে। সব তোদের দেখাব। এখন ওপরে চল।'

উঠোনের তিনদিক জুড়ে দোতলা বাড়ি। একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত টানা বারান্দা। একেই বোধহয় চকমেলানো বাড়ি বলে। এরকম বাড়ি কলকাতায় এখনও দু-একটা আছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তাদের মধ্যে অন্যতম।

একটা বেশ চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দোতলায় পা রাখা মাত্র ছড়া কাটার শব্দ পেলাম। খোকনদা গলা তুলে বলল, 'টুকাই, মাকে খবর দে। কলকাতা থেকে কাকুরা এসে গেছে।'

সাত-আট বছরের একটা বাচ্চা ছেলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। খোকনদা বলল, 'আমার ছেলে, টুকাই।'

বিদুর বাচ্চা ভালোবাসে। টুকাইয়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বলল, 'তোমার ছড়াটা কিন্তু খুব সুন্দর। আমাদের একবার শোনাবে না?'

টুকাই কালবিলম্ব না করে ছড়া বলতে শুরু করল—

কালীঠাকুর কালীঠাকুর
নদী কোথায় বলো
কালীঠাকুর বলেন হেসে
পাতালদেশে চলো
চারটে ছাগল আসছে ছুটে
ঘাসের গন্ধ শুঁকে
নদীর বুকে ঘাস গজাল
ছাগল খাবে সুখে।

ছড়া শুনে বিদুর খুব খুশি। সমঝদার শ্রোতা পেয়ে টুকাইও উৎফুল্ল। পরে আরও অনেক ছড়া শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে গেল মাকে খবর দিতে।

আমি একটু অবাকই হয়েছিলাম। বললাম, 'এই ছড়া কার লেখা খোকনদা?'

'এ তো ছেলেভুলানো ছড়া। ছোটবেলায় আমিও বলতাম। গঙ্গাধরপুরের সব বাচ্চাই বলে। কার লেখা তা তো জানি না। কেন বল তো?'

'না, মানে টুকাইয়ের ছড়াতেও কালীঠাকুর আছেন তো, তাই!'

খোকনদা হো-হো করে হাসল। বিদুরও দেখলাম হাসছে।

যতই হাসিঠাট্টা করি মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি টের পাচ্ছিলাম। খোকনদা আমার আর বিদুরের কলেজের বন্ধু ধীমানের দাদা। ধীমানের অনুপস্থিতিই আমার অস্বস্তির কারণ। ওরও আসার কথা ছিল, কিন্তু অফিস থেকে ছুটি পেল না বলে আসতে পারল না।

অন্দরমহলে প্রবেশ করা গেল। খোকনদার স্ত্রী চৈতালী বৌদি দারুণ মিশুকে মহিলা। খোকনদার মুখে আমাদের পরিচয় পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এমন আপন করে নিলেন যে আমার অস্বস্তি কেটে গেল।

অতঃপর আমাদের জন্য নির্দিষ্ট একটা দক্ষিণ খোলা ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে গঙ্গাধরপুর রোড। রাস্তার ধারে ইটের তৈরি ব্যারিকেড। তার ওপারে অনেকটা খালি জমি পেরিয়ে একটা সরু খাল। খোকনদা বলছিল খালটার নাম গড়াই। একসময় গড়াই ছিল নদী। খালের দু'ধারের খালি জমি আসলে পুরনো নদীখাত। ভাগীরথীর শাখা নদী ছিল গড়াই। ভাগীরথী থেকে বেরিয়ে আবার ভাগীরথীতেই মিশে গেছে। মাত্র একশো বছর আগেও গড়াই ছিল ভরাট। ভাগীরথী সরে যাওয়ায় এখন তার এই হাল।

হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সিগারেট ধরালাম। বিদুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। কিছুক্ষণ পর ঘরে ঢুকে বলল, 'ধীমান ফোন করেছিল।'

'আমি ভাবছিলাম ওকে একটা ফোন করব। যাক, কিছু বলল?'

'বলল মন্দিরটা যেন অবশ্যই দেখি। পুজো দেবার কথাও বলল। এখানকার মা কালী নাকি খুবই জাগ্রত।'

কথাটা অদ্ভুত লাগল। খোকনদা বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু চাকরি না করে পৈতৃক জমিতে চাষাবাদ করে। পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠা করা মন্দিরের প্রতি ওর টান থাকা স্বাভাবিক। ধীমান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এখন বেঙ্গালুরুতে পোস্টেড। ওর ছাত্রজীবনের সবটাই কেটেছে হস্টেলে। মন্দিরের প্রতি ওর এই টান কোথা থেকে আসে আমার বুদ্ধির অগম্য।

'এখানকার সবাই এমন মন্দির মন্দির করে কেন বল তো?'

'কারণ, মন্দিরটা সাধারণ নয়।'

'তুইও এই কথা বলছিস!'

'একটু তলিয়ে ভাবলে তুইও বলবি। মন্দির বা মন্দিরের দেবী সাধারণ হলে তাকে নিয়ে ছেলেভুলানো ছড়া লেখা হতো না।'

এই সময় একটি অল্পবয়সি মেয়ে চায়ের ট্রে হাতে ঘুরে ঢুকল। পিছনে বৌদি। শুধু চা নয়, সঙ্গে লুচি আর আলুর তরকারি। বিদুর কালক্ষেপ না করে খাওয়ায় মন দিল।

গঙ্গাধরপুরে কালীমন্দির ছাড়া আর কিছু দেখার নেই বৌদি— আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বৌদি অবাক হয়ে বললেন, 'ও মা! সেকি কথা! আড়াইশো বছরের প্রাচীন কালীপ্রতিমা দেখতে আশপাশের গ্রাম থেকে রোজ কত লোক আসে জানো? তাছাড়া আমাদের মায়ের কাছে যা

চাইবে, তাই পাবে।'

'না, মানে, শুনেছিলাম এখানে পর্তুগিজদের কীসব কেল্লা-ফেল্লা আছে—'

'দূর! সেসব তো কবেই ভেঙেচুরে গেছে। একটা লাইটহাউস ছিল, তাও সুনামির সময় নষ্ট হয়ে গেছে। ওখানে এখন সাপের আড্ডা। খবরদার ওখানে যেও না।'

বিদুর খেতে খেলে বলল, 'খোকনদার মুখে শুনলাম মন্দিরের সেবায়েত আপনারা। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাও কি এই বংশের কেউ করেছিলেন?'

আমার মনে হলো বৌদি কী যেন বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'সেসব তোমরা দাদার কাছে শুনো। আমি ভালো বলতে পারি না।'

নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলাম। কাজের মেয়েটি এঁটো থালাবাসন নিয়ে চলে গেল। বৌদিও আর দাঁড়ালেন না।

'তোর প্রশ্ন শুনে বৌদির বডি ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ হয়ে গেল কেন বল তো?'

'তুইও লক্ষ্য করেছিস?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এর কারণ কী?'

বিদুর আমার কথার জবাব না দিয়ে টুকাইয়ের ছড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে বলল, 'ছড়াটা কিন্তু দারুণ।'

বুঝলাম কিছু বলবে না। ভাবনার রসদ পেলে ও এরকম আবোলতাবোল কথা বলে আলোচনা থামিয়ে দেয়। কিন্তু কী ভাবছে যথক্ষণ না ও বলছে জানার কোনও উপায় নেই।

।। দুই ।।

পরের দিন খোকনদার সঙ্গে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। বিশেষ করে সাতদিন যখন থাকব, তখন পরে কোনও একসময় গেলেই চলত। কিন্তু বিদুর নিজেই কথাটা তুলল। খোকনদা সানন্দে রাজি। আমিও আর এড়িয়ে যেতে পারলাম না।

নারানকুটীর থেকে হাঁটাপথে মন্দিরে যেতে মিনিট পনেরো লাগে। সাধারণ আটচালা ধরনের মন্দির। আড়াইশো বছরের প্রাচীনত্ব হয়তো আছে, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই। নিয়মিত সংস্কারের ছাপ সর্বাঙ্গে। এমনকী কামাখ্যা মন্দিরের মতো লাল রংটাও সম্ভবত মাস ছয়েক আগে করা হয়েছে। বিশেষত্বের মধ্যে একটা জিনিসই চোখ পড়ল। সেটা মন্দিরের দরজা। আগাগোড়া লোহার তৈরি। খোকনদা বলল, 'এই অঞ্চলে নবাবি আমলে যেসব মন্দির তৈরি হয়েছে, তাদের সবার দরজাই নাকি লোহার। প্রতিমার অলংকারের সুরক্ষার জন্য সম্ভবত এই ব্যবস্থা।'

'এটা কার স্ট্যাচু, খোকনদা?'

বিদুরের গলা শুনে পিছন ফিরলাম। এতক্ষণ খেয়াল করিনি মন্দিরের মূল ফটক থেকে ফুটদশেক দূরে এক অচেনা প্রৌঢ়ের আবক্ষ মূর্তি।

'ইনি আমাদের পূর্বপুরুষ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এখানকার লোক ওঁকে নারানঠাকুর বলে ডাকত।'

খোকনদাদের বাড়ির নেমপ্লেটটার কথা আমার মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তার মানে এর নামেই নারানকুটির!'

'হ্যাঁ।'

বিদুর পলকহীন চোখে মূর্তিটা দেখতে দেখতে বলল, 'কিন্তু একটা তিনফুটের স্ট্যাচুর জন্য এত বড়ো বেদী কেন?'

ব্যাপারটা সত্যিই অদ্ভুত। নারানঠাকুরের মূর্তির উচ্চতা তিন ফুটের বেশি হবে না। কিন্তু নীচের বেদীটি উচ্চতায় কমপক্ষে পাঁচ ফুট। চওড়াও ছ'ফুটের কম হবে না।

খোকনদা হেসে বলল, 'জানি না ভাই। যারা বানিয়েছিলেন তারা হয়তো জানতেন। আমি শুধু মাকে নিয়ে থাকি। আমার আর কিছু চাই না।'

মন্দিরের ভেতরে ঢুকলাম। মূল ফটক থেকে একটা প্যাসেজ ক্রমশ চওড়া আর ঢালু হয়ে একটা চাতালে শেষ হয়েছে। চাতালের দু'দিকে দুটি প্রদীপ জ্বলছে। মাঝখানে ভয়ালদর্শন কালীমূর্তি। প্রদীপের ম্লান আলোয় হঠাৎ দেখলে বেশ গা ছমছম করে।

বিদুর নৃতত্ত্বের ছাত্র। দেবদেবীর মূর্তি সম্বন্ধেও তার বিস্তর পড়াশোনা। মোবাইলের টর্চের আলোয় ভালো করে প্রতিমা দেখে ও বলল, 'খোকনদা, এই মূর্তি নিশ্চয়ই ওই নারানঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেননি?'

'না, না। নারানঠাকুর এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষের দিকের লোক। মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার অনেক আগে। তবে হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষেরাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।'

বিদুরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'কিন্তু আমি যতদূর জানি, এই ধরনের মূর্তি বাংলার ডাকাতরা পুজো করত।'

'তুই ঠিক বলেছিস। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ডাকাতই ছিলেন। আশপাশের গ্রামের অনেকে এখনও গঙ্গাধরপুরের কালীমন্দিরকে ডাকাতে কালীর মন্দির বলে।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও আমি এতটা অবাক হতাম না। খোকনদা খুবই সুপুরুষ। ধীমানকে তো রাজপুত্রের মতো দেখতে। মানুষ হিসেবেও দুইভাই চমৎকার। ওদের শরীরে ডাকাতের রক্ত বইছে, নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন।

মন্দিরের বাইরে এসে খোকনদা বলল, 'এই মন্দির কিন্তু পরে হয়েছে। পরে মানে সতেরোশো নব্বইয়ের পর।

মূল মন্দিরটা গড়াইয়ের ধারে। জঙ্গলের ভেতর। নতুন মন্দির তৈরি হবার পর থেকেই ওটা পরিত্যক্ত। কেউ আর যায়-টায় না। তবে মন্দির পরিত্যক্ত হলেও মূর্তিটা কিন্তু হয়নি। ওটা অরিজিনাল।'

বিদুল বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক। মূর্তিটা প্রোটো অস্ট্রলয়েড রীতির। ডাকাতদের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে যা বেশ মানানসই। কিন্তু মন্দিরটা রিজেকটেড হলো কেন?

'তার জন্য দায়ী একটা ঘটনা। তোরা কলকাতার ছেলে। তোদের সেসব শুনতে ভালো লাগবে না।'

রোমহর্ষক গল্পের সন্ধান পেয়ে তাড়াতাড়ি বললাম, 'ঘটনাটা যদি সত্যি হয় তুমি বলো।'

'আমরা মানে গঙ্গাধরপুরের লোকেরা ঘটনাটা সত্যি বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু এর কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। আমি শুনেছি বাবার মুখে। বাবা শুনেছিলেন দাদুর কাছে। গঙ্গাধরপুরের প্রতিটি মানুষ এইভাবেই এতদিন ঘটনাটার কথা জেনে এসেছে।'

দেখলাম বিদুরের চোখের মণিদুটো স্থির হয়ে গেছে। ওর একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল। ও বলে, আমাদের দেশের সব জনশ্রুতি মিথ্যে নয়। ভালো করে বিশ্লেষণ করতে পারলে অনেক জনশ্রুতির মধ্যেই ঐতিহাসিক উপাদান মেলে।

কাছেই একটা গোড়াবাঁধানো বটগাছ। আমরা আরাম করে বসলাম। খোকনদা রিল্যাক্সড ভঙ্গিতে শুরু করল।

সময়টা পলাশির যুদ্ধের দু-এক বছর পর। গঙ্গাধরপুর সবদিক থেকেই তখন কুখ্যাত। একে তো চারিদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। তার ওপর যে পনের-বিশ ঘর মানুষ বসবাস করে, তাদের বেশিরভাগই ডাকাত। গঙ্গাধরপুরের ডাকাতরা সে যুগের নিয়ম অনুযায়ী চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে যেত। আবার কখনও কখনও বিশেষ করে গরমের সময় সাঁড়ালের মাঠে অপেক্ষা করত। পালকি বা কোনও পথিক গেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ত। পুরো দলটাই ছিল লাঠিখেলায় ওস্তাদ। সেইসঙ্গে ফাঁস দিয়ে খুনও করতো। দূর থেকে ফাঁস ছুঁড়ে এমন কায়দায় টান দিত মুহূর্তের মধ্যে অসহায় পথচারী দম আটকে মারা যেত। নবাবি শাসন তখন শিথিল। কোম্পানির শাসনও ভালোভাবে চালু হয়নি। সুতরাং ধরা পড়ার সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। এসব তথ্য আমি পেয়েছি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আঞ্চলিক ইতিহাস থেকে। লেখক বৃন্দাবন দাস গঙ্গাধরপুরেরই লোক। পরে একদিন তোদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

আগেই বলেছি, আমার পূর্বপুরুষরা ডাকাতি করতেন। সবথেকে বড়ো কথা ডাকাত দলের সর্দার হতেন আমাদেরই বংশের কেউ। নিয়মটা করে দিয়েছিলেন পরেমশ্বর গুণিন। তিনি তখন এই অঞ্চলের নামকরা লোক। তন্ত্রসিদ্ধ জ্যোতির্মানব। যা বলেন তাই ফলে যায়। গণনা করে তিনি রায় দিয়েছিলেন আমাদের বংশের কেউ মাথার ওপর থাকলে ডাকাত দলের কোনও ক্ষতি হবে না। বাঁকিপুরে গুণিনের ভিটে এখনও আছে। প্রত্যেকবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে মেলা হয়।

পরমেশ্বর গুণিনের বেঁধে দেওয়া নিয়মেই সব চলছিল। তাতে বাদ সাধলেন কালী ডাকাতের ছেলে নারায়ণচন্দ্র। একটু আগে যার মূর্তি তোরা দেখলি। নারায়ণচন্দ্র জানিয়ে দিলেন তিনি ডাকাতি করবেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি মা কালীর ভক্ত। প্রায় সারাদিনই তিনি মন্দিরে বসে থাকতেন। মায়ের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেক চেষ্টা করেও ছেলেকে বাগে আনতে পারলেন না কালীডাকাত। অকালেই তার মৃত্যু হলো। নারায়ণচন্দ্র তখন বিবাহিত। ঈশানচন্দ্রের বাবা।

নারায়ণচন্দ্র সর্দার না হওয়ায় ডাকাত দল ভেঙে গেল। গঙ্গাধরপুর মূলত ডাকাতদের গ্রাম হলেও দু-এক ঘর কৃষক ছিল। তাদের মধ্যে একজন শ্রীমন্ত দাস। একটু আগে যে বৃন্দাবন দাসের কথা বললাম, উনি শ্রীমন্ত দাসের বর্তমান বংশধর। ... যাই হোক, শ্রীমন্ত ছিলেন সম্পন্ন চাষি। তারা বৈষ্ণব হলেও নারায়ণচন্দ্রের অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বলতে পারিস এই দুজনের চেষ্টায় ডাকাতরা লাঠি ফেলে লাঙল ধরল।'

আমি সাহিত্যের ছাত্র। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম, 'বলো কী! এ তো রেভেলিউশন।'

খোকনদা হাসল, 'তা তো বটেই। শ্রীমন্ত দাস উদ্যোগ নিলেন। জঙ্গল কেটে জমি চাষের উপযোগী করে তোলা হলো। পরের দুই দশকে গঙ্গাধরপুর হয়ে উঠল চাষিদের গ্রাম। ওদিকে নারায়ণচন্দ্রের জীবনেও ততদিন পরিবর্তন এসেছে। কালীসাধক হিসেবে তার নাম আশপাশের বিশটা গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন আর তিনি নারায়ণচন্দ্র নন, নারানঠাকুর। লোকে তাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর মানে। তাদের বিশ্বাস, তিনি ডাকলে স্বয়ং মা গঙ্গাধরপুরে অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু নারানঠাকুর জানেন, তিনি ঈশ্বর নন। তার জীবনেও শোকতাপ আছে। যক্ষ্মারোগে একমাত্র পুত্র ঈশানচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে। বাড়িতে লোক বলতে বিধবা পুত্রবধূ পার্বতী এবং পৌত্র কার্তিকচন্দ্র।

গঙ্গাধরপুরের জীবন তখন নিস্তরঙ্গ। কিন্তু হঠাৎই এক দারুণ দুর্বিপাক ঘনিয়ে উঠল। গঙ্গাধরপুর ছিল বানিয়ালের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। বানিয়ালের জমিদার তখন বিরাজনারায়ণ রায়চৌধুরী। লোকটা যেমন অত্যাচারী

তেমনই লম্পট। সুন্দরী মেয়ে বউদের রেহাই ছিল না। বিরাট লেঠেল বাহিনী ছিল বিরাজনারায়ণের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ার কাজটা করত চারজন বাছাই করা লেঠেল। রতন, শিবু, হারান আর ভূষণ।'

ওদের নজর নিশ্চয়ই গঙ্গাধরপুরেও পড়েছিল— বিদুর অনেকক্ষণ পর কথা বলল।

'হ্যাঁ। গ্রামের কয়েকটা মেয়ে পরপর নিখোঁজ হয়ে গেল। তাদের কারোর কারোর লাশ ভেসে উঠল খড়াইয়ের জলে। গঙ্গাধরপুরের সকলেই তখন আতঙ্কিত। বিশেষ করে যাদের মেয়ে আছে, তারা। নারানঠাকুর আর শ্রীমন্ত দাস অনেক ভাবনাচিন্তা করেও কী করবেন বুঝতে পারেন না। এর মধ্যে একদিন পার্বতীর পালকি আক্রান্ত হলো।'

'পার্বতী মানে নারানঠাকুরের পুত্রবধূ?'— উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

খোকনদা ওপর-নীচে মাথা নেড়ে বলল, 'পার্বতী সম্ভবত কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিল। এখানকার জনশ্রুতি অনুযায়ী পালকির বেহারাদের সাহায্যে পার্বতী পালাতে পারলেও বিপদ কাটেনি। দু'দিন পর নারানঠাকুরের কাছে হাজির হয় চার মূর্তিমান। তাদের দাবি পার্বতীকে তুলে দিতে হবে, নয়তো জমিদারের লেঠেল এসে গঙ্গাধরপুর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। অনেক বুঝিয়েও তাদের নিরস্ত করা গেল না।'

'তারপর কী হলো?'

'এখানকার লোকে বলে ডাকাতে কালীর মন্দিরে নাকি গুপ্তধন ছিল। এবং রতন ছিল গঙ্গাধরপুরের পাশের গ্রাম চন্দনদাঁড়ির লোক। সে জানত, গুপ্তধনের কথা। সে-ই নাকি বলে গুপ্তধন যদি তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, তাহলে তারা গঙ্গাধরপুরের কোনও মেয়ের অনিষ্ট করবে না।'

'নারানঠাকুর নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব মেনে নেননি।'

'প্রথমে নেননি। চার শয়তানের মুখের ওপর নাকি বলে দিয়েছিলেন গুপ্তধন কোথায় আছে তিনি জানেন না। কথাটা সম্ভবত সত্যি। কারণ, ছোটবেলা থেকে তিনি কালীভক্ত। মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত সম্পদ রক্ষা করতে চাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার এটাও সত্যি রতনের দাবি মেনে না নিলে গঙ্গাধরপুরের মেয়েদের সর্বনাশ হবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই বোধহয় পরে শ্রীমন্ত দাসের পরামর্শে তিনি এই অন্যায় শর্ত মেনে নেন। এবং গুপ্তধন খোঁজার সময় চেয়ে নিয়ে দুদিন পর ওদের আসতে বলেন।'

'দুদিন পর কেন?'— এবার বিদুর প্রশ্ন করল।

'কারণ, দুদিন পর ছিল অমাবস্যা। নারানঠাকুর নাকি মনস্থির করে ফেলেছিলেন। এতদিন কালীসাধনা করে তিনি যে শক্তি অর্জন করেছেন, তারই প্রয়োগ ঘটাবেন অমাবস্যার রাতে। তা না হলে তিনি গঙ্গাধরপুরের ঐতিহ্য, পরম্পরা, সম্পদ, নারী কিছুই বাঁচাতে পারবেন না। যাই হোক, নির্দিষ্ট দিনে ওরা এল। নারানঠাকুর মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তারপরেই ঘটল সেই যুগান্তকারী ঘটনা।'

'কালীঠাকুর এলেন?'— উত্তেজনা বশে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

'বাবার কাছে শুনেছি, স্বমূর্তিতে আসেননি। সেদিন তিনি প্লাবন হয়ে মন্দিরে এসেছিলেন। প্রচণ্ড আক্রোশে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন চার লেঠেলকে। খুঁজে পাওয়া যায়নি তাদের। জলের প্রচণ্ড তোড়ে কোথায় ভেসে গিয়েছিল কে জানে! বিপুল শক্তি নিজের শরীরে ধারণ করার ফলে নারানঠাকুরও সম্ভবত মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ তার মৃতদেহ দেখেনি। জলের গর্জন শুনে শ্রীমন্ত দাস গ্রামের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এসে শুধু দেখেছিলেন, খোলা চুলের একটি মেয়ে মায়ের মূর্তি হাতে নিয়ে গড়াইয়ের দিকে চলে যাচ্ছে।'

'উনিই নিশ্চয়ই মা কালী?'— আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম।

খোকনদা হাতজড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ অমিত। উনিই। গঙ্গাধরপুরের সবাই তাই বিশ্বাস করে। পরেরদিন মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল এখন যেখানে মন্দির, সেখানে। ইঙ্গিত স্পষ্ট। মা আর পুরনো মন্দিরে থাকবেন না। দুর্বৃত্তের পা পড়েছে, অপবিত্র হয়ে গেছে মন্দির। শ্রীমন্ত দাস নতুন মন্দির তৈরি করে দিলেন।'

'বিরাজনারায়ণ প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেনি?'— বিদুর জিজ্ঞাসা করল।

'না। নারানঠাকুরের অলৌকিক কাহিনি আগুনের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মায়ের কৃপায় গ্রামের লোকেরাও তখন এককাট্টা। তাই বোধহয় বিরাজনারায়ণ সাহস পায়নি।'

'নারানঠাকুর কোথায় গেলেন এই প্রশ্নও কেউ করেনি?'

'কেন করবে! তন্ত্রসাধনা সম্বন্ধে যাদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে, তারা জানে সিদ্ধিলাভ হবার পর সাধকের দেহ থাকে না। সেদিন নারানঠাকুর তাঁর অর্জিত শক্তি প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাই করতে গিয়ে তার ব্রহ্মদর্শনও হয়েছিল। তারপর সাধক আর বাঁচে না।'

'কিন্তু মৃতদেহটা তো থাকবে?'

'মা স্বয়ং নিয়ে গেলে তাও থাকবে না।'

খোকনদার ব্যাখ্যায় বিদুর সন্তুষ্ট হলো না। উদাসীন ভঙ্গিতে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'মন্দিরের ভেতর জল ঢোকার রাস্তা ছিল কিনা তুমি জানো?'

'সেটা আর একটা মজা। মন্দিরে দুটো দরজা আর একটা জানালা। সেদিন তিনটেই বন্ধ ছিল। অন্য কোনও রাস্তার

প্রশ্নই ওঠে না। অথচ মন্দিরের ভেতরটা পুরোটাই নাকি জলে ভরে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে জলের চিহ্ন ছিল না। সবই মায়ের মাহাত্ম্য।'

খোকনদা আবার হাতজোড় করে কপালে ঠেকাল।

বিদুর উঠে পড়ল। সে যে কোনও বিষয়ে চিন্তামগ্ন, তার ছাপ চোখেমুখে স্পষ্ট। এখন সে জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের ভাবনায় ডুবে থাকবে। যারা ওকে ভালোভাবে জানে না তাদের কাছে ব্যাপারটা বিসদৃশ লাগতে পারে। তাই বললাম, 'চলো খোকনদা, এবার ফেরা যাক। বেলা অনেক হলো।

।। তিন ।।

পুরো একটা দিন বিদুর চুপচাপ বসে থেকে কাটিয়ে দিল। আমি সকালে আর একবার মন্দির দেখলাম। নারানঠাকুরের কাহিনি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। বস্তুত সেদিন তিনি না থাকলে গ্রামের মেয়েগুলোর সর্বনাশ হয়ে যেত। বিকেলে গেলাম খোকনদার ফার্মিং দেখতে। সে-ও অসাধারণ একটা ব্যাপার। বছর তেত্রিশের একজন যুবক কীভাবে এই অসাধ্যসাধন করতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সন্ধেবেলায় বাড়ি ফিরে দেখলাম, বিদুর তখনও বারান্দায়। আরামচেয়ারে বসে সিগারেট খেয়ে চলেছে। কাছে যেতেই বলল, 'কয়েকটা গিঁট খুলছে নারে অমিত।'

'কীসের গিঁট?'

'খোকনদা যতই মায়ের কৃপার কথা বলুক, মন্দিরের ভেতরে জল ঢোকার একটা রাস্তা থাকতেই হবে। নয়তো ভেতরে জল বাইরে শুকনো— এই তত্ত্ব দাঁড়াবে না। দ্বিতীয়ত, পাঁচটা বডি কোথায় গেল? ভেসেও যদি যায় তা কোন পথে? তৃতীয়ত, ওই খোলাচুলের মেয়েটা! মন্দিরের ভেতর জল থাকলে সে ঢুকল কীভাবে?'

'আরে এইজন্যই তো খোকনদা বারবার মায়ের কৃপার কথা বলছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে কী এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটানো সম্ভব?'

বিদুর চোখ পাকিয়ে বলল, 'দ্যাখ অমিত, আমি নাস্তিক নই। আবার অন্ধও নই। যে ঘটনায় তোরা শুধু দৈবী মাহাত্ম্য দেখছিস, আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে এর পিছনে একটা প্ল্যানিং রয়েছে।'

অবাক হলাম, 'প্ল্যানিং! কার প্ল্যানিং?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। পুরনো মন্দিরটা একবার দেখতেই হবে। আমার প্রশ্নের উত্তর কোথাও যদি থাকে তো ওখানেই থাকবে।'

কিছু বললাম না। বলে লাভও নেই। বিদুরের মনে একবার কোনও বিষয়ে খটকা লাগলে সমাধান না করা পর্যন্ত ও স্বস্তি পায় না। ছোটবেলা থেকে দেখছি।

কিন্তু একটা কথা না বললেই নয়, 'প্ল্যানিং যদি কিছু থেকেও থাকে, তোর কী মনে হয়, আড়াইশো বছর পর তুই তার কথা জানতে পারবি?'

'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী? সফল হলে ইতিহাসের একটা মিসিং লিঙ্ক তো খুঁজে পাওয়া যাবে।'

রাতে খাবার সময় বিদুর বলল, 'খোকনদা কাল আমি একবার পুরনো মন্দিরে যাব।'

খোকনদা অবাক, 'পুরনো মন্দিরে! তা হয় না বিদুর। সেই ঘটনার পর কেউ যায় না ওদিকে। চারদিকে জঙ্গল। সাপটাপ থাকতে পারে।'

'সাপের ভয় আমার নেই খোকনদা। আমার কাছে বেশি জরুরি কালীভক্তির আড়ালে চাপা পড়া ইতিহাস উদ্ধার করা।'

'কী বলতে চাইছিস তুই?'

অতঃপর বিদুর আমাকে যা বলেছিল, সেই কথাগুলো বলল। খোকনদা বলল, 'দ্যাখ বিদুর, তোরা ধীমানের বন্ধু। জেনেশুনে আমি তোদের বিপদে ফেলতে পারি না। তাছাড়া মাকে পেয়েই আমরা খুশি। ইতিহাস নিয়ে আমাদের খুব একটা মাথাব্যথা নেই।'

এরপর আর কথা চলে না। কিন্তু বিদুর এত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। রাতেই ও ধীমানকে ফোন করল। সব কথা বলে বলল, 'খোকনদাকে রাজি করাতেই হবে ধীমান। আমার অনুমান, তোরা এতকাল যেভাবে বুঝেছিস, ঘটনাটা ঠিক সেভাবে ঘটেনি।'

কলেজে পড়ার সময় বিদুর একবার ভারি অদ্ভুতভাবে একটি রহস্যজনক চুরির কিনারা করেছিল। সেই থেকেই ধীমান বিদুরের ভক্ত। তাছাড়া গঙ্গাধরপুরে জন্মালেও ধীমানের মানসিকতা খোকনদাদের থেকে আলাদা। তাই ওকে বোঝাতে বেশি সময় লাগল না।

পরেরদিন রবিবার। সকালেই ফোন করল ধীমান। খোকনদা শুরুতে তর্জন-গর্জন করলেও শেষমেশ রাজি হয়ে গেল। তবে বিদুরকে একলা ছাড়ল না। ঠিক হলো আমরা তিনজন যাব। আমি, বিদুর আর খোকনদা।

হালকা ব্রেকফার্স্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। পুরনো মন্দিরে কেউ যায় না বলে সরাসরি কোনও রাস্তা নেই। বাস রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ যাবার পর দেখলাম খোকনদা বাঁদিকে একটা ইটবাঁধানো রাস্তা ধরল। সে রাস্তার একদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। খোকনদা রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল।

আমার বেশ গা-ছমছম করছিল। সেটা সম্ভবত পুরনো মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অলৌকিকতার কারণে। — 'মন্দিরে যাওয়ার আর কোনও রাস্তা নেই খোকনদা?'

রাস্তা দুটো। একটা এই বাঁকিপুরের জঙ্গল দিয়ে। অন্যটা গড়াইয়ের দিকে।

শুনেছিলাম, গড়াইয়ের সেই ডাকাতেকালীর ঘাট ভেঙে গেছে। তাই ওদিকটায় যাইনি।'

'খোকনদা একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। সত্যিই তুমি কখনও পুরনো মন্দিরে যাওনি?'

'হঠাৎ এ প্রশ্ন! বললাম তো যাইনি।'

'না গেলে কেউ এত কনফিডেন্টলি বেরিয়ে পড়তে পারে? উঁহু, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।'

খোকনদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'একবার গিয়েছিলাম। কথাটা জানতে পেরে বাবা খুব রাগ করেছিলেন। তারপর আর যাইনি।'

বিদুর এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। চুপচাপ হাঁটছিল। এবার বলল, 'তুমি ডাকাতে কালীর ঘাটের কথা বলছিলে না? গড়াই মন্দিরের কাছ দিয়েই বয়ে যেত নাকি?'

'মন্দির থেকে গড়াইয়ের দূরত্ব তিরিশ-চল্লিশ ফুট।'

লক্ষ্য করলাম বিদুরের চোখদুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কী কারণে অবশ্য জানি না। গড়াই নিশ্চয়ই চল্লিশ ফুট লাফ দিয়ে বন্ধ মন্দিরে ঢুকে পড়েনি।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর জঙ্গল বেশ পাতলা হয়ে গেল। সামনে অনেকটা ঘাসে ঢাকা জমি। ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। খোকনদা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'মনে হচ্ছে রং সাইডে চলে এসেছি। এরকম তো হওয়ার কথা নয়।'

বিদুরের চোখ বাইনোকুলারে। ও বলল, 'আমরা ঠিক সাইডেই আছি খোকনদা। এই যে দ্যাখো—'

খোকনদা দেখল। আমিও দেখলাম। একটা ঘরের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। জোরে পা চালিয়ে আমরা মিনিটদশেকের মধ্যে নারানঠাকুরের সাধনভূমিতে পৌঁছে গেলাম।

জায়গাটা গাছ-গাছালিতে এমনভাবে ঢাকা যে মন্দিরের চূড়াটা চোখেই পড়ে না। খুব উঁচু না হলেও একটা চূড়া আছে। ঝোপঝাড় পেরিয়ে আমরা এগোলাম। মন্দিরের প্রধান ফটকের শুধু লোহার ফ্রেমটা টিকে আছে। পাল্লা উধাও। খোকনদা চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়ে ভেতরে ঢুকল। পিছনে আমরা।

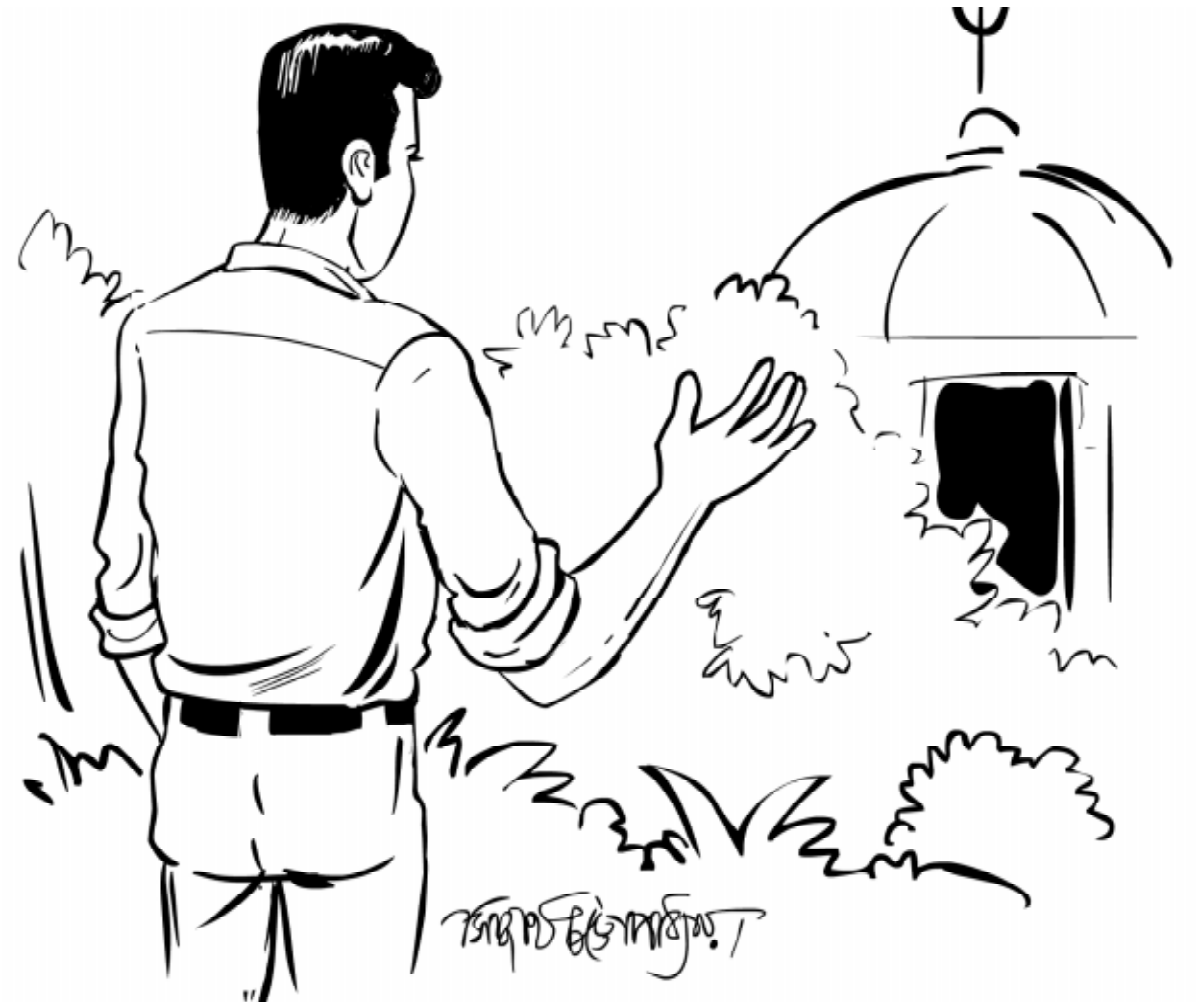

কিন্তু একী! আড়াইশো বছর ধরে পরিত্যক্ত মন্দির এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় নাকি? দেওয়ালে পলেস্তারার লেশমাত্র নেই, চূড়ার ফাঁপা অংশে বিপজ্জনক ফাটল, চুন-সুরকির প্রলেপ উঠে গিয়ে মেঝের ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। অথচ কোথাও এককণা ধুলো নেই। এটা কী করে সম্ভব হয় জানি না।

বিদুর দেখলাম মন দিয়ে কী যেন দেখছে। দেখার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। শুধু বেঢপ সাইজের বেদীটাই যা পড়ে আছে। নতুন মন্দিরে আমরা কালীঠাকুরের প্রতিমা দেখেছি। চারফুটের বেশি লম্বা হবে না। ওই প্রতিমাই তো এখানে ছিল। অথচ এখানকার বেদী অস্বাভাবিক চওড়া। নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর নীচের বেদীর কথা মনে পড়ে গেল। সেই সময়ের লোকেরা এমন প্রমাণ সাইজের বেদী কেন বানাতো কে জানে!

'এগুলো কী খোকনদা?'

বেদীর ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। বিদুরের গলা শুনে সম্বিত ফিরল। দেখলাম ওর হাতে কয়েকটা বিড়ির টুকরো। খোকনদা অবাক হয়ে বলল, 'এসব এখানে এলো কী করে? এখানে তো কেউ আসে না!'

বিদুরের ঠোঁটের কোণে হাসি। সে কিছু না বলে বেদীর পিছনদিকে চলে গেল। মন্দিরের পিছনের দেওয়াল আর বেদীর সঙ্গে ফুট তিনেকের ফাঁক। সেখানে কিছু একটা দেখে ও হো-হো করে হাসল। তারপর নীচু হয়ে একটা দিশি মদের বোতল কুড়িয়ে খোকনদাকে দেখিয়ে বলল, 'এবার বুঝতে পারছ তো এখানে লোকজনের দিব্যি যাতায়াত আছে! মন্দিরের ভেতরের চেহারা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

মন্দির দেখার পর আমরা পিছন দিকে চললাম। মন্দিরের পিছনের জমি বেশ ঢালু। ঢালের দৈর্ঘ্য অন্তত কুড়ি ফুট। লক্ষ্য করলাম এদিকে গাছপালা বিশেষ নেই। ঘাসও কম। ঢাল শেষ হবার পর একটা আয়তাকার সমতল। সেটাও দশ ফুটের কম নয়। খোকনদা বলল, 'বাবার কাছে শুনেছি এই ঢালু জমিকে বলা হত নাবাল। আর নাবালের পর এই যে সমতল জমিটা দেখছিস, একে বলা হত নাবালের চরা। আশ্চর্যের ব্যাপার কী জানিস, গড়াইয়ে যখন জোয়ার আসত তখন জল নাবালের চরা পর্যন্ত এসে আটকে যেত। নাবালের ঢাল পেরিয়ে মন্দির পর্যন্ত যেতে পারত না।'

বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। যেন এটা একবিংশ শতাব্দী নয়, অষ্টাদশ শতাব্দী। কিছুক্ষণ পরেই গড়াইয়ে জোয়ার আসবে এবং নারানঠাকুর নাবালের ঢালে দাঁড়িয়ে সেই অনন্ত জলরাশি দেখতে দেখতে তাঁর ইষ্টদেবীকে প্রণাম করবেন।

ধ্যানভঙ্গ করল বিদুর, 'খোকনদা, গড়াইয়ে বান আসত না?'

'ঠিক বলতে পারব না রে। তবে বৃন্দাবন কাকা জানতে পারেন।'

'বৃন্দাবন কাকা মানে বৃন্দাবন দাস, তাই না? শ্রীমন্ত দাসের বংশধর।'

'হ্যাঁ। বয়েস হয়েছে বৃন্দাবন কাকার। আগে এখানকার একটা স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন। রিটায়ার করার পর নানা সূত্র থেকে গঙ্গাধরপুরের ইতিহাস সংগ্রহ করেন। একটা বইও লিখেছেন। গঙ্গাধরপুরের প্রাচীন ইতিহাস।'

কথা বলতে বলতে আমরা হাঁটছিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর একটা ঘাট চোখে পড়ল। দূরে শীর্ণকায় গড়াই বয়ে যাচ্ছে। গড়াইয়ের মূল খাতের সত্তর ভাগই শুকনো। দেখতে ভালো লাগে না।

খোকনদা বলল, 'এই সেই ডাকাতে কালীর ঘাট। ডাকাতি করতে যাওয়ার আগে ডাকাতরা এই ঘাটে স্নান করত। শুনেছিলাম ঘাটটা ভেঙে গেছে। কিন্তু কয়েকটা ফাটল ছাড়া তো কিছুই চোখে পড়ছে না।'

আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলাম। ঘাটের দুদিকের পাড় মজবুত করে বাঁধানো। ডানদিকের গাঁথুনিটা চোখে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকটা বট-অশ্বত্থের ঝুরিতে এমনভাবে ঢাকা যে কিছুই দেখা যায় না।

বিদুর অনেকক্ষণ ঘাটে বসে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'চলো, এবার ফেরা যাক।'

বাড়ি ফিরে এলাম। বিদুর গম্ভীর। খোকনদার বোধহয় কিছু জিজ্ঞাসা করা ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বিদুর তেমন সাড়াশব্দ করল না।

।। চার ।।

ভেবেছিলাম বিদুর বোধহয় আজ বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ও সারাদিন পুরনো মন্দিরে কাটিয়ে দিল। দুপুরে বেরোবার সময় বলল, 'তোর যাওয়ার দরকার নেই। তেমন কিছু হলে আমি তোকে ফোন করব।' আমি টুকাইয়ের ছড়া শুনলাম। বৌদির সঙ্গে গল্প করলাম। বিকেলে নতুন মন্দিরে গিয়ে দেখলাম বিদুর নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর সামনে বসে আছে।

'কী রে কিছু পেলি?'

'হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে বুঝতে পারলাম না।'— বিদুর অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল।

'হাওয়া! সে আবার কী?'

বিদুর কিছু বলল না। রাতে খাবার সময় আমি আর খোকনদা কথা বলে গেলাম। বিদুর চুপচাপ খেয়ে উঠে পড়ল।

ভূতের মতো একলা সিগারেট টেনে আমি শুয়ে পড়লাম। বিদুর তখনও বারান্দায়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মধ্যরাতে বাথরুমে যাব বলে আলো জ্বেলে দেখি বিদুরের বিছানা খালি।

বাথরুমেও নেই। কোথায় গেল এত রাতে? ফোন করতে গিয়ে চোখে পড়ল ওর ফোন বালিশের পাশে পড়ে।

আধঘণ্টা পর যখন আমি খোকনদাকে খবর দেব কিনা ভাবছি, বিদুর গদাইলশকরি চালে ঘরে ঢুকে বলল, 'পাঁচ মিনিট আগে যেতে পারলে লোকদুটোকে ধরতে পারতাম। একটুর জন্য ফস্কে গেল।'

কারা ফস্কে গেল কিছুই বুঝলাম না। আমার ভ্যাবাচাকা মূর্তি দেখে বিদুর ঘটনাটা খুলে বলল। আমি শুয়ে পড়ার পর বিদুর বারান্দায় পায়চারি করছিল। তখনই ও লোকদুটোকে দেখে। গঙ্গাধরপুর রোড গড়াইয়ের পাড় ছুঁয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। রাস্তায় আলো আছে। এবাড়ির বারান্দা থেকে রাস্তাটা স্পষ্ট দেখা যায়। লোকদুটো ব্যাগ নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ধারের ব্যারিকেড টপকে পাড়ে নেমে যায়। বিদুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়াইয়ের পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের দেখতে পায়নি।

'ওরা কোথায় যেতে পারে কিছু বুঝতে পারলি?'

বিদুর হাসল, 'সেটা বুঝলে তো সেখানে চলেই যেতাম। ওদের হাতে টর্চ ছিল। গড়াইয়ের খাত ধরে ওরা যদি দূরে কোথাও যেত তাহলে টর্চের আলো দেখে আমি ট্রেস করে ফেলতাম। ওরা কাছাকাছি কোথাও শেল্টার নিয়েছে।'

'কী করে বুঝলি?'

'রাস্তা থেকে গড়াইয়ের পাড়ে নেমে বাঁদিকে কিছুটা হাঁটলেই ডাকাতে কালীর ঘাট। আমি কাল গিয়ে দেখে এসেছি। ইনফ্যাক্ট, আমি কাল ফেরার সময় পাড় দিয়ে হেঁটে এসেই রাস্তায় উঠেছিলাম। লোকদুটো যদি ঘাটের সিঁড়িতে বসে থাকে তা হলে রাস্তা থেকে আমি ওদের দেখতে পাব না।'

'তাহলে ওরা নির্ঘাত পুরনো মন্দিরে গেছে।'

'হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন যাবে? যেহেতু আমরা পুরনো মন্দিরে দিশি মদের বোতল পেয়েছি, তাই যদি ধরে নিই নেশাভাঙ্গ করাটাই উদ্দেশ্য, তাহলে আমি বলব মাঝরাতে অতবড়ো ব্যাগ নিয়ে কেউ ওসব করতে যায় না।'

অকাট্য যুক্তি। চুপ করে গেলাম। বিদুর বলল, 'আমার অনুমান ওরা কোনও ক্রিমিনাল অ্যাক্টের সঙ্গে জড়িত। তাই ওদের খোঁজখবর নেওয়াটা জরুরি।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তুই তো ইতিহাসের মিসিং লিংক খুঁজছিস। তাতে এই লোকদুটো এত ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠছে কেন?'

বিদুর হাই তুলে বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছে অমিত। চল শুয়ে পড়া যাক।'

বুঝলাম কিছু বলবে না। অগত্যা আমিও শুয়ে পড়লাম।

সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই। আজও আমি কোথাও বেরোব না। বিদুর যা পারে করুক। কোনও মন্দিরেই আমার আর দেখার কিছু নেই।

দিনটা বিশুদ্ধ আলসেমি করে কেটে গেল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আরাম করে সিগারেট টানছি, বিদুর বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চোখ রেখে বলল, 'আজ কিন্তু তোকে রাত জাগতে হবে অমিত।'

'খামোখা রাত জাগতে যাব কেন?'

'কারণ লোকদুটো আজও এদিকে আসছে। হাতে কালকের সেই ব্যাগটা। সুতরাং আমাদের এখনই বেরোতে হবে। কুইক।'

ঘুম মাথায় উঠল। বিদুর নৈশ অভিযানে যেতে বলছে মানে কিছু ঘটার সম্ভাবনা আছে। আগেও দু-একবার দেখেছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা সোজা ব্যারিকেডের ধারে চলে গেলাম। লোকদুটো তখনও দূরে। গাছগাছালির আড়ালে। আমাদের দেখতে পাবে না।

এক জায়গায় ব্যারিকেডটা একটু ভাঙা। বিদুর বলল, 'কাল রাতে ওরা এখান দিয়েই পাড়ে নেমেছিল। সেটাই সুবিধাজনক। নয়তো ব্যারিকেডের ওপর উঠে লাফ দিতে হবে। ব্যাগটা ভারি হলে তা সম্ভব নয়। আজ ওদের আগে আমাদের নামতে হবে।'

বিদুর নেমে গেল। দেখাদেখি আমিও, চাঁদনি রাত। গড়াইয়ের খাল হিরের নেকলেসের মতো জ্বলছে। বাঁদিক ঘুরে কিছু দূর যেতেই চোখে পড়ল ডাকাতে কালীর ঘাট।

'তুই কি শিয়োর, ওরা এখানেই আসবে?'

'এখানে আসবে কিনা জানি না, তবে আমার অনুমান এদিকে আসবে।'

ঘাটটা একটু খাড়া ধরনের। ধাপগুলো চওড়া আর উঁচু। অনেকটা বেনারসের মতো। আমরা একদম ওপরের ধাপে উঠে দুদিকে ঘাপটি মেরে বসলাম।

বিদুরের অনুমান অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। লোকদুটো এদিকেই এল। কিন্তু ঘাটে না উঠে সোজা চলে গেল। অর্থাৎ ঘাটের বাঁদিকে। মানেটা সহজ। পুরনো মন্দির ওদের গন্তব্য নয়।

বেড়ালের মতো নিঃশব্দে বিদুর নীচের ধাপে নেমে গেল। পিছনে আমি। উপুড় হয়ে শুয়ে কুমিরের মতো গলা বাড়িয়ে দেখছিলাম। এখান থেকে দেখতে অসুবিধা হয় না। লোকদুটো গড়াইয়ের খাত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানকার কংক্রিটের দেওয়ালের সামনে দাঁড়াল। আগের দিনই দেখেছিলাম এদিকের দেওয়ালের প্রায় সবটাই বট-অশ্বত্থের ঝুরিতে ঢাকা। ঝুরির নীচে কিছু থাকতে পারে ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি। কিন্তু লোকদুটো দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে আলগা ঝুরিগুলো

সরাতেই চোখে পড়ল বিশাল একটা গর্ত। প্রমাণ সাইজের একজন মানুষও ওই গর্তে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে।

রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনায় বললাম, 'ওটা কী বিদুর?'

বিদুর ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, 'কথা বলিস না। চুপচাপ দেখে যা।'

দুজনের মধ্যে একজন ব্যাগ নিয়ে গর্তের ভেতরে চলে গেল। অন্যজন রইল পাহারায়।

বিদুর বোধহয় এই সুযোগটার জন্যই অপেক্ষা করছিল। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ঘাট থেকে নেমে ও এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। তারপর পিছন থেকে ঝাপটে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল হাতদুটো। বিদুরের নিয়মিত জিম করা শরীর। ওর শক্তির সঙ্গে যোঝা সহজ কথা নয়।

'এবার বলো তো বাছাধন তোমরা কে? কী করতে রোজ এখানে আসো?'

'তা নিয়ে আপনার কী দরকার?'

'আমরা পুলিশের লোক। লালবাজার থেকে আসছি। কথার উত্তর না দিলে এইখানেই পুঁতে দিয়ে যাব।'

ভেবেছিলাম লোকটা বোধহয় আবার তেড়িয়া হয়ে কিছু বলবে। কিন্তু লালবাজারের নাম শুনে বেশ মুষড়ে পড়ল।— 'আমি কিছু জানি না স্যার। সব শিবেনদা জানে।'

'শিবেনদা কে?'

লোকটা যা বলল তা এইরকম— শিবেন পাল দিশি মদের কারবার করে। নস্করপাড়ায় তার ঠেক আছে। কিন্তু পুলিশ ঝামেলা করে বলে বিক্রি না হওয়া মদের বোতল ও এই গর্তে রেখে যায়। এটা তার গোডাউন বলা যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা গর্তের কথা জানে না বলে কোনও সমস্যা হয় না।

পুরনো মন্দিরের সেই দিশি মদের বোতলটার কথা মনে পড়ে গেল। বললাম, 'তোমরা তার মানে পুরনো মন্দিরেও যাও?'

'না স্যার, ওখানে আমরা যাই না। গেলে মা কুপিত হন। তবে শিবেনদা যায়। মাল-ফাল খায়। ফুর্তি করে।'

যে লোকটা গর্তের ভিতরে গিয়েছিল এই সময় ফিরে এল। বিদুর তৈরি ছিল। ওকেও মাটিতে ফেলে হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর আমাকে বলল, 'তুই এদের কাছে থাক। আমি আসছি।'

আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেলাম না। তার আগেই বিদুর ক্যাঙারুর মতো লাফ দিয়ে গর্তে ঢুকে গেল। আমার সামনে লোকদুটো হাতবাঁধা অবস্থায় হাঁটু মুড়ে বসে আছে। নিতান্তই নিরীহ চেহারা। অসামাজিক কাজ করে বলে চোখেমুখে কৃত্রিম কাঠিন্য ফুটিয়ে তোলে। কিন্তু লালবাজারের অফিসারদের সামনে ট্যাঁ ফোঁ করার মুরোদ নেই। তাই নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট ধরালাম।

বিদুর ফিরল প্রায় কুড়ি মিনিট পর। দেখে মনে হলো বেশ চিন্তিত। লোকদুটো হাঁ করে ওকে দেখছিল। বিদুর বলল, 'আজ তোমাদের ছেড়ে দিলাম। কিন্তু ফের যদি এখানে দেখি তো সাত বছরের জন্য ঢুকিয়ে দেব।'

ছাড়া পেয়ে লোকদুটো দৌড়ে পালাল।

আমার তর সইছিল না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'গর্তের মধ্যে কিছু পেলি?'

'রহস্য আরও বেড়ে গেল রে অমিত। ওটা যে সাধারণ গর্ত নয় সেটা আমি বাইরে থেকে দেখেই বুঝেছিলাম। গর্তের মুখে পাড়ের দেওয়ালের গাঁথুনি একদম সার্কুলার। অর্থাৎ গর্ত আগেই ছিল। দেওয়াল গাঁথা হয়েছে পরে, গর্ত বাঁচিয়ে। এখন ভেতরে ঢুকে বুঝলাম ওটা একটা সুড়ঙ্গ।'

'মাই গুডনেস! কী বলছিস তুই?'

'ইয়েস। কিছুদূর যাবার পর সুড়ঙ্গটা খাড়া হয়ে ওপরে উঠেছে। লেন্থ আন্দাজ তিরিশ-চল্লিশ ফুট। কিন্তু রহস্যটা অন্য জায়গায়। যে কোনও সুড়ঙ্গের দুটো মুখ থাকে। এটির ওদিকের মুখটি বন্ধ। প্রশ্ন হলো, প্রথম থেকেই বন্ধ ছিল নাকি ধস-টস নেমে বন্ধ হয়েছে?'

'খোকনদা জানতে পারে।'

'মনে হয় না। শুনলি না লোকটা বলল গ্রামের কেউ এই গর্তের কথা জানে না।'

ফিরে চললাম। তিনটে বেজে গেছে। চারদিকে আধিভৌতিক শূন্যতা। হয়তো এরই মধ্যে কোথাও বিদুরের প্রশ্নের উত্তর আছে। সময় হলেই জানতে পারা যাবে। অথবা কোনওদিনও জানা যাবে না।

।। পাঁচ ।।

'সুড়ঙ্গ! গড়াইয়ের পাড়ে! এসব তুই কী বলছিস বিদুর?'

কাল রাতের বিবরণ শুনে খোকনদা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছি। বাড়িতে বানানো কচুরি আর চা খেতে খেতে কথাবার্তা হচ্ছে।

বিদুর বলল, 'হ্যাঁ খোকনদা, আমরা কাল দেখে এসেছি। সুড়ঙ্গটার একটা মুখ খোলা, অন্যটা বন্ধ। প্রবলেম সেটাই। কারণ বিপদের সময় পালানোর জন্যই লোকে সুড়ঙ্গ বানায়। কিন্তু একটা মুখ বন্ধ থাকলে সে যুক্তি টেকে না।'

'ওই লোকদুটো কিছু বলতে পারল না?' খোকনদার ইঙ্গিত শিবেনের চ্যালাদের দিকে।

'নেসেসিটি ইজ দা মাদার অব ইনভেনশন, কথাটা জানো তো? ওদের উদ্দেশ্য মদের বোতলগুলো নিরাপদে রাখা। সেটা সুড়ঙ্গের দশ হাত দূরত্বের মধ্যে রাখলেও চলে। ওরা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?'

মীমাংসাসূত্র বেরোল না। আমার মনে

হলো, বিদুর বোধহয় অসম্ভবের পিছনে ধাওয়া করছে। আড়াইশো বছর আগে সেই ভয়ঙ্কর রাতে মন্দিরের ভেতর জল কীভাবে ঢুকেছিল আজ আর জানা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত আমাদের হয়তো হতাশ হয়েই কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

বিদুর হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা খোকনদা, পুরনো মন্দিরে গুপ্তধন কোথায় থাকত তোমার কোনও ধারণা আছে?'

খোকনদা হেসে বলল, 'না রে। শুধু আমি কেন, গঙ্গাধরপুরের কারোরই নেই। তোর কী মনে হয় গুপ্তধনের সঙ্গে সুড়ঙ্গের সম্পর্ক আছে?'

'ইতিহাস তো তাই বলছে। যেসব মন্দিরে গুপ্তধন থাকত, সেখানেই সুড়ঙ্গ কাটার রেওয়াজ ছিল। যাতে ডাকাত-ফাকাত পড়লে গুপ্তধন নিয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়।'

'ডাকাতদের মন্দিরে কীভাবে ডাকাত পড়বে?' এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

'ভুলে যাস না অমিত এখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র দশ কিলোমিটার। সেসময় আরাকান থেকে মগেরা এসে প্রায়ই লুটপাট করত। একটা গ্রাম্য ডাকাত দলের পক্ষে মগেদের মতো অর্গানাইজড্ লুটেরাদের মোকাবিলা করা সম্ভব কি?

খোকনদা বলল, 'আমি তো বলছি তুই একবার বৃন্দাবন কাকার সঙ্গে দেখা কর। উনি অনেককিছুর খবর রাখেন। কবে যাবি বল, আমি নিয়ে যাব।'

ঠিক হলো আজ সন্ধ্যেবেলায় যাওয়া হবে। ওই সময় বৃন্দাবন দাস আহ্নিক করে বৈঠকখানায় কিছুক্ষণ বসেন। অন্যসময় শোবার ঘর থেকে বড়ো একটা বেরোন না। বাতে প্রায় পঙ্গু। বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না।

খোকনদা বেরিয়ে যাবার পর ঘরে এসে সিগারেট ধরালাম। বিদুর একটা মোটা ডায়েরিতে কীসব লিখছে। টুকাইয়ের গলা শুনতে পাচ্ছি। সম্ভবত বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছড়া কাটছে। আমি লক্ষ্য করছি খোকনদা বাড়িতে না থাকলে ওর ছড়া কাটার মাত্রা বেড়ে যায়।

বিদুর হঠাৎ ডায়েরি বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে গেল। শুনতে পেলাম টুকাইকে বলছে, ছড়াটা আর একবার বলো তো সোনা।'

টুকাই বলতে লাগল—

'কালীঠাকুর কালীঠাকুর
নদী কোথায় বলো
কালীঠাকুর বলেন হেসে
পাতালদেশে চলো
চারটে ছাগল আসছে ছুটে
ঘাসের গন্ধ শুঁকে
নদীর বুকে ঘাস গজাল
ছাগল খাবে সুখে।

একই ছড়া প্রায় বারতিনেক শুনে বিদুর যখন ঘরে ঢুকল তখন তার চেহারা পাল্টে গেছে। চাপা খুশিতে চকচক করছে চোখ। ঠোঁটের কোণে হাসি। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী রে হাসছিস কেন?'

'আমি একটা আস্ত ইডিয়ট রে অমিত। হাতের কাছে সব সাজানো অথচ আমি দেখতে পাইনি।'

আমার বেশ রাগ হয়ে গেল, 'কী বলতে চাস স্পষ্ট করে বল। বারবার হেঁয়ালি আমার ভালো লাগে না।'

'হেঁয়ালি নয় রে। টুকাইয়ের ছড়ার মধ্যে নারানঠাকুরের পুরো গল্পটাই ধরা রয়েছে। এমনকী সুড়ঙ্গের সঙ্গে যে মন্দিরের যোগ রয়েছে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তারও।'

কথাটা বিশ্বাস করতে পারলাম না। যে ঘটনা সম্পর্কে গঙ্গাধরপুরে এত গোপনীয়তা, একটা ছেলেভুলানো ছড়ায় তার কথা বলে দিলে তো তা ফাঁস হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আমার যুক্তি শুনে বিদুর বলল, 'সেইখানেই তো ছড়া লেখকের কৃতিত্ব। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। হয়তো তার আশা ছিল কেউ না কেউ ছড়ার অর্থ বুঝতে পারবে।'

'বেশ, তোর ব্যাখ্যাটা আগে শুনি।'

'ছড়ায় জানতে চাওয়া হচ্ছে, নদী কোথায়? কালীঠাকুর বলছেন পাতাল দেশে। পাতাল অর্থাৎ মাটির নীচে। অথচ নদী মাটির নীচে থাকে না। এখানেই এসে যাচ্ছে সুড়ঙ্গের কথা। তারপর ধর চারটে ছাগল। বিরাজনারায়ণ চারজন লেঠেল পাঠিয়েছিল। ব্যঙ্গ করে তাদের ছাগলের প্রতীকে দেখানো হয়েছে। পার্বতী অথবা গুপ্তধন এখানে ঘাস। ঘাসের সঙ্গে ছাগলের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। এখানেও সেই অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। সব শেষে নদীর বুকে ঘাস গজানোর প্রসঙ্গ। নদীর বুকে ঘাস গজায় না। তাহলে চারটে ছাগল ঘাস খেতে কোথায় গেল?'

বিদুরের ব্যাখ্যা শুনে আমার রোমকূপ খাড়া হয়ে গেল। ওর প্রশ্নের উত্তর দেব কী, কথাই বলতে পারলাম না।

'মন্দিরের ভেতর ঢুকে পড়া গড়াইয়ের জলে ডুবে চার লেঠেলই মারা গিয়েছিল অমিত। পরে চারটে বডি গড়াইয়েই ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছড়ার শেষ লাইন, নদীর বুকে ঘাস গজাল, ছাগল খাবে সুখে— সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে।'

'কিন্তু মন্দিরে জল ঢুকল কোথা থেকে?'

'সুড়ঙ্গ দিয়ে। মন্দিরের সঙ্গে সুড়ঙ্গের কানেকশন এখনও আমরা পাইনি বটে, কিন্তু আমার অনুমান পেয়ে যাব।'

'আর নারানঠাকুরের কী হলো?'

'ছড়ায় যখন তার উল্লেখ নেই, ধরে নিতে হবে তিনি জীবিতই ছিলেন। সম্ভবত বিরাজনারায়ণের কোপদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।'

আমি আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু বিদুর বলল, 'আর কোনও কথা নয় অমিত। মনে আছে তো,

সন্ধ্যেবেলায় বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট! তার আগে দুপুরে আমরা একবার পুরনো মন্দির যাব।'

একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। এখানে বেড়াতে এসেছিলাম। জড়িয়ে পড়লাম অষ্টাদশ শতাব্দীর এক রহস্যে। বিদুর অনেকটাই রহস্যভেদ করে ফেলেছে। বাকিটাও নিশ্চয়ই পারবে। ছড়ার মানে জানার পর আমার আর কোনও সংশয় নেই।

দুপুরবেলায় বিদুরের সঙ্গে পুরনো মন্দিরে হাজির হলাম। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখ খোঁজার পরিবর্তে ও বেদীর ওপর বসে সিগারেট ধরাল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী রে! ওইভাবে বসে থাকলে কাজ হবে।?'

বিদুর অন্যমনস্ক, 'সুড়ঙ্গটা কোথায় থাকতে পারে বলে তোর মনে হয়?'

'সম্ভবত মেঝের নীচে।'

'তা হলে তো লেঠেলরা মন্দিরে ঢোকার আগে মেঝে খুঁড়ে রাখতে হয়। আর লেঠেলরা ঢুকে যদি দেখে মেঝে খোঁড়া তাহলে কি ওদের সন্দেহ হবে না?'

বিদুরের যুক্তি অস্বীকার করতে পারলাম না। দ্বিতীয় কোনও সম্ভাবনার কথাও মাথায় এল না। অগত্যা চুপ করে থাকাই শ্রেয়। বিদুর বলল, 'সুড়ঙ্গের মুখ এমন জায়গায় আছে যার কথা কেউ ভাবতেই পারবে না। কিন্তু প্রয়োজনে সেই মুখ সহজেই খুলে ফেলা যাবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেরকম জায়গা ওই মন্দিরে কোথায়?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিদুর পকেট থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করল। ওই ব্যাগের ভেতর ছুরি কাঁচি ম্যাগনিফাইং গ্লাস ইত্যাদি থাকে। বিদুর ম্যাগনিফাইং গ্লাসে চোখ রেখে বেদীর সামনে পিছনে দুই ধারে কী যেন দেখতে শুরু করল।

ওর উদ্দেশ্য বিধেয় কিছুই না বুঝে বললাম, 'ওটা আবার কী শুরু করলি?'

'হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে তাই দেখছি।'

হাওয়ার কথা বিদুরের মুখে আগেও একবার শুনেছিলাম। কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, 'দুটো দরজার একটারও পাল্লা নেই। জানালার অবস্থাও একইরকম। হাওয়া কোথা দিয়ে আসছে এরপরও বুঝতে পারছিস না?'

বিদুর আমার কথার কোনও জবাব দিল না। মিনিট পাঁচেক পর ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দ্যাখ তো তুই কিছু দেখতে পাস কিনা।'

গ্লাসে চোখ লাগালাম। বেদীর উচ্চতা চার ফুট মতো। ওপর থেকে আন্দাজ আড়াই ফুট নীচে একটা সরু ফাটল চোখে পড়ল। ফাটলটা একটুও না বেঁকে বেদীর সামনে থেকে দুই ধার দিয়ে পিছনে ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। কারণ এরকম জ্যামিতির নিয়ম মেনে ফাটল ধরে না।

'কী বুঝলি?' বিদুর জিজ্ঞাসা করল।

'ফাটল বলেই তো মনে হচ্ছে।

'তার মানে কিছুই বুঝিসনি।'

অস্বীকার করব না, বুঝতে পারিনি। তবে বিদুর বোধহয় কিছু একটা অনুমান করেছে। দেখলাম ছুরি দিয়ে চেঁছে ও বেদীর ওপরের চুনসুরকির আস্তরণের অনেকখানি তুলে ফেলল। লালচে রঙের আভাস পাওয়া মাত্র বুঝলাম ইট বেরিয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ডটা ঘটল এরপর। বিদুর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ওই আড়াই ফুট নীচের ফাটলের ওপর হাত রেখে তুলে ফেলতে চাইল বেদীটা। একচুলও নড়াতে পারল না।

অবাক হয়ে বললাম, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?'

বিদুরের মুখে কুলুপ। বারদুয়েক চেষ্টা করার পর হাল ছেড়ে ও ফোন করল খোকনদাকে, 'তিন-চারজন শক্তিশালী লোককে নিয়ে এখনই একবার পুরনো মন্দিরে চলে এস। — ফোনে নয়, এখানে এস তারপর বলব।'

ফোন রেখে বিদুর আবার গম্ভীর। চোখ বেদীর ওপর। মাঝে মাঝে বেদীর ইটে আঙুল ঘষে কীসের যেন গন্ধ শুঁকছে। একটু আগে হলে হয়তো এসব আমার পাগলামি বলে মনে হত। কিন্তু রহস্যভেদের খুব কাছাকাছি পৌঁছে না গেলে বিদুর খোকনদাকে ফোন করে আসতে বলত না। তবে শক্তিশালী লোকের কেন প্রয়োজন সেটা এখনও বুঝতে পারিনি। বেদীর নীচেই যদি সুড়ঙ্গের মুখ তাকে তা হলে তো ওটা ভেঙে ফেললেই হয়।

খোকনদা এল প্রায় আধঘণ্টা পরে। সঙ্গে তিনটে পালোয়ান গোছের লোক। বিদুর তখন সরু ফাটলটা ছুরি দিয়ে চেঁছে চওড়া করার চেষ্টা করছে। খোকনদা বলল, 'বেদী কি ভাঙতে হবে বিদুর?'

'না। শুধু একটা আড়াই ফুট মোটা লোহার প্লেট সরাতে হবে।'

'লোহার প্লেট! কী বলছিস তুই? এটা তো বেদী।'

'হ্যাঁ বেদী। কিন্তু ওপরে রয়েছে একটা লোহার প্লেট। বেদীর ওপর থেকে আড়াই ফুট নীচে একটা সরু রেখা দেখে আমার সন্দেহ হয়। অমিত ভেবেছে ওটা ফাটল। আসলে ওটা ইটের গাঁথনি আর লোহার প্লেটের জোড়। প্লেটটা সরালেই তোমরা বুঝতে পারবে।'

চারজন চারদিকে পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। তারপর প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টায় লোহার প্লেটকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হলো।

বিস্ফারিত চোখে দেখলাম বেদীর নীচে সুড়ঙ্গের দ্বিতীয় মুখ। প্রবল বেগে ধেয়ে আসা হাওয়ার ধাক্কায় বুঝলাম মন্দির থেকে সুড়ঙ্গ গিয়ে শেষ হয়েছে গড়াইয়ের পাড়ে।

বিদুর বলল, 'এই সেই সুড়ঙ্গ

খোকনদা। এখান দিয়েই মন্দিরে জল ঢুকেছিল।'

খোকনদা বলল, 'কিন্তু বিদুর, গড়াইয়ের জোয়ারের জল তো নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না।'

'জানি। ওই একটি প্রশ্নের উত্তরই আমার এখনও জানা বাকি। আসা করছি বৃন্দাবন দাস এব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।'

।। ছয়।।

বৃন্দাবন দাস যে বাড়িতে থাকেন, সেটি শ্রীমন্ত দাসের তৈরি। ভক্ত বৈষ্ণবের বাড়িতে যা যা থাকার কথা সবই আছে। রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দোলমঞ্চ, নাটমন্দির পেরিয়ে আমরা বৈঠকখানায় প্রবেশ করলাম।

ঘরটি বেশ বড়ো। দেওয়ালে অজস্র ছবি। বেশিরভাগই অয়েল পেন্টিং। প্রতিটি ছবির নীচে যার ছবি তার পরিচয় লেখা। বিদুর মন দিয়ে ছবি দেখছিল।

খোকনদা বলল, 'এগুলো বৃন্দাবন কাকার পূর্বপুরুষদের ছবি। শ্রীমন্ত দাসের পর থেকে সকলের ছবি আছে।'

দেখতে দেখতে বিদুর ঘরের এক কোণে একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই ছবির নীচে পরিচয় নেই কেন?'

উঁকি দিয়ে দেখলাম এক সন্ন্যাসীর ছবি। চুলদাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা। কপালে রক্তচন্দনের টীকা। পোশাক তান্ত্রিকদের মতো। বৈষ্ণবের বাড়িতে তান্ত্রিকের ছবি দেখে অবাক হলাম।

বিদুর জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার ছবি খোকনদা?'

'উনি মধুসূদন ভারতী।'

না, খোকনদা নয়। জবাব এল ভারী গলায়। পিছন ফিরে দেখলাম একটি মাঝবয়সি লোকের কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকছেন একজন সৌম্য চেহারার বৃদ্ধ। অনুমানে বুঝলাম ইনি বৃন্দাবন দাস। ওকে একটি সাবেক আরাম কেদারায় বসিয়ে মাঝবয়সী লোকটি বিদায় নিল।

খোকনদা বলল, 'এরা আমার ভায়ের বন্ধু বন্দাবন কাকা। বিদুর আর অমিত। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে।'

'তুই তো বলেছিস ওদের কথা। — তোমাদের মধ্যে বিদুর কে? সেই তো গোয়েন্দাগিরি করছে শুনলাম।'

বিদুর লজ্জা পেয়ে বলল, 'ঠিক গোয়েন্দাগিরি নয়। আসলে ইতিহাসের মিসিং লিংকগুলো খুঁজতে আমার ভালো লাগে।'

'বাহঃ! এক সময় আমিও খুঁজতাম। তা, কিছু পেলে নাকি?'

'পেয়েছি। তবে সেসব বলার আগে আমি আপনার কাছে দুটো প্রশ্নের উত্তর জানতে চাই।'

'বেশ তো, বলো।'

'মধুসূদন ভারতী কি গঙ্গাধরপুরের লোক ছিলেন?'

বৃন্দাবন দাস কয়েক মুহূর্ত বিদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'উনি বেনারসের লোক। তবে শ্রীমন্ত দাসের সঙ্গে বন্ধুত্বের সুবাদে মাঝে মাঝে গঙ্গাধরপুরে আসতেন। এখন যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো একজন বৈষ্ণবের সঙ্গে ওঁর মতো এক তান্ত্রিকের কীভাবে বা কোথায় বন্ধুত্ব হয়েছিল, আমি বলতে পারব না। ছোটবেলা থেকে আমরা ওসব কথা শুনতে শুনতে বড়ো হয়েছি।'

'মধুসূদন ভারতী কি বেনারস থেকে এসে এই বাড়িতে উঠতেন?'

'না। উনি থাকতেন কালীমন্দিরে। শুনেছি ওর দেখাশোনা করত নারানঠাকুরের পুত্রবধূ পার্বতী।'

'আশ্চর্য! সেই সময় পার্বতীর মতো বিধবা মহিলা একজন সন্ন্যাসীর দেখাশোনা করতেন, কেউ কিছু বলত না?'

'কেন বলবে! উনি তো সন্ন্যাসী। ভোগবাসনার অনেক ঊর্ধ্বে। তাছাড়া গ্রামের বহু লোক তার কাছে আসত। অনেকে দীক্ষাও নিয়েছিল। পার্বতীও দীক্ষা নিয়েছিল ওঁর কাছে।'

বিদুর অর্থপূর্ণ হেসে বলল, 'তা হলে বোধহয় তাই হবে। এবার আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। শুনেছি, গড়াইয়ে জোয়ার এলে সেই জল নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না। আমার প্রশ্ন, গড়াইয়ে বান আসত না?'

'পূর্ণিমা-অমাবস্যায় আসত বৈকি! কিন্তু বান এলেও জল নাবালের চরা পেরিয়ে ওপরে উঠত না। তার কারণটাও খুব সহজ। আমাদের পূর্বপুরুষরা নদীনালার দেশের মানুষ তো, ওরা নদীর চরিত্র খুব ভালো বুঝতেন। তাই দেখবে গড়াইয়ের পাড় প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু। বানের জল এত উঁচুতে উঠতে পারত না। তবে পাড় যদি নীচু হত কিংবা নীচের দিকে যদি জল ঢোকার রাস্তা থাকত তাহলে মন্দির-টন্দির সব ডুবে যেত।'

বিদুর হঠাৎ বৃন্দাবন দাসকে প্রণাম করে বলল, 'যে দুটো জট আমি খুলতে পারছিলাম না, আপনার কথায় তা পরিষ্কার হয়ে গেল। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

বৃন্দাবন দাস অবাক হয়ে বললেন, 'তা তো বুঝলাম। কিন্তু সব পরিষ্কার হবার পর তুমি কী সিদ্ধান্ত নিলে সেটা তো জানা দরকার।'

বিদুর কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, 'আমার সিদ্ধান্ত আপনাদের বিশ্বাসকে আঘাত করতে পারে।'

'খোকন আমায় সব বলেছে বিদুর। আড়াইশো বছর আগের সেই রাতে মা কালীর আবির্ভাবের গল্পে তুমি বিশ্বাস করো না। এই নিয়ে অবশ্য একদিনই ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তারপর তোমরা কী করেছ আমি জানি না। আমি পুরোটা শুনতে চাই।'

এই সময় সেই মাঝবয়সী লোকটি চায়ের ট্রে আর নিমকি নিয়ে ঘরে ঢুকল। চা খেতে খেতে গল্প শুরু হলো।

বিদুর প্রথমে গঙ্গাধরপুরের কালী মন্দিরের ইতিহাস শোনার পর যেসব ঘটনা ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল। তারপর বলল, 'আড়াইশো বছর আগে মন্দিরে যা ঘটেছিল তার পিছনে ছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় প্রধান ভূমিকা ছিল নারানঠাকুর, শ্রীমন্ত দাস এবং পার্বতীর। সঙ্গে ছিল কয়েকজন বাছাই করা বিশ্বাসী গ্রামবাসী। এদের মাধ্যমেই কালীঠাকুরের আবির্ভাবের মিথ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিরাজনারায়ণকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য তার প্রয়োজন ছিল।

গঙ্গাধরপুরের ইতিহাস শোনার পরেই আমার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, মন্দিরে জল কোথা দিয়ে ঢুকল? চার লেঠেলের মৃতদেহই বা পাওয়া গেল না কেন? এখন আমরা এর উত্তর জানি। জল ঢুকেছিল সুড়ঙ্গ দিয়ে। মন্দিরের দরজা লোহার। তাই প্লাবনেও ভেঙে পড়েনি। এমনকী ভেতরের জল বাইরেও যায়নি। জলে ডুবে চারজনের মৃত্যু হওয়ার পর তাদের মৃতদেহ গড়াইয়ের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এসব কথা টুকাইয়ের ছেলেভুলানো ছড়া থেকে আমি জানতে পারি।'

খোকনদা বলল, 'টুকাইয়ের ছড়া! মানে ওই কালীঠাকুরের ছড়া? কীরকম একটু বল?'

ছড়ার অর্থ ব্যাখ্যা করে বিদুর বলল, 'এখন প্রশ্ন হলো ঘটনাটা ঠিক কীভাবে ঘটেছিল। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটা কথা মনে রাখা জরুরি। আড়াইশো বছর আগে যা ঘটেছিল, তার কোনও সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স আমাদের হাতে নেই। সুতরাং আমি যেভাবে সাজিয়েছি, ঘটনাটা ঠিক সেভাবেই ঘটেছিল এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই। কমবেশি তফাত থাকতেই পারে। নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাসের মনস্তত্ত্ব বিচার করে যা মনে হয়েছে আমি তাই বলছি।

'নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাস দুজনেই চন্দনদাঁড়ির রতনকে চিনতেন। মন্দিরের গুপধনের কথা ও যে জানে, তাও তাদের অজানা ছিল না। নারানঠাকুর এও জানতেন, গঙ্গাধরপুর যতই ছোট গ্রাম হোক লম্পট বিরাজনারায়ণের গ্রাস থেকে বেশিদিন বাঁচতে পারবে না। হয়েছিলও তাই। নিজে ডাকাতি না করলেও নারানঠাকুর ডাকাত বংশের সন্তান। অন্যায়ের প্রতিকার যে তিনি সাধারণ গৃহস্থের মতো করবেন না, সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং শ্রীমন্ত দাসের সঙ্গে তিনি বসলেন প্ল্যান করতে। বলা ভালো ফাঁদ পাততে।'

'ফাঁদ! কীসের ফাঁদ?' — বৃন্দাবন দাস অবাক হয়ে বললেন।

'হ্যাঁ, ফাঁদ। পার্বতীর পালকির ফাঁদ। পালকির বেহারাদের পক্ষে যে চারজন শিক্ষিত লেঠেলের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, আশাকরি এ বিষয়ে আপনারা আমার সঙ্গে একমত হবেন। নারানঠাকুর সুকৌশলে রটিয়ে দিয়েছিলেন ওইদিন সন্ধ্যাবেলায় পার্বতী পালকিতে ফিরবেন। কিন্তু পার্বতী পালকিতে ছিলেন না। লেঠেলরা সেই ফাঁদে পা দেয়। ওদের দেখেই বেহারারা পালিয়ে গিয়েছিল। পাঁকা পালকি দেখে রতনরা ভেবেছিল পার্বতীও পালিয়ে গেছেন। পরের দিনই ওরা নারানঠাকুরের মন্দিরে হানা দেয়। নারানঠাকুর এটাই চেয়েছিলেন। ফাঁদ না পাতলে তিনি এত সহজে রতনদের টেনে আনতে পারতেন না।

'নারানঠাকুরকে শুধু বুদ্ধিমান বললে কিছুই বলা হয় না। মানুষের মনস্তত্ত্ব বিচারেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তিনি জানতেন, রতনরা খালি হাতে গঙ্গাধরপুরে মেয়েদের মুক্তি দেবে না। সম্ভবত সে সময় ডাকাতে কালীর গুপ্তধনের ওপর অনেকের নজর ছিল। বিরাজনারায়ণেরও থাকতে পারে। তাই আলোচনার সময় রতন যখন গুপ্তধন দাবি করে বসল, তিনি অবাক হননি। শুধু রতনদের লোভ আরও বাড়িয়ে দেবার জন্য গুপ্তধন সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হলো না। অতঃপর নারানঠাকুর প্রবেশ করলেন পরিকল্পনার দ্বিতীয় ভাগে। দুদিন পর ওদের আসতে বললেন। কারণ, দুদিন পর ছিল অমাবস্যা। অমাবস্যায় কখন গড়াইয়ে বান আসে নারানঠাকুর জানতেন। তাই রাত বারোটার সময় ওদের আসতে বলা হলো।

ওরা এল। নারানঠাকুর তন্ত্রচর্চা করতেন। সুতরাং ওর মন্দিরে কারণবারি থাকা অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত কারণবারি খাইয়েই চার লেঠেলকে নিস্তেজ করে দেওয়া হয়েছিল। ওরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে দেখে শ্রীমন্ত দাসের সহায়তায় নারানঠাকুর লোহার প্লেট সরিয়ে দেন। নারানঠাকুর শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। ওর স্ট্যাচু দেখেই সেটা বোঝা যায়। শ্রীমন্ত দাসও সম্ভবত যথেষ্ট শক্তি ধরতেন। কারণ যে কাজটা আজ আমরা চারজনে মিলে করেছি, সেটাই ওরা দুজনে করেছিলেন। প্লেট সরিয়ে ফেলার পর শ্রীমন্ত দাস মন্দির থেকে চলে যান। কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে আসেন তখন ওর সঙ্গে গ্রামের কয়েকজন লোক। ওরা দেখতে পায় একপিঠ খোলা চুলের একটি মেয়েকে। মেয়েটি কালীপ্রতিমা হাতে বেদীর পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গড়াইয়ের পাড়ে মিলিয়ে গেল। মেয়েটি পার্বতী। পার্বতী চলে যাবার পর নারানঠাকুর মন্দিরের দুটো দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ করে দেন। সম্ভবত তার কিছুক্ষণ পর থেকেই মন্দিরে জল ঢুকতে শুরু করে। বিরাজনারায়ণের

লেঠেলদের আর্ত চিৎকার শুনেও গ্রামের লোকেরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে যায়নি। কারণ ওরা জানত, নারায়ঠাকুর শুদ্ধাচারী তান্ত্রিক এবং গ্রামের শুভানুধ্যায়ী। তাই তিনি যা করবেন গ্রামের, বিশেষ করে গ্রামের মেয়েদের ভালোর জন্যই করবেন। আমার অনুমান, গ্রামের ওই বাছাই করা লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করেই নারানঠাকুর এবং শ্রীমন্ত দাস কালীঠাকুরের আবির্ভাবের তত্ত্ব খাড়া করেন। পরে তা লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। বিরাজনারায়ণ সম্ভবত সুড়ঙ্গের কথা জানত না। এরকম একটি অতিপ্রাকৃত ঘটনার কথা শুনে সে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়।'

বিদুর দম নেবার জন্য থামল। আমি বললাম, 'রতনও কি সুড়ঙ্গের কথা জানত না?'

'সেটা বলা মুশকিল। তবে জানলেও সেটা কাজে আসেনি। কারণ, এই শ্রেণীর লোকেরা একটু আত্মম্ভরী টাইপের হয়। ক্ষমতার খুব কাছাকাছি থাকে তো, তাই। দুজন প্রৌঢ় ওদের মেরে ফেলার প্ল্যান করতে পারে, সেটা বোঝার মতো কল্পনাশক্তি ওর ছিল না। থাকলে রাত বারোটার সময় দেখা করতে যেত না।'

বৃন্দাবন দাস এতক্ষণ মন দিয়ে শুনছিলেন। এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কিন্তু একজনের কথা এখনও বলোনি। নারানঠাকুরের কী হলো?'

বিদুর রহস্যময় হেসে বলল, 'বিরাজনারায়ণের কোপ থেকে বাঁচবার জন্য ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীমন্ত দাসই দিয়েছিলেন। তিনিই বেনারসে আশ্রম করে দেন। নারানঠাকুর সেখানে থাকতেন। অনেক বছর পর শ্রীমন্ত দাসের অতিথি হয়ে তিনি গঙ্গাধরপুরে ফেরেন। তখন তিনি আর নারানঠাকুর নন, মধুসূদন ভারতী।'

ঘরে আলপিন পড়লে বোধহয় তার শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে। খোকনদার চোখদুটো ফুটবলের মতো হয়ে গেছে। বৃন্দাবন দাসও শ্রদ্ধা আর বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে বিদুরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

বিদুর বলল, 'নতুন মন্দিরের সামনে নারানঠাকুরের যে স্ট্যাচু আছে তার সঙ্গে মধুসূদন ভারতীর এই ছবি মেলালে স্পষ্ট বোঝা যায় নারানঠাকুর আর মধুসূদন ভারতী একই ব্যক্তি। যতই চুলদাড়িতে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে ফেলুন, নাক চোখ ঠোঁটের গড়ন তো আর

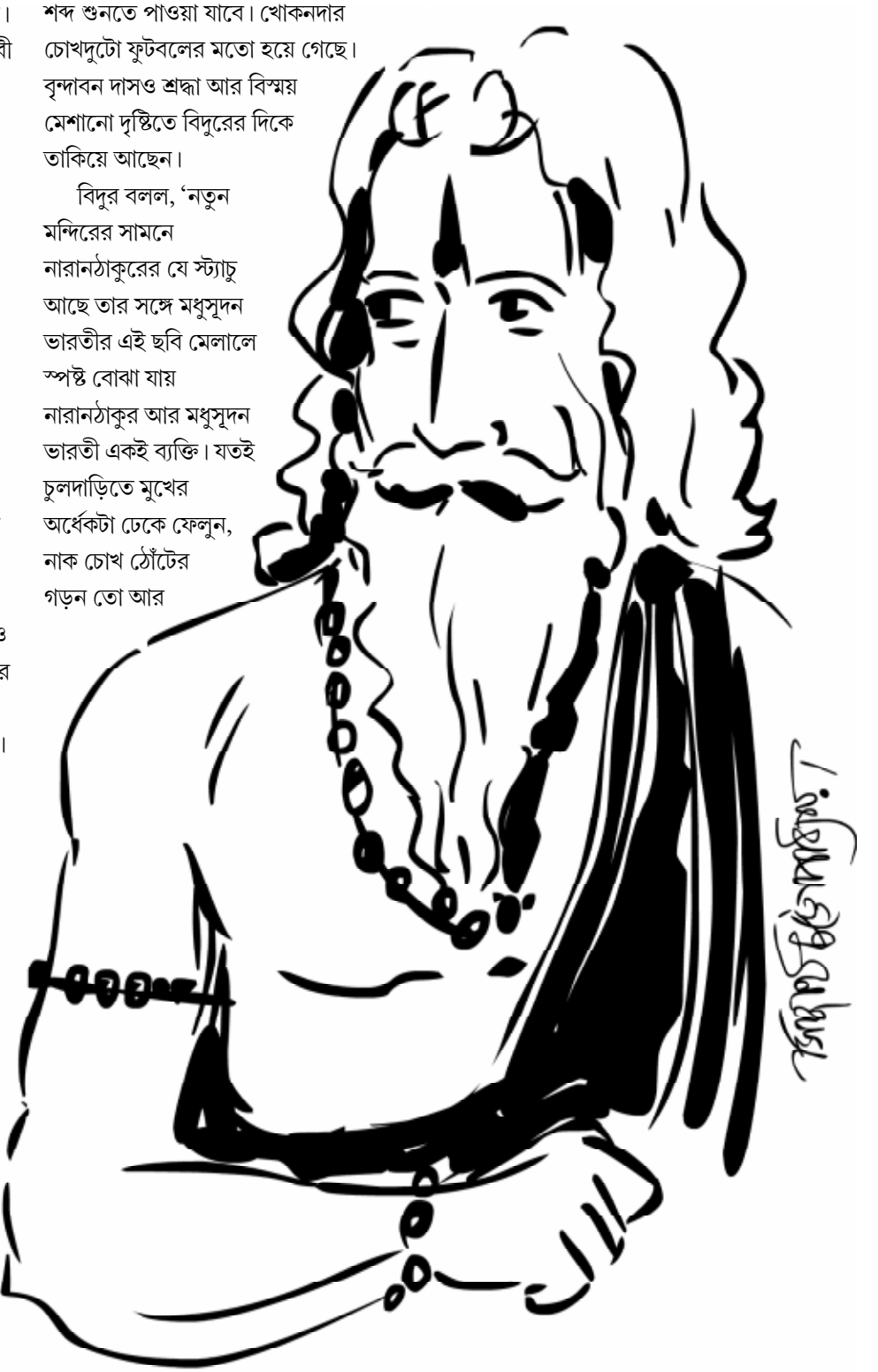

বদলানো যায় না।'

'তুমি শিয়োর, নারানঠাকুর আর মধুসূদন ভারতী একই লোক?' বৃন্দাবন দাস জিজ্ঞাসা করলেন।

'ছবি দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলাম। পরে আপনি যখন ওর পরিচয় দিলেন তখন নিশ্চিন্ত হই। পূর্ব পরিচয় না থাকলে পার্বতীর মতো একজন গ্রাম্য গৃহবধূর পক্ষে মধুসূদন ভারতীর দেখাশোনা করা সম্ভব হতো না। ওর সংস্কারে বাধত। শ্রীমন্ত দাসও ওকে অনুরোধ করতে পারতেন না।

বৃন্দাবন দাস একদম চুপ করে গেলেন। মনে হলো তিনি বোধহয় এই ঘরে নেই। অন্য কোনও জগতে বিচরণ করছেন।

বিদুর বলল, 'আমি জানি আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। আপনাদের এতদিনের ধারণা আজ ভেঙে গেল।'

'না বিদুর। সেজন্য আমি কষ্ট পাচ্ছি না। তুমি যেভাবে ঘটনাটা সাজিয়েছ তাতে যুক্তি আছে। মানা না-মানা যে যার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা কেন তোমার মতো যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার করতে পারলাম না? কেন একটা মনগড়া তত্ত্বে আটকে রইলাম।'

'সেটা বোধহয় আপনারা একটা প্রি ডিটারমাইন্ড কনসেপ্ট নিয়ে বড়ো হয়েছেন বলে। যার বাইরে যাবার স্বাধীনতা আপনাদের দেওয়া হয়নি। আমি বাইরে থেকে এসেছি। তাই খোলা মনে সব দেখতে পেরেছি।'

বৃন্দাবন দাসকে প্রণাম করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। গঙ্গাধরপুরের রাস্তা এরই মধ্যে বেশ ফাঁকা হয়ে গেছে। কাল চলে যাব। তাই মন্দিরে মাকে দর্শন করার ইচ্ছে হলো। খোকনদাও এক কথায় রাজি।

মন্দিরের আরতি দেখে ফেরার সময় খোকনদা বলল, 'একটা প্রশ্ন আছে বিদুর। গুপ্তধনের কী হলো?'

'সম্ভবত যেখানে ছিল সেখানেই এখনও আছে।'

কৌতূহল সামলাতে না পেরে বললাম, 'কোথায় রে? তুই জানিস?'

'কেন রে! গুপ্তধন খুঁজতে যাবি নাকি?' বলে বিদুর দাঁড়াল। আমরা মন্দির থেকে খানিক দূরে চলে এসেছিলাম। বিদুরের ইশারায় ফিরে গেলাম মন্দিরের কাছে। বিদুর নারানঠাকুরের স্ট্যাচুর সামনে থামল। মন্দিরের আলোয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ব্রাহ্মণের বলিষ্ঠ প্রতিরূপ। স্ট্যাচুর নীচের বেদীটার দিকে আঙুল তুলে বিদুর বলল, 'এটার বিশাল সাইজ দেখে তোমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল, খোকনদা। বিশেষ করে বেদীর তুলনায় স্ট্যাচুটা যেখানে চোখে পড়ার মতো ছোট। অমিত বোধহয় লক্ষ্য করেছিল কিন্তু তলিয়ে ভাবেনি। আমার বিশ্বাস, এই বেদীর ভেতর একটা সিন্ধুক জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে। তাতেই আছে তোমার গুপ্তধন। তবে—'

'তবে কী বিদুর?' খোকনদা জিজ্ঞাসা করল।

'ডাকাতি করা ধন খোকনদা। বহু মানুষের চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ওর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওসব নিয়ে এখন আর না ভাবাই ভালো।'

বিদুর আবার হাঁটতে শুরু করল। আমরা ওকে অনুসরণ করলাম। রাস্তায় আর কোনও কথা হলো না। বিদুরের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে নারান কুটীরে পৌঁছে গেলাম। ▮

With Best Compliments:-

Monoj Kumar Kakra

Krishna Bangles
37, Biplabi Rashbehari Bose Road
2nd floor, Kolkata-1
M : 9831280306

গীতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ

ড. সুদীপ বসু

গীতা উপনিষদেরই ভাষ্য। গীতার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। গীতা যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন কর্ম ও জ্ঞানমার্গীয় সন্ন্যাসী ও দার্শনিকদের মধ্যে বিরোধ ছিল। জ্ঞানমার্গে যাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁরা মনে করতেন, আত্মজ্ঞান লাভই মোক্ষ বা মুক্তির একমাত্র পথ। গীতাকার তাঁর নিষ্কাম কর্মের মহান বাণী ও আদর্শ প্রচার করে পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের অবসান ঘটালেন। স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দের ভাবাদর্শে গীতার প্রভাব এবং তাঁদের এ বিষয়ক চিন্তার একটি তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ, আলমবাজার মঠে থাকাকালীন সতীর্থদের সঙ্গে, কখনও বা যুবক শিষ্যদের সঙ্গে গীতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের ৪২তম অধিবেশনে বিবেকানন্দ নিষ্কাম কর্ম সম্পর্কে যে বক্তৃতা করেছেন, সেখানে গীতার প্রসঙ্গ এসেছে। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তিনি যে একাধিক বক্তৃতা করেন, সেগুলিতেও গীতার শ্লোক উল্লেখ করেছেন বারংবার— গীতার বিষয়গুলিকে সহজসাধ্য করে তুলে ধরেছেন।

মানুষই যে অনন্তশক্তির আধার সে যে সর্বশক্তিমান— সেকথা বিবেকানন্দ বারংবার বলেছেন। তাঁর প্রিয় একটি শ্লোক হলো :

'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ / বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।। সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্। / ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্' (গীতা ১৩।২৭-২৮)

'বিনাশশীল সর্বভূতের মধ্যে অবিনাশী— পরমেশ্বরকে যিনি সমভাবে অবস্থিত দেখেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন; কারণ ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া তিনি নিজেকে হিংসা করেন না, সুতরাং পরমগতি প্রাপ্ত হন' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮২-৮৩)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে কর্মযোগের শিক্ষা দিয়েছেন সেটি বিবেকানন্দকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা যেসব কাজ প্রতিনিয়ত করি— তার প্রত্যেকটিই যে শুভ ফল দেয়, তা তো নয়— সবই শুভাশুভমিশ্র। আগুনের তেজ ও দীপ্তি সত্য। কিন্তু তার চারপাশে যে ধোঁয়া সেটিও কিন্তু মিথ্যা নয়। কাজেই এমন কোনও শুভ কর্ম থাকে না, যেখানে অশুভের সামান্য স্পর্শ নেই। কিন্তু সেজন্য কাজ বন্ধ থাকা উচিত নয়। বিবেকানন্দের মতে, আমাদের এমন কাজে নিযুক্ত থাকা উচিত, যার দ্বারা অধিক পরিমাণে শুভ এবং অল্প পরিমাণে অশুভ হয়। খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে তিনি বললেন, 'অর্জুন ভীষ্ম ও দ্রোণকে বধ করিয়াছিলেন। ইহা না করিলে দুর্যোধনকে পরাভূত করা সম্ভব হইত না। অশুভ শক্তি শুভ শক্তির উপর প্রাধান্য লাভ করিত এবং দেশে এক মহাবিপর্যয় আসিত। একদল গর্বিত অসৎ নৃপতি বলপূর্বক দেশের শাসনভার অধিকার করিত এবং প্রজাদের চরম দুর্দশা উপস্থিত হইত।' (বাণী ও রচনা / ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৭-৬৮)।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে সানফ্রান্সিস্কোতে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন বিবেকানন্দ। অবশ্যম্ভাবীরূপে কর্মযোগের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন জিজ্ঞাসা করেছেন যে, জ্ঞানই যদি জীবনের উচ্চতম অবস্থা হয়, তবে কর্মকে কেন তিনি অগ্রাধিকার দিচ্ছেন? গীতাকে অনুসরণ করে বড় চমৎকার করে বললেন বিবেকানন্দ যে প্রকৃতির গুণগুলিই আমাদের বাধ্য করে কাজ করতে। গীতার ৩/১ সংখ্যক শ্লোককে অনুসরণ করে বিবেকানন্দ বুঝিয়ে বললেন, যে মানুষটি বাইরের কাজ বন্ধ করে মনে মনে কাজের চিন্তা করেন, সেই বিষয়ে ভাবেন— স্বভাবতই কোনও কিছুই তিনি লাভ করতে পারেন না। কিন্তু যে মানুষ মনের শক্তি দিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করে কাজ করে চলেন, তিনি আগের জনের থেকে শ্রেষ্ঠ। তাই কাজই একমাত্র পন্থা। নিজের জীবন দিয়ে বিবেকানন্দ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। জোরের সঙ্গে তিনি বলতে পেরেছেন— 'শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলেন, কিন্তু আসক্তিবর্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনওই সংসারের হয়ে যাননি। সকল কাজ করো, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে করো; কাজের জন্যই কাজ করো, কখনও নিজের জন্য করো না।' (বাণী ও রচনা / ৫ম সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৭)।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, গীতা হলো উচ্চতর জীবন সংগ্রামের এক অপূর্ব রূপক। পার্থিব জগতের বিপন্নতা, দুঃখ, ক্লেশ প্রতিনিয়ত আমাদের খর্ব করে, যন্ত্রণামলিন করে। এটাই খুব স্বাভাবিক। চাওয়া ও পাওয়া সমবিন্দুস্থ না হলে আমরা হতাশ হই— বিষাদভারাতুর হই। বিবেকানন্দ বলছেন, অধ্যায়ের পর অধ্যায় ধরে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উদ্দীপিত করে চলেছেন— যাতে তিনি যুদ্ধবিমুখ না হন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, বিষণ্ণতাকে জয় করতে, মৃত্যুভয় ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। কলকাতাবাসী কয়েকজন যুবক শিষ্যকে বিবেকানন্দ গীতা ও বেদান্ত চর্চার কথা বলতেন, নিজেও ব্যাখ্যা করতেন। আলমবাজার মঠে বাস করার সময় প্রায়ই এই কর্মযোগ নিয়ে আলোচনা করতেন তিনি। তাঁর মতে, সমগ্র বেদান্ত দর্শনই গীতায় নিবদ্ধ। খুব সুন্দর করে বলেছেন, 'এই মহৎ কাব্যগ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্যরত্নরাজির চূড়ামণি রূপে পরিগণিত। ইহা বেদের ভাষ্যস্বরূপ। গীতা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতেছেন, এই জীবনেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামে আমাদের জয়ী হইতে হবে। সংগ্রামে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া সবটুকু প্রাপ্য আদায় করিতে হইবে। গীতা উচ্চতর জীবনসংগ্রামের রূপক, তাই যুদ্ধক্ষেত্রেই গীতা বর্ণনার স্থান নির্ণীত হওয়ায় অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭)।

এই যে নিষ্কাম কর্ম, এই যে অনাসক্তি— তা আমাদের আনন্দে রাখবে। আমরা যখন উপলব্ধি করবো যে, অন্যের জন্য কাজ নয়— নিজের জন্য করছি, কাজ করছি কাজের জন্য, তখন কাজের মধ্যে যে বন্ধন থাকে, ক্লেশ থাকে তা সরে যায়। এই অনাসক্তি অর্জন করা যখনই সম্ভব হয়, তখনই মানুষের উত্তরণ ঘটে। তুচ্ছ হয়ে যায় বিষয়বাসনা। বিবেকানন্দ বারংবার বলেছেন, অপরের জন্য কাজ করে করে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবার কথা।

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মে সানফ্রান্সিস্কোতে আয়োজিত এক সভায় বিবেকানন্দ দেখিয়েছেন, গীতায় কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতার কথা বলা হয়েছে। সাধনপথ-সাধনক্রম ভিন্ন হলেও গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে লক্ষ্যের প্রতি মনোনিবেশ করতে নির্দেশ করেছেন। 'প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভালো। কিন্তু মনে রাখিবেন— ইহা আপনার পক্ষেই ভালো হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভালো, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়— সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সবসময় জন বা মেরির গায়ে নাও লাগিতে পারে।' (বাণী ও রচনা, ৫ম সংস্করণ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪১১)। তাই যিনি প্রকৃত জ্ঞানী, তিনি অন্যের দুর্বলতা দেখে তাকে মন্দ বলবেন না কখনও, বরং তার স্তরে নেমে গিয়ে তাকে সাহায্য করে যাবেন যতদূর সম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ স্বার্থরহিত নিষ্কাম কর্মের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সেই কাজ 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'।

এর বাস্তবায়নেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা। নিষ্কাম কর্মকে পরম সত্য ঘোষণা করেও সতর্ক করেছেন বিবেকানন্দ। নিষ্কাম কর্ম অর্থে সুখ বা দুঃখ— কোনওটিই মন স্পর্শ করে না, এটা নয়— তা হলে দস্যুবৃত্তি করার সময় সুখ বা দুঃখের কোনও অনুভূতি যদি কোনও দুরাচারীর মনে না জাগে, তবে সে নিষ্কাম কর্ম করছে এটা বলা যাবে না। অহং শূন্য হয়ে কাজ করার কথা গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— বিবেকানন্দ সেই কর্মের কথাই বলেছেন—। সেই কর্মেই জগতের মঙ্গলবিধান সম্ভবপর।

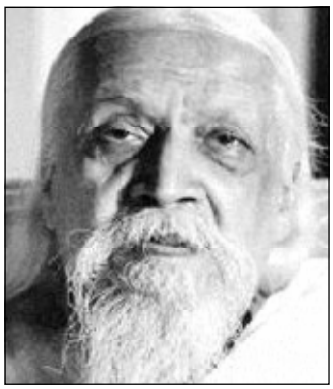

বিবেকানন্দের মতোই শ্রীঅরবিন্দও বাসুদেব কৃষ্ণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সাধনপথে— 'বাসুদেবঃ সর্বম্' (গীতা ৭/১৯) (দিব্য জীবন, ৫ম সংস্করণ, পৃঃ ৩৮৯) শ্রীঅরবিন্দ গীতাকে 'The Divine Teacher' বলেছেন (The complete works of Sri Aurobindo, Vol.19, 1992 ed. Page12)।

তাঁর মতে, মহাভারতের যে বিচিত্র ঘটনাপ্রবাহ— বহু ঘাত-প্রতিঘাত, সেখানে কৃষ্ণ কখনোই 'Hero' রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি— অথচ, সব ঘটনার নিয়ন্ত্রী তিনিই— অর্জুনের সমস্ত শক্তির উৎসব সেই বাসুদেব কৃষ্ণ। এবং কৃষ্ণের শক্তি-বীর্যবত্তার সবটুকু নিয়োজিত বৃহত্তর মঙ্গলকামনায়। সেখানে তাঁর নিজের ব্যক্তিসুখ চরিতার্থের প্রশ্ন নেই, নেই অর্জুনের লক্ষ্য পূরণের অভিলাষ— সবটাই সংঘটিত মহাভারতের সংগঠনে। কৃষ্ণ সেই 'hidden guide'. (Essays on Gita. Complete works of Sri Aurobindo, Vol. 19, 1992)। যে অজ্ঞানতা, যে অহংবোধ নিয়ে আমরা চালিত— সেসব বিচূর্ণ হয় কৃষ্ণের এই স্বার্থরহিত কর্মসম্পাদন প্রত্যক্ষ করলে। আমাদের মধ্যে যে কর্মস্পৃহা যা আত্মসুখ রহিত তাই কৃষ্ণ। খুব সুন্দর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি, বুঝিয়ে বলছেন কীভাবে আমাদের অস্তিত্বে, তা যত সামান্যই হোক না কেন, তা কীভাবে উন্নততর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে কর্মের ব্যাপ্তিতে— কৃষ্ণকে তিনি সেই ত্যাগের সম্রাট বলেছেন— সেই ত্যাগ যা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবতাকেই গুরুত্ব দেয় এবং তাকেই 'এক' বলে গণ্য করে। The Divive Teacher' প্রবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন, 'The Teacher of the Gita is therefore not only the God in man who unveils himself in the word of knowledge but the God in man who moves out whole world of Action, by and for whom all our humanity exists and struggles and labours towards whom all human life travels and progresses. He is the secret master of works and sacrifice and the friend of the human people.' (The Divine Teacher : Essays on Gita. Complete works of Sri Aurobindo. Vol. 19, 1992)।

জগতে আছে একটি বিশ্ববিধান— তেমনি আছেন তার নিয়ন্ত্রক। জীব আছে নিজের উপস্থিতিকে আঁকড়ে ধরে, জীব চলেছে তার আশু প্রয়োজনের কক্ষপথটিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে। শ্রী অরবিন্দ দেখিয়েছেন জীব যখন তার ব্যক্তিগত সীমাসংহতিকে অতিক্রম করে যেতে সমর্থ হয়, তখনই তার মধ্যে বিশ্বমানবতার প্রকাশ লক্ষিত হয়। এই যে অতিক্রমী শক্তি বা মানসিকতা সে একটি আদর্শে স্থিত থাকে। সেই আদর্শ অন্ন-বস্ত্রের মতো প্রয়োজনীয় বিষয় ঘনিষ্ঠ নয়। সেই আদর্শে আছে এক অবিচ্ছিন্ন আন্তরিকতার বোধ। সেই বোধ জাগলেই মানুষ পারবে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে।

'ভবানীমন্দির' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর আত্মোপলব্ধির কথা জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, সর্বভূতে শক্তিরূপে তিনিই অর্থাৎ সেই পরমশক্তিমান বিশ্বম্ভর পুরুষই অধিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে জীবাত্মার ঐক্য বিধানের মধ্যেই আছে সৌন্দর্য। আজকের যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার— আমরা তার মধ্যেও তো শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করে থাকি। কিন্তু 'বিজ্ঞানের শক্তি রাক্ষসের হাতে ভীমসেনের গদার মতো। দুর্বলতার জন্য সে তা তুলতে পারে না, তার চাপে নিজেই মারা পড়ে।' (The Life of Sri Aurobindo - A. B. Purani, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry 1964, P-75)। খুব সুন্দর ভাবে তিনি প্রাকৃত জগতের বিজ্ঞান ও বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রীশক্তি সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন এই প্রবন্ধে।

শ্রীঅরবিন্দ গীতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনের কথা বলেছেন। মানুষ মনোময়। সেই মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মনোময় রাজ্যের মানুষকেই হতে হবে বুদ্ধ, প্রবুদ্ধ এবং সম্বুদ্ধ। অতিমানস অধিমানসের স্তরে যাবে মানুষের মন, যা স্থূল বাসনা কামনায় আবদ্ধ। গীতায় সেই কামনা-বাসনা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিকে দূরে

সরাবার কথাই প্রকাশিত। যে 'Spirit' মানুষের কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে স্বাধীন হতে হবে— এই স্বাধীনতা তো কোনও রাষ্ট্রনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, এর প্রকৃতি ভিন্ন— 'It will be vigilant to illuminate them so that they may grow into the light and law of the spirit, not by supervision and restriction, but by a self searching, self controlled expansion and a many sided finding of their greatest, highest and deepest potentialities, for all these are potentialities of the spirit.' (Sri Aurobindo, Vol. XV, 1971, P-170)। নিষ্কাম বা স্বার্থশূন্য হলেই আলোক প্রাপ্ত মন ঊর্ধ্বতর মানস (higher mind), বিভাসিত মন (illuminated mind) ছাড়িয়ে অধিমানসের (Overmind) রূপরেখা অতিক্রম করে উপনীত হবে অতিমানসের (Supermind) জগতে। কর্মবন্ধন কেটে যাবে তখনই। শ্রীকৃষ্ণের যে কর্ম, তা সম্ভব হয়েছিল নিজের মনকে বশীভূত করতে সমর্থ হবার কারণেই।

স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দ — এঁরা দুজনেই পাশ্চাত্যের শিক্ষা ভাবাদর্শকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু বেদান্ত ও উপনিষদের ঐতিহ্য তাঁদের বোধ ও বোধিকে প্রদীপ্ত করেছে। আলিপুর জেলে ধ্যানমগ্ন শ্রীঅরবিন্দের কাছে সূক্ষ্ম শরীরে বিবেকানন্দের আত্মপ্রকাশ ও যোগ সাধনার সহায় হবার কথা। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন— 'Vivekananda came and gave me the knowledge of intuitive mentality'. (Life of Sri Aurobindo, A.B. Purani, Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry, 1964, P-213)।

বিবেকানন্দ প্রায়োগিক বেদান্তের কথা বলেছেন। গীতা প্রসঙ্গেও তাঁর চিন্তাধারা একই— নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে সমাজ হিতৈষণার দিকটি বারংবার প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর চিঠিপত্র, বক্তৃতাদিতে। সোচ্চারে তিনি ঘোষণা করেছেন— 'যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি।' (বাণী ও রচনা / ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯২)

শ্রীঅরবিন্দ জীবনের সূচনালগ্নে পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খলামুক্তিতে তৎপর হয়েছিলেন বহু সংখ্যক মানুষের হিতকল্পে, সেকথা ঠিক। কিন্তু সেই কর্মযজ্ঞ তাঁর জীবনে শেষপর্যন্ত রক্ষিত হয়নি। প্রবাহিত হয়ে গেছে একটি ভিন্ন খাতে। অন্তরাত্মার পরম প্রকাশ তিনি লক্ষ্য করেছেন পূর্ণ যোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির পরিণাম সেই চৈতন্যের মুক্তিতে অভিব্যক্ত।

শ্রীঅরবিন্দের মতো বিবেকানন্দও আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বারংবার বলেছেন— অরবিন্দ বিবর্তনের স্তরের কথা বলেছেন— আত্মশক্তিতে উদ্বোধিত হওয়া সম্ভব সেই বিবর্তনের স্তরগুলিকে জেনে ও বুঝে।

শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব বিবেকানন্দের আদর্শের ভাবভূমি রচনা করেছিল। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মেলবন্ধনে যে অনন্তরূপকে অধিগত করা সম্ভব, কামনারহিত হওয়া সম্ভবপর তার পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে বিবেকানন্দ চারটি পন্থার কথা বলেছেন— জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও রাজযোগ। মানুষকে অজ্ঞানতা বা স্বল্পজ্ঞানের স্তর থেকে যেতে হবে উন্নততর জ্ঞানলোকে। শ্রীকৃষ্ণের মতোই বিবেকানন্দও বলছেন অন্তঃস্থিত জ্ঞান ও শক্তির কথা। শ্রীকৃষ্ণ গীতাতেও বলেছেন, আমাদের মন বুদ্ধি একেবারে নতুন নয়— আমাদের শক্তি আমাদের মধ্যেই নিহিত। অন্তঃশায়ী সেই শক্তির উদ্ঘাটনেই আমরা আমাদের মানসিক বিন্যাসের পরিমার্জন ঘটাতে পারবো। মনকে সেই জ্ঞান ও বোধের কাছে উপনীত করার কথাই বলেছেন বিবেকানন্দ। বিপরীতে, শ্রীঅরবিন্দ অজ্ঞানতাকে (Ignorance) জ্ঞানের অভাব বলেননি কোনওভাবেই। তাঁর মতে, অজ্ঞানতাও জ্ঞানের একটি রূপ (form)। এই অজ্ঞানতাই supermind -এর স্তরে গেলে উন্নত মনের অধিকারী হওয়া সম্ভব।

বিবেকানন্দ অদ্বৈত দর্শনে প্রত্যয়ী— গীতার তত্ত্বদর্শন অনুসরণ করেও অরবিন্দ পূর্ণ অদ্বৈতবাদে (Integral Dualism) প্রত্যয়ী।

বিবেকানন্দ মনে করতেন, মানুষ স্বভাবতই পূর্ণ। সেই পূর্ণতার পরিস্ফূরণ ঘটাতে চেয়েছেন তিনি, যেভাবে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আস্থিত করেছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে। অন্যদিকে অরবিন্দ মনে করতেন, ঊর্ধ্বায়িত যা পূর্ণতা লাভের আগে মন নির্দিষ্ট কিছু স্তরে প্রস্তুতির অবকাশ রাখে।

কিন্তু উভয়েই মনে করতেন, ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের বিভ্রান্ত করে। গীতায় (২/২৬) কৃষ্ণ যে বলেছেন যা চিরকাল আছে, (সৎ) তা নেই— এটা কখনোই সম্ভবপর নয়; আবার যা কখনোই নেই (অসৎ), তা আছে— সেটিও সম্ভবপর নয়। বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ দু'জনেই মনে করতেন যা কিছু এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, তা আদি অন্তহীন ও অবিনাশী। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর— তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

আধুনিক ভারতে বিজ্ঞান গবেষণা-বিস্তৃতির প্রয়াসে নিবেদিতার ভূমিকা

দেবীপ্রসাদ রায়

নিবেদিতা আধুনিক ভারতে জগদীশচন্দ্র বসু প্রবর্তিত বিজ্ঞান গবেষণার পথকে সুগম ও অর্থবহ করে তুলতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। পরাধীন ভারতে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমস্ত প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি ও জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান জগতের বিচিত্র দিগন্তগুলিকে দৃশ্যমান করে তুলেছিলেন। তাকে বজায় রাখতে এবং সম্প্রসারিত করতে স্বামীজী আবিষ্কৃত ও পরে দীক্ষিত নিবেদিতার অসামান্য ভূমিকার স্মরণ ও মনন আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখে চলা ভারতের এক জাতীয় কর্তব্য। যুগ যুগান্ত সঞ্চিত কুসংস্কারে দীর্ণ, নিজের বিপুল ঐতিহ্য ও পরম্পরা-বিস্মৃত, তন্দ্রাচ্ছন্ন এক জাতিকে জাগ্রত করতে আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শক্তির উন্মেষ চাই—স্বামী বিবেকানন্দ এটা বুঝেছিলেন। পাশ্চাত্য জগৎকে আধ্যাত্মিক শক্তির সন্ধান দেওয়া ও পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক প্রাপ্তিগুলিকে আত্মস্থ করে দীন-দরিদ্র জাতির বৈষয়িক উন্নতি ত্বরান্বিত করার যুগ্ম প্রয়োজনেই স্বামীজী আমেরিকা গেছিলেন। প্রথম ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেই স্বামীজী অধীর হয়ে উঠেছিলেন দেশে বৈজ্ঞানিক চর্চার সুষ্ঠু বাতাবরণ তৈরি করার উদ্যোগ নিতে। কারণ ওই পথেই অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হবে সাধারণ ভারতবাসীর। পরিব্রাজক হিসেবে ভারত ভ্রমণের সময় দীন-দরিদ্র ভারতবাসীর সংস্পর্শে এসে সম্যকভাবে বুঝেছিলেন 'এক মুঠো ছাতু খেতে পেলেই এরা জগত উল্টে দিতে পারে', আর এই জগৎ ওল্টানো কাজটাই তো তাঁকে এদের দিয়ে করাতে হবে।

এই খোঁজাটাই স্বামীজীর সামনে এনে দিল ইংলন্ড ভ্রমণকালে মার্গারেট এলিজাবেথ নোবলকে ১৮৯৫ সালে। মার্গারেট নোবল স্বামীজীর বক্তৃতায়, বক্তব্যের আন্তরিকতায়, দৃঢ়তায়, আস্থা উৎপাদনের ক্ষমতায় বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে স্বামীজীকে তাঁর গুরু বলে ভাবতে

শুরু করলেন। সেই সময়কার ভারতবর্ষের সার্বিক প্রয়োজন বুঝতে এবং তদনুযায়ী কর্মে প্রবৃত্ত হতে এই বিদুষী ভয়হীন মহিলাকে স্বামীজীও চিনতে ভুল করেননি। তৎকালীন ভারতবর্ষের প্রয়োজনে, সেখানকার শত দুঃখ কষ্ট ঝুঁকি সব কথা পুঙ্খানুপুঙ্খ জানানোর পরও এই মার্গারেট নোবল ভারতবর্ষে যেতেই মনস্থ করলেন। ভাবের ঘোরে কোনও অলীক কল্পনার শিকার না হয়ে কাজ করার ব্রতে ব্রতী হওয়ার জন্য স্বামীজীর সাবধানবাণীকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করেই মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ১৮৯৮ সালের এক বৃষ্টি-ঝঞ্ঝামুখর প্রাতে মোম্বাসা নামক জাহাজে রওনা হয়ে কলকাতা এসে পৌঁছলেন ২৮ জানুয়ারি। স্বামীজী স্বয়ং তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। ২২ ফেব্রুয়ারি স্বামীজী তাঁকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনকক্ষে, স্বামীজীর তীর্থক্ষেত্রে এবং বিশ্বমানবতাবোধ উন্মেষের পীঠস্থানে। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে পরিচিতি ঘটনানোর জন্য স্বামীজী ১১ মার্চ, তাঁর সভাপতিত্বে স্টার থিয়েটারে নোবলের এক বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ইংলন্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক প্রভাব'। অসাধারণ সাফল্য পেলেন, অভিনন্দিত হলেন বিপুলভাবে। ১৭ই মার্চ শ্রীশ্রীমা'র সঙ্গে মার্গারেট নোবলের সাক্ষাৎকার হলো। সবাইকে অবাক করে শ্রীমা নোবলকে আপন করে নিলেন। ২৫ মার্চ স্বামীজী দীক্ষা দিলেন মার্গারেট নোবলকে। নাম দিলেন নিবেদিতা। পরবর্তীকালে ভারতের ভগিনী নিবেদিতা। গুরু-শিষ্য পরম্পরার ইতিহাসে এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কারণ এই নামকরণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিবেকানন্দের এক সাফল্যমণ্ডিত এবং সাফল্যবহনকারী নামকরণ।

দীক্ষা নেবার পরই নিবেদিতা চাইলেন শিক্ষিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মসমাজে একটা প্রবেশপথ পেতে, স্বামীজী প্রকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছতেই। তিনি জানতে পেরেছিলেন স্টার থিয়েটারের সভায় জগদীশচন্দ্রের উপস্থিতির কথা। জগদীশচন্দ্র, ড: প্রসন্নকুমার রায়, রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ ব্রাহ্ম ব্যক্তিত্বের এবং তরুণ ব্রাহ্মদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য নানা পরিকল্পনা মাথায় খেলত তাঁর। ১৮৯৯ সালে বিবেকানন্দও নিবেদিতাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 'Make inroads into the Brahmos'। ব্রাহ্মরা বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ ভাবাদর্শর প্রবল সমালোচক-বিরোধী ছিলেন প্রায় সবাই। এর মধ্যে জগদীশচন্দ্রর সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ তাঁর আগেই ঘটেছিল ১৮৯৮ সালের প্রথম দিকে। তবে ব্রাহ্ম হিসেবে নয়, ইউরোপে হুলস্থূল ফেলে দেওয়া বিজ্ঞানী হিসেবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসেবে, প্রেসিডেন্সি কলেজ কম মাইনে দেওয়ার প্রতিবাদে বেতন না নেওয়া। গবেষণাগারের ন্যূনতম সুবিধা না দেওয়াতে মাত্রাতিরিক্ত ক্লাসের বোঝা চাপানো, গবেষণার সময় না দেওয়া— এসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাইক্রোওয়েভ সৃজন, প্রেরণ এবং গ্রহণের

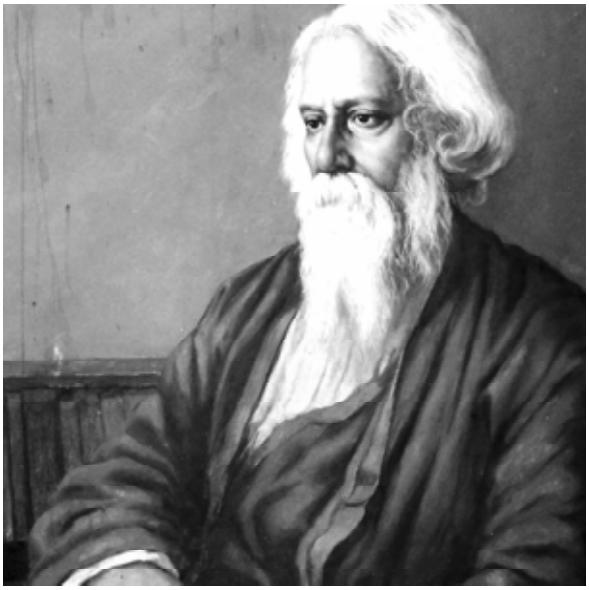

নিজ নির্মিত যন্ত্রাদির সাহায্যে যে চাঞ্চল্যকর সাফল্য পেয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তাঁর খবর ইংলন্ডেও এসে পৌঁছায়। র‍্যালে, লর্ড কেলভিন প্রমুখের প্রশংসা, তাঁর কার্যকলাপ নিবেদিতার কাছেও পৌঁছায় লন্ডনের বিখ্যাত সিমেস ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে। ততদিনে স্বামীজীর সান্নিধ্যে এসে ভারতীয়ত্বকে গ্রহণ করতে উন্মুখ ছিলেন নিবেদিতা। সুতরাং ভারতে এসে সেই জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল তো থাকবেই। নিবেদিতা সারা বুলকে নিয়ে জগদীশচন্দ্র বসুর ল্যাবরেটরিতে এসেছিলেন। স্বামীজীর কাছ থেকে নবলব্ধ অদ্বৈত তত্ত্ব ও বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তাতেই উদ্দীপ্ত নিবেদিতার মন আকর্ষিত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলনের প্রশ্নে বিবেকানন্দের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দও যেমন, নিবেদিতাও তেমন ভারতের প্রয়োজনে জগদীশচন্দ্রের ভারতীয় দর্শন আধারিত বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে আন্তরিক সহযোগিতা করেছিলেন। বসুর মতো একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কাজ করতে দেখে নিবেদিতা ক্ষোভে দুঃখে মর্মাহত হতেন। নিজ জাতির সভ্যতার বড়াই যেন তাকে ব্যঙ্গ করত। ১৮ এপ্রিল ১৯০৩, তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "The College routine was made as orduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation and every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence and flags misrepresentation."

নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অর্থাভাবে পীড়িত জগদীশচন্দ্রকে তিনি সন্ত্রান্ত

প্রতিপত্তিশালিনী মহিলা স্বামীজী-শিষ্যা সারা বুলের সঙ্গে পরিচিত করানোর উদ্যোগ নিলেন। সারা বুল ছিলেন বিখ্যাত বেহালাবাদক ওলি বুলের বিধবা পত্নী। সারা বুলকে নিবেদিতা জানালেন, ভারতীয় বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রয়োজন। আবার জগদীশচন্দ্রকে বললেন, 'তুমি তাঁকে চিঠি লিখে তোমার কাজের কথা, আশা আকাঙ্ক্ষার কথা জানাও। কিছু লুকিও না। তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আছেন, একটু সাড়া পেলেই তিনি তোমার পাশে দাঁড়াবেন। তোমার শক্তিতে তাঁর আস্থা আছে।'

সৌজন্যে : বোস ইন্সটিটিউট

ঠিক সেটাই হয়েছিল। ১৯০৪ সালে সারা বুল এবং নিবেদিতার চেষ্টায় জগদীশচন্দ্র রাজি হলেন তাঁর 'গ্যালিনা ক্রিস্টাল ডিটেক্টর'-এর পেটেন্ট নিতে। বসু পেটেন্ট নেবার বিরোধী ছিলেন খুব— মানুষের জ্ঞানকে নিয়ে ব্যবসা করতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাই এর বাস্তব প্রয়োজন বুঝে বিবেকানন্দ বসুকে অনুরোধ করলেও বসু রাজি হননি। কিন্তু সারা বুল ও নিবেদিতার ঐকান্তিক প্রয়াসে তা সম্ভব হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা প্রবন্ধগুলি যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য সময়ে প্রকাশিত হতে পারছিল না আর্থিক কারণ ছাড়াও কিছু সংকীর্ণচিত্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানীর জন্য। তাই নিবেদিতা এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন। জগদীশচন্দ্রের গবেষণালব্ধ ফলগুলিকে লিখিত রূপে দিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হলেন। আয়ারল্যান্ডের বুদ্ধিদীপ্ত এলিট সমাজে এক সময়ে তাঁর বৌদ্ধিক আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতায় বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকাটা কোনওভাবেই তাঁর আগ্রহকে অবদমিত করতে পারেনি। বরং যে মুন্সিয়ানায় তিনি সেগুলি করেছিলেন তা ভারতের সার্বিক উন্নয়নপ্রয়াসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কোনও একটি দিকও তাঁর সচেতন সংযুক্তি থেকে দূরে থাকেনি। অবশ্য মাঝে মাঝে একটা অপরাধবোধ তাঁকে পীড়া দিত। স্বামীজীর একসময়ে কাঙ্ক্ষিত ও প্রকাশিত ইচ্ছে যে, রামকৃষ্ণভাব আন্দোলনের সঙ্গে নিবেদিতার যুক্ত থাকা, তা ব্যাহত হচ্ছিল। ১৮৯৯ সালের ১৮ এপ্রিল স্বামীজীর সঙ্গে দুপুরের আহারের সময় নিবেদিতা তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বর কথা ব্যক্ত করলে স্বামীজী বলে ওঠেন, "You just keep as you are"। নিবেদিতা আশ্বস্ত হলেন এটা জেনে যে, ভারতে বিজ্ঞানচর্চাকে সাহায্য করাটা ভারতীয়ত্ববোধ জাগ্রত করারই অঙ্গ। নিবেদিতাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বামীজীর আর একটি দৃষ্টিভঙ্গি— ''আমার উদ্দেশ্য রামকৃষ্ণ নয়; বেদান্ত নয়, আমার উদ্দেশ্য সাধারণের মধ্যে মনুষ্যত্ব আনা।''

২৫ জুন, ১৮৯৯, স্বামীজী আমেরিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য বেরিয়ে পড়লেন। এবার নিবেদিতাও সঙ্গী হলেন। উদ্দেশ্য তাঁর বাগবাজার স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে বেশ কিছুদিনের জন্য সম্পর্করহিত হলেন। কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল, প্যারিসে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও সম্মেলনের সংগঠক Patric Geddes তাঁর সেক্রেটারি হওয়ার জন্য নিবেদিতাকে আহ্বান জানান। এই আহ্বান নিবেদিতার বৌদ্ধিক অবস্থানের স্বীকৃত মান নির্দেশ করে। নিবেদিতা কিন্তু সম্মেলনের আগেই ভারতে ফিরতে মনস্থ করে তাঁর অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সম্মেলনের ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ ফিজিসিস্ট-এ জগদীশচন্দ্র বসু এবং ইতিহাস ও ধর্ম শাখায় স্বামীজীর আমন্ত্রণ থাকায় শুভানুধ্যায়ীদের পীড়াপীড়িতে সেক্রেটারি হতে রাজি হন। জগদীশচন্দ্র বসুর বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর অসাধারণ সাফল্যে চমৎকৃত স্বামীজীর সেই উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য, ''..এ মহাকেন্দ্রের ভেরিধ্বনি আজ যাঁর নাম উচ্চারণ করবে, সে নাদতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্বদেশকে সর্বজনসমক্ষে গৌরবান্বিত করবে। ... সমগ্র বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর শীর্ষস্থানীয় আজ জগদীশচন্দ্র বসু— ভারতবাসী, বঙ্গবাসী ধন্য বীর।''

সেপ্টেম্বর ১৯০০, ব্রডকাস্ট ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনে প্যারিস বক্তৃতারই অনুরূপ একটি বক্তৃতা দেন জগদীশচন্দ্র বসু। এরপরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হন। নিবেদিতা ও মিসেস বুল এই সময় আগলে রেখেছিলেন বসু-দম্পতিকে। বসুর বৈজ্ঞানিক পেপারের অনুবাদের সঙ্গে আর একটি গুরুতর আশ্চর্য কাজ নিবেদিতার উপর বর্তায়, তা হলো রবীন্দ্র সাহিত্যের অংশবিশেষ ইংরেজি অনুবাদ। বেরিয়ে এল ইংরেজিতে অনূদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' গল্প। বসুর বিজ্ঞান প্রকল্পগুলির উপস্থাপন এবং রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ দুই-ই সমানে চলেছিল দিনরাত এক করে। বসু ১০ মে ১৯০১ সালে ইংলন্ডের রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে জীব ও জড়ের ঐক্য সেতু সংক্রান্ত গবেষণা পত্রটি পেশ করেন। নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভার আনুপূর্বিক বিরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র

With Best Compliments from-

A
Well
Wisher

(NG)

With Best Compliments from-

TANTIA CONSTRUCTIONS LTD.

Registered & Corporate Office
DD-30, Sector -I,
Salt Lake City, 7th Floor
Kolkata - 700 064
Tel. : +91 33 4019 0000
Fax : +91 33 4019 0001

Delhi Office :
112, Uday Park, 2nd Floor
August Kranti Marg
New Delhi - 110049
Tel. : 011-40581302

Best Compliments from-

ELGA PAINTS & POLYMERS

Manufacturer of

Quality Paints & Ancillaries

30D, Diamond Harbour Road
Kolkata - 700060
Phone : 033 2406 2431

দিয়েছিলেন নিবেদিতা, তার বঙ্গানুবাদ-নির্ভর একটি রচনা 'আচার্য জগদীশের জয়বার্তা' নামে 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধ জানিয়ে দেয় কী পরিমাণ শ্রদ্ধায় বসুর বক্তৃতা বর্ণিত হয়েছিল মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে সে চিঠির অংশ বিশেষ : ''মাঝে মাঝে তাঁহার (বসুর) পদবিন্যাস গাম্ভীর্যে এবং সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিল। মাঝে মাঝে তিনি সহাস্য সুনিপুণ পরিহাস সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরল ভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা প্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন। তাহার পরে বিজ্ঞান শাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ নিরূপক সংজ্ঞা ছিল তাহা তিনি মাকড়সার জালের মতো ঝাড়িয়া ফেলিলেন... ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহত ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিককালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলক সঞ্চার হইল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। মনে হইল যেন বক্তা নিজের নিজত্ব আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন— কেবল তাঁহার দেশ ও তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ... আমরা অনুভব করিলাম যে এতদিন পরে ভারতবর্ষ শিষ্যভাবে নহে, সমকক্ষভাবেও নহে— গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞান শ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল, পদার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।"

জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্তিগুলিকে যুব সমাজের মধ্যে অনুপ্রেরণা জোগাতে, সর্ব প্রযত্নে তুলে ধরতেন নিবেদিতা। অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ওদেশে ভালো চাকরির সুযোগ পেয়েও বসু তা নিলেন না। আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষ। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন ধন্য হইবে।" নিবেদিতা এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি হয়ে ব্রিটিশ সরকারের কৃপাপ্রার্থী না হয়ে নিজস্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভাবনায় মগ্ন হলেন। এবং চমৎকৃত হওয়ার কথা, সারা বুল এর যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিলেন। বলা বাহুল্য, এই লক্ষ্যেই একদিন নিবেদিতা সারা বুল-জগদীশচন্দ্র সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন হয়তো। ১৯০১ সালে ইংলন্ডে থাকার সময় থেকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার কাজে সাহায্য করতে শুরু করেন। ১৯০২ থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ড: বসুর তিনটি বই— 'Response in the living and nonliving', 'Plant Response' এবং 'Comparative Electrophysiology' প্রকাশিত হয়। এছাড়া ধারাবাহিক ভাবে বসুর প্রবন্ধগুলি রয়্যাল সোসাইটি পরিচালিত Philosophical Transctions-এ প্রকশিত হয়। এ সবগুলিই নিবেদিতার সম্পাদিত শুধু নয়, নিবেদিতার অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য প্রবন্ধগুলিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ভারতে এসেও এই কাজে দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন নিবেদিতা। বসু প্রতিদিন বোসপাড়া লেনে আসতেন এবং বহুক্ষণ ধরে লেখালেখি চলত। বসু নিজে তাঁর প্রেরণা যোগানো নিবেদিতা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'হতাশ ও অবসন্ন বোধ করলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম।' নিবেদিতার জীবনীকার লিজেল রেঁম জানিয়েছেন, Plant Response তাঁদের যৌথ উদ্যোগে ছাপা হয়। বসু তাঁর মনের ভাবনাগুলির খসড়া একটা কাগজে লিখে রাখতেন। পরদিন দেখতেন সেগুলি যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। বলাবাহুল্য, নিবেদিতার দ্বারাই। নিবেদিতার সম্পাদনায় জগদীশচন্দ্রের প্রথম বই Response in the living and nonliving-এর শুরুটা ছিল খুবই উত্তেজনাপূর্ণ। ১০ মে ১৯০১ সালে ইংলণ্ডে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে বিশ্বের তাবড় বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর বক্তৃতা Response in the living and nonliving। বিপুল আলোড়ন উঠল বসুর প্রামাণিক প্রদর্শনীতে। তবুও নানা ঈর্ষান্বিত বিজ্ঞানীর বিরোধিতায় রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে তা প্রকাশিত হয়নি। অনেক টালবাহানার পর

সোসাইটির পক্ষ থেকে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত জানায়। মানের বিচারে দ্বিতীয় শ্রেণীর জার্নাল লিনিয়ান সোসাইটির জার্নালে (মার্চ ১৯০২) প্রকাশে বাধ্য হন বসু। মধ্যবর্তী সময়ে রয়্যাল সোসাইটি বক্তৃতা থেকে তথ্য নিয়ে ড: ওয়েলার নামে এক বিজ্ঞানী বসুর গবেষণার অগ্রগতিগুলি নিজের নামে অন্য জার্নালে প্রকাশ করে দেন। নীচতার এই উদাহরণে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় বসু নিবেদিতা ও সারা বুলের সোৎসাহে নিজ উদ্যোগে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত নেন। নিবেদিতা তো বসুকে বলেই রেখেছিলেন, আমার কলম অনুগত ভৃত্যের মতাই তোমার কাজ করবে। মানসিক এই অবস্থায় বসু রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (ভাষান্তরে)

''বন্ধু,

প্রিন্স ক্রোপটকিন সেদিন বিশেষরূপে আমার সমস্ত পরীক্ষা দেখিয়াছেন। তাঁর ন্যায় মনীষী ইউরোপে দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, 'আপনার Experiment এবং Argument পরম্পরার মধ্যে সূচাগ্র প্রবেশ করবার ছিদ্র নাই। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।''

—তোমার জগদীশ

রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি স্যার উইলিয়ম ক্রুকস প্রমুখ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব পরীক্ষাগারে এসে পরীক্ষাগুলি দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। পরে ১৯২০ সালে রয়্যাল সোসাইটি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল জগদীশচন্দ্র বসুকে F.R.S. করে।

ভারতে ফেরার তাগিদ অনুভব করলেও প্রথম গ্রন্থটির কাজ শেষ করার জন্য জগদীশচন্দ্র ও সারা বুল জেদ করতে থাকেন ইংলন্ডে আরও কিছুদিন থাকতে। ওদিকে স্বামীজী স্বয়ং নিবেদিতার ভারতে প্রত্যাবর্তন চাইছিলেন। তখন ইংলন্ডে থাকা রমেশচন্দ্র দত্ত, জগদীশচন্দ্রের বন্ধু এবং স্বামীজীরও আত্মীয়, স্বামীজীকে পত্র দেন, ''ভারতের মঙ্গলের জন্যই নিবেদিতার ভারতে ফিরে যাওয়া আপনার স্থগিত করা উচিত।'' নিবেদিতা দ্রুত গতিতে আরব্ধ কাজ শেষ করলেন এবং সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে লিখে চললেন— ইংলন্ডের বিখ্যাত Reviwe of Reviews তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। ১৯০২ সালেই বইটি প্রকাশ সম্ভব হয়। জগদীশচন্দ্রের কাজের প্রচারে সদা তৎপর থাকতেন নিবেদিতা। ভারতে ফেরার পর ১৯০২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজের মহাজন কক্ষে তিনি বলেন, ''আসুন, মাতৃভূমির অপর এক বিশ্বস্ত সন্তানের কথা বলি, যিনি বহু দূরে একাকী কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁকে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ থেকে স্মরণ করা প্রয়োজন প্রতিদিনের প্রেমে ও প্রার্থনায়। আমি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কথাই বলছি।'' বিবেকানন্দের দেহত্যাগের পরও তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারের জন্য ভারত পরিক্রমাকালেও জগদীশচন্দ্রের কাজ সম্পর্কে অবহিত রাখার প্রয়াসে নিরলস থাকতেন। ২৬ অক্টোবর ১৯০২ সংখ্যা The Indian Social Reformer জানাচ্ছেন, Sister Nivedita gave the students of Bombay the otherday a view of the discoveries of Prof. Bose"। ১৩ অক্টোবর ১৯১১ এই আলোক শিখা নিবেদিতার জীবনাবসান হলো। কোনও দেশের জন্য কোনও ব্যক্তি, মহিলা বা পুরুষ অন্যত্র জন্মেও সেই দেশের জন্য এতটা ভাবতে পারেন, এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে পারেন, এতটা সংগ্রাম করতে পারেন, এতটা দুঃখ দুর্দৈব ঝুঁকি বরণ করে নিতে পারেন, এতটা ভালবাসতে পারেন নিবেদিতার উদাহরণ না থাকলে ভাবাই যেত না। ভারতবাসীর সৌভাগ্য, এমন একজনকে তারা পেয়েছেন। ভাবতবাসীর দুর্ভাগ্য যে এমন মানুষের যথাযথ মূল্যায়ন তারা সর্বাংশে করতে পারেনি, আজকের অতিপ্রয়োজনীয় সময়েও পারছে না। এবারে এই প্রবন্ধের উপসংহারে আসা যেতে পারে। ১৮৯৯ থেকে ১৯১১ — এই বারো বছর মাত্র জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে নিবেদিতার সংযোগ ও সম্পর্ক। কিন্তু এই বারো বছরেই নিবেদিতা-সৃষ্ট অনুপ্রেরণা জগদীশচন্দ্রের বাকি গবেষণা জীবনে যে প্রভাব বজায় রেখেছিল তা যেমন ব্যাপক যেমন সুগভীর তেমনই সৃজনমুখী। বিজ্ঞান গবেষণার লব্ধ তত্ত্বতথ্য, তার প্রকাশ প্রচার ও সংরক্ষণের যে বাস্তব প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁর মাত্র বারো বছরের কর্মচঞ্চল জীবনে বলে গিয়েছিলেন তা ভারতীয় গবেষকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ বলে ভাবা যেতে পারে। তা ঠিকমতো হৃদয়ঙ্গম হয়নি বলে যেমন ভুগেছিলেন, বঞ্চিত হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র তেমনই হয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে। ভারতে নিবেদিতার কর্মপ্রয়াস-চরিত্র বিশ্লেষণ যত হবে ততই আমাদের বিজ্ঞানীরা বাস্তব সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করবেন। ৩০ নভেম্বর ১৯১৭ বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জগদীশচন্দ্রের স্বপ্ন ও নিবেদিতার লক্ষ্য পূরণ হলো, হয়তো আশা করি নিবেদিতার আকাঙ্ক্ষাও পূরণ হয়েছিল সেদিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ''মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোৎসব আজ হে, শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে...''

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দ্বারদেশে দেওয়ালের গায়ে খোদিত দীপহস্তে নারীমূর্তিটি নিবেদিতার পুণ্য স্মৃতি এবং তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধার নিদর্শন। অধ্যাপক গেডিস লিখেছেন, ''বিজ্ঞান ও ভারতের বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ বহু কাঙ্ক্ষিত এই গবেষণাগারের বাস্তব রূপ গ্রহণে নিবেদিতার জ্বলন্ত বিশ্বাস কম প্রেরণা ও উৎসাহ দেয় নাই। তাঁহার (বসুর) গবেষণাগারের প্রবেশপথে সম্মুখস্থ মন্দিরাভিমুখে দীপ্তহস্তে নারীমূর্তিটির এই ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।''

তথ্যসূত্র : (১) উদ্বোধন, কার্তিক, ১৪২৩ (২) দেশভক্তের চিঠি, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪২২ (৩) বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ, শংকরী প্রসাদ বসু (৪) Nivedita of India - RKM Institute of Culture - Gol park, Kolkata.।

আরব সভ্যতায় ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যার অবদান

সৌমেন নিয়োগী

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে হজরত মহম্মদের এক বৈপ্লবিক ও বিস্ফোরক একেশ্বরবাদ মন্ত্রশক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে শুষ্ক মরুভূমির আদিম বর্বর জীবনচারী, ছন্নছাড়া, ক্ষুধার্ত বেদুইন আরবরা মহাপরাক্রমে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে পৃথিবীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে। তাদের এই ভূমিকা ঐতিহাসিক দিক থেকে এক চমকপ্রদ ঘটনা। আরবদের এই নতুন একেশ্বরবাদী উন্মত্ত ধর্মান্দোলনের মহাপ্লাবনের ফলে নবির মৃত্যুর মাত্র ১১৮ বছরের মধ্যে ইউরোপের স্পেন, উত্তর আফ্রিকা-সহ এশিয়ার পূর্বদিকে ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত প্রাচীন পৃথিবীর এক বিস্তীর্ণ জনপদ ইসলামের বিজয় পতাকার তলে চলে আসে। সুবিশাল এই সাম্রাজ্যের ঐক্যতান নিহিত ছিল তাদের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্ব। সুতরাং ধর্মের নিয়ম ও অনুশাসন অনুসারে সঠিক সময় মতো উপবাস শুরু বা ভাঙতে গেলে প্রয়োজন চন্দ্রের অবস্থান ও গতি সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান। এবিষয়ে বলে রাখা প্রয়োজন, ইসলামের আবির্ভাবের বহু আগে থেকেই প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে আরবভূখণ্ডের মানুষদের কাছে 'চন্দ্রের' এক বিশেষ তাৎপর্য ছিল। কাজেই মুসলমানদের প্রার্থনার রীতি অনুযায়ী তাঁদের প্রার্থনার সঠিক স্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। যার ফলে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা হেতু সঠিক দিক্ নির্ণয়েরও প্রয়োজন দেখা দিল। সহসা এই প্রয়োজনীয়তার অনুভবের ফলেই ধর্মীয় গোঁড়ামির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে আরবদের জ্যোতিষচর্চায় মনোনিবেশ ঘটে, মূলত আব্বাসীয় খলিফাদের রাজত্বকালে (৭৪৯-১২৫৮) বাগদাদকে কেন্দ্র করে মুক্তাজ্জীলা প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে। যেখানে বিজিত জাতিদের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুক্ত চিন্তার ফল্গুধারার অনুপ্রবেশের ফলেই সমৃদ্ধ হতে থাকে আরব জাতি ও তাদের সভ্যতা। The development of Muslim learning and science reached its culmination during the period of the Abbasid Caliphs (749-1258) on their centre at Baghdad and has been termed by Prof. Bronne as the period of Philosophical and Cosmopolitan Islam. In this period Muslim

Best Compliments from-

Basudeo Lohia
Charity Trust

Kolkata

Best Compliments from-

A
Well
Wisher

civiliation became the inheritor of the ancient wisdom of Assyria, Babylon, Persia, India and Greece.

বাগদাদের খলিফা

''খলিফা আল্ মানসুরের সময় আরবদের সিন্ধু বিজয়ের (৯৫৩-৯৯৮) পর ভারতীয় পণ্ডিতদের সহিত আরব্য পণ্ডিতদের সাক্ষাৎকার ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবের আদান-প্রদানের আর এক সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত' বা 'সিন্ধহিন্দ', খণ্ডখাদ্যক বা 'অর্কন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থ এই সময় আরব পণ্ডিত মহলে প্রসার লাভ করে। ইব্রাহিম আল ফাজারি ও ইয়াকুব ইরন্ তারিক নামক দুই আরব্য গণিতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে ব্রহ্মগুপ্তের দুই জ্যোতিষীয় গ্রন্থের আরবি তর্জমা প্রণয়ন করেন। এই তর্জমার ফলে ভারতীয় গণিত ও জ্যোতিষ ইসলামিক জগতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এই দুই শাস্ত্রে আরব্য গবেষণার পথ উন্মুক্ত করে। "It was on this occassion that the Arabs first became acquainted with a scientific system of astromony. They learned from Brahmagupta earlier than from Ptolemy"। (তথ্যসূত্র— বিজ্ঞানের ইতিহাস - সমরেন্দ্রনাথ সেন)। ব্রহ্মগুপ্ত হিন্দু ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র উজ্জয়িনীতে ৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র তিরিশ বছর বয়সে মূলত সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভট্টের গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্ম-স্ফুট-সিদ্ধান্ত'। পরে খ্যাতি দেশের সীমানাকে অতিক্রম করে বিদেশেও যথেষ্ট ব্যাপ্ত হয়েছিল। আরবভূমিতে তাঁর এই 'সিন্ধহিন্দ' ও 'অর্কন্দ' নামে প্রচলিত হয়ে আরবদের জ্যোতিষ চর্চায় অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তাই George Sarton তাঁর Introduction of the History of Science, Vol.1 গ্রন্থে বলেছেন— "One of the greatest Scientists of His race and the greatest of his time" (তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস - সমরেন্দ্র সেন)। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় ঋষি পরম্পরায় জাগতিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে সঠিকভাবে সম্পন্ন বা সামাজিক, ধর্মীয় যে কোনও আচার অনুষ্ঠানকে যথার্থভাবে পালন ও প্রণয়নের জন্য জ্যোতিষের জ্ঞান ও কালনির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক হিসেবে মনে করেছিলেন। যার ফলস্বরূপ কাল গণনাসহ বিভিন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার উৎসাহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এইরকম জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ও অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিন্দু ভারতের উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান। হিন্দু মনীষার সময়ের সেই শেষ পথে যা সময়ের ঊর্ধ্বে তা অনন্ত তাই সেই অনন্তের অন্তরালে সময়কে বৃত্তীয় /বৃত্তাকার পরিমণ্ডল ধার্য করে নিয়ে সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করার নিমিত্তে সময়কে বিভিন্ন কল্পে বিভাজনের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করেছে। সেই অতীন্দ্রিয় দার্শনিক চিন্তনের ফলেই উজ্জয়িনীর মহাকালের আবির্ভাব। উজ্জয়িনীতে মহাকালের প্রকৃত স্থান প্রাচীনকালের পৃথিবীর প্রধান মধ্যরেখা (prime meridian) এবং কর্কটক্রান্তি রেখার (Tropic of cancer) ছেদবিন্দু হওয়ার জন্যই সমস্ত রকম কালগণনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। উজ্জয়িনী হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের ভূ-জ্যোতিষ গণনার এক আদর্শ স্থান। কাজেই খুব সঙ্গত কারণেই উজ্জয়িনীতে জ্যোতিষচর্চা অত্যন্ত প্রাচীন এবং যথার্থ বৈজ্ঞানিক। যার প্রশস্তি সুদূর দেশবিদেশে সমাদৃত ছিল। হিন্দুদের এই গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান আরবদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। "Notable Indian influence is evidenced from Al-Fazaris Kitab-ul-Zij (tablets) complied in the second half of the eighth century A.D. The cupola of the earth (Qubbatul Ayin) recorded as Arin which according to Kramers is a corrupt reading of Ujjayini (Ujjain) and points to the direct Indo-Arab contact in the field of astromony".

চন্দ্রের নিয়মিত ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ ঘটিত চন্দ্রকলার বৃদ্ধি ও হ্রাসকে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চন্দ্রদিন, মাস ও গ্রহণ ইত্যাদিকে সঠিকভাবে গণনা করার পদ্ধতি আরবরা ভারতীয়দের কাছ থেকে আয়ত্ত করেছিল। হিন্দুদের থেকে প্রাপ্ত গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আধার থেকেই সম্ভব হয়েছিল। যার ফলে আরবেরা ভূগোল, রসায়ন ও সমুদ্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ভারতীয় জ্যোতিষের প্রভাব আরবদের মধ্যে এতটাই অনুভূত হয়েছিল, যার ফলে— 'ফ্লেরিয়ান ক্যাজরি লিখিয়াছেন, ৭৭২ খ্রিস্টাব্দে এক হিন্দু জ্যোতিষ আল্-মান্ সুরের সভায় আসেন এবং হিন্দুদের সিদ্ধান্ত, জোতিষীয় তালিকা ও গণনার কথা খলিফার নিকট জ্ঞাপন করেন। খলিফা হিন্দুদের এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিয়া আরবি ভাষায় তর্জমা করার আদেশ দেন। আরব্য গণিতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কারা-দ্যভোও বাগদাদে খলিফার সভায় এক হিন্দু

জ্যোতিষীর উপস্থিতির কথা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই জ্যোতিষীর নামোল্লেখ করিয়াছেন মঙ্কা' (তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস)। পরবর্তীকালে বার্মাক বংশীয়রা যাদের পূর্বপুরুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে বৌদ্ধ ছিলেন সেই জ্ঞানের ধারাকে অব্যাহত রেখেছিলেন খালিফা হারুন-অল্ রসিদের সময় পর্যন্ত। চন্দ্রের সঠিক অবস্থান ও ধর্মীয় প্রার্থনা ইত্যাদির সঠিক দিক নির্ণয়ের জন্য আরব মুসলমানদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ্যা ও জোতিষ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণের জন্য প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ার ফলে ৮০৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সহায়তায় বাগদাদ ও দামাস্কাসে মানমন্দিরে (Astronimical observatory) প্রতিস্থাপন করা হয়, যা পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও বর্তমান ছিল না, যার ফলে নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাগদাদের বাব্-আত্-তাকে মানমন্দিরে মুসা ভ্রাতৃত্রয় তাঁদের গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক অন্বেষণের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যের দৃষ্টান্ত রেখে যেতে সক্ষম হন।

খলিফা আল্-মামুনের সমসাময়িক 'মহম্মদ ইবন মুকা আল্ মোয়ারিজমি' খলিফার ইচ্ছা অনুসারে টলেমির জ্যোতিষীয় পর্যবেক্ষণ ও তালিকা পুনঃপরীক্ষা করেন ও ভারতীয় সিদ্ধান্তের আলোচনা ও ব্যাখ্যা রচনায় মনোনিবেশ করেন। কার্যত আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব সাম্রাজ্যের রাজধানী বাগদাদে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা ধারার জন্ম ও সুনাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার ভিত্তিই ছিল ভারতবর্ষ। "The Baghdad school represented the Indian scientific approach and spirit"। খলিফা আল-মামুনের গ্রন্থাগারে নিযুক্ত এই আরব জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মিশনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে তিনি সম্ভবত ভারতবর্ষ ও গান্ধার প্রদেশে পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং তার ফলেই ভারতীয় গণিত ও জোতিষের সঙ্গে তার পরিচয় ও সম্পর্ক হয়। আরব দেশে আব্বাসীয় খলিফাদের অনুপ্রেরণায় ও তাদের মুক্তচিন্তনের ফলে জ্যোতিষ, গণিত-সহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতিসাধন হয়েছিল যার মধ্যে অন্যতম প্রতিথযশা মুসলমান বিজ্ঞানী আবু রৈহান মহম্মদ ইবন অহমদ আল্-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮)। তিনি আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীর রচনা ও জ্ঞান আহরণ করেন এবং আল্-কানুন আল্-মাসুদি নামক এক জ্যোতিষীয় বিশ্বকোষ রচনা করেন। তাই ভারতীয় কালগণনা ও জ্যোতিষ চর্চার যে জ্ঞান উজ্জয়িনীতে সুদুর অতীতে ঋষি প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়, সারা বিশ্বে বিশেষ করে, আরবভূমিতে যেভাবে বিস্তার ও প্রসারিত হয়, তার ফলে পরবর্তী আরব পণ্ডিতরা জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের জ্ঞানে প্রভূত সাফল্য লাভ করেন ও তার প্রসারণ করেন। কাজেই আরবদের জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার অবদান অনস্বীকার্য যা ক্রমশই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হতে চলেছে।

তথ্যসূত্র : বিজ্ঞানের ইতিহাস — সমরেন্দ্রনাথ সেন।
India's Contribution to world thought & Culture.

মহাকাল মন্দির, উজ্জয়িনী

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

অধ্যাপক জয় সেন

উত্তরে অনন্তের প্রতীক— প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর শ্বেত ধবল হিমালয়। পূর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে নীল মহাসাগরের বিস্তৃত প্রসার। মধ্যে নদ ও নদীর প্রবাহ ও পবিত্র অববাহিকা। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র এই আর্যাবর্তকে পশ্চিম ও পূর্বপ্রান্তে ধারণ করে আছে। মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা অবশেষে সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরাজ সাগরসঙ্গমে এসে মিশেছে। এই আমাদের সনাতন ভারতবর্ষ। আর্যাবর্ত— চিরন্তন দেবভূমিরূপে খ্যাত। ঋষি-মহর্ষিদের যুগে যুগে কল্পে-কল্পে নিত্য তপস্যার স্থান। মানব-বিকাশের ও বিবর্তনের বিরাট পথ ধরে এই দেশের মানুষ তাই অন্তর্মুখী। যুগ-প্রয়োজন বৈদিক ও উপনিষদিক যুগদ্বয়ের পরে আজ অবধি সেই ধারা অব্যাহত ও প্রবাহিত আছে।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—

''ভূমধ্যসাগরের পূর্বকোণে সুঠাম সুন্দর দ্বীপমালা পরিবেষ্টিত, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বিভূষিত একটি ক্ষুদ্র দেশে অল্পসংখ্যক অথচ সর্বাঙ্গসুন্দর, পূর্ণাবয়ব অথচ দৃঢ়স্নায়ুপেশীসমন্বিত, লঘুকায় অথচ অটল-অধ্যবসায়-সহায়, পার্থিব সৌন্দর্যসৃষ্টির একাধিরাজ, অপূর্ব ক্রিয়াশীল, প্রতিভাশালী এক জাতি ছিলেন। অন্যান্য প্রাচীন জাতিরা ইঁহাদিগকে 'যবন' বলিত; ইঁহাদের নিজ নাম— গ্রিক।''

যুগচক্রের সুনির্দিষ্ট কালপর্যায়ের ক্রম ধরে এই দুটি দেশ বা জাতির ভাবনা— (১) অন্তর্মুখী ভারতীয় সনাতনধর্ম ও জীবনদর্শন ও ২) বহির্মুখী গ্রীক মানবজীবনের দুটি বিভিন্ন প্রান্ত। আজ তারা আবার মিলিত হতে চলেছে। কীভাবে? বর্তমান লেখা তারই একটা বিশ্লেষণ করতে চলেছে।

'Problem of modern India and its solution -এই রচনাতে স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন—

''ভারতের বায়ু শান্তিপ্রধান, যবনের প্রাণ শক্তিপ্রধান। একের গভীর চিন্তা, অপরের অদম্য কার্যকারিতা। একের মূল মন্ত্র 'ত্যাগ, অপরের 'ভোগ'। একের সর্বচেষ্টা অন্তর্মুখী, অপরের বহির্মুখী। একের প্রায় সর্ববিদ্যা অধ্যাত্ম, অপরের অধিভূত। একজন মুক্তিপ্রিয়, অপর স্বাধীনতাপ্রাণ। একজন ইহলোক কল্যাণলাভে নিরুৎসাহ, অপর এই পৃথিবীকে স্বর্গভূমিতে পরিণত করিতে প্রাণপণ। একজন নিত্যসুখের আশায় ইহলোকের অনিত্য সুখকে উপেক্ষা করিতেছেন। অপর নিত্যসুখে সন্দিহান হইয়া বা দূরবর্তী জানিয়া যথাসম্ভব ঐহিক সুখলাভে সমুদ্যত।''

এই আপাতবিরোধী দুটি জীবন ও সমাজদর্শন কি কখনও মিলিত হতে পারে? তা কি সম্ভব?

প্রখ্যাত জার্মান জড়বিজ্ঞানী Werner Heisenberg একটা আশ্চর্য কথা বলছেন— "It is probably true quite generally that in the history of human thinking the most fruitful developments frequently take place at those points were two different lines of thought meet."

আশ্চর্যভাবে পূর্ব-উল্লেখিত রচনাতে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, এ একই কথা। তিনি বলছেন যে অন্তত তিনবার এই দুই বিপরীত ধরনের জীবনদর্শন একীভূত হয়েছে ও তা থেকে মানবসভ্যতার ধারা আরও আরও অনেক এগিয়ে গেছে। স্বামীজী তাই বলেছেন—

Best Compliments from-

A Well Wisher

''সুদূরস্থিত বিভিন্ন পর্বত-সমুৎপন্ন এই দুই মহানদীর মধ্যে সঙ্গম উপস্থিত হয় এবং যখন ঐ প্রকার ঘটনা ঘটে, তখনই জনসমাজে এক মহা আধ্যাত্মিক তরঙ্গে উত্তোলিত সভ্যতারেখা সুদূর সম্প্রসারিত হয় এবং মানবমধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হয়।''

অতি প্রাচীনকাল হতে এই কয়েকদিনের আগের ইতিহাস অবধি এই দুটি ধারা পরপর তিনবার সম্মিলিত হয়েছে বা সংঘর্ষিত বা সংমিশ্রিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ এদের মধ্যে প্রথমটি উল্লেখ করতে গিয়ে বলছেন,

''অতি প্রাচীনকালে একবার ভারতীয় দর্শনবিদ্যা গ্রিক উৎসাহের সম্মিলনে রোমক, ইরানী প্রভৃতি মহাজাতিবর্গের অভ্যুদয় সুত্রিত করে।''

এই প্রথমটির কয়েক সহস্র বছর পরে ঘটে দ্বিতীয় সংঘর্ষ। তার সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন, ''সিকন্দরসাহেব (Emperor Alexander) দিগ্বিজয়ের পর এই দুই মহাজলপ্রপাতের সংঘর্ষে প্রায় অর্ধ-ভূভাগ ঈশাদি (Christianity) নামাখ্যাত অধ্যাত্মতরঙ্গরাজি উপপ্লাবিত করে।''

আর অবশেষে তারও এক হাজার বছর পরে এই দুই ধারার সংমিশ্রণ আবার ঘটে। এই তৃতীয় মিলন সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন— ''আরবদিগের অভ্যুদয়ের সহিত পুনরায় ঐ প্রকার মিশ্রণ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন (European Renaissance) করে এবং বোধ হয়, আধুনিক সময়ে পুনর্বার ঐ দুই মহাশক্তির সম্মিলনকাল উপস্থিত।''

স্বামীজী তার ঋষিনয়নে স্থির দেখতে পারছেন যে, পরপর তিনবারের পরে তার চতুর্থ ও চরম মোলাকাতের সম্মিলনকাল আজ উপস্থিত। লক্ষ্য রাখার বিষয় এই যে—

১) এই প্রথম মিলন ঘটেছিল মধ্য এশিয়ায়, যার প্রভাব পশ্চিম এশিয়া অবধি ছড়িয়ে পড়ে। পারস্যের জরথুস্টের ধর্ম (Zorostrianism) এর দ্বারা পুষ্ট হয়।

২) দ্বিতীয় মিলন ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়াতে যা পূর্ব ইউরোপ অবধি ছড়িয়েছিল।

৩) তৃতীয় মিলন ঘটে পশ্চিম ইউরোপে যা অবশেষে আমেরিকান সভ্যতার জন্মের কারণস্বরূপ হয়ে ওঠে। এবং তার প্রভাব আজ আমেরিকাকে অতিক্রম করে, প্রশান্ত মহাসাগরকেও অতিক্রম করে পূর্ব এশিয়ার তটে (Asia Pacific Rim) -এ প্রবিষ্ট হচ্ছে। তার থেকে পরপর জেগে উঠছে জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর ও অবশেষে আরও অভ্যন্তরে পূর্ব-রাশিয়া ও চীন দেশ।

এই মহাশক্তির সম্মিলন আস্তে আস্তে এশিয়ার প্রাণকেন্দ্র ভূমিতে প্রবিষ্ট হচ্ছে! তার থেকেই চতুর্থ মহামিলন নিশ্চিত। তাই স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—

''এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।''

আই আই টি খড়্গপুরের একটি মহাপ্রকল্প 'The Science and Heritage Initiative' বা সন্ধির আদর্শ অনুসারে স্বামী বিবেকানন্দের এই চতুর্থপর্যায়ের মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কথার ওপর আমরা কাজ করে চলেছি। এই পরপর চারটি পর্যায়ের ওপর সর্বজনগ্রাহ্য ও বিশেষত শিশুমনের জন্য আমরা গল্পাকারে কয়েকটি বই পরিকল্পনা করেছি। তার মধ্যে বলা যেতে পারে পরপর চারটি বইয়ের ক্রম-প্রকাশের মধ্যে প্রথমটি, যার নাম 'সিন্ধু হতে সায়ন' (আনন্দ পাবলিশার্স) তা মুদ্রিত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়েছে। আপনাদের জন্য।

ভারতসভ্যতার সনাতন ধর্মের শাশ্বত মূল ও প্রবাহিত ধারার অব্যাহত ইতিহাস ও তার সঙ্গে সঙ্গে রহস্য-রোমাঞ্চ ভরা একটা অভিযানমূলক গল্পের আকারে এই চরম সত্য আমরা জনপ্রিয়স্তরে তুলে ধরেছি। আমরা আশা করে আছি, এর পরের পরপর তিনটি বই আমরা প্রকাশিত করতে পারব আপনাদের জন্য। আর তুলে ধরতে পারব না-বলা, না-জানা, হারিয়ে যাওয়া আমাদের দেশের সত্যকারের ইতিহাস ও তার ভবিষ্যৎ। 'সিন্ধু হতে সায়ন' বইটিতে তার প্রথম ইঙ্গিত আপনারা পাবেন। আমাদের এই প্রচেষ্টা ও আপনাদের সকলের অনেক আন্তরিক ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই আমাদের সনাতন ধর্ম আবার সমগ্র বিশ্বে নিত্য মর্যাদা পাবে। তাই এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

উপন্যাস

কুসুম কুমারী

সুমিত্রা ঘোষ

'নমস্তে মাস্টারজী। অব্ কহাঁ চল পড়ে?'

'আরে ফল্গু, ম্যায় ঔর কহাঁ যা সক্তা হুঁ? ও-হি লখনৌ যা রহা হুঁ। সরকারি দপ্তরো মেঁ ধর্না দেনে কে লিয়ে।'

কাঁধে কিট্ ব্যাগ, পরনে ধুতির ওপর ফুলহাতা সাদা শার্ট, সাদা বেশি কালো কম মাথা আর দাড়ির চুল। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি এই গ্রামের মেরুদণ্ড। নাম পরমেশ্বর শর্মা। পেশায় স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয়ের মাস্টার। আঞ্চলিক ভাষা তার পিতৃদত্ত নামটিকে বিকৃত করে পর্মেশ শর্মা করে দিয়েছে। নিজগুণে তিনি শুধুমাত্র নিজের গ্রামে নয়, আশপাশের লোকালয়গুলোতেও শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রমের সঙ্গে আদরণীয় মানুষ। ছোটবেলা থেকেই গাঁয়ের সাধারণ বালকদের থেকে পর্মেশের ভাবনাচিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা রকমের ছিল। অগোছালো, নোংরা কোনও কিছু সে পছন্দ করত না। অস্বাস্থ্যকর গোয়াল আর পচা ডোবা দেখলেও নাক কুঁচকে রাখত বালক পর্মেশ। বছরের কয়েকটা বিশেষ ঋতুতে কত লোক মরে যেত বাহ্যে-বমি করে। যে বয়সে এসব ভাবার কথা নয়, সেই বয়সেই ও এসব ভাবনা ভাবত। গ্রামের একমাত্র প্রাইমারি স্কুলে পড়তে যেত। ওর বাবুজী এই স্কুলের শিক্ষক। বাবুজীকে প্রশ্নবাণে নাজেহাল করে দিত ছেলে। বাবুজী রাগ করত না। বলতো, তুই বড় হয়ে এই গ্রামের চেহারা বদলে দিস।

পরমেশ্বর সেই কাজটাই করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন। শাহাগঞ্জ আর ডেহরী ঘাটের সংযোগস্থলের অভ্যন্তরে হরিয়াল গ্রাম বর্তমানে একটি আদর্শ গ্রাম বলে মানা হয়। পরমেশ্বর নিজের আত্মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বিদ্যার্জন শেষ হলে নিজের গ্রামের জন্য সে তার শিক্ষাদীক্ষা উৎসর্গ করবে। পাঠশালার পাঠ শেষ হলে বাবুজী ওকে লখনৌতে নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে পড়িয়েছিলেন। হাইস্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পুরো শিক্ষাজীবনটাই ওর লখনৌতে কেটেছে। নগরতান্ত্রিক সুখ-সুবিধার যতটুকু সম্ভব নিজের গ্রাম অবধি পৌঁছে দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে ছাত্রজীবনেই হরিয়াল গ্রামের সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটা ক্লাব তৈরি করে ফেলেছিল, শুধুই অবসরের আড্ডা আর ফুটবল খেলার জন্য। মনের গোপনে পরিকল্পনা ছিল, এই ক্লাব থেকেই একটি সঙ্ঘ তৈরির যাত্রা শুরু করা। সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ছুটিতে বাড়ি এসেই ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে ছোট ছোট সংস্কারের কাজ যেমন— পাতকুয়োতে বস্তায় করে ফিটকারি ফেলা, কোনও পচা পুকুর পানামুক্ত করে পরিষ্কার করা, কোথাও মাটির রাস্তায় পট-হোল বুজিয়ে ভরাট করা— এমনি ছোট ছোট কাজগুলো দিয়ে আরম্ভ করেছিল। অন্য ছেলেরাও বেশ উৎসাহিত হতে লাগল। অবসর বিনোদনের নতুন ফর্মূলা পেয়ে খুশিই হলো তারাও। হরিয়াল মূলত কৃষিপ্রধান গ্রাম। ইন্ডাস্ট্রি-কটেজ কিছুই নেই। যারা শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে পেরেছে তারা চাকরি সূত্রে শহরেই থাকতে বাধ্য হয়েছে। আর যারা প্রাইমারি স্কুলের পর আর এগোবার সুযোগ পায়নি, তারা কৃষিকাজেই থেকে গেছে। এদের সাথে নিয়েই পরমেশ্বরের গ্রামসেবা কাজ শুরু হয়েছিল। আস্তে আস্তে গ্রামের প্রদূষিত পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হতে লাগল। মানুষের মধ্যেও একটু একটু করে সচেতনতা জাগতে লাগলো। পরমেশ্বর বুঝতে পারল, গাছে মুকুল এসেছে, তবে ফল হতে এবং পাকতে আরও অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে। অনেক ধৈর্য অনেক অসাধ্য সাধন করার পরীক্ষা পাশ করতে হবে ওকে। বহুযুগের অন্ধ কুসংস্কার, অশিক্ষা, জাতপাতের অলঙ্ঘনীয় দেওয়াল ভাঙতে হয়তো ওর সারা জীবনটাই ব্যয় হয়ে যাবে, যাক্ গিয়ে। নিজের প্রতিজ্ঞা থেকে নড়বে না ও কিছুতেই।

ওর পোস্ট গ্র্যাজুয়েট হতে হতে প্রাইমারি স্কুলটা মিডল স্কুল হয়েছে। এম-এ পাশ করে পরমেশ্বর অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে এই মিডল স্কুলে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়ল। কারণ কাজ করতে হলে সেই স্থানে থেকেই করতে হবে। সেই থেকে ওর জীবনের দৌড় শুরু হলো মহকুমা থেকে রাজধানী লখনৌ হয়ে প্রয়োজনে দিল্লি দরবারের দপ্তরগুলির দিকে। সেই দৌড় এখনও থামেনি। আজও মাস্টারজী চলেছেন লখনৌয়ের উদ্দেশে। গ্রাম থেকে তিন কিমি হেঁটে হাইওয়েতে গিয়ে লখনৌগামী বাস ধরবেন বলে হনহনিয়ে চলেছেন তিনি। পথে যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, সেই তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে। কারণ তারা জানে, বিনা প্রয়োজনে মাস্টারজী বাইরে যান না। তিনি বাইরে যান গ্রাম উন্নয়নের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে। আজ এই গ্রামে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, সব কিছুই এই নিরলস নিঃস্বার্থ মাস্টারজীর পরিশ্রমের জন্য হয়েছে। ত্রিশ বছর আগের বিবর্ণ চেহারার গ্রামটাকে কসমেটিক সার্জারি করে এই পুরুষসিংহ সুজলাং সুফলাং আধুনিক গ্রামে রূপান্তরিত করেছেন। হরিয়াল এখন ইউপি-র অন্যতম আদর্শ গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী মোদীজীর শৌচালয় প্রকল্পের আগেই হরিয়াল গ্রামে স্যানিটারি ল্যাট্রিন, বাথরুম তৈরি হয়ে গেছে ঘরে ঘরে। জুনিয়র মিডল স্কুল, হাইস্কুলের অ্যাফিলিয়েশন পেয়েছে। মেয়েদের জন্য বাঞ্জার জমিকে কাজে লাগিয়ে ইঁট-সিমেন্টের দেওয়াল, মাথার ওপর টিনের চাল দিয়ে আলাদা স্কুল হয়েছে। সন্ধ্যেবেলা পুরনো ক্লাবঘর সংস্কার করে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাশরুম করা হয়েছিল কুড়ি বছর আগে। হরিয়াল গ্রামের চাষিরাও এখন আখ্বার পড়তে পারে। স্বাস্থ্য পরিষেবা বলে কিছুই ছিল না। সামান্য অসুখেই মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যেত। গোরুর গাড়িতে করে সতেরো কিমি দূরে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথেই মরে যেত রোগী। এই পরমেশ্বর ছিনে জোঁকের মতো স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পেছনে পড়ে থেকে

প্রথমে একটা স্বাস্থ্যকেন্দ্র আদায় করেছিল, পরে সেটাকে পাঁচ বেডের একটা ছোট হাসপাতাল করে ছেড়েছে। ওর আরও কতশত কীর্তি! পরমেশ্বর হরিয়ালের অহংকার, ও হরিয়ালের প্রাণ। পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বছরের পর বছর ধরে ওকে নিজেদের দলে পাবার জন্য লালায়িত হয়ে আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ওই পথে পা মাড়াবে না বলে জেদে অটল। এই ব্যাপারে ওর বক্তব্য স্পষ্ট— 'আমি তো সারা দেশের ঠিকা নিইনি। আমি শুধু আমার গ্রামটার ঠিকা নিয়েছি। রাজনীতির নোংরা জলে নেমে নিজের শরীর-মন নোংরা করব এমন বোকা নই মনে হয়।'

ফল্গু বলে— 'ওহ্ তো মালুম হ্যায় কোই না কোই জরুরত আন্ পড়া হোগা। পরন্তু মাস্টারজী আপনি গ্রামের বেকার ছেলেদের ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে অটো রিক্সা কিনে চালাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওরা অটো কিনে এই গ্রাম থেকে পনেরো কুড়ি কিমি অব্দি অটো চালিয়ে রোজগার করছে এখন। ওদের একজনকে ডেকে নিলে তো আপনার কষ্ট হতো না। গরম পড়ে যাচ্ছে, এতটা পথ হেঁটে যাচ্ছেন, তাই বলছি।'

পাশে পাশে হাঁটতে থাকা গ্রামের কিষান ফল্গুর পিঠে হাত রেখে মুচকি হেসে মাস্টারজী বলেন—'যেদিন থেকে অটোতে চেপে যাব, সেদিনই হাইওয়ে তক্ হেঁটে যাবার সারাজীবনের কষ্টটা ভুলে যাবো ফল্গু।... এবার এই কষ্ট দূর করার সংকল্প নিয়ে যাচ্ছি। শাহাগঞ্জ আমাদের হরিয়াল থেকে সতেরো কিলোমিটার দূরে। যদি এখানে একটা লাইন টেনে এক মিনিটের হল্ট স্টেশনও করে দেয় রেলওয়ে, তাহলে আশপাশের কতগুলো গ্রাম উপকৃত হবে ভাবো তো? হাইওয়ে দিয়ে ১৭ কিমি হলে রেলওয়েতেও তাই হবে তা তো নয়। মাঠঘাটের ওপর দিয়ে ৯-১০ কিমি হবে বড়জোর। এইটুকু একটা লাইন বহু মানুষের লাইফ লাইন হতে পারে।'

লেখাপড়া জানা সম্পন্ন কিষান ফল্গুর চোখের পলক পড়ে না। টিপ করে মাস্টারজীর হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে— 'জয় হো।' আমি আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলোর কিষান ভাইদের জান দিয়ে বোঝাবো আপনার কথা। সবাই সামান্য সামান্য জমি ছাড়লেই এমন মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। ওরাও আমাদের মতোই আপনাকে দারুণ শ্রদ্ধা করে মাস্টারজী। আপনি রেল দপ্তরকে বলবেন জমি আমরা দেব, ওরা শুধু লাইন পেতে দিক।'

মাস্টারজী বললেন —'স্বপ্ন দেখা ভালো, স্বপ্ন দেখ। তবে আমরা চাইলাম বলে সরকার এক কথায় মেনে নেবে এমনটা হবে না। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে, হাজারবার গিয়ে ভিক্ষা চাইতে হবে, তবে যদি মন গলে সরকারের। তাতেও না হলে ধর্না আন্দোলনের শেষ পথে যেতে বাধ্য হতে হবে। আন্দোলন-টন আমি পছন্দ করি না। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে একেবারে শেষ চেষ্টা হিসাবে করে ফেলতেও পারি তোমাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। ... তাছাড়া দেখ, তুমি না হয় এদিকে কিছু জমি দেবে, কিন্তু রেলমন্ত্রক যদি রাজি হয়ও, ওরা কোনদিক দিয়ে লাইন আনবে জানা নেই। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি যদি কিছু হয়। আপাতত এটুকুই। এই দেখো না, গার্লস স্কুলটার স্থানান্তর হলো, কিন্তু নিজস্ব অ্যাফিলিয়েশন হলো না আজও। বয়েজ স্কুলের সঙ্গে কো-এডুকেশন তক্মা নিয়েই চলছে।

— 'মাস্টারজী, আপনার যাত্রা শুভ হোক। আজ অবধি আপনি যে কাজ হাতে নিয়েছেন, সেটা আদায় করেই ছেড়েছেন। কেউ কি ভেবেছিল, হরিয়ালে একজনও নিরক্ষর মানুষ থাকবে না? আমরা একটা হাসপাতাল পাবো? হোক না ছোট, কিন্তু গ্রামে এখন ডাক্তার তো আছে। কী অসাধ্য সাধনই না করেছেন আপনি। আমরা শুধু কিছু ডোনেশান দিয়েই খালাস। কাজ তো আপনি করেছেন।'

বিফল হয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে পরমেশ্বর শর্মাকে। কিন্তু তিনি হতাশ নন, তিনি বারবার আসার জন্য প্রস্তুত। লখনৌতে এলে ইদানিং তিনি তার প্রিয় ছাত্র হরিয়াল গ্রামের ছেলে ডাক্তার অরবিন্দ কুমারের বাড়িতে ওঠেন। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার। দুদিন ধরে এখানে ওখানে ঘুরে অবশেষে যখন কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির দেখা পাওয়া গেল, তিনি তখন ভয়ানক ব্যস্ত। ঈষৎ বিরক্ত গলাতে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, একটা বাই পোল নিয়ে বিজি আছেন, আগামী দু'মাসে কোনও সময় দিতে পারবেন না আর্জি শোনার জন্য।

লখনৌ থেকে বাসেই ফিরছেন। পারতপক্ষে ট্রেনে চড়ে কোথাও যান, যেখানে বাসে যাবার সুবিধা নেই। তা না হলে বাসজার্নি তাঁর পছন্দ। কারণ, বাস তাকে হাইওয়েতে নিজের গ্রামের সামনে নামিয়ে দেবে। ভলভো বাসে করে এসে চৌরাহা-চৌক বাস আড্ডার সামনে নেমে পড়লেন। এখান থেকে অন্য বাসে করে গন্তব্যে যেতে হবে। টার্মিনাসের ভেতরে যাবার মুখে দুপাশে দুটো গোল সিমেন্ট বাঁধানো বেদি আছে, দুটো প্রাচীন বটগাছকে ঘিরে। এই বেদি মাস্টারজীর খুব প্রিয় ওয়েটিং প্লেস। ওঁর বাস একঘণ্টা পরে ছাড়বে। টার্মিনাসের ভেতরে গিয়ে টিকিট কেটে উনি হাইওয়ের উপর এই বেদিতে শুয়ে থাকবেন। প্রত্যেকবারই এখানেই বসে শুয়ে সময় কাটান। বাস আড্ডার ভেতরটা এমিশনের কালো ধোঁওয়া, ধুলো আর যাত্রীদের ভিড়ে ঠাসা থাকে। নিঃশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয়। আর এই বেদিতে খোলা হাওয়ায় নিরিবিলি থাকা যায়। এখানে অন্ধকার বলে রাত্রে এদিকে বসতে কেউ আসে না লক্ষ্য করেছেন বহুবারের আসা-যাওয়ায়। হাইওয়ের দিকে পিঠ করে

বসে বা শুয়ে থাকলে ছুটে যাওয়া গাড়িগুলোর হেডলাইট চোখে আঘাত করে না। মাস্টারজী টিকিট কেটে নিয়ে প্রিয় বেদিতে এসে ব্যাগের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকেন চুপচাপ।

একটু পরেই বুঝতে পারেন, এই বেদির সামনের দিকে কারা যেন এসে বসল। তারপরই নারীকণ্ঠে ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে কিছু টুকরো টুকরো কথা কানে এলো— 'মেরী কসুর ক্যা হ্যায় পিতাজী... কসুর তো উস্‌কা থা... আপ মুঝে কহাঁ লে আয়ে হো... কিঁউ মুঝে ত্যাগ রহে হো... মুঝে কিঁউ য়্যাসা সাজা দে রহে হো... ম্যায়নে ক্যা কিয়া...'

একটা পুরুষ কণ্ঠ বলল, 'তু সমঝনে কা কোশিস নহী কর রহী হ্যায়। হালাত্ ইত্না গম্ভীর হো গয়া কি উস্ হারামজাদা নে হম সবকো জান্ সে মার ডালনে কা ধমকি দিয়া হ্যায়। তুনে উস্‌কা ডাহিনা আঁখ নিকাল লিয়া। অব্ জিন্দগী ভর কে লিয়ে ওয়হ্ এক আঁখ খো দিয়া। ওয়হ্ তুঝে জিন্দা জ্বালাকে মারনে কা কসম লে লিয়া হ্যায়। থানেদার বলরাজকা চামচা হ্যায়, মেরা রিপোর্ট দর্জ করনে সে ইন্‌কার কর দিয়া, ঔর মুঝে হি পিটাই কর ভগা দিয়া। .. তু জানিত হ্যায় বিটিয়া, বলরাজকে সাথ মুকাব্‌লা করনে কা হিম্মত গাঁও মে কিসিকা নহী হ্যায়? তেরে সাথ জো হুয়া ইয়ে পহলে সে হোতা আরহা হ্যায়। কোই কুছ কর নহী পায়া, বলরাজ কা কুছভী নহী বিগড়া। গাঁও কা বহু-বেটিয়া খুদখুশি কর মরতি রহী, লেকিন ইস্ বার তুনে পলটবার কিয়া, নরহুন ঘুসা কর উস্‌কা আঁখ পুরা নিকাল লিয়া।... শুনা হ্যায়, উস্‌কা আঁখ কভী ওয়াপস্ নহী আয়েগা। হাসপাতাল সে হী উস্‌নে অপ্‌নে চেলে সে ধম্‌কি ভেজা হামারা ঘর জ্বালায়েগা ঔর তুঝে সারে-আম জিন্দা জ্বালাকে মারেগা। অব্ তু হী বতা, তুঝে বঁচানে কে লিয়ে মেরে পাস ঔর কোই রাস্তা খুলা হুয়া থা ক্যা?... এক মুসিবত্ কে উপর দুসরা মুসিবত্ আন্ পড়া... তেরি মা-নে বোলা তেরি মাহিনা তারিখ ভী দশদিন পার হো গয়া, মহিনা নহী হুয়া। ইস্‌কা মতলব তু পেট মে ভী হো গয়ী হ্যায়। অব্ গাঁওবালে ভী তুঝে জিনে নহী দেঙ্গে।'

মেয়েটি কঁকিয়ে কেঁদে বলতে লাগল—'লেকিন ম্যায় কহাঁ যাঁউ পিতাজী? ম্যায় গাঁও কে বাহর কভী নহী নিকলী। ইস আনজান দুনিয়া মে পিতা হোতে হুয়ে আপ মুঝে হাজারো বার বালাৎকার হোনে কে ওয়াস্তে ক্যাসে ছোড় কর চলে যায়েঙ্গে? আপ নে মুঝে রক্ষা তো কর নহী সকেঁ অব মরনে কে লিয়ে ছোড় রহে হো? ক্যাসা বাপ হ্যায় আপ? ম্যায় মরনা নহী চাহতী হুঁ পিতাজী... মুঝে বঁচা লো... ছোড়কে মত্ যাও...'

— 'তু পড়িলিখি লড়কি হ্যায়, সমঝদার, হোশিয়ার ভী হ্যায়। খুদ কো বঁচানে কা কোই তরিকা খুদ হী ঢুন্ড লেনা। জিন্দা জ্বল কর মরনে সে জিনে কে লিয়ে কুছ ভী করনা মুমকিন হ্যায়। ... তেরি ব্যাগ মে তিন হাজার রুপাইয়া ঔর তেরী কিতাবেঁ, সার্টিফিকেট— সব কুছ ম্যায়নে ডাল দিয়া। অব্ তু জানে ঔর তেরী নসীব জানে...'

পরমেশ্বর আর থাকতে পারলেন না। যা শোনার যা বোঝার তিনি বুঝে নিয়েছেন। ওরা গাছের পেছনে তার উপস্থিতি টের পায়নি। উনি উঠে ওদের সামনে এসে পুরুষটির উদ্দেশে বললেন, 'নমস্তে ভাইসাব। আমি পরমেশ্বর শর্মা। পেশায় শিক্ষক। পেছনে শুয়েছিলাম আমার বাসের অপেক্ষায়। আপনাদের সব কথাই শুনে ফেলেছি। বুঝতে পারছি, আপনি মহাসংকটে পড়েছেন, কিন্তু তাই বলে নিজের কন্যাকে এইরকম একটা বাস আড্ডায় ছেড়ে চলে যাবেন? অন্য কোথাও কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে তো রাখতে পারতেন। ওর তো সত্যিই কোনও দোষ নেই। বিনা দোষে মেয়েকে মহা সর্বনাশের দিকে বাপ হয়ে ফেলে রেখে যাচ্ছেন আপনি? ধর্ম, বিবেক সব বিসর্জন দিয়ে ফেলেছেন একটা গুন্ডার ভয়ে?'

লোকটি এবার কেঁদে ফেলল— 'জানি, অধর্ম করছি, কিন্তু লাচার বলে করতে বাধ্য হচ্ছি। ও খুব ভালো মেয়ে, এগারো ক্লাশে পড়ে, ক্লাশে ফার্স্ট হয়। আমাদের বাহুবলী এম এল এ-র পেয়ারের ভাতিজা ওকে বলাৎকার করেছে। সম্ভবত ওর পেটে বাচ্চাও এসেছে। বলাৎকারের কথা যদি গোপনও করি, অন্য বিপদটা তো গোপন করতে পারব না ভাইসাব। কুমারী মেয়ে মা হতে চলেছে জানার সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে। নিজের গ্রামে তো ও থাকতেই পারবে না। ওকে তো বলরাজ মেরে ফেলবে, সঙ্গে পুরো পরিবারকে মেরে ফেলবে। আমি সামান্য এক কিষান। ওদের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা নেই। আমি দুর্বল বলেই মেয়ের নজরে, ভগবানের নজরে একজন না-মর্দ বাপ হয়ে অপরাধী হয়ে থাকব। ভাইসাব, আপনি শিক্ষক, আপনাকে দেখে সজ্জন বলে মনে হয়। আমি তো এক মামুলি চাষা। দুনিয়ার কিছুই জানি না। ওকে বলি দিয়ে অন্যদের বাঁচানোর চেষ্টা করাটাই মাথায় এসেছে। আপনি শিক্ষিত মানুষ, দেখুন না ওকে কোনও আশ্রমে যদি রাখে। তাহলে ও বেঁচে যাবে।'

পরমেশ্বরের মুখে কথা ফোটে না। জীবনে এরকম একটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, কল্পনাও করতে পারেননি। একটা বাস এসে টার্মিনাসের গেটের সামনে দাঁড়ালো। যাত্রী নামল দু-তিনজন। বাসের হেডলাইটের আলোয় এতক্ষণে মেয়ের মুখ দেখে চমকে উঠলেন তিনি। অপূর্ব সুন্দর একটি ১৭-১৮ বছরের নিষ্পাপ মুখ। কেঁদে কেঁদে দুটো দীঘল চোখ ফুলে গেছে। বিকৃত পুরুষের লালসার শিকার হয়ে গেছে এক নিরপরাধ কিশোরী। ওর সামনে এখন শুধু ব্ল্যাকহোল, যার আদি-অন্ত কিছুই ও জানে না। বেদনায় বুকটা চিনচিন করে ওঠে মাস্টারজীর। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে

পড়েছিলেন। হঠাৎ দেখেন বাসটা ছেড়ে দিয়েছে আর এক লাফ মেরে মেয়ের বাবা বাসের হাতল ধরে ফুটবোর্ডে উঠে পড়েছে। তিনি কালবিলম্ব না করে — 'রুক যাইয়ে রুক যাইয়ে ভাইসাব' বলে বাসের পেছনে দৌড় লাগালেন, কিন্তু বাসও দাঁড়ালো না, ভাইসাবও নামবার চেষ্টা করলেন না। ফিরে আসার জন্য পেছন ফিরেই দেখেন মেয়েটা রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর ওর দিকে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে বড় যান— ট্রাকও হতে পারে, বাসও হতে পারে। ছুটে এসে এক ঝটকায় মেয়েটাকে নিজের বুকের ওপর ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পাগল গতিতে ছুটে চলে গেল একটা মালবাহী ট্রাক। মেয়েটাকে বুকে চেপে ধরে রেখে তিনি নিজেই তখন কাঁপছেন।

মেয়েটার হাত মুঠোয় ধরে টার্মিনাসের ভেতর টিকিট কাউন্টারে গিয়ে নতুন করে টিকিট কাটলেন দুটো। লখনৌ ফিরে যেতে হবে, অরবিন্দের বৌ গৌরীকে দেখাতে হবে মেয়েটাকে। ওর নামটাও জানা হয়নি এখনও। যা নাটক ঘটে চলেছে তাতে পরিচয় করার সুযোগই ঘটেনি। বাসে বসে কিছু জলপান করে কথা বলা যাবে। একবার আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছেন বটে, তবে ও আবার চেষ্টা করতে পারে। তাই সারাক্ষণ নজরবন্দি করে রাখতে হবে এখন। টিকিট, জল, ফ্রুটজুস, পাউরুটি, মাখন, কলা কিনে আবার ভলভো বাসে চড়ে বসলেন মেয়েটাকে পাশে নিয়ে। খাওয়া দেখে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে মেয়েটা উপবাসী ছিল, ভয়ানক ক্ষুধার্ত ছিল। ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে মরার চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এখনও একটাও কথা বলেনি মেয়েটা, বরং পরমেশ্বর যা বলেছেন নীরবে আজ্ঞা পালন করে চলেছে। হয়তো তাঁর উপর আস্থা এসেছে। এটা ভালো লক্ষণ। বাস ছাড়ার আগেই অরবিন্দকে ফোন করে জানালেন যে তিনি চৌরাহা-চৌক থেকে ফিরে আসছেন লখনৌ। সঙ্গে ১৭-১৮ বছরের একটি মেয়ে আছে। বাকি কথা সাক্ষাতে বলবেন। নিজের বাড়িতে স্ত্রী চামেলীদেবীকেও জানালেন আজ রাত্রে ফিরতে পারবেন না। কবে ফিরবেন পরে জানিয়ে দেবেন।

— 'আপ নে কুছ খায়া নহী। ব্রেড মে বাটার লগাকে দেতী হুঁ, কুছ তো খা লিজিয়ে বাবুজী।'— ভারী নরম আর মিষ্টি গলায় বলে ওই মেয়ে।

— 'ব্রেড-বাটার নহী, মুঝে এক কেলে ঔর জুস্ দে দো বেটিয়া।'

—'জী।'

— 'তুমহারা নাম বাতাও।'

— 'আপ নে মুঝে নয়া জিন্দেগী দিয়ে হ্যায়, নয়া নাম ভী আপ দে দিজীয়ে বাবুজী। ম্যায় পুরানা সব কুছ ভুল যানা চাহতী হুঁ।'

— 'অপনা বচ্পন জিন্দেগী কা পহেলা হিস্যা হোতা হ্যায় বেটা, ইসকো ভুল যানা আসান নহী হ্যায়। পুরি জিন্দেগী বচ্পন কা ইয়াদেঁ সাথ সাথ চলতা রহতা হ্যায়।... অব্ তুমকো পড়না হোগা, স্কুল মে দাখিল হোনা পড়েগা তো পুরানা নাম সে হী অ্যাডমিশন মিলেগা। তুম বচ্চী হো, ইস সময় দুখী ভী হো, ইস লিয়ে পুরানা বিতে হুয়ে সময় কো ভুলনে কা ইরাদা মন মে জাগ রহা হ্যায়। ... অব্ নাম বাতাও।'

— 'কুসুম কুমারী সিং।'

এরপর অনেকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে থাকেন। পরমেশ্বর কুসুমকে নিয়ে কী করবেন, কীভাবে মেয়েটাকে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেবেন, সেই ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েন আর কুসুম ভাবতে থাকে যদি সত্যিই ওর পেটে বলরাজের বাচ্চা এসে থাকে, তাহলে ও কী করবে? ওর নিজের বাবা ওকে হয় মরবার জন্য, নয়তো রেন্ডিখানায় গিয়ে ঘৃণ্যভাবে বেঁচে থাকার জন্য বাজারে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। ও এখন এতবড় পৃথিবীতে একেবারে একা। এই মানুষটি ওকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন, এখন সঙ্গে করে লখনৌ সিটিতে নিয়ে যাচ্ছেন। হয়তো ইনি ওখানেই থাকেন। কিন্তু ওনার তো নিশ্চয়ই পরিবার আছে, ওদেরও সমাজেই বাস করতে হয়, ওরা কি এই মানুষটির মতো ভালো? ওরা ধর্ষিতা, পেটে বাচ্চা আসা অচেনা একটা মেয়েকে আশ্রয় দিতে রাজি হবে? মরা ছাড়া আর কি কোনও পথ খোলা থাকবে ওর জন্য? এত টেনশনের মধ্যেও ওর একটুকরো আনন্দ পড়ে আছে মনের গোপন কুঠুরিতে। ওর নিজের শরীরে কম শক্তি নেই। কর্মঠ এই হাত দুটো দিয়ে বলরাজকে ও প্রচুর আঘাত করেছিল সেদিন, ওর ধারালো দাঁত নখ আর নরুনটা কুকুরটাকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তাক্ত করেছিল। রেপ করে চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল নিশ্চিন্তে। সেই ফাঁকে ব্যাগে রাখা সর্বক্ষণের সঙ্গী নরুনটা বের করে ডান চোখের ভেতর পুরো ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে চোখটাকে উপড়ে নিয়ে সবলে টেনে শিরা উপশিরা ছিঁড়ে বের করে ফেলে মুঠোয় ধরে চটকে দিয়েছে। বাধা দেবার আগেই ও আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়েছিল। বেহোঁশ হয়ে। তখনও নরুন চালিয়েছে গাল, বুক, হাত ফালা ফালা করে। জন্মের মতো কানা করে দিতে পেরেছে— এটাই এত দুঃখের মধ্যে ওর গোপন আনন্দ।

রাত পৌনে এগারোটায় লখনৌ পৌঁছালেন পরমেশ্বররা। অটো নিয়ে চলে যাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু আরবিন্দ গাড়ি নিয়ে এসে অপেক্ষা করছিল। মাস্টারজীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল অরবিন্দ। কুসুমকে দেখিয়ে পরমেশ্বর বললেন, 'এ কুসুম। বাকিটা বাড়ি গিয়ে বলব। আজ একটা ঘটনাবহুল দিন গেল। ভাবতেও পারিনি যে সকাল বেলা তোমার এখান থেকে বেরিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে।'

গ্রামের মানুষের কাছে তিনি মাস্টারজী আর নিজের ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তিনি গুরুজী। বাড়ি এসে অরবিন্দ ওর বৌ গৌরীকে বলল, 'আগে ওরা স্নান করে নিলে ভালো হয়। যা গরম পড়েছে!... আর মেয়েটির থাকার ব্যবস্থাও কর। খাওয়া-দাওয়া বোধহয় হয়নি সারাদিন।'

গৌরী বলল— 'ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি শুধু ভাবছি কী এমন হলো যে গুরুজী একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলেন?'

— 'উতলা হয়ো না। গুরুজী সব বলবেন যথাসময়ে। মেয়েটা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে আছে মনে হচ্ছে আমার। বাবলিকে ডেকে বলো, মেয়েটাকে একটু সঙ্গ দিতে। খালি টিভি দেখলেই চলবে? বাড়িতে মেহমান এসেছে, তাদের সঙ্গ দিতে হবে না? এই মেয়েটা তো বাবলিরই বয়সী হবে, এসে একটু কথা-টথা বলুক ওর সঙ্গে।'

— 'যা বলেছ! ওর টিভি-র নেশা এবার ছাড়াতে হবে। আমরা দুজনেই হসপিটাল আর পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকি বলে বড় বাড় বেড়েছে ওর। আরে যাহ্! মেয়েটার সঙ্গে স্নান করে পরবার মতো জামাকাপড় আছে কিনা জিজ্ঞেসই করিনি।... দাঁড়াও দেখে আসি।'

কুসুমের ব্যাগে জামাকাপড় ছিল। ওদের স্নান হয়ে যেতে গৌরী খাবার দিয়ে দিল সবাইকে একসঙ্গে। বাবলি আর ছেলে গলু নবাগতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু নবাগতা নিজের আড়ষ্টতা কাটিয়ে ওদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারছে না, এটা গুরুজী, অরবিন্দ এবং গৌরীর নজর এড়ালো না। যাই হোক, খাওয়ার পালা মিটতে গৌরী মেয়েকে বলল, 'বাবলি কুসুমকে তোর রুমে নিয়ে যা। ও ওই ঘরে শোবে, অন্য খাটটাতে। যাও কুসুম, এবার গিয়ে শুয়ে পড়।'

— 'জী আন্টি'।— বলেই কুসুম প্রথমে মাস্টারজীকে তারপর অরবিন্দকে, শেষে গৌরীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বাবলির সঙ্গে শুতে চলে গেল। ক্লাশ সেভেনে পড়া গলুর এই প্রণাম পর্বটা বড় আশ্চর্য লেগেছে, তাই সে জিজ্ঞেস করল— 'ওহ কুসুম দিদি নে আপলোগোঁ কো অব্ প্রণাম কিস্ লিয়ে কিয়া?'

অরবিন্দ বলল, 'বয়স্কদের প্রণাম করার কোনও সময় অসময় নেই গলু। এটা আমাদের দেশের রেওয়াজ। ইংরেজরা ঘুম থেকে উঠে গুডমর্নিং বলে, রাত্রে শুতে যাবার আগে গুডনাইট বলে। আমরা সকালে উঠে ভগবানকে প্রণাম করি, তারপর বাবা-মাকে করে দিন শুরু করি তাদের আশীর্বাদ নিয়ে। রাতে আবার একইভাবে প্রণাম করে শুতে যাই। ... আমাদেরই ভুল আমরা তোমাদের এই শিক্ষাটা দিতে ভুলে গেছি, তাই তোমরা কর না। তবে আমরা নিজেরা কিন্তু করি। কখনও ভুলি না। আজ কুসুম দিদিকে দেখে শিখলে তো?'

— 'হ্যাঁ, পাপা। বাবলি দিদিকো ভী বতা দুঙ্গা।'— বলে গলু সবাইকে প্রণাম করে বলল, 'গুড নাইট।' — ওরা তিনজনই হেসে ফেললেন। বাচ্চারা চলে যাবার পর মাস্টারজী বললেন, 'বহু, রাত অনেক হয়েছে, সকাল থেকে উঠে তোমাদের ব্যস্ত জীবন। আমি সব জানি, তবুও আর একটু সময় যে আমাকে দিতে হবে, মা। অরবিন্দের থেকেও তোমাকে আমার বেশি দরকার। আজকে আমাকে যে পরিস্থিতিতে পড়ে ফিরে আসতে হলো সেই ঘটনা এখন বলব।'

গৌরী একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'কাল আমার অফ ডিউটি গুরুজী। আর ডিউটি যদি থাকতো তাহলেও আমি সারা রাত জেগে থাকতে পারি আপনার কথা শোনার জন্য। বুঝতে তো পারছি, এমন কিছু ঘটেছে, যাতে আপনি বিচলিত হয়েছেন। বলুন গুরুজী। ডাক্তারের রাত জাগার অভ্যাস থাকে, চিন্তা করবেন না।'

এরপর আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা ওদের দুজনকে খুলে বললেন মাস্টারজী।

সব শুনে দুজনেই বলল— 'মেয়েটার কপাল ভালো যে সেখানে আপনি ছিলেন, তা না হলে ও যে কোথায় গিয়ে ঠেকতো, কী ভয়ংকর অবস্থা হতো ভাবতেও ভয় হয়। গুরুজী আপনি অজনা অচেনা একটা মেয়েকে সুস্থ জীবন দানের জন্য এতবড় রিস্ক নিয়েছেন, আর আমরা আপনার পাশে থাকব না, এটা কি হয়?'

গৌরী বলল, 'কাল বাবলি-গলু স্কুলে চলে যাবার পর আমি ওর সঙ্গে কথা বলে জেনে নেব। যদি সত্যিই প্রেগন্যান্সি হয়ে থাকে তাহলে টার্মিনেট করে ফেলা দরকার। কারণ ও এখন আপনার কাছে থাকবে। আপনিও ওকে পড়াশুনা করিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে ইচ্ছুক। আমাদের গ্রামে যতই শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ুক, এখনও এতোটা মুক্তমনের সবাই হয়ে যায়নি যে কুমারী মেয়ে রেপড্ হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে স্কুলে পড়তে যাচ্ছে— না গুরুজী, এটা মেনে নেবে না বেশিরভাগ মানুষ। ওর লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না।'

অরবিন্দও গৌরীর সঙ্গে একমত। বলল, 'এতদিন হয়ে গেছে, ৪৫ দিন পরে টেস্ট করলেই বোঝা যাবে। তবে ওর বয়স সঠিক কত সেটাও জিজ্ঞেস করে নিও। ওর বাবা তো বলেছে ব্যাগে ওর সব সার্টিফিকেট ভরে দিয়েছে, ক্লাশ টেন বোর্ডের হল কার্ড, পাস সার্টিফিকেট দুটোই চেক করে নিও। ১৮ বছর হয়ে গিয়ে থাকলে টার্মিনেশনে ওর মত আছে কিনা এটাও জানা জরুরি। গুরুজী ওকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজে যেন কোনও বিপদে না পড়েন। কারণ, আমরা কেউই এই মেয়ের সম্বন্ধে কিছুই জানি না। গুরুজী বলেই এই কেস কাঁধে করে

নিয়ে এসেছেন। অন্য কেউ আনতো না। পথে অ্যাকসিডেন্ট কেসগুলো দেখ না? দাঁড়িয়ে মোবাইলে ফটো তুলবে, কিন্তু পুলিশে, অ্যাম্বুলেন্সে একটা ফোন করার চেষ্টা করবে না। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। সময়মতো একটু সাহায্য পেলে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যুর হার ৭৫ শতাংশ কমে যাবে।... আমরাও গুরুজীর সঙ্গে সঙ্গে কুসুমের জন্য কিছু করতে পারলে ধন্য হব এটাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু কুসুম পরে গুরুজীর প্রতি কতটুকু কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবে কী থাকবে না সেটা বলতে পারব না। জানি, উনি কারও কৃতজ্ঞতার পরোয়া করেন না, বিবেকের আজ্ঞা পালন করে চলেন, কিন্তু কুসুম কখনও গুরুজীকে বিট্রে করলে আমি ছাড়ব না।'

মাস্টারজী বললেন, 'দাঁড়া। বড় ইমোশন্যাল হয়ে পড়িস সামান্য বিষয়ে। কুসুম খারাপ মেয়ে হবে না রে! জীবনের শুরুতেই যে চোট পেল ও সেই চোটই ওকে নীচ হতে দেবে না, দেখে নিস। দেখলি তো ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণায় যে মেয়ে কিছুক্ষণ আগে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল, সে কিন্তু শুতে যাবার আগে বড়দের প্রণাম করার শিষ্টাচার ভোলেনি। ও কিচ্ছু ভুলবে না। একটু সুযোগ, সামান্য সহায়তা পেলে ও একদিন মাতা চণ্ডী হয়ে আবির্ভূত হবে বলরাজের মতো সমাজের শত্রুদের জন্য। ... দ্যাখ, তোরা এবরশনের পক্ষে যে যুক্তি দিয়েছিস সেটা অস্বীকার করি অমন সাধ্য আমার নেই। ভালো যুক্তি। একেবারে ওয়েদার ফোরকাস্টের মতো। হরিয়াল গ্রাম সত্যিই এত উদার হয়ে যাবে, এটা আমারও বিশ্বাস হয় না। আমি নিজে অকারণ ভ্রূণ হত্যার বিরোধী। কন্যা সন্তান আছে গর্ভে তাহলে তো সর্বনাশ। এবর্ট করে ফেলো! এইরকম ব্যাপারগুলোকে আমি অপরাধ, হত্যা বলে মনে করি। যে প্রাণ গর্ভে এসেছে সে তো জানে না সে পুং লিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ, জানে না তার গর্ভে আসাটা পবিত্রতার সূত্র ধরে, না অপবিত্রতার সূত্র ধরে। হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষেত্রে তবুও মানা যায় যদি এই ভ্রূণের জন্য মা-র জীবন সংশয় দেখা দেয় তাহলে টার্মিনেট করা ছাড়া উপায় থাকে না।... কুসুমের যদি গর্ভাবস্থা ধরা পড়ে তাহলে ও যা চাইবে তাই হবে। আমি মতামত দেব না।'

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে— 'আপনি বললেন না যদি মা-র জীবন সংশয় দেখা দেয়, তাহলে মেনে নেওয়া চলে? কুসুমের জন্য তো এটা জীবন সংশয়ই গুরুজী! ওর আত্মহত্যার চেষ্টাই তো প্রমাণ। জীবন সংশয় শুধু শারীরিক কারণে হয় তা কিন্তু নয়, সামাজিক অবক্ষয়ও কারণ হতে পারে। এখন রেপ একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন খবরের শিরোনাম হচ্ছে।

আমরা কতজনের কথাই বা জানতে পারি, বেশিরভাগই তো কুসুমের মতো গোপন থাকে। বাচ্চা মেয়েরা ১৩-১৪ বছর বয়সে জীবন সংশয়ে ভুগে সুইসাইড করে।'

মাস্টারজী হাসিমুখে বললেন, 'আমার চালেই আমার কিস্তিমাত করে দিলে বহু। জয় হো। মেনে নিলাম তোমার যুক্তি।'

অরবিন্দ বলল, 'আমার একটা কথা ছিল। বলছিলাম যে কুসুম তো এখানে আমাদের কাছেও থাকতে পারে। আপনি সারা জীবন ধরে আমাদের গ্রামের মানুষের বোঝা বয়ে চলেছেন, এখন তো দেখছি পথঘাটেও বোঝারা আপনার জন্যই যেন অপেক্ষা করে থাকছে। গুরুজী, কিছু বোঝা আমাদেরও বইতে দিন। কুসুম এখানে থেকেই পড়াশোনা করুক না। বাবলি-গলুর সঙ্গে ভালোই থাকবে ও।'

— 'একেবারে ঠিক কথা বলেছ তুমি। এখানেই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। ও এবর্ট করতে চাইবেই যদি প্রেগন্যান্ট হয়ে গিয়ে থাকে তো। এখন গ্রামের মেয়েরা আর বোকা নেই, শহরের মেয়েদের মতোই কেরিয়ার সচেতন হয়ে গেছে। অনেক বুদ্ধি রাখে তারা। ... এই ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, এটা আমি সামলে নিতে পারব। কয়েক ঘণ্টা আগে ওর মাথার উপর আকাশ ছাড়া আর ছাদ ছিল না। এখন দুর্ভাগ্য ওকে ছেড়ে চলে গেছে। ও একটা পরিবারের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েছে, এটা বোঝার বুদ্ধি কি ওর নেই? হ্যাঁ, এখন থেকে গুরুজীকে দায়-দায়িত্ব নিজের ছেলেদের সঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত প্রিয় ছাত্রদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। উনি একা কেন করবেন আমরা থাকতে?'

— 'আমি জানি তো তোমরা আমার পাশে আছো, তাই তো দায়ে পড়লে ছাত্রদের কাছেই যাই। হংসরাজ, অজয়, বিমান, রামপ্রসাদ, অরবিন্দ— তোমরা যে আমার কলিজার এক একটা টুকরো। তোমাদের সহায়তা না পেলে আমি কি হরিয়াল গ্রামে এত কাজ করতে পারতাম কখনও? এখন কথা হলো, কুসুমের থাকা নিয়ে। তোমাদের কাছে ও হরিয়াল গ্রামের চেয়ে অনেক বেশি ভালো থাকবে, কিন্তু এগারো ক্লাশে মিডিল অফ দ্য সেশন স্কুলে ভর্তি করাবে কী করে? ওর বাপ সব সার্টিফিকেট দিয়েছে, কিন্তু টি.সি. দিয়েছে কি? আমার মনে হয় না, লোকটা টি.সি. দিয়েছে। সে অতো চিন্তাশীল ব্যক্তি নয়, নিজের জান বাঁচানোর চিন্তাটাই ওর বেশি ছিল। নেহাতই বার্থ আর স্কুলের সার্টিফিকেটগুলো সঙ্গে দিয়ে বলেছে ছোটখাটো কাজকর্ম পেলে করিস। যদি পড়ার সুযোগ পাস সে কথা ভেবে বইগুলোও দিয়েছে আর তিন হাজার টাকাও দিয়েছে। টি.সি. ছাড়া কোনও স্কুলে অ্যাডমিশন করাতে পারবে না তোমরা। হরিয়াল স্কুলেই সম্ভব হবে, ব্যাপারটা আমার নিজের হাতে আছে বলে।'

অরবিন্দ হতাশ হয়ে বলে, 'যাহ্! তাহলে তো হবে না।'

— 'আমারও আর একটা কথা ছিল। বলছিলাম, গ্রামের মানুষকে কী বলবেন, কুসুমের কী পরিচয় দেবেন, এটাও ভাবতে হবে। আত্মীয় তো বলতে পারবেন না, কারণ আপনি ব্রাহ্মণ আর ও সিং। হরিয়াল যতই উন্নতি করুক গ্রাম্য কৌতূহল এখনও তীব্রভাবে আছে।'

মাস্টারজী মুগ্ধ গলায় বলেন, 'এই জন্যই আমি মেয়েদের রেসপেক্ট করি। আমাদের মাথায় যা ঠিক সময়ে আসে না মেয়েদের বেলা সেগুলো ঠিক সময়ে মাথায় হাজির হয়ে যায়। বহু, একটা নতুন সমস্যার ইঙ্গিত দিলেন। এখন বহু তুমিই পথ বাত্‌লে দাও তাহলে।'

গৌরী মুচকি হেসে বলল, 'আমাকে পথ বাত্‌লাতে হবে না গুরুজী। আপনাকে মার্গদর্শন করাবার জন্য বাড়ির অন্দরমহলের কর্ত্রীই যথেষ্ট। তিনিই কোনও কাহিনি বানিয়ে আপনাকে শিখিয়ে দেবেন। আপনি শুধু ওনার বলা কথাটুকু শুনে চলবেন, তাহলে সব দিক রক্ষা হবে।'

— 'বেশ! তিনিও চাণক্যর থেকে কিছু কম নন। তুখোড় বুদ্ধি যেমন রাখেন, তেমনি এমন গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন যে লোকে দিনকেও রাত বলে বিশ্বাস করে ফেলবে।'— মাস্টারজী হাই তুলছেন। সারাদিনের ধকলে এখন ক্লান্ত ঘুমার্ত হয়ে পড়েছেন। রাত এখন ১.২০ মিনিট। অরবিন্দ গৌরীকে ওঠার ইশারা করল। ওরা গুরুজীকে প্রণাম করে ওনার রুম পর্যন্ত গিয়ে বিদায় নিল।

বাবলি ঘুম থেকে উঠে পড়েছে, কিন্তু কাল রাত্রে যে মেয়েটা এসেছে সে গভীর ঘুমন্ত। বুকের উপর হাত ভাঁজ করে এক পায়ের উপর অন্য পা তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। বাবলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল— 'ও য়া..ও! হোয়াট অ্যা স্লিপিং বিউটি।' সশব্দেই বলেছে, তবুও মেয়েটার ঘুম ভাঙল না। গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসে বুক উঠছে নামছে। থাক, ঘুমোক, ওকে তো স্কুলে যেতে হবে না। গত রাতে বেশি কথা হয়নি, বলেছিল ইলেভেন ক্লাশে পড়ে। তার মানে ওর একবছরের জুনিয়ার। কী দারুণ সুন্দর দেখতে ওকে। যেমন লম্বা, তেমনি মজবুত পেটানো স্বাস্থ্য। ওর থেকে এক বছরের ছোট, কিন্তু কাল দেখে মনে হয়েছিল বড়। তবে কেমন যেন চুপচাপ। হাসেওনি একটি বার। কথাও কম বলছিল কাল।

ফ্রেন্ডশিপ করবে কিনা কে জানে! বাবলি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কুসুম ঘুম ভেঙে চোখ খুলে পায়ের দিকের দেওয়ালে লাগানো ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। একি! সাড়ে আটটা বাজে! জীবনে কোনও দিন এত বেলা অব্দি ঘুমোয়নি। রাত কাটেনি তেমনি ভোরে জাগার অভ্যাস চিরকাল। চারপাশটায় চোখ বুলিয়ে মনে পড়ল গতকালের কথা। ওই দেবতুল্য মানুষটি ওকে লখনৌ শহরে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। আঙ্কেল-আন্টি দুজনেই ডাক্তার। এরাও মনে হয় খুব ভালো মানুষ, তা না হলে নিজের মেয়ের কামরায় ওকে শুতে দেয়? এরকম গদিওয়ালা বিছানায় শুয়েছে বলেই ঘুম ভাঙেনি। এরা ধনী মানুষ হয়েও গরিব, গ্রামের মেয়েকে এতো সম্মান দিয়েছেন, যা ওর কল্পনাতীত। ও তো জানত বড়লোকেরা গরিবদের মানুষ বলেই মনে করে না। কিন্তু এরা তো একেবারেই অন্যরকম। বড় আশ্চর্য লাগছে ওর। আঙ্কেলরা দেবতুল্য মানুষটিকে গুরুজী বলে ডাকছেন। উনি তো বলেছিলেন উনি একজন শিক্ষক। অবশ্য শিক্ষকও গুরুই হন, তাই বোধহয় গুরুজী বলে সম্বোধন করেন! ওদের মেয়ে বাবলি নামজাদা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, কিন্তু কাল রাতে কথা বলার সময় শুদ্ধ হিন্দিতেই কথা বলেছে। অহঙ্কার আছে বলে মনে হয়নি। ও ইংরেজিতে ভালোই নম্বর পেত, ইংরেজি কথা বুঝতে পারে, তবে বলতে একেবারেই পারে না। ভগবান বোধহয় একেবারে অকৃপন নন। তা না হলে আজকের সকাল ওর জীবনে এতো সুন্দর হয়ে আসার কথা নয়।

তাড়তাড়ি পাশেই শৌখিন বাথরুমে গিয়ে মুখ কুলি করে চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে আসে ও। ওরা সবাই নাস্তা করছে, এটাকে ব্রেক-ফাস্ট বলে। প্রথমেই আন্টি বলেন, 'শুভ্ দিন বেটা।' কুসুমও উত্তর দিয়ে একে একে তিনজনকে প্রণাম করে বলে, 'মুঝে মাফ করেঙ্গে আপলোগ। মেরি নিন্দ নহী টুটি, ম্যায় শর্মিন্দা হুঁ।'

ওর পিঠে চাপড় মেরে গৌরী বলে, 'কোই বাত্ নহী বেটা। ভালো ঘুম হয়েছে, এখন ফ্রেশ লাগবে। তোমাদের বাথরুমের কাবার্ডে নতুন টুথব্রাশ আছে কয়েকটা, একটা নিয়ে ব্রাশ করে ফেলো। যাও, দেরি করো না, পরোটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

কৃতজ্ঞতায় মাথা নীচু করে কুসুম বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ আন্টি।' বলেই দ্রুত বাবলির রুমের দিকে চলে যায়। কী আজব ব্যাপার, আন্টি বাবলির রুমকে, বাথরুমকে 'তোমাদের বাথরুম' বলেন। ব্রাশ করতে করতে ওর প্রবল কান্না এলো। ঝরঝর করে ধারাপাত হতে লাগল দুচোখ থেকে। এসব কী সত্যিই ঘটছে নাকি ও দিবা স্বপ্ন দেখছে? এসব কী সত্যিই ওর মতো অভাগা, অনাথ মেয়ের জীবনে টিকে থাকবে? নাকি ক্ষণিকের জন্য বুদবুদের মতো ফুটে উঠেই মিলিয়ে যাবে? আন্টিরা ওর কলঙ্কিত হয়ে যাওয়ার বিষয়ে এখনও কিছু জানেন না নিশ্চয়, যখন জানবেন তখন কি ওকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন? ওনাদের পূজনীয় গুরুজীর সঙ্গে এসেছে বলে ভালো মেয়ে বলে ভেবেছেন। ও যে প্রকৃতই ভালো মেয়ে, ওকে যে জবরদস্তি কলঙ্কিত করা হয়েছে, সেকথা কি ওরা বুঝবেন? এরা যদি ওকে না রাখেন তখন গুরুজী ওকে কোথায় রাখার ব্যবস্থা করবেন?— প্রবল অনিশ্চয়তার দোলাচলে দুলতে থাকে ১৭ বছরের নিরপরাধ অসহায় মেয়ে কুসুম সিং।

মনের ভাবনা তো আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে ছোটে, বাথরুমে কিন্তু ও বেশি সময় কাটায়নি। ঝটপট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে ডাইনিং রুমে ফিরে এসে গৌরীর কাজে সাহায্য করতে চায়— 'আন্টি, আমি খানা বানানো, ঘরের কাজ সব করতে জানি।'

— 'খুব ভালো কথা। আমিও তোমার মতো বয়স থেকে ঘরের সব কাজ করেছি। আমার মা'র অ্যাস্থমা মানে শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুখ ছিল, তাই ১০-১২ বছর বয়স থেকে কাজ করতে হয়েছে। তবে এখন তো আমি ঘরের কাজ করি না, আর রান্নাবান্না সব কাজেরই লোক আছে বেটা। আমি শুধু খানা পরিবেশনটুকু নিজে করতে ভালোবাসি, তাই ওটা করি। তোমাকে এসব কিছু করতে হবে না। তুমি নাস্তা করতে আরম্ভ কর।'

বাড়ি এখন খালি। গুরুজী হাতে সময় পেয়েছেন। ব্যাস! নাস্তা করেই কোনও তাগাদায় কোথাও ধর্না দিতে বেরিয়েছেন। গৌরী কুসুমকে পাশে নিয়ে বড় সোফায় গিয়ে বসলো ড্রইং রুমে। কোনও ভনিতা না করে বলল, 'বেটা, কাল রাত্রে তোমরা শুয়ে পড়ার পর অনেক রাত অবধি গুরুজী আমাদের কাছে তোমার সব কথা খুলে বলেছেন। তোমার উপর যে অবিচার হয়েছে, তার জন্য তুমি দায়ী নও। আমি তো একজন মা, আমি বুঝতে পারছি তোমার নিজের ভেতরে কত যন্ত্রণা চলছে। আজ তোমার উপর বলাৎকার হয়েছে, কাল বলা কি যায় বাবলির উপর হবে না? তোমার আঙ্কেল, আমি দুজনেই যে ডাক্তার তুমি সেটা জেনেছ। তাই তুমি সত্যিই প্রেগন্যান্ট কিনা সেটা আমি টেস্ট করলেই বুঝতে পারব। সে জন্য কবে ঘটনাটা ঘটেছিল, তোমার লাস্ট পিরিয়ডস কবে হয়েছিল, সেই তারিখগুলো আমাকে বল। অনেক সময় তোমার বয়সী মেয়েদের স্বাভাবিক কারণেও ২-৩ মাস পিরিয়ডস বন্ধ থাকে। পরে আবার হয়ে যায়। ভগবান করুন তোমার যেন সেটাই হয়। কিন্তু যেহেতু তোমার উপর বলাৎকার হয়েছে এবং পিরিয়ডস্ সময়মতো

হয়নি সেই হেতু প্রেগন্যান্ট হবার সম্ভাবনাও থাকতে পারে। আমি স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ গাইনোকোলজিস্ট বেটি। তুমি প্রথম দিন থেকে আজ অবধি সব কথা আমাকে বল নিঃসঙ্কোচে, মনে কর আমিই তোমার মা। আমি ডেট কাউন্ট করে ইউরিন টেস্ট করলেই জানতে পারব। রেপ-এর পর তোমার কি ৪০ দিন পার হয়ে গেছে পিরিয়ডস্ হয়নি। কত তারিখ রেপ হয়েছিল আর তারপর কত তারিখ তোমার ডেট ছিল সেটা বললেই বুঝতে পারব। বল বেটা, আমাকে বিশ্বাস করে বল। আমিই তোমাকে উদ্ধার করতে পারব।'

কুসুম কথা বলার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল। গৌরী ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে সাহস জোগাচ্ছিল। সময় দিচ্ছিল। একসময় কুসুম দোপাট্টা দিয়ে চোখের জল মুখে শক্তি জোগাড় করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলতে লাগল। কী করে কত তারিখ একা স্কুল থেকে ফেরার পথে বলরাজ মোটর বাইক নিয়ে ওর পথ আটকে ওকে টেনে নিয়ে গন্না ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছিল। তারিখ, সময় সব বলল। গৌরী ক্যালকুলেট করে দেখল ঘটনা প্রায় আঠাশ দিনের পুরনো। অ্যাকুরেট টেস্ট রেজাল্ট ৪৫ দিনে পাওয়া যায়, ৪০ দিনেও মোটামুটি বোঝা যায়।

কুসুম বলছিল, 'আমার বাবা একজন মামুলি কিষান, বেশি জমি নেই, তবে যেটুকু আছে তাতে গুজারা হয়ে যায় কষ্ট করে। আমরা তিন বোন। ভাই নেই বলে বাবার মনে খুব আক্ষেপ দেখেছি। ভাই এনে দিতে না পারার জন্য মাকে সবসময় দোষী করত, শান্তি দিত না। মা আড়ালে কাঁদত। আমি ছোটবেলা থেকে লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিলাম। একটু বড় হওয়ার পর ভাবতাম বাবার পাশে ছেলে হয়ে দাঁড়াবার মতো করে নিজেকে তৈরি করব আমি। আমাদের গ্রামে মিডল স্কুলের উপর আর স্কুল নেই। মিডল স্কুল পাশ করার পর পাশের গ্রামের এইচ এস স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরলাম। বাবা রাজি হচ্ছিল না। প্রথমত, সেটা আমাদের গ্রাম থেকে ২ কিলোমিটার দূরে, দ্বিতীয় : পড়ার খরচের কথা ভেবে ভয় পাচ্ছিল। অনেক কান্নাকাটি করে রাজি করালাম। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে দল বেঁধে হেঁটে স্কুলে যাওয়া-আসা করতে কোনও কষ্ট হতো না আমার। যাদের সাইকেল আছে তারা সাইকেলে যেত। স্কুলে পড়াশুনা, খেলাধুলায় ভালো ফল করে টিচারদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। তাঁরা বই-খাতা দিয়ে অনেক সময় সাহায্য করেছেন আমাকে। ক্লাশ টেন-এ ইউ পি বোর্ডে আমি ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলাম, এই নম্বর এই স্কুলের ইতিহাসে আগে কেউ পায়নি। আমার কোনও প্রাইভেট টিউটর ছিল না, সকলেই জানত আমি একক চেষ্টায় পড়াশুনা করেছি। স্কুল পরিষদ খুশি হয়ে স্কুলের তরফ থেকে মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তি দিলেন আমাকে। বললেন, ১২ ক্লাসের বোর্ডে যেন আরও ভালো রেজাল্ট করে তাদের এবং স্কুলের নাম রৌশন করি।.. নাম রৌশন করতে পারলাম না আন্টি, নাম বদনাম করে আজ আমি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার বাবা নিজে আমাকে ভরা সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে একটা বাস স্টেশনে পথে বসিয়ে রেখে পালিয়ে গেল। উনি আমাকে রক্ষা না করলে এতক্ষণে আমি বেওয়ারিশ লাশ হয়ে মর্গে পড়ে থাকতাম, না হলে হিউম্যান ট্র্যাফিকিং মাফিয়ার হাতে পড়ে ফ্লেশ ট্রেডিং-এ ঢুকিয়ে দিত।

গৌরী অবাক হয়ে বলে ওঠে— 'তুমি এসবও খবর রাখো? আমি ভাবতে পারিনি তোমার এতখানি নলেজ আছে! বাহ্!'

কুসুম বলল, 'অফ টাইমে নিউজ পেপার পড়তাম স্কুলে। বাড়িতে তো রাখা হতো না পেপার। আমাকে যে বাবার ছেলের শখ মিটিয়ে তার পাশে খুঁটির মতো দাঁড়াতে হবে। এডুকেশন, নলেজ, কেরিয়ারই যে আমার অব্যর্থ নিশানা ছিল। হিন্দি মিডিয়ামে পড়েছি, ইংরেজি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝি মোটামুটি। শুধু পড়াশোনা করিনি, তার সঙ্গে যোগ ব্যায়াম, লাঠি চালনা, খেলাধুলা করে নিজেকে একটা ছেলের মতো তৈরি করার চেষ্টাও করেছি। পারিনি শুধু এই মেয়ে শরীরটাকে রূপান্তরিত করতে। যে পরিবার, যে বাবা-মার জন্য আমার তপস্যা ওরাই আমাকে সবচেয়ে বেশি বিট্রে করেছে আন্টি। আমি আর ওদের মাতা-পিতা বলে মনে করতে পারব না কোনও দিন। বলরাজ গুন্ডা, সে আমার আগেই গ্রামের তিনজনকে রেপ করেছে। ওর ভয়ে সকলেই কথাটা গোপন রাখতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি। কারণ ওরা তিনজনই প্রেগন্যান্ট হয়ে সুইসাইড করে মরেছে। আমার পিতাও তো আমাকে সুইসাইড করার জন্যই বাস আড্ডায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি মরতে চাইনি আগে কখনও, ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছি। জানি না আমার কী হবে।'

গৌরী কুসুমের হাতখানা ধরে ভরসার চাপ দিয়ে বলে, 'আপসেট হয়ো না বেটা। একটা দুর্ঘটনাতেই জীবনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার মতো দুর্বল মেয়ে তো তুমি নও। লড়াই করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেছ এইটুকু বয়সে, দুর্ভাগক্রমে লড়াই জলদি এসে গেছে সামনে। তোমাকে তো এই লড়াই জিততেই হবে, স্কুলের পরীক্ষায় যেমন জিত হাসিল করেছ, তেমনি জীবনের পরীক্ষাতেও জিত হাসিল করতে হবে। ঈশ্বর তোমার কাছে ঠিক সময়ে গুরুজীকে এনে দিয়েছেন। জানো, গুরুজী হারতে জানেন না। বারবার বাধা পেলেও ধৈর্য ধরে একসময় সব বাধা অতিক্রম করতে জানেন তিনি। তুমি যখন তাঁর শরণে এসে পড়েছ, তখন জানবে তোমার আর কোনও ভয় নেই। তিনিই তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত মোকামে পৌঁছে দেবেন। এখন আমরা কাজের কথা বলব। তোমার

ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তোলার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। প্রথমে বল ওখানকার স্কুল থেকে তোমার বাবা কি স্কুল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়েছিলেন? সেটাও কি তোমার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন?'

— 'টি. সি.? না তো! বাবা তো আর আমাকে পড়াবার ধান্ধা করেনি, যে টি.সি. নেবে। ঘরে বার্থ সার্টিফিকেট, টেনথ্ বোর্ডের অ্যাডমিট হল কার্ড, মার্কিশিট, আধার কার্ড আর ম্যাট্রিকের রেজাল্টএগুলোই ছিল, ব্যাগে ঢুকিয়ে দিয়ে লোকদেখানো ভালমানুষী করে বলেছে, যদি সুযোগ পাস তাহলে পড়িস! টি.সি. নিলে আমাকে বলতো। জানেন আন্টি, বাবা গ্রামে সবাইকে বলেছে রেপড্ হবার পর আমি আর বাড়িতে ফিরে আসিনি। কোথায় চলে গেছি বাবা জানে না। আমাকে নাকি খুঁজে চলেছে, কিন্তু পাচ্ছে না। ওদিকে বলরাজের চ্যালারাও আমাদের ঘরে ঘরে ঢুকে তল্লাশি করে গেছে। আমি তখন আমাদের বাড়ির পেছনে কচুরিপানা ভরা তালাউটাতে ডুবে থেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি। ওরাও পায়নি, বাবা পাচ্ছে না আমাকে। তাই সবাই বিশ্বাস করেছে যে আমি ধর্ষণের লজ্জায় গ্রাম ছেড়ে কোথাও চলে গেছি। পরশুদিন রাত দুটোর সময় আমার লুকিয়ে থাকার জায়গা রসুই ঘরের মাচানের উপর থেকে নামিয়ে বলল, 'চল, আমাদের এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। তুই এখানে থাকলে তোকে জিন্দা জ্বালাবে বলে বলরাজ ফতোয়া জারি করে দিয়েছে। বলরাজের চোখটাতে শূন্য একটা গর্ত ছাড়া আর নাকি কিছু নেই। ওরা তোকে না মেরে ছাড়বে না। আমি তোকে প্রাণে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। রাতের অন্ধকারে ক্ষেতের গন্নাগাছের আড়াল দিয়ে অনেক দূরে চলে যাবো। তারপর বাঁচলে অনেক কিছুই হতে পারে, মরে গেলে তো সব শেষ। তোর মা তো বলেছে তুই কাল বমিও করেছিস, তোর পেটে বাচ্চা এসে গেছে সন্দেহ হচ্ছে। এই অবস্থায় মাচানের উপর কতদিন থাকবি বল? আমরাই বা কী করব? তুই এখানে থাকলে সবাইকে যে মরতে হবে! আমি নিরুপায়। আয় দেরি হয়ে যাচ্ছে। তোর নসিবে থাকলে ভালও হতে পারে।'

— 'থাক কুসুম। ওসব যত ভাববে তত কষ্ট পাবে। তোমার পিতাজী যদি স্কুল থেকে টি.সি. নিয়ে তোমার সঙ্গে দিয়ে দিতো আর কোনও সমস্যা থাকতো না। তুমি আমার কাছে থেকে স্কুলে পড়তে পারতে। কিন্তু টি.সি. ছাড়া এখানে কোনও স্কুলে ভর্তি নেবে না। আমরা ডাক্তাররা টেষ্ট না করে কাউকে প্রেগন্যান্ট বলে ঘোষণা করি না। বমি করলে বা মাথা ঘুরালেই যে প্রেগন্যান্ট হয়ে যায় এমন নয়। তোমার রেপ হয়েছে বলেই তোমার মা সন্দেহ করেছেন। আমি সঠিক সময়ে টেস্ট করে দেখব। আচ্ছা, ধর যে তুমি সত্যিই প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছ, সেই ক্ষেত্রে তুমি কী চাইবে আমার কাছে? ঐ অবাঞ্ছিত বাচ্চা রাখতে চাইবে না ফেলে দিতে চাইবে? ওটা কিন্তু এখন কোনও আকৃতি নেয়নি, শুধুই একটা রক্তের ঢ্যালা অবস্থায় আছে।'

কুসুম শান্ত গলায় বলল, 'আমি তো চাইব আমার কিছু হয়নি এটাই আসুক টেস্টে।'

গৌরী ক্রস করে, 'আর যদি উল্টো হয়? বাচ্চা এসেছে ধরা পড়ে তখন কি চাইবে যে, মরতে মরতে বেঁচে যাওয়ার যে সুযোগ পেলে সেই সুযোগ নষ্ট হয়ে যাক? জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন হারিয়ে যাক একটা নাজায়েস বাচ্চা পয়দা করার মুর্খতার জন্য? তোমার ১৭ বছরের সুন্দর জীবনে একটা অঘটন ঘটে গেছে, সেই ঘটনার অভিশাপ কিছুটা তো এখনই টের পাচ্ছো, সারাজীবন ধরে এই অভিশাপ একা বহন করতে পারবে? আমরা বাচ্চার ভার নেব না।'

কুসুম মাথা নীচু করে বসে হাতের লম্বা করা নোখ খুঁটছিল। ওই অবস্থায় বসেই মৃদু স্বরে বলল, 'এ..এটা থাকলে ব...বলরাজের বদলা নিতে পারব, সবুত থাকবে, ওর সাজা হবে, ফাঁসির ফান্দায় লটকাতে চাই ওকে। আন্টি শুধু ভদ্র পরিবেশে থাকতে চাই, একটু আশ্রয়, একটু দয়া কর।'

গৌরী কঠিন গলায় বলল, 'না, কুসুম। তুমি তোমার বাবার চেয়েও বেশি স্বার্থপর। গুরুজী আর আমাদের ভালোমানুষ পেয়ে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছ। তুমি নিজের জন্য সব চাও, অন্যদের অসুবিধার কথা ভাবো না। আমার ছেলেমেয়ে এসব দেখে প্রশ্ন করবে, সেটা কেন মেনে নেব? এবর্ট করতে রাজি হলে ওরা বুঝতেই পারত না। তুমি গুরুজীর কথাও ভাবছ না। ওনার পরিবার আছে, গ্রামের মানুষ কত সম্মান করে তাদের। বলরাজকে সাজা অন্য ভাবেও দেওয়া যায়, তার জন্য তোমাকেই বহু বছরের পড়াশুনায় নিজেকে তৈরি করতে হবে। বাচ্চা কে পালবে?'

এই মেয়ে অত্যন্ত অ্যাম্বিশাস, গতকাল জীবনের কাছে হেরে গিয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল, ক্ষণিকের জন্য ইমপালসিভ্ হয়ে। আশ্রয় পেয়েই নিজের জেদ, দাবি প্রকাশ করছে। ও বুঝতে পেরেছে গুরুজী ঈশ্বর প্রেরিত দূতের মতো ত্রাণকর্তা হয়ে ওর জীবনে এসে হাজির হয়েছেন। ওর বাবা ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারত না, কিন্তু এখন সেই আশা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা প্রচুর। জাতে জাঠ এই মেয়ে কন্যাসন্তানের ওপর অত্যাচার দেখে বড় হয়েছে। এখন মুক্ত জীবনের হাতছানি পেয়েই ওর ইচ্ছে পূরণের ঠিকাদার মনে করছে আমাদের সবাইকে।

পরমেশ্বর শর্মার দিনটা আজ শুভ। অ্যাসেম্বলি হাউসের বাইরেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন কড়া রোদে, এমন সময় একটা গাড়ি একেবারে তার প্রায় গা ঘেঁষে এসে থামল। আর একটু

হলে হয়তো চাপা দিয়ে দিত। ড্রাইভারকে তিরস্কার করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই পেছনের জানালা খুলে, 'আরে, শর্মাজী'— বলে উঠল কেউ। ফিরে তাকিয়ে দেখেন বিজয়েন্দ্র তিওয়ারি, ইউ-পির শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং।

উনি বললেন, 'এত রোদে দাঁড়িয়ে কার অপেক্ষা করছেন শর্মাজী?'

মাস্টারজী জানালার পাশে এসে অম্লান বদনে একটি মিথ্যে কথা বলেন— 'কার আবার? আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যই দশ নম্বরি পথে যদি ভেতরে যাওয়া যায় সেই চেষ্টাই করছিলাম স্যার।'

হেসে তিওয়ারিজী গাড়ির দরজা খুলে বললেন, 'উঠে আসুন।'— মাস্টারজী সঙ্গে সঙ্গে হাতে পাওয়া স্বর্গে উঠে বসে পড়েন। বিজয়েন্দ্রর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়। তখন তিনি মন্ত্রী হননি, পার্টির প্রথম সারির নেতা ছিলেন। কত ব্যাপারে যে বিজয়েন্দ্র তাঁকে সাহায্য করেছেন ইয়ত্তা নেই। অতি অল্প সংখ্যক নেতা যারা আম আদমির সেবা করার আদর্শ মেনে চলে বিজয়েন্দ্র তাদের একজন। বিজয়েন্দ্রও জানেন, পরমেশ্বর শর্মা নিজের ছেলে, অন্য আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন ইত্যাদিদের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান না। শর্মাজীও তার গ্রামের আম আদমির জন্য নিঃস্বার্থ সেবা বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিজয়েন্দ্র পরমেশ্বর শর্মাকে পছন্দ করেন, শ্রদ্ধা করেন। কতবার তাঁকে নিজের পার্টিতে যোগদানের অনুরোধ করেছেন, কিন্তু শর্মাজী রাজি হননি। নাম, যশ, পদ— কিছুর প্রতিই এই ব্যক্তির আকর্ষণ নেই। এই নির্লোভ মানুষটি বিজয়েন্দ্রর মুষ্টিমেয় পছন্দের তালিকায় একজন।

পরস্পর সৌজন্য বিনিময়ের পর বিজয়েন্দ্র বললেন, 'আপনি ফোন তো করতে পারতেন।'

— 'ফোন যখন করতাম তখন আপনি দেশের সবচেয়ে বড় প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন না স্যার। এখন যার যে সম্মান প্রাপ্য তাকে সেটা অবশ্যই দিতে হবে। এসে দেখা করে আর্জি পেশ করতে হবে।'

মুগ্ধ বিজয়েন্দ্র বিনম্রভাবে বলেন, 'আপনাদের মতো গুটিকয় আদর্শবাদী মানুষ আমার শিক্ষাগুরু। এবার বলুন, কী জন্য দেখা করতে এসেছেন। তার আগে বলুন খাওয়া হয়েছে? শুনেছি না খেয়ে আপনি সারাদিন নাকি অপেক্ষা করতে পারেন, তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

মাস্টারজী মনে মনে ভাবেন— এসে তো ছিলাম হল্ট স্টেশনের মতলবে, ভগবান যখন তোমার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিলেন তখন গার্লস স্কুলের অ্যাফিলিয়েশনের আর্জি পেশ করার মৌকা ছাড়ব কেন? মুখে হাসি নিয়ে আবার অম্লান বদনে আর একটি মিথ্যে কথা বললেন— 'হ্যাঁ, সেই পরিস্থিতি কখনও হয়েছে বটে, তবে আজ লাঞ্চ করেছি। আপনি বিধানসভা ছেড়ে কোথায় চললেন?'

— 'আমি একটা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে যাচ্ছি। যেতে যেতেই কথা হবে। আপনার সুবিধামতো জায়গায় নামিয়ে দিয়ে যাবো। এবার বলুন।'

কথা হলো। বিজয়েন্দ্র আশ্বাস দিলেন তিনি নিজে ব্যাপারটা দেখবেন। ওর আশ্বাস মানে বাদলা আকাশে সূর্য ওঠা। মাস্টারজীর মন ভরে গেল। এ যেন মেঘ না চাইতে জল। যথাস্থানে তাকে নামিয়ে দিয়ে মন্ত্রীর গাড়ি চলে গেল, তখন রিস্ট ওয়াচে চোখ দিয়ে দেখেন বেলা সাড়ে তিনটে বাজে। ছিঃ ছিঃ! গৌরীকে জানাবার সময়ই পাননি। না খেয়ে গুরুজীর অপেক্ষায় বসে থাকবে মেয়েটা। এখান থেকে অরবিন্দের বাড়ি অটো রিক্সাতে ১৫-২০ মিনিটের রাস্তা। তাড়াতাড়ি গৌরীকে ফোন করে বললেন, 'খেয়ে নাও। জানাতে না পারার জন্য দুঃখিত। আমি এসে সব বলব। আমার খাওয়া হয়ে গেছে, মা। তুমি অপেক্ষা করো না আর। খেয়ে নাও এখন।'— ফোন করে একটা চায়ের দোকানে এসে এক গ্লাস চা আর দুটো রাস্ক বিস্কুট নিয়ে চায়ে ডুবিয়ে খেয়ে নেন।

গৌরী জানে কোনও বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন গুরুজী, তা না হলে সময়মতো এসে পড়তেন খেতে, নয়তো দেরি হবে বলে জানিয়ে দিতেন। ও খায়নি বলে কুসুমও খেতে চাইচিল না। বকাবকি করে গৌরী ওকে লাঞ্চ খাইয়ে দিয়েছে। লক্ষ্য করছে সকালের আলোচনার পর থেকে কুসুম ঘাবড়ে গেছে, কিন্তু বলেনি— তাহলে এবর্ট করিয়ে দাও। উল্টে বকবক করেই চলেছে— কোনওদিন ওদের গ্রামের বাইরে কোনও শহর দেখেনি, আর এখন একেবারে লখনৌ সিটিতে এসে পড়ল! এরকম বাড়ি টিভিতে দেখেছে। এটা কী, ওটা কী সব জানার কৌতূহল আছে। কাজ করতে চাইছে, আমাকে শিখিয়ে দাও, আমি মাইক্রো ওভেনে খানা পাকাবো। ওয়াশিং মেশিনে কাপড়া ধোলাই করব— মানে সব কাজই ও করবে, গৌরীর আর লোকজন রাখার দরকার নেই যেন! ওর আন্তরিক হবার, ওদের কাছের মানুষ হবার প্রচেষ্টাকে গৌরী আমল দিচ্ছে না। ইচ্ছেটা প্রাণের ভেতর থেকেই আসছে বুঝতে পারছে গৌরী। কৃতজ্ঞতা শুধু মুখের ভাষায় নয়, কাজ করে, ওদের সেবা করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছে আশ্রয় বাঁচানোর জন্য। অন্য যে কোনও মেয়ে হলে তক্ষুনি রাজি হতো, এত বোঝানোর দরকারই হতো না। নিখর্চায় নির্ঝঞ্ঝাটে নিজের ভবিষ্যৎ বাঁচানোর এত ভালো সুযোগ হারাতে চাইত না। কুসুম মুর্খের স্বর্গে বাস করে। ও বলেছে কোনও হিন্দি ম্যাগাজিনে গল্প পড়েছে ওর মতোই এক মেয়ে রেপড্ হয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়েছিল। ও এক সুহৃদয় মানুষের কাছে আশ্রয় পেয়ে বাচ্চার

জন্ম দেয়। পরে কোর্ট-কাছারি হয় এবং ডি.এন.এ. টেস্ট করে রেপিস্ট ধরা পড়ে। সাজাও হয়। সে জন্যই ও নিজেও যদি অন্তঃসত্তা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে বড় হয়ে ওকালতি পাশ করে বলরাজের বিরুদ্ধে কেস লড়বে। বাচ্চার সঙ্গে ডি. এন. এ. টেস্ট করিয়ে বলরাজকে সাজা দেবে।— বা-বা-বা! কী চমৎকার ওর পরিকল্পনা। গুরুজী ওকে প্রাণে বাঁচিয়ে নোংরা হাতে পড়া থেকে রক্ষা করার জন্য মানবিকতা দেখিয়ে তো মহা ফ্যাসাদে ফেঁসে গেলেন বলে ভয় হচ্ছে গৌরীর। এই মেয়ে গল্পের নায়িকা হতে চায়। আর গুরুজীও তেমনি! বলে দিলেন ওর এবরশনের ব্যাপারে মতামত দেবেন না, ও যা চায় তাই হবে। অবশ্য তাঁকে দোষ দিয়ে লাভ কী? পরের উপকার করাই তো তাঁর ধর্ম, তাই তো ছাত্ররা গুরুজী বলে ডাকে তাঁকে। স্পিরিচুয়াল গুরু না হয়েও তিনি মানবিক সত্তার গুরু তো বটেই। গৌরী ভাবতেই পারছে না সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ চামেলী দেবী কুসুম সিং জাঠভের আঁতুড় তুলছেন স্বামীর আদর্শের খাতিরে! ধর্ষিতা বালিকাকে বাঁচিয়ে নিজের বাড়িত মাস্টারজী ঠাঁই দিয়েছেন এইটুকু হরিয়ালের মানুষ ভালো মনেই মেনে নেবে। কারণ, সবাই জানে মাস্টারজী জাত-পাতের ঊর্ধ্বে। কিন্তু কুমারী মেয়ে তাঁর বাড়িতেই সন্তান প্রসব করবে, অতো উদার কেউ হতে পারবে না এই ব্যাপারে গৌরী নিশ্চিত। গুরুজীকে হরিয়ালে আত্মমর্যাদা খোওয়াতে হবে একথা যে কল্পনাও করা যায় না। কী করে আটকাবো? কুসুমের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে ওর। জোর করেই ব্লাড ক্লটটাকে ফেলে দিয়ে ওকে সাফ করে হরিয়াল পাঠাবার ইচ্ছে হচ্ছে। এই মেয়েটা নাকি লেখাপড়ায় ভালো! বেশ তো, এখান থেকে সাফ হয়ে ওখানে গিয়ে পড় না বাবা! উকিল হতে চাস তো উকিল হ! তখন আমার বাড়িতে থেকে ওকালতি পড়িস না হয়। কিন্তু পেটে বাচ্চা নিয়ে গুরুজীর পরিবারে গিয়ে ওনাদের ইজ্জত নষ্ট করিস না মূর্খ মেয়ে।

না। আজ রাতে গুরুজীর সঙ্গে ওর তর্কাতর্কি কেউ আটকাতে পারবে না। কুসুমের প্রেগন্যান্সি ধরা পড়লে ওকে এবর্ট করেই হরিয়াল যেতে হবে, না করতে চাইলে ওকে কোনও নারী নিকেতনে পাঠাতে হবে। সেখানে গিয়ে বুঝুক ও কী হারিয়েছে নিজের জেদ আর বোকামির দোষে।

রাত্রে আগের রাতের মতোই ছোটরা চলে গেলে ওরা তিনজন বসে কথা বলছিল। গুরুজী বিজয়েন্দ্র তেওয়ারির কথা বললেন ওদের। খুশিতে ভরপুর লাগছিল ওনাকে। ওরা জানে স্কুল স্কুল করে গুরুজী কত ঘাম ঝরিয়েছেন, শরীরের কত রক্ত জল করেছেন। গার্লস স্কুল অ্যাফিলিয়েটেড হলে নতুন নতুন টিচার আসবে, অনেক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। তাঁর মতো মানুষ খুশি তো হবেনই।

এসব কথা শেষ হতেই গৌরী আর দেরি না করে নিজের কথা পেড়ে ফেলল। —'গুরুজী এখানে কুসুমের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আজ। কী আশ্চর্য, ও বেবি রাখতে চাইছে।' — তারপর ও সব কথা খুলে বলল। অরবিন্দ প্রচণ্ড রেগে বলল, 'মগের মুলুক পেয়ে গেছে নাকি? আমি কালকেই বলেছিলাম ও অকৃতজ্ঞ, সেলফিস হবে। গুরুজী মানলেন না। উনি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করেছেন ওকে। জানেন না তো আজকাল একটু প্রশ্রয় পেলেই সবাই মাথায় উঠে বসতে চায়। না-না। ওর সব আবদার মানা যাবে না। বাপ-মা রাখল না আর এখানে এসে গুরুজীর মানবিকতার দুর্বলতার ষোলোআনা সুযোগ নিতে চাইছে? এসব হবে না, ও এবার পথ দেখুক নিজে পথে নেমে।'

গৌরী বলল, 'আমি বলছি ওকে কোনও নারী নিকেতনে তো রাখা যায়। গুরুজী যে অত্যন্ত ভালোমানুষ এটা বোঝার বুদ্ধি ওর আছে, কিন্তু ম্যাগাজিনে পড়া গল্পের নায়িকা সাজবার শখ মেটানোর জন্য ত্রাণকর্তার উপর প্রেসার ক্রিয়েট করা যে অন্যায় সেটা বোঝার বুদ্ধি নেই নাকি? সব বুদ্ধি আছে ওর। ও জানে গুরুজী যখন ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন তার মানে এই হয় যে, উনি ওর সবরকম দায়িত্ব নিলেন। আর এই সুযোগটাই ও পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চাইছে। বাপরে বাপ, ঐটুকু মেয়ের মাথায় কী পাকা বুদ্ধি, অ্যাঁ!'

অরবিন্দ বলল, 'হ্যাঁ, একদম ঠিক বলেছ। তুমি ওকে এখানেই রাখতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি ওকে এখন আর এখানে রাখার আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম। ও হরিয়াল যাক এটাও আমার ইচ্ছে নেই। তুমি ঠিকই বলেছ, ওর জন্য গুরুজীর সম্মানহানি হবে আমাদের গ্রামে। তার চেয়ে ওকে এন. জি. ও.-র হাতে দিয়ে দেওয়া ভালো গুরুজী। আপনি আপত্তি করবেন না দয়া করে। আপনার যতখানি করার তা করেছেন, এর বেশি করতে যাবেন না। আমি কালই এন জি ও পরিচালিত ভালো destitute womens home-এর খোঁজ নেব। যতদিন না ব্যবস্থা হচ্ছে ও এখানে থাকুক। গ্রামে যাবার দরকার নেই।'

মাস্টারজী বুঝতে পারেন ওরা দুজনেই কুসুমের নির্বুদ্ধিতায় খুব রেগে গেছে। এটাও ঠিক যে অন্য হাজারটা মেয়ে এক বাক্যে রাজি হয়ে যেতো। কুসুম বোকার মতো অতি নাটকতা করে ফেলেছে। জীবনে এসে পড়া কঠিন বাস্তবকে ও এখনও ভালো করে উপলব্ধি করতেই পারেনি। কারণ, ওর চরম বিপদের ঠিক পূর্বক্ষণেই তিনি রক্ষাকারী হয়ে ঢুকে পড়েছিলেন নাট্যমঞ্চে। ও ধরেই নিয়েছে মাতা-পিতার শূন্য স্থানটাকে তিনিই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে পূর্ণ করে দেবেন। এটা ওর অল্প বয়সের দোষ, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় না থাকার কারণ। সে জন্যই ও প্র্যাকটিক্যাল হতে পারছে না, কল্পলোকে

ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা। বললেন— 'আমার জায়গায় তুই থাকলে তখন তুইও এতশত ভাববার অবকাশ পেতিস না অরবিন্দ। তোরও মনে হতো কতক্ষণে ঐ বাস টার্মিনাসের থেকে দূরে মেয়েটাকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় যেতে পারবি। মনে হতো একটা শকুনে খেয়েছে, এবার একশোটা চিল-শকুনে মিলে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলবে। তোর আমার মতো মানুষরা নির্বিকার থাকতে পারে না রে! আমরা ডুবন্তকে বাঁচাবার জন্য আগে জলে ঝাঁপ মারি। যাই হোক, কুসুম নির্বোধ, আমরা তো নির্বোধ নই। বহু-মা কাল বলেছিল না যে মেয়েটারও তো জীবন সংশয়। আমার কিস্তি মাত করে দিয়েছিল। দ্যাখ, কিছু না ভেবেই ইমপালসিভলি নিয়ে যখন চলে এসেছি, তখন কী করে আর দায়িত্ব এড়িয়ে যাবো গলার কাঁটা ভেবে? আমি জানতাম না পারফেক্ট রেজাল্ট পাবার জন্য ৪৫ দিন অপেক্ষা করতে হয়। ধারণা ছিল বহুর কাছে নিয়ে এলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারব মেয়েটা অন্তঃসত্তা হয়েছে না হয়নি। ৪৫ দিন হতে এখনও ১৭ দিন বাকি। আমি ভাবছি, এখন ওকে নিয়ে বাড়িতেই যাওয়া উচিত হবে। ১৭ দিন পর নিয়ে আসব। ততদিনে চামেলী চাচি ওর মাথার ভূত নামিয়ে এবরশনের জন্য রেডি করে ফেলবে। বুঝলি তো?'

গৌরী-অরবিন্দ দুজনেরই অপরাধবোধ হচ্ছিল। ওরা কুসুমের প্রতি বেশি কঠোরতা প্রকাশ করে ফেলেছে। গুরুজী হয়তো নারাজ হয়ে চলে যেতে চাইছেন। গৌরী বলল, 'এই ১৭ দিন ও এখানেই থাকুক না। নিয়ে যাবে আবার নিয়ে আসবেন, সেও তো ঝামেলা। আমিই পারব ওকে বোঝাতে।'

— 'না বহু, এটা তোমার কর্ম নয়। দু-পাতা পড়েছে বলেই ও সবজান্তা হয়ে যায়নি। ও জীবনে প্রথম বাসে চড়া, একেবারে কাঁচা গ্রাম্য মেয়ে। তোমার মতো স্পেশালিস্ট গাইনোকোলজিস্টের ভাষা ও বুঝবে না। ওর জন্য তোমাদের চাচিজীর দরকার, তিনি কাঁচা গ্রাম্য ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন ও কেমন অকূল পাথারে পড়েছে! যে বিষের জন্য যে ওঝার দরকার তার কাছেই নিয়ে গিয়ে ফেলব। কাল লাঞ্চ খেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

স্ত্রী চামেলী দেবীর ওপর পরমেশ্বর শর্মার অগাধ বিশ্বাস। স্বামীর আদর্শে বিশ্বাসী সহধর্মিণী চামেলী। লেখাপড়া জানেন, ম্যাট্রিক পাশ। বাইরে কোথাও গেলে প্রতিদিন বেশি রাতে ফোন করেন স্ত্রীকে। রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা শহরের না হলেও গ্রামের মধ্যরাত্রি। চামেলী জানেন, তার ভবঘুরে পতিদেবের এই সময়ের আগে ফোন করার সময় হয় না, তাই তিনি অপেক্ষা করে থাকেন টিভি-র সামনে বসে। গৌরী-অরবিন্দ দুজনেরই কাল ডিউটি আছে। ওরা শুতে চলে যাবার পর পরমেশ্বর নিজের কামরায় গিয়ে স্ত্রীকে ফোন লাগালেন। গত রাতেও কথা বলেছেন, কুসুমের উল্লেখও করেছেন, বাকি কথা এসে বলবেন বলেছিলেন। কিন্তু এখন শিডিউল চেঞ্জ হয়ে গেল, তাই কাল গ্রামে যাবার আগে আজই চামেলীকে সব জানিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে। চামেলী খুবই বুদ্ধিমতী, ওর উপস্থিত বুদ্ধির তুলনা নেই। বহুবার ওর পরামর্শ মেনে চলার জন্য পরমেশ্বর উপকৃত হয়েছেন।

প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে সবিস্তারে ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলেন এবং কালই কুসুমকে নিয়ে বাড়ি চলে আসবেন জানালেন। চামেলী নীরবে বিনা প্রশ্নে সব শুনলেন, তারপর স্বামীর বলা শেষ হতেই জীবনে যা করেননি, এবার সেটা করে ফেললেন। তিরস্কারের সুরে বললেন— 'উফ্! আপ ভী না কভি কভি লা-পরওহা, বে-সমঝ হো যাতে হ্যাঁয়। রাস্তে কা কচড়া উঠা কর ঘর লে আ রহেঁ হ্যাঁয়। লড়কি পেট মে হ্যায়, অব উসকো লে কর গাঁওবালে হমারে মুহ পর থু-থু করেঙ্গে। আচ্ছা লাগেগা আপকো? ছোড়ো। শুনিয়ে জরা ধ্যান সে, আপ কতেউ উসকো লে কর দিন দাহাড়ে গাঁও মে নহী পাধারনা। ম্যায় চাহতি হুঁ মেরে পহলে ঔর কোই ভী উসকি সকল (চেহরা) না দেখেঁ। আপ রাত কা অন্ধেরে মে গাঁও মে আইয়ে। লড়কি কো কহনা বো আপকে সাথ সাথ না চলে, পিছে পিছে আয়ে। সমঝ গয়েঁ না?'

পরমেশ্বর বললেন, 'হ্যাঁ। বুঝতে পেরেছি। এটাও বুঝতে পারছি যে এবার একটা গর্হিত কাজ করে ফেলেছি, যার জন্য অরবিন্দরাও বিরক্ত আর তুমিও বিরক্ত হলে। কী করব? ফেলে আসতে বিবেকে বাধলো আমার।'

— 'আপনার মাত্রাধিক বিবেকবোধের জন্য পুরো পরিবারকে বিশেষ করে আপনার এতকালের তপস্যালব্ধ ইজ্জত না হারাতে হয়, সেটাই চিন্তার বিষয়। প্রকাশ-বিকাশরা এটা ভালোভাবে নেবে না। আমার সংসারে না ভাঙন ধরে। সমাজে হুক্কা পানি না বন্ধ হয়ে যায়!'

ফোন বালিশের পাশে রেখে দুহাত কপালের উপর ভাঁজ করে শুয়ে থাকেন চুপচাপ। জীবনে বহু বাধা অতিক্রম করেছেন পরমেশ্বর, কাজে সফল হতে না পারলে হতাশ হননি, কখনও মন খারাপ হয়নি তাঁর। কিন্তু আজ প্রথম মন খারাপের অনুভূতি উপলব্ধি করছেন। মনে হচ্ছে কুসুমকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা যেন অপরাধ হয়ে গেছে। প্রিয় ছাত্র, প্রিয়তমা স্ত্রী— কেউ তাকে আর

সুনজরে দেখছে না, সবাই এই মামলা থেকে নিজেদের দূরে রাখতে পারলে যেন বাঁচে। দীর্ঘ দাম্পত্যজীবনে চামেলীকে এমন অশান্ত হতে দেখেননি, এমন তীক্ষ্ণ ভাষায় কথা বলতে শোনেননি। বুঝতে পারছেন ওরা সকলেই ধর্ষিতা কুসুমের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে রাজি, কিন্তু পেটে বাচ্চা থাকার সমস্যা ওদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, এই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। হরিয়ালের বাড়িতে কুসুম খুব সুখে যে থাকতে পারবে না সেটা পরিষ্কার। শুধু চামেলী নয়, ছেলেরাও বিপক্ষে যাবেই, বিশেষ করে বড় ছেলে প্রকাশ আর ওর নববিবাহিতা বউ। ভুলই করে ফেললাম। আর ওই মেয়েটাও ঠ্যাটা। যার গাছের তলায় থাকার স্থান নেই সে রাজমহল চায়। বাচ্চা পয়দা করে বলরাজকে শাস্তি দেবে! যত্তসব বেওকুফি বুদ্ধি।

সারারাত নির্ঘুম মাস্টারজী অনেক অ্যাঙ্গেল থেকে চিন্তা করে অবশেষে বোঝেন, অন্যদের কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, দোষী তিনি নিজে আর ওই কুসুম। আদর্শবাদের মূল্যে নিজের আপনজনদের পর করে দিতে চলেছেন তিনি। সকলের চিন্তাধারা তাঁর মতোই হতে হবে, এটা তো হতে পারে না। আর কুসুমেরও সব আবদার তাঁকে মেনে নিতে হবে এমন প্রতিশ্রুতি তিনি দেননি তাকে। তাই এবার তাঁকেই কুসুমকে পথে আনতে হবে, স্পষ্ট ভাষায় সোজাসুজি বলতে হবে— 'তুমি এখানে থাকতে পারবে, লেখাপড়ার সুযোগ পাবে, কিন্তু একটা শর্তে। বাচ্চার দায়িত্ব আমি নেব না। এটা তোমাকে গিরাতে হবে।' কুসুম রাজি হলে ভালো, তা না হলে ওকে যেখান থেকে এনেছিলাম সেখানেই ফেরত যেতে হবে। এতে হয়তো তাঁর প্রিন্সিপল নষ্ট হবে, কিন্তু একজনের ব্যক্তিগত ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে প্রিন্সিপল রাখতে গিয়ে দশজনকে বিপাকে ফেলা তো আরও বড় অধর্ম।

সেই দশজন কোন অপরাধে দুনিয়ার সামনে শির নীচু করবে? কুসুমও নিরপরাধ, তাই তিনি কুসুমের সহায়ক হতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তো ও তাঁর সততাকে দুর্বলতা বলে ভাবতে শুরু করেছে বলে মনে হচ্ছে। এটা হতে দেওয়া যাবে না। তাঁকে শক্ত হতে হবে। কুসুমও বাঁচুক আর তার নিজের পরিবারও বাঁচুক— এটাই তাঁর লক্ষ্য থাকা উচিত। কেউই যেন জবরদস্তি করে অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কাল যাবার সময় পথে যেতে যেতে কুসুমকে বলে দিতে হবে যে, সে তাঁর অনুগ্রহে পালিত হতে যাচ্ছে, তাই ওকে নিজের স্থান সম্বন্ধে সচেতন থেকে তাঁর পরিবারের অনুশাসন মেনে চলতে হবে।

সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যে অরবিন্দের বাড়ি খালি হয়ে যায়। ছেলে-মেয়ে স্কুলে যায়, ওরা দুজন হাসপাতালে। সর্বক্ষণের কাজের মহিলা কান্তা মৌসি অতিথির দেখাশুনা খুব ভালোভাবে করতে জানে। পরমেশ্বরকে কান্তাও গুরুজী বলে ডাকে বাড়ির অন্যদের অনুকরণে। দুপুরে লাঞ্চের পর একটু ঘুমিয়ে নিলেন মাস্টারজী। বিকেল চারটেয় রওয়ানা হবেন বলে দিয়েছেন কুসুমকে। — 'তৈয়ার রহনা। হম চার বাজে চল পড়েঙ্গে।'

কুসুম মাথা হেলিয়ে বলেছে— 'জী। তৈয়ার রহুঙ্গী।'

মাত্র দু'দিন আগের মতো সেই চৌরাহা-চৌক। সেই আসন্ন রাত্রির লগ্নে এসে নামলেন বাস থেকে। কুসুম নেমেই

জিজ্ঞেস করে— 'এটা সেই জায়গা তাই না বাবাজী?'

— 'হাঁ বেটা। এটা সেই জায়গা, যেখান থেকে তোমার নতুন জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র দুদিন আগে। চলো, আগে টিকিট কেটে আনি, এসে এই বেদীতেই বসব। তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার আছে আমার। এখানে বসে বলব।'

ফিরে এসে প্রিয় জায়গায় হাইওয়ের দিকে পেছন করে কুসুমকে নিয়ে বসলেন। তারপর বলতে আরম্ভ করলেন— 'এই জায়গায় তোমার পিতাজী তোমাকে অকূল সাগরে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আমি তোমাকে সাহারা দিতে চেয়েছি, আজ তোমাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আমার পত্নী, ছেলে, পুত্রবধূ আছে।' — এইভাবে বলা আরম্ভ করে লখনৌয়ে গৌরীর কাছে শোনা কথার সূত্র ধরে মাস্টারজী ওকে যারপরনাই বোঝাবার চেষ্টা করে যখন শেষ করলেন তখন ওনার বাস ছাড়ার মাত্র তিন মিনিট বাকি। ওঁর শেষ কথাগুলো ছিল— 'তুমি যদি আমার কথা না শুনে অবাধ্যতা কর, তাহলে এখানে থেকে যাও। নিজের ভবিষ্যৎ নিজের চেষ্টাতে গড়ে নিও। তোমার বাবা যদি চলে যেতে পেরেছে, তাহলে আমি কেন পারব না? তুমি তো আমার কেউ নও! আমি আমার বাস ধরে চলে যাবো।' — বলে ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েন।

ব্যাস! যে কুসুম আধঘণ্টা ধরে নির্বাক থেকে কথা শুনছিল, সেই মেয়ে — 'না, না' বলে আর্তনাদ করে মাটিতে বসে মাস্টারজীর পা জড়িয়ে ধরে।— 'মুঝে ছোড় কর আপভী মত্ চলে যাইয়ে বাবাজী। ম্যায় বচন দেতী হুঁ, আপলোগোঁকা হর এক কহনা শুন কর রহুঙ্গী। মুঝে সাথ লে চলিয়ে, অকেলা মত্ ছোড়িয়ে।'

— 'চলো ওঠো। বাস এসে পড়েছে।'

বাসে জানালার দিকের সিটে বসে বারবার দোপাট্টা দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। তারই মধ্যে বলতে থাকে— 'একিন মানিয়ে, ম্যায় ইতনী বুরি লড়কী ভী নহী হুঁ বাবাজী। গলতিয়াঁ কর সকতি হুঁ লেকিন বুরি কতেউ নহী। বুজুর্গো কো মান্যতা দেনা জানতি হুঁ। কৃপয়া মেরে উপর ভরোসা রখিয়ে, ম্যায় উন লোগোঁকা আজ্ঞা পাল্‌কর চলুঙ্গী। ভগবান কসম। আপকা কসম বাবাজী।'

মাস্টারজী আবার নরম হয়ে পড়ে পিঠে হাত রেখে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে থেমে যান। না থাক। একটু ভয় পাওয়া ভালো।

হাইওয়েতে নেমে তিন কিমি হেঁটে বাড়ি যেতে যেতে রাত দশটার ওপর হয়ে যাবে। তার উপর সঙ্গে কুসুম আছে, এ পথ ওর অচেনা। পদে পদে হোঁচট খেতে পারে। এই সময় গ্রামের রাস্তায় লাঠিয়াল গ্রামরক্ষীরা ছাড়া আর কেউ থাকে না। তবুও চামেলীর কথা মতো উনি কুসুমকে বলেছেন, দোপাট্টা দিয়ে মাথা ঢেকে তার পেছন পেছন চলতে। কুসুম সেরকমই করছে। গ্রামে ঢোকার পরই দূর থেকে টর্চের আলোর সংকেত এবং সঙ্গে আওয়াজ ভেসে এলো— 'কৌন যাঁয়ে?'

মাস্টারজী নিজের টর্চের সংকেত দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, — 'মাস্টারজী পরমেশ্বর শর্মা।

—'ও, পাও লাগুঁ মাস্টারজী।'

বাড়ি পৌঁছতেই চামেলী দরজায় দাঁড়িয়ে আছে দেখে জিজ্ঞেস করলেন— 'প্রকাশরা শুয়ে পড়েছে তো?' — কুসুম নত হয়ে প্রণাম করছিল দুজনকেই।

—'হ্যাঁ। আপনি পাতকুয়ায় চলে যান, ও কলঘরে যাক। খাবার গরমই আছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমার ব্যাগ নিয়ে। তোমার কামরা দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাগ রেখে কলঘরে চলো। হাতমুখ ধুয়ে আসবে।'

ছোট কামরাটাতে তক্তোপোশে পরিষ্কার বিছানা পাতা। টেবিল ফ্যান আছে, দুদিকে দুটো জানালা খোলা। ঘরখানা ভালো। কুসুম ব্যাগ থেকে ওর গামছা বের করে নীরবে চামেলীকে অনুসরণ করে। বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখে, উনি বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। ততক্ষণে পরমেশ্বরও গা ধুয়ে চলে এসেছেন এদিকে। চামেলী কুসুমকে নিয়ে নিজেদের কামরায় এসে বললেন— 'তুমি গ্রামেরই মেয়ে অন্য একটা গ্রামে এসে পড়েছ সম্ভবত পেটে বাচ্চা নিয়ে। গ্রামের মানুষ কেমন হয় তুমি ভালো করেই জানো। এখন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি, সেটা দেখে তুমিও বিস্মিত হবে, উনিও হবেন। কিন্তু তোমার এবং আমাদের ইজ্জত বাঁচানোর এছাড়া আর কোনও পথ নেই। তোমাকে সাদী-সুদা সুহাগনের বেশে থাকতে হবে। আমি যা শিখিয়ে দেব, সেই কথা বলতে হবে, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে। দেখি, হাত দুটো বাড়াও।'

কুসুম নীরবে হাত বাড়িয়ে দেয়। চামেলী নিজের চুড়ির বাক্স থেকে একগাছা কাঁচের চুড়ি বের করে ওর হাতে পরিয়ে দেন। তারপর লাল বিন্দির পাতা থেকে একটা বিন্দি নিয়ে কপালে লাগান। সবশেষে সিঁদুরের কৌটা থেকে এক টিপ সিঁদুর আঙ্গুলে ধরে ওর সিঁথিতে লাগিয়ে বলেন— 'এটা তোমার আর আমাদের রক্ষা কবচ। প্রতিদিন স্নান করে এসে সিন্দুর লাগাতে ভুলবে না। কারণ, তুমি সকলের নজরে সাদীসুদা আউরত হয়ে থাকতে পারলে এই গাঁওয়ে তুমিও বাঁচবে, আমরাও বদনামের হাত থেকে বাঁচব।'

— 'এবার তোমাকে কী বলতে হবে মন দিয়ে শোনো। তুমি বাবার একমাত্র মেয়ে। মা আগেই মারা গেছে। তোমার বাবা মাস্টারজীর বন্ধু ছিলেন। তুমি স্কুলে পড়াশুনা করছিলে, এগারো ক্লাশে পড়ার সময় তোমার বাবার ক্যান্সার হয়। উনি মারা গেলে তোমার কী হবে ভেবে বাবা তোমাকে সাদি করে

দেন। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। সাদির পর শ্বশুরাল আরও দেহেজের দাবি করে চাপ দিতে থাকে তোমার অসুস্থ বাবাকে। আর তোমাকে মারধর অত্যাচার করতে শুরু করে। অবস্থা চরমে ওঠে যখন টাকা না দিলে তোমাকে পুড়িয়ে মারার ধমকি দেয় তখন। তোমার বাবা তোমাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন। ওরা তোমাকে আর নেবে না বলে দিয়েছে। এদিকে তোমার বাবারও শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন তিনি মাস্টারজীকে যাবার জন্য অনুরোধ করেন। কারণ দোস্ত মাস্টারজী ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে তিনি তোমাকে রেখে যেতে পারেন। মাস্টারজী গেলেন আর তোমার বাবা অমৃতলোকে চলে গেলেন। তোমাকে চৌথার শ্রাদ্ধ করিয়ে মাস্টারজী এখানে নিয়ে এসেছেন। শোনো, আমি ছাড়া এই বাড়ির আর কেউ মানে আমার ছেলে-বহু ওরাও কেউ তোমার কথা জানে না। ওরা জিজ্ঞেস করলেও এই গল্পটাই বলতে হবে তোমাকে। শ্বশুরালে মাত্র চার মাসই ছিলে তুমি, তার মধ্যেই এত ঘটনা ঘটেছে। পেটে বাচ্চা এসেছে কিনা আমরা তো এখনও জানি না, তাই একথা আগবাড়িয়ে কাউকেই বলতে যেও না। কী? বলতে পারবে তো?'

— 'জী।' কুসুম মাথা নীচু রেখে বলে।

— 'তাহলে গল্পটা একবার আমাদের শোনাও।'

কুসুম আস্তে আস্তে বেশ গুছিয়ে গল্পটা পুরো বলতে পারে। চামেলী বলেন— 'হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। কোন গ্রামের মেয়ে, কোথায় বিয়ে হয়েছিল জিজ্ঞেস করলে নিজের গ্রামের নাম আর কাছাকাছি অন্য কোনও গ্রামের নাম বলে দিও। নিজের জাত লুকিও না, বলবে জাঠভ। ঠিক আছে?'

— 'জী।'

এরপর চামেলী ওদের রাতের খাবার দেন। নিজেও খান। কুসুম ওর কামরায় চলে যাবার পর স্বামীকে বলেন— 'এই গল্পটা শুধু ওর জন্য নয়, আপনার জন্যও।'

পরমেশ্বর বলেন— 'বুঝতে পেরেছি। তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

— 'কাল রাতে আপনাকে কড়া কথা বলেছি এর জন্য ক্ষমা চাইছি।'

— 'তখন মন খারাপ হয়েছিল। তুমি কোনওদিন কড়া কথা বলোনি তো। কিন্তু তোমার কথায় আমার হুঁশ ফিরেছে। আজ আসার সময় আমি ওকে সোজাসুজি বলতে পেরেছি ওর বাচ্চার দায় আমরা নেব না।'

— 'বেশ করেছেন। আমি আজ ওকে গল্প শিখিয়েছি, কাল থেকে কুমারী মেয়ের মা হওয়ার আতঙ্ক কাকে বলে শেখাব। ও নিজে বাচ্চা ফেলার জন্য পায়ে পড়বে। দেখে নেবেন। অনেক রাত হলো, এবার শুয়ে পড়ুন। আমি পা টিপে দিচ্ছি।'

ঘুম ঘুম গলায় মাস্টারজী বললেন— 'চামেলী, তুমি তো মনোরমা হিন্দি ম্যাগাজিন পড়, ওতে গল্প লিখে পাঠাও না কেন?'

— 'আমি গল্প লিখব? আমার কি সেই মেধা আছে? ওকে যা বলেছি সে তো পান্তাভাতের মতো সবাই খায়।' — মাস্টারজী ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে প্রকাশ-অল্‌কারা তো বিস্ময়ে হতবাক। কাল রাতে বাবুজী ফিরেছেন, যত রাতেই হোক সেটা নাহয় বুঝল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে একজন অপরিচিত বৌও এসেছে এটা বুঝতে পারল না।— 'এ কে মা? আগে তো কখনও দেখিনি ওকে?'

চামেলী বললেন, 'সব বলব পরে। আমিও তো দেখিনি। তোদের বাবুজী কাল বেশি রাতে ফিরে এলেন একে সঙ্গে নিয়ে। আমাকে শুধু বললেন, ওর থাকার ব্যবস্থা করে দাও। আমার এক বন্ধুর মেয়ে। অত্যন্ত বিপাকে পড়ে ওকে নিয়ে আসতে হয়েছে। এখন এখানেই থাকবে। উপায় নেই। কাল সব বলব। এইটুকু বলে খেয়ে শুতে চলে গেলেন।'

প্রকাশ বলল, 'বাবুজী যখন নিয়ে এসেছেন তখন নিশ্চয়ই খুবই সমস্যা ছিল। যাই হোক, পরে জানা যাবে।'

— 'হ্যাঁ। আমিও তাই কাল রাতে আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। দুজনই খুব ক্লান্ত ছিল তো'

— 'ভালো করেছ।'

প্রকাশের বৌ অলকা নতুন বৌ। সে শুনলো, কিন্তু কোনও উক্তি করল না। ওর নবাগতের এই বাড়িতে আগমন ভালো লাগেনি। সাদিসুদি আউরত একা কেন এসেছে? বয়স তো নিতান্তই কম, আউরত বলা যায় না, লড়কিই বলা ভালো। তার উপর এ যে অনন্য রূপসী। ওর নিজের রূপ এর সামনে ম্লান। মাতাজী বললেন, এখানেই নাকি থাকবে। কেন? ওর পীতহর, শ্বশুরাল নেই নাকি? ঈর্ষার একটা ফুলকি। অল্‌কার বুকে জ্বলে ওঠে চিন্ চিন্ করে জ্বলতে লাগল। চামেলী কুসুমকে ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলেন— 'এ হলো আমার বড় ছেলে প্রকাশ। তুমি ওকে বড়ে ভাইয়া বলে ডাকবে। আর এ আমার নয়ী দুলহন, প্যারি বহু-মা। তুমি ভাবিজী বলবে। ওর নাম কুসুম।'

কুসুম দুজনকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সকাল বেলার সময়, সংসারে শতেক কাজ, প্রকাশ স্কুলে যাবে, ওর খাবার বানানো, সকলের নাস্তা বানানো চামেলী একাই করেন। নতুন বৌকে এসব কাজে লাগাননি এখনও। পরে সারা জীবন তো করতেই হবে। কুসুম নরম গলায়

ভয়ে ভয়ে বলে, 'আমি সব কাজ করতে পারি। আমাকে কিছু কাজ করতে দেবেন? রসুই ঘরে ঢুকবো না, আমি তো ওবিসি, আপনি অন্য যা করতে বলবেন করব।'

চামেলীর ভালো লাগল ওর সাহায্য করার আগ্রহে। বললেন, 'রসুই ঘরেও আসতে পারো। আমরা নামেই ব্রাহ্মণ, এ বাড়িতে জাতপাত মানে না কেউ। তুমি তাহলে আমাকে আটা মেখে সবজিগুলো কেটে দিও।'

কুসুমের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ছটফটিয়ে বলে, 'হাত ধুয়ে আসছি মাজী।'

কুসুম চলে যেতেই অল্‌কা বলে, 'ও চৌকা তে ঢুকবে? কেন মাজী? আমি করে দিচ্ছি।'

চামেলী বুঝতে পারেন নতুন বৌ কুসুমকে প্রতিরোধ করতে চাইছে। ওখানে একটা ঝড়ের সংকেত পাচ্ছেন তিনি। কিন্তু তাকে শক্তহাতে হাল ধরে সংসার বৈতরণী পার হতে হবে। প্রশ্রয় তিনি কাউকেই দেবেন না। বৌকেও না, কুসুমকেও না। মুখের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বৌকে বললেন, 'আমাদের সাফ-সাফাই যে করে হরিয়া, সেও চৌকা (রসুই ঘর) সাফ করতে ঢোকে বহু। কুসুম কেন ঢুকবে না? তোমার শ্বশুর জাতপাত নিয়ে কথা বলা পছন্দ করেন না। আমরা কেউই করি না। তাছাড়া মেয়েটা যখন এখানেই থাকবে, তখন অযথা বসে থাকবে কেন? ও তো মেহমান নয়। তুমি বরং পুজোর ঘরটা পরিষ্কার করে ফেল। তার আগে বিছানাগুলো তুলে বাবুজীর জামাকাপড় বের করে রাখো। প্রকাশের সব জিনিস গুছিয়ে রাখো। সে তো বের হবে।'

এভাবেই শুরু হলো ব্যালান্সিং, চামেলীর ট্র্যাপিজের খেলার সার্কাস। অল্‌কা অবস্থাপন্ন ঘরের বিএ পাশ শহুরে মেয়ে। চামেলীর বানানো কুসুমের বিপর্যস্ত জীবন ইতিহাস এখন সকলেই জানে, এমনকী গ্রামের মানুষও। একমাত্র অল্‌কা ছাড়া অন্য সকলেরই এক সপ্তাহের মধ্যে অসহায় মেয়েটার প্রতি সহানুভূতি জেগেছে। প্রণম্য মাস্টারজীকে সবাই ধন্যবাদ দিয়েছে কুসুমকে আশ্রয় দেবার নিমিত্ত। স্কুল কমিটি ওকে ভর্তি করার ব্যাপারে মাস্টারজীর অনুরোধ এককথায় মেনে নিয়েছে। একমাত্র অল্‌কা কিছুতেই ওকে মেনে নিতে পারছে না। গত এক সপ্তাহে অন্তত সাতাশবার কুসুমের দোষ খুঁজে খুঁজে শাশুড়ির কাছে লাগানো হয়ে গেছে। চামেলী এসবে আমল দিচ্ছেন না। তিনি তো দুজনকেই দেখছেন। আজ সাতদিনের মধ্যে কুসুমের কাছ থেকে ভাবির বিরুদ্ধে অসন্তোষের আভাসও আসেনি। সে ঘরের কাজে কর্মে সারাক্ষণ মাজীকে সাহায্য করতে ব্যস্ত হয়ে রয়েছে। সেজন্য মনে মনে খুশি হলেও বৌয়ের সামনে কখনও কুসুমের প্রশংসা করেন না, আবার বৌয়ের কুটকাচালিও ঝেড়ে ফেলে দেন না। বুঝিয়ে বলেন, 'কী করবে বল? গ্রামের গরীবের ঘরের মেয়ে, দোষ-ত্রুটি তো থাকবেই। একটু মেনে নাও। উপায় তো নেই না মেনে। তুমি শিক্ষিত মানুষ তোমাকেই বুঝেশুনে মানিয়ে নিতে হবে বহু মা!' — মনে মনে ভাবেন, কুসুম তোমার থেকে হাজার গুণে ভালো। কিন্তু তুমি আমার পুত্রবধূ, তাই তোমার সব অধিকার আমাকে রক্ষা করতে হবে, সামাল দিতে হবে। তুমি কুসুমের জীবন দুর্বিসহ করে তুললেও ওকে সেটা মেনে নিতে হবে। এটাই ওর দুর্ভাগ্য। আর দশটা দিন পর জানা যাবে কুসুমের গোপন ব্যাপারটা সত্য না মিথ্যা। আমি তো এখনও কোনো লক্ষণ দেখলাম না। ওটা মিটে গেলে আমি এর প্রতি এত নিস্পৃহ হয়ে থাকব না আর। ওকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে মাস্টারজীর সঙ্গে আমিও সাহায্য করব অবশ্যই। তোমাকে বুঝিয়ে দেব অল্‌কা ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া মানুষেরও আত্মসম্মান থাকে। কারও আত্মসম্মানে আঘাত করার অপরাধ করে তুমি আমার নজরে কতটা নীচু হয়ে গেছ।

কুসুম সব দেখে সব বোঝে। এখন ও নিজের অবস্থা যে কতখানি দুর্বল, কতটা পরনির্ভরশীল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে। এখানে বাবাজী, মাজী, বড়ে ভাইয়া ওকে সুনজরে দেখেন। খাওয়া-থাকার তো অসুবিধা নেই একেবারে। কিন্তু ভাভীজী ওকে সহ্য করতে পারে না কেন সেটা বুঝতে পারে না ও। ভাভীকে খুশি রাখার চেষ্টায় সদাসতর্ক থেকেও কোথায় যে ভুল হয়ে যায় ধরতে পারে না। ভাভী রেগে যায়, বকাবকি করে। কোনও অন্যায় না করলেও বলে অন্যায় করেছ। কান্না পায় ওর, তখন লুকিয়ে কাঁদে। মাজীকে প্রথম দিন খুব ভয় পেয়েছিল, কিন্তু এই ক'দিনে বুঝেছে তিনি খারাপ মানুষ নন। ওনার মনে স্নেহ মমতা আছে। উনি ওকে সাদিসুদা বেশে রেখে ওর মঙ্গলই করেছেন। বাড়ির বাইরে এখনও পা রাখেনি ও। বাইরের কেউ আসেওনি এই বাড়িতে, তাই মাজীর শেখানো কাহিনি এখনও কাউকে বলতে হয়নি, ভাভী ছাড়া। ভাভী সব জেনেও বারবার জানতে চায় শ্বশুরালে ওকে কী কী অত্যাচার করেছে, স্বামীটা কেমন ছিল— এই সব প্রশ্ন করে। কুসুম নিজেই এখন ১৭ তারিখের জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, কারণ বাবাজী ওকে সত্যিই স্কুলে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ও পড়তে চায়, জীবনে কিছু হয়ে বাবাজীর ঋণ মেটাতে চায়। এখন বলরাজকে সাজা দেবার আবোল-তাবোল ভাবনাগুলো নিয়ে বেশি ভাবে না। জীবন টিকে থাকলে ওসব পরে ভাবা যাবে। এখন যিনি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছেন, যিনি নতুন জীবন দান করেছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, তাঁর মান রাখার জন্য ব্যস্ত ও। বাবাজীই ওর ভগবান, তাঁর নামে নেওয়া কসম ও কখনও ভাঙবে না। ভাভী ওকে যত কষ্টই দিক ও কাউকে বলবে না, মুখ বুজে সহ্য করবে। কারণ ও বুঝে ফেলেছে ভাভী

ওকে নির্যাতন করে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। করুক। ও নির্বিকার হয়ে মাজী, বাবাজীর সেবাযত্ন করে ওদের পায়ের তলায় নিজের স্থান কামড়ে পড়ে থাকবে।

দিন আসে দিন যায়। দেখতে দেখতে ১৫ তারিখ এসে গেল। মাজী সেদিন ভাইয়া-ভাভীর সামনে ঘোষণা করলেন — 'কাল তোমাদের বাবুজী কুসুমকে নিয়ে লখনৌ যাবেন। ওর কী একটা এফিডেবিট করাতে হবে।'

অল্‌কা ওমনি বলে ওঠে— 'বাবা রে বাবা! ওর আবার এফিডেবিট কিসের জন্য দরকার পড়ল? তিনকুলে কেউ নেই এখানে খাওয়া-পরায় কাজ করছে, ভালোই তো আছে। বাবুজী পারেনও বটে।'

প্রকাশ খিঁচিয়ে ওঠে— 'কী যা-তা বলছ তুমি? কুসুম আমাদের খাওয়া-পরার কাজের লোক? একটা ভদ্র ঘরের লেখাপড়া করা মেয়ের সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে হয়? ছিঃ ছিঃ। এই নিয়ে তুমি বিএ পাশের অহংকার দেখাও? ভুলে যেও না ও বাবুজীর বন্ধুর মেয়ে। অবস্থা বিপাকে এখানে এসেছে। আমাদের বোন নেই, আমি ওকে আমার বোন বলে মনে করি। আর বিকাশও তাই মনে করবে। ভবিষ্যতে ওর সম্বন্ধে কথা বলার আগে মনে রেখো তুমি আমাদের বোনকে বলছ।'

স্বামীর রাগ দেখে অল্‌কা থমকে গেল। কিন্তু সকলের সামনে অপদস্থ হয়ে ওর যত রাগ কুসুমের ওপরে গিয়ে পড়ল। শাশুড়িও ছেলেকে কিচ্ছু বললেন না। শাশুড়ির ব্যক্তিত্বকে অল্‌কা ভয় পায়, তাই তখনকার মতো চুপ করে রইল।

আবার সেই চৌরহা চৌক। এই জায়গাটার সঙ্গে ওর যেন গাঁটছড়া বেঁধে আছে— ভাবে কুসুম। সেই বেদিতে বসে কালকে ওর কী হবে সে কথাও ভাবনায় মিশে থাকে। ওর জীবন -মরণ কালকের টেস্টগুলোর উপর নির্ভর করছে। মনে টেনশন আছে, কিন্তু এত গাড়ি যাচ্ছে হাইওয়ে দিয়ে দেখতে ভালো লাগছে। আগের দুবার রাতের বেলা ছিল আজ দিনের আলোয় চারদিক, মানুষজন দেখছে ওর সতেরো বছরের চোখ।

কুসুমকে দেখে গৌরী আর হেসে কূল পায় না। মাথায় সিঁদুর, বিন্দি, দুহাত ভরা লাল-সবুজ রংয়ের কাঁচের চুড়ির গোছা। লজ্জায় কুসুমও মাথা তুলতে পারে না। গৌরী হাসি বন্ধ করে জিজ্ঞেস করে, 'চাচিজীর বুদ্ধি, তাই না?'

— 'আর কার হবে? এগুলো সেই রাত্রেই ওকে পরিয়ে, তারপর লম্বা ভাষণ দিয়ে খেতে দিয়েছে আমাদের। এগুলোর নাম ইজ্জতের রক্ষা কবচ।'

— 'কুসুমের বেশ দেখে হাসলাম বটে, কিন্তু ভাবছি, চাচিজীর দূরদৃষ্টির কথা। আগে থেকে সব ভেবে রাখেন। কুসুম তুমি শ্যাম্পু করে সিঁদুর ধুয়ে এসো। চুড়িও খুলে রাখো। যাবার দিন আবার বেশ বদল করে যেও। গলু এসব দেখেই প্রশ্ন করবে। যাও।'

কুসুম চলে যেতেই গৌরী বলল— 'পুরো ছয় সপ্তাহ হয়ে গেছে গুরুজী। ৪৫ দিন। আপনার টেনশন দূর করার জন্য আমি এখুনি হাতে ইন্টারন্যাল টেস্ট করে বলে দিচ্ছি ও প্রেগন্যান্ট হয়েছে কি হয়নি। এখন হাতেই ঠেকবে।'

— 'না, থাক। এখুনি দরকার কী? কাল হসপিটালেই করো। আমি খুব কিছু চিন্তা করছি না। ও তো এবর্ট করতে রাজি হয়েছে। থাকলে কাল একেবারেই ওটাও হয়ে যাবে।'

— 'ঠিক আছে।'

রাত থেকেই কুসুম ঘাবড়ে ছিল, ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। আন্টি কি ওর পেট কাটবে? ভয়ে ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করতেও ভয় পায়, যদি রেগে যায়। আন্টির গাড়িতে ওরা হসপিটালে যাচ্ছে। নিজে গাড়ি চালাচ্ছে আন্টি। জীবনে এই প্রথম ও এমন সুন্দর একটা গাড়িতে চড়লো, কিন্তু এই আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না কুসুম। বাবাজী সঙ্গে আছেন তবুও সাহস আসছে না মনে। সুঁই লাগাতে ওর খুব ভয় করে আর পেট কাটবে... ওরে বাবা!

যা যা ভেবে ভয়ে অধমরা হয়েছিল, সেসব কিছুই করেনি। শুধু ভয়ানক লজ্জায় চোখ বন্ধ করে রেখেছিল যখন আন্টি হাতে দস্তানা পরে ওর শরীরে হাতে করে কী করছিল তখন। একটু পরেই হাত বের করে দস্তানা খুলে ফেলে দিয়ে ওকে বলল— 'ওঠো।' আন্টির মুখটা দেখে খুশি খুশি লাগছিল। বলল— 'কুসুম আও মেরে সাথ।'

গৌরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কুসুমের ইউট্রাসে ফিটাস নেই টের পেয়ে। তবু একবার আলট্রা সোনোগ্রাফি করে দেখে নেওয়া উচিত, অন্য কোনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা জরায়ু। ওদিকে ইউরিনও ল্যাবে চলে গেছে টেস্ট করতে। ও কোনও কিছু বাদ রাখতে চায় না পুরো কনফার্ম হবার জন্য।

আল্ট্রাসোন করে যা দেখল তার জন্য প্রস্তুত ছিল না মন। কুসুম হাজারবার ধর্ষিতা হলেও কখনও মাতৃত্ব আসবে না ওর। কারণ ওর ফেলোপিয়ান টিউবের মুখ বন্ধ। সার্জারি করে খুলে না দিলে ও মা হতে পারবে না।

— 'কুসুম তুমহারা পেট মে বচ্চা নহী হ্যায় বেটা। অন্দর জখম ভী নহী হ্যায়। তুম বিলকুল ঠিক হোক। কনগ্রাচুলেশনস্।'

প্লাগ-টাগ ফ্রি করতেই কুসুম গৌরীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে খুশিতে। গৌরী বলে— 'অব যা কর আপনা কপড়া পহেন লো। ম্যায় জা রহি হুঁ মেরী চেম্বার মে। বহা আ জানা। জাও সিস্টার কে সাথ। বো বাহার খড়ি হ্যায়।'

গুরুজীকে ওর চেম্বারে বসিয়ে রেখে এসেছে। চেম্বারে হাসি মুখে ঢুকল গৌরী। বলল— 'সমাচার শুভ হ্যায় গুরুজী।

কুসুম প্রেগন্যান্ট নহী হ্যায়। তবে ওর মা হবার প্রবলেম আছে।'— এর পর ফেলোপিয়ান টিউবের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

মাস্টারজী সব শুনে বললেন,— 'ওর ওসব জানার দরকার নেই। যদি কখনও সাদী হয় তখন দেখা যাবে। যাক, মেয়েটা এবার নিঃসঙ্কোচে বাঁচতে পারবে।'

রাত্রে চামেলীকে ফোন করে বললেন— 'কুয়াঁরী লড়কী কো তো সুহাগন কা ভেস পহেনা দিয়ে থে, অব ক্যাসে লড়কিকা সাদী তোড়ো গি, ওয়াপস লড়কি বনাওগী?'

কুসুম মা হতে যাচ্ছে না শুনে প্রথমেই চামেলীর বুকের পাথর নেমে গিয়েছিল। এখন স্বামীর বিদ্রূপ খুশি হয়েই গ্রহণ করলেন। বললেন, 'অব নয়া কাহানি লিখনা পড়েগা। ঝুটি বাত্ তো আপ ভী কহতে হো জী, জব গাঁও কা শুভ-মঙ্গল কাম সে কোই রুকাবট আন পড়তা হ্যায় তব শৌ ঝুট বলতে হ্যায় কাম নিপটনে কে লিয়ে। মুঝে ভী কুসুমকো আজাদ করনে কে লিয়ে ঝুট কা সাহারা লেনা পড়েগা জী।'

— 'বোলিয়ে বোলিয়ে। অচ্ছে কাম কে লিয়ে ঝুট বোলনা অধর্ম নহী মানা জাতা হ্যায়, বল্‌কি জায়েস মানা জাতা হ্যায়। কাল আর রহা হুঁ।'

ওরা ফিরে আসার পরই চামেলী কোনও গল্প কাউকে শোনালেন না। স্বামীর পরামর্শে সময় নিলেন কিছুদিন। কুসুমকে পছন্দ করতে শুরু করেছিলেন ওর ব্যবহারের জন্য। এখন স্নেহ, ভালোলাগা আসতে লাগল মনে। ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ে নিরালায় গোপন পরিকল্পনা চলে। দুজনে মিলেই গল্প তৈরি করলেন এবার। কুসুমের বদমাশ বর ওকে ডিভোর্স করার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল, সেই কারণেই মাস্টারজী কুসুমকে নিয়ে লখনৌ গিয়েছিলেন কোর্টের শুনানির ডেট ছিল বলে। মিউচুয়াল ডিভোর্সের কাগজে মাস্টারজী কুসুমকে দিয়ে সই করিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। ডিভোর্স হয়ে গেছে ওর।

এতসব মিথ্যা বলতে ওদের দুজনের মনে কোনও গ্লানি নেই। কারণ ওনারা চান মেয়েটা সমাজে মাথা উঁচু করে যেন বাঁচতে পারে। সেজন্যই অ্যাবর্শনের জন্য গৌরী চাপ দিয়েছে, ওনারাও চাপাচাপি করেছিলেন। আজ গৌরীরা খুশি, কুসুম খুশি, ওনারা খুশি। এবার বাকি রইল কুসুমের নতুন ইতিহাস রচনার জন্য আবার পড়াশুনা শুরু করা। এই দুনিয়ায় চারজন হিতৈষী মানুষ ছাড়া কুসুমের অতীতের কথা আর কেউ জানবে না। নিজের ছেলেরাও না। সেই দরজা ওরা বন্ধ করে দিয়েছেন চিরতরে। ওনাদের মহান প্রয়াসে কুসুমের সহযোগিতাও আছে। ওকে যখন যা বলতে শিখিয়েছেন চামেলী ও বিনা দরকারে তো কিছুতে মুখ খোলেনি, কিন্তু জিজ্ঞেস করলে শেখানো কথাটুকু বলেছে, নিজে কোনও সংযোজন করেনি।

কুসুমকে নিয়ে তৈরি করা এবারকার গল্পটা মাস্টারজী নিজেই বললেন। প্রকাশ বলল— 'ভালো হয়েছে বাবুজী, বহিনা আজাদ তো হয়ে গেল! এমন বিয়ে টিকিয়ে রাখাই উচিত নয়, যেখানে সম্পর্কের মূল্য নেই। আর কুসুম বহিনা তুই চুড়ি, বিন্দি, সিন্দুর সব ছেড়ে দে। যে পতি তালাক দিয়েছে তার কল্যাণের জন্য এগুলো আর রাখবি না। সে আর তোর পতি নয়।'

কুসুম কী করবে বুঝতে না পেরে চামেলীর দিকে তাকায়। উনি বললেন— 'ভাইয়া ঠিকই বলেছে বেটা। চুড়িগুলো খুলে আমার চুড়ির বাক্সে রেখে দাও, আর মাথা ঘষে নিও। সামনের সোমবার থেকে স্কুলে যেতে হবে।'

চামেলী লক্ষ্য করছেন অল্‌কা কুসুমকে পড়তে দিতে চায় না। আগে নিজে সামান্য যেটুকু ঘরের কাজ করতো সেগুলোও কুসুমের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজের কামরায় বসে টিভি দেখে। সন্ধ্যের সময় কুসুম পড়তে বসলেই বারবার নানা ছুতোয় ওকে ডেকে নিয়ে যায়। দু-মাস মেয়েটার এক পাতাও পড়া হয়নি, এখন পুরনো পড়াও পড়তে হচ্ছে মেকআপ করার জন্য। আর নতুন পড়া তো আছেই। অল্‌কা যে এত হিংসুটে সেটা আগে জানলে প্রকাশের বৌ করে আনতেন না। তার দুই ছেলেই উদার মনের, বাবুজীর আদর্শ যতটা সম্ভব মেনে চলতে চেষ্টা করে। দাঁড়াও তোমার বাড়াবাড়ি এবার বন্ধ করতে হবে। ভেবেছিলাম, নতুন বৌ, এখনই সংসারের কাজে ঢোকাবো না। সারা জীবন তো করতেই হবে। কিন্তু তুমি মানুষের ভালোবাসার মূল্য দিতে জানো না। এবার কুসুমের কাজগুলো তোমাকে দেব। কারণ তুমি সেইসময় ফাঁকা থাকো। প্রকাশও সন্ধ্যেবেলা সেবা দল ক্লাবে চলে যায়। কুসুম আর তুমি যখন একসাথে থাকবে তখন বলব রুটিন পরিবর্তনের কথা।

পরদিন সন্ধ্যায় অল্‌কা যেই কুসুমকে ডেকেছে— 'আয়ী ভাভী' বলে মেয়েটা পড়িমরি করে ছুটে গেছে পড়া ফেলে। আর চামেলীও পেছন পেছন বৌয়ের কামরায় গিয়ে হাজির। — 'আরে বহু, এক কাম করনা বেটি... একি কুসুম তুই এখানে ভাভীর সঙ্গে গল্প করতে বসেছিস? তোর পড়া নেই? যাও, এখুনি বইপত্র নিয়ে আমার ঘরে গিয়ে পড়তে বসো। ফাঁকিবাজি আমি একদম পছন্দ করি না। এখন থেকে রোজ আমার ঘরে বসে পড়বে, বুঝলে? যত্তসব আড্ডা মারার ধান্ধা!— ও হ্যাঁ, বহু তোমাকে বলতে এসেছিলাম রাত্রের রোটি-সবজি বানিয়ে ফেলতে। কুসুমের শরীর খারাপ হয়েছে, ও রসুই ঘরে যাবে না। আমার বয়স বাড়ছে, কোমর-পিঠে ব্যথা হচ্ছে। বেশ কিছুদিন কুসুম করেছে, বিশ্রাম পেয়ে ব্যথাটা কমে গিয়েছিল। এখন

ওকে পড়ার সময়ও দিতে হবে বলে আবার নিজে করতে গেলাম। ব্যাস্, ব্যথা বেড়ে গেল। আজ থেকে সকালের নাস্তা আর রাতের খাবারের ভার তোমার উপর। উঠে পড়। আটটার আগে হয়ে যাওয়া চাই। প্রকাশ না হলে রাগ করে না খেয়েই শুয়ে পড়বে। যাও যাও, দেরি করো না।'

— 'জী মা-জী। জা রহী হুঁ।'— ব্যাজার গলায় বলে বহু।

হরিয়ালে এখন আগের মতো মাঠের মধ্যে হপ্তা বাজারের দিন নেই। সপ্তাহে একদিন হাট বসে এখনও, কিন্তু ভালো ভালো দোকানে ছেয়ে গেছে হরিয়াল। জামা-কাপড়, জুতো, মুদিখানা থেকে শুঁড়িখানা সবই এখন হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। শহরে যেতে হয় না। এখন হরিয়ালে শহুরে হাওয়া বয় সুন্দর সুন্দর সাজানো দোকানগুলোয়। চামেলী যেদিন বৌকে রান্নাঘরে ঢোকালেন তার পরদিন নিজে বিকেলে বাজারে গিয়ে বৌয়ের জন্য ঝকমকে পাথর সেটা করা একসেট চুড়ি আর কুসুমের জন্য সুতির সালোয়ার স্যুট কিনে এনে উপহার দিলেন। সুন্দর বেলোয়ারী চুড়ি পেয়ে বৌ গদগদ হলো। আর কুসুম বলল— 'আমার জন্য টাকা খর্চা করে এখন কেন আনলেন মাজী? এখন আমার চারখানা সালোয়ার স্যুট আছে।'

— 'আছে, কিন্তু পুরনো, রং চটে গেছে। সামনের মাসে আর একটা কিনে দেব। তাছাড়া তোর পেটে বাচ্চা আসেনি জেনে যে কী শান্তি হলো, সেই খুশিতে কিনলাম।'

স্কুলে ক্লাসের মেয়েদের মধ্যে একদল প্রথম দিন থেকেই ওর সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে, আর এক দল দূর থেকে লক্ষ্য করছে, এখনও কথা বলেনি। গ্রামের সবাই ওর কথা জানে, হয়তো সে জন্যই ওরা একটা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়া মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ইচ্ছুক নয়। মাজী বলে দিয়েছিলেন, এইরকম হতে পারে, তুই দুঃখ পাস না। কুসুম এখন কোনও কিছুতেই দুঃখ পায় না, কিংবা এইটুকু বয়সে বড় বড় দুঃখ পেয়ে ওর দুঃখ হজম শক্তি বেড়ে গেছে। মাজী বলেছেন, আস্তে আস্তে সময়ই সব ঠিক করে দেয়, ওরও ভালো সময় আসবে। ও জানে, মাজী এখন ওকে স্নেহ করেন, ওকে জীবনের প্রতি আসক্তি, উদ্যম বাড়াতে সাহায্য করেন। আশা দেন। কিন্তু কেউ বোঝে না যে ওরও মন ছিল, সেই মনে কল্পনা ছিল, অনেক কিছু করে দেখাবার উদ্দীপনা ছিল। ও একটা কিশোরী মেয়ে মাত্র ছিল দু'মাস আগেও। একদিন এক অঘটনে ও বয়স্ক নারী হয়ে গেল আপন-পর সকলের নজরে। জীবনের শুরুতেই ওর মন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সাধ-আহ্লাদ সব কিছু মরে গেছে। ভালো সময় আসার অপেক্ষা করতে ও ভুলে গেছে। এখন গড্ডলিকার মতো গড়িয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট নেই। ক্লাশে সবাই বন্ধু হলো না বলে ওর কোনও দুঃখ নেই। আজ যারা বন্ধু তারা কাল ওর কলঙ্ক জানতে পারলে আর বন্ধু থাকবে না। কিন্তু যে চারজন ওর কলঙ্ক গোপন রাখার চেষ্টায় কখনও ওর প্রতি কোমল, কখনও কঠোর হয়েছেন সেই বাবাজী, মাজী, ডক্টর আঙ্কেল, আন্টি— এদের ও হারাতে চায় না। এক জীবনে ওদের ঋণ শোধ করবে কী করে? তাই বারবার জন্ম নিতে হবে ওকে।

আর্টসের ছাত্রী নতুন মেয়ে কুসুম সিং যে কিনা সেশনের মাঝখানে এসে ইলেভেন ক্লাশে অ্যাডমিশন নিয়েছিল, সে এই মাসের ক্লাশ টেস্ট পরীক্ষায় অকল্পনীয় মার্কস পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে। এতো হাই মার্কস সচরাচর এই স্কুলের ছেলে-মেয়েরা পায়নি কখনও। তাও প্রত্যেকটা সাবজেক্টে ৯৭-৯৮, ভাবাই যায় না আগে। টিচার্স কমনরুমে কুসুম সিং আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে টিচারদের কাছে। এক বাক্যে ওরা বলছেন— ওর পেপারে একমাত্র নম্বর লেখা ছাড়া আর একটা ডট্ পর্যন্ত দেননি, মানে সামান্য স্ক্র্যাচও পড়েনি কারও কলম থেকে। যেমন হ্যান্ড রাইটিং তেমনি টু দ্য পয়েন্ট আনসার। বিস্ময় বালিকার পেপার নিয়ে টানাটানি হয়ে যায় টিচারদের মধ্যে। ওরা প্রকাশকেই বাধাই দিতে থাকে— 'জরুর তুমনে কোচ কিয়া হোগা।'

— 'না, ও নিজে নিজেই পড়েছে, কারও সাহায্য ছাড়াই। পল সাইন্স, হিস্ট্রি— এগুলোর আমি কী জানি? আমি কী করে পড়াবো বলো?'

বাড়িতেও হৈচৈ হলো খুব। চামেলী মহা খুশি। সারা গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। চারিদিকে শুধু কুসুম সিংয়ের কথা। পাস কোর্সে কোনওমতে বিএ পাশ অল্‌কা খুশি হতে পারল না।

— এই মেয়েটা রূপে গুণে কাজেকর্মে সব দিক থেকে আমাকে নীচু করে দিচ্ছে, কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে। এখন আমার চেয়ে বাইরের মেয়ের কদর বেশি। শাশুড়ি খারাপ নন, কিন্তু ওই মেয়ের পড়া পড়া করে বেশি মাথায় তুলে ফেলছেন। ওর এতো পড়াশুনা করার দরকার কী বুঝি না আমি। ডিভোর্সি মেয়েকে তো কেউ সেধে বিয়ে করতে আসবে না! আশ্রয় দিয়েছ ঠিক আছে, আশ্রিতার মতো থাকুক। কিন্তু তোমরা তো মেয়ে বানিয়ে ফেলছ! আমার প্রকাশবাবু তো বোন বলতে অজ্ঞান! ওকে নাকি সম্মান দিতে হবে। এতো প্রশ্রয়ে ওর অধিকার বাড়বে বই কমবে না। একটা সময় আসবে যখন ও জমিজমা, সম্পত্তির অংশ চেয়ে ফেলবে। তখন কী করবে? কী যে করি? আমি, আমার যারা সন্তান হবে আমরা সবকিছু থেকে বঞ্চিত না হয়ে যাই, সেটাই ভয় হয়। নাহ! একে তাড়াবার জন্য কাজে লেগে পড়তে হবে। এদিকে এমন রেজাল্ট করল যে গ্রামশুদ্ধ লোক ধন্য ধন্য করছে। আমার বিএ পাশের এই গ্রামে কোনও মূল্য নেই। এরকম বিএ পাশ নাকি এখানে ঘরে ঘরে আছে। ধুর, কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

কুসুম ওর একটা বই খুঁজে পাচ্ছে না। স্কুলে ফেলে আসার মেয়ে ও নয়, জানে বাড়ির লোক। অনেক খুঁজেও বইটা পাওয়া গেল না। সামনের মাসের টেস্ট পরীক্ষার প্রিপারেশন করবে কী করে? ও নিজে কিছুই বলে না, কিন্তু চামেলীর মনের সন্দেহ যায় না, তাই তিনি আনাচে কানাচে নিঃশব্দে খুঁজে চলেছেন কয়েকদিন ধরে। কোথাও নেই। প্রকাশ অবশ্য স্কুল থেকে ওই বইয়ের একটা কমপ্লিমেন্টারি কপি এনে দিয়েছে কুসুমকে, কিন্তু ওর আগের বইটা তো হাওয়ায় উড়ে যায়নি। গত ৫-৬দিন ধরে খুঁজেও কেন পেল না ভাবছিলেন রসুই ঘরে বসে। এমন সময় সাফাইওয়ালা হরিয়া রসুড় সাফ করতে এলো।

— 'হরিয়া কুসুম দিদির একটা মোটা কিতাব পাওয়া যাচ্ছে না। তুই সাফাই করার সময় চারদিকে ধ্যান রাখবি বুঝলি?'

ঝাড়ু দিতে দিতে হরিয়া বলে— 'এক মোটা কিতাব তো আমি গাইশালায় তুলে রেখেছি। গাইয়ের জাবে ফেলা ছিল। কিতাব দেখে আমি তুলে রেখেছি। এখুনি এনে দেখাচ্ছি, দাঁড়ান।' ভিজে জবজবে হয়ে গিয়েছিল।

চামেলী মাস্টারজীকে ছাড়ার আর কাউকেই বই পাওয়ার কথা জানালেন না, এমনকী কুসুমকেও না। মাস্টারজী বললেন— 'সতর্ক থাকা ছাড়া আর কী করবে? আরও অনেক কিছুর জন্য তৈরি থাকো।'

এই ঘটনার মাসখানেক পরে ছোট ছেলে বিকাশ ছুটিতে বাড়ি এসেছে। বিকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে। বাড়িতে আনন্দের বাতাবরণ। পুরো পরিবার এক সঙ্গে নিজেদের বাড়িতে, এর চেয়ে বেশি আনন্দ আর কী হতে পারে? বিকাশ কুসুমকে প্রথম দেখল। ওর মনে হলো এই আপাত শান্ত, সুশীল, সুন্দরী মেয়েটির মধ্যে ভরা পূর্ণিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না যেমন আছে, তেমনি অন্তর্নিহিত রূপে সূর্যের প্রখর দাবানলও ধিকিধিকি জ্বলছে। বাবুজী আর মা এই মেয়ের ভার নিয়েছেন বলে বেশ গর্ব হচ্ছে ওর। ওদের সংসারে কোনও অভাব নেই। একটা মেয়েকে প্রতিপালন করে জীবনে প্রতিষ্ঠা করিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য আছে, বাবা-মার আদর্শবাদ আছে, তাহলে কেন করবেন না? দরকার পড়লে ভাইয়া আর ও দুজনে মিলে সাহায্য করবে এমন মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে।

এবছরই ওর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের শেষ বছর। আগামী বছর থেকে চাকরি করবে। যদিও ছেলেদের টাকার আশায় বাবুজী বসে নেই, ক্ষেতের ফসল, বাবুজীর পেনশন ওনার আয়ের উৎস। তাঁর উপার্জন কম নয়। তবুও ওরা দুই ভাই কেন কর্তব্য পালন করবে না? ভাভী অল্‌কাকে বিকাশের ভালো লাগে না। অসম্ভব আত্মসর্বস্ব, অহংকারী মানুষ অল্‌কা ভাভী। সেই জন্য দেওর-ভাভীর মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেটা এক্ষেত্রে হয়নি। ওপর ওপর শ্যালো রিলেশনশিপ আছে ডেপথ্ নেই। তাই ছুটিতে বাড়ি এলে অবসর কাটানোর জন্য বিকাশ 'গ্রাম সেবাদল'এর সঙ্গে কাজ করে, নিজের বাড়ির চারপাশে গজানো লতা, ঝোপঝাড় কেটে সময় কাটায়। এমনকী প্রত্যেকটা কামরায় জিনিসপত্র সরিয়ে কোণাগুলোতে জমে থাকা ধুলো নিজের হাতে সাফ করে। ছারপোকা না লাগার জন্য সব বিছানা তুলে ছাদে রোদ খাইয়ে আবার এনে পেতে দেয়।

সেদিন কুসুমের ছোট কামরায় সাফাই করবে ঠিক করেছে। ঘরটাকে যদিও কুসুম নিজেই গুছিয়ে রাখে দেখেছে ও। কিন্তু সব সরিয়ে ও আর কী করে সাফ করবে? যতক্ষণ বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ মাকে সব কাজেই সাহায্য করে লক্ষ্য করেছে। আর কত করবে? তাছাড়া ও যখন ভাইয়ার কামরা সাফাই করে, তখন কুসুমের ছোট ঘরখানাই বা করবে না কেন? মেয়েটা তো এই পরিবারেরই একজন। ওয় বয়সী ছোট বোন যদি থাকত তাহলে কি করে দিত না? ভাভী ওকে পছন্দ করে না বুঝতে পেরেছে বিকাশ। এরই মধ্যে বিকাশের কাছে ওর সম্বন্ধে বেশ নিন্দে করে ফেলেছে ভাভী।

দুপুর এগারোটায় মা আর ভাভী ছাড়া এই বাড়িতে আর কেউ থাকে না। এখন অবশ্য ও থাকে। সেদিন ও কুসুমের ছোট ঘর সাফাইয়ের জন্য ঝাড়ু নিয়েছে যখন, তখন হঠাৎ দেখে ভাভী চারপাশে তাকিয়ে পা টিপে টিপে ছোটঘরের দিকে যাচ্ছে। একটু পরে একই ভাবে চোরের মতো বেরিয়ে এসে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। মা তখন রসুই ঘরে। ব্যাপারটা দেখে বিকাশের বেশ সন্দেহ হচ্ছে। ভাভী বলেছিল— 'আমি ওর ঘরে যাই না, ওর সঙ্গে মিশিও না। আমার বাইরের ঐ মেয়েটাকে বিশ্বাস নেই।'— তাহলে এভাবে লুকিয়ে চোরের মতো গেল কেন? উদ্দেশ্য কী? বিকাশ মোবাইলে ওর যাওয়া-আসার ছবি তুলে নিল।

এই কামরায় ও নিজেও থেকেছে। তখন যেমন ছিল তেমনি আছে। তক্তাপোশে তোষক, বালিশ, পড়ার টেবিল চেয়ার আর উঁচু টুলের ওপর টেবিল ফ্যান— এইটুকু আসবাব। পরিষ্কারই আছে একটু চাট্ আপ করলেই হয়ে যাবে। আগে বিছানাটা ছাদে রোদে দিয়ে আসবে ভেবে যেই তোষকটা টেনে নামিয়েছে ওমনি ঠক্ করে মেঝেতে কিছু পড়ল। একটা গলার হার। এই সোনার হার ওর চেনা, এটা মা-র গলায় থাকত। মা ভাভীকে আশীর্বাদ করেছিল এই হার দিয়ে। এখন ভাভীর গলায় থাকে, আজ সকালেও ভাভীর গলায় ঝকঝক করে ঝুলতে দেখেছে। আচ্ছা! এবার অল ক্লিয়ার হলো। হারটা তুলে হাফ প্যান্টের পকেটে রেখে নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে বিকাশ। কাউকে একটা আভাসও দেয় না। ভাভী তার মানে কুসুমকে

চোর সাব্যস্ত করতে চেয়েছে! বেশ। এবার তোমার পোল খুলব আমি। এসব নিশ্চয়ই অনেকদিন ধরেই চলছে। এখানে থাকি না তাই জানি না আমি। মা কাউকে বলেও না। ছিঃ ছিঃ! বেচারা ভাইয়ার কত খারাপ লাগবে বৌয়ের নীচতা জানলে! কিন্তু জানা দরকার। অন্যায়কে প্রশ্রয় দিলে বাড়ে। কাজ শেষ হলে ঘরে এসে ভাভীর হারটাকে নিজের সুটকেসে রেখে লক করে দিল। বাবুজী দুপুরে আসবেন না বলে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন। দুপুরে ওদের খাওয়ার পর বিকাশ এসে মা-র পাশে শুয়ে পড়ল। এ কথা সে কথার পর বলল— 'মা, তুমি কি জানো ভাভী কুসুমের এখানে থাকা পছন্দ করে না?'

— 'জানি। কেন, তোকে কিছু বলেছে নাকি?'

— হ্যাঁ, বলেছে। কুসুমের অনেক নিন্দা করেছে। বলেছে, এত এত নম্বর ও পেতেই পারে না। বাবুজী ওকে পালন করছেন বলে টিচাররা পক্ষপাত করে বেশি নম্বর দিয়েছে। আরও অনেক কিছু বলেছে।'

— অল্‌কা কুসুমকে খুব হিংসে করে আমি জানি। আসলে, রূপে, গুণে ব্যবহারে কুসুম যে ওর থেকে অনেক শ্রেয় এটা অল্‌কা মানতে পারে না। এরকম হয়, তুই এসবের মধ্যে মাথা গলাস না। আমি তো আছি!'

— 'কেন? মাথা গলাব না কেন? তুমি একা আছো, কেন আমরা আছি তো! বাবুজী যাকে এনেছেন, মেয়ে বলে গ্রহণ করেছেন, তার কোনও ব্যাপারে একটা কথা বলারও হক নেই ভাভীর? দেখ মা, তুমি তাপ্পি মেরে আমাদের কাছে ভাভীর অন্যায় গোপন করে কতদিন অশান্তি এড়াবে? ভাভী অশান্তি সৃষ্টি করতে চায় কুসুমকে কেন্দ্র করে, কুসুমকে অপদস্থ করে তোমাকে অশান্ত করতে চায়, যাতে তুমি কুসুমের বিরোধী হয়ে দাঁড়াও। বল তো আমাকে আজ অব্দি ভাভী কী কী করেছে? মিথ্যে বলবে না। আমি নিজে এমন প্রমাণ পেয়েছি যে তুমি ভাবতেও পারবে না, আর ভাভীকে ঢাকতেও পারবে না। বল, আমারও জানার অধিকার আছে।'

— 'তোর কাছে আবার কী প্রমাণ এলো?'

— 'পরে বলব। কথা ঘুরিও না, মা। বল।'

অগত্যা বাধ্য হয়ে চামেলীকে বলতে হয় কুসুমকে বাড়ির খাওয়া-দাওয়া পরার কাজের মেয়ে বলে প্রকাশের কাছে কড়া বকুনি খাওয়ার কথা, পড়তে বসলেই ডেকে নিয়ে পা টেপানো, মাথায় তেল মাখানোর কথা, ইকনমিক্সের বই গোরুর জাবে ফেলে দেবার কথা— সবই বলেন।

— 'আমি কত যে ব্যালেন্স করে চলি জানিস না। কুসুম কোনও প্রতিবাদ করে না রে। নিঃশব্দে

থাকে। ওর সব কাজ করে দেয় তবুও ওর রক্ষা নেই।'

— 'আর তুমি বাবুজী, ভাইয়া সকলের কাছে এই দুরাচার লুকিয়ে রেখে শান্তি পেতে চেয়েছ? ভুল করেছ মা। এভাবে শান্তি আসে না, শত্রুকে ফেস করে বুঝিয়ে দিতে হয় সে তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করেছে।'— এরপর ও সুটকেস খুলে হার বের করে স্বচক্ষে দেখা ঘটনা বলল মাকে।

— 'এতদূর গেছে?'

— 'তোমার জন্য গেছে মা। আর যেতে পারবে না। ভাইয়া, বাবুজীকে সব বলব আমি। ওরাই দাওয়াই দেবে। এখন ভাভী যেন জানতে না পারে। ওকেই আগে হার পাচ্ছে না এ কথা বলতে দাও। এই দেখ প্রমাণ।' — মোবাইলে তোলা ছবি খুলে মাকে দেখায়— 'এটা ঘরে যাওয়ার সময়। বুকের ওপর হার ঝুলছে দেখ। আর এটা বেরিয়ে আসার সময়। গলায় হার নেই। সরি মা, আমার ভীষণ সন্দেহ হয়েছিল। ওর এটা মাটিতে পড়ে যাওয়া হার।'

চামেলীর চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে— 'আর ক্ষমা নয় তোমাকে। কুসুমের দিকে চুরি অপবাদের আঙুল তুলে তোমাকেও ওর মতো ডিভোর্সি হয়ে বৌদিদের আশ্রয়ে দাদাদের বাড়িতে থাকতে হবে অল্‌কা বহু! প্রকাশ তোমাকে ক্ষমা করতে পারবে কিনা জানি না, কিন্তু আমি আর পারব না। আমার ঘরের চালে তুমি আগুন লাগাচ্ছ, কুসুম নয়। আমাকে ঘর বাঁচাতে হবে।'

এরপর ঘটনা অনেক দূর গড়ালো। অল্‌কা ওর হার খুঁজে পাচ্ছে না বলে ঘোষণা করল সকলের সামনে। ও নাকি ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখেছিল। বাথরুম থেকে স্নান করে এসে দেখে ওখানে নেই। সব জায়গায় খুঁজেছে, পায়নি।

চামেলী জিজ্ঞেস করেন— 'কখন হলো এটা?'

— 'আজ সকালে মাজী।'

— 'আজ সকালে তুমি স্নান সেরে যখন রসুইয়ে এসেছিলে তখন তো তোমার গলায় হার ছিল। আমি দেখেছি।'

প্রকাশ বলল— 'স্কুলে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলে আমি চুল আঁচড়িয়েছি, কই ওখানে তো দেখিনি। তুমি তখনই বাথরুম থেকে এলে। হারটা আমিও তোমার গলায় দেখেছি তখন। কোথায় যাবে গলা থেকে? তুমি পরে কোথাও রেখেছ হয়তো। খুঁজে দেখ।'

বিকাশ বলল— 'তোমরা সবাই বেরিয়ে যাবার পর ভাভীর সঙ্গে আমি কতক্ষণ কথা বলেছি। তুমি লম্বা হারটা মুখে নিয়ে কথা বলছিলে ভাভী। অন্য কোথাও রাখোনি তো? মা, তুমি আর আমি ছাড়া বাড়িতে ঐসময় আর কেউ ছিল না। কিন্তু! মা রসুইয়ে ছিল, আমি উঠানে ছিলাম। তবে কে নিল?'

— 'কী করে বলব? আমার স্পষ্ট মনে আছে খুলে ড্রেসিং টেবিলে রেখেছি। তোমরা বলছ আমার গলায় হারটা দেখেছ। আমার অন্যরকম মনে হচ্ছে। কেউ ওটা চুরি করেছে।'

প্রকাশ হেসে ফেলল — 'চোর তাহলে আমি। ড্রেসিং টেবিল আমি ব্যবহার করেছি তখন। আমি ওটা ওখান থেকে নিইনি, তোমার গলা থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি।'— হা-হা-হা— প্রকাশ হাসতে লাগল।

— 'মজাক্ ছোড়ো। চোর এবাড়িতেই আছে। জানি আমি।'

বিকাশ বলে— 'ভাইয়া, বাবুজী, কুসুম এরা তো ছিল না, ছিলাম আমি। তাহলে আমিই চোর একথা বলছ কি?'

— 'না, না। ছিঃ! আমার মনে হচ্ছে কুসুমের কামরা সার্চ করলেই বেরিয়ে পড়বে।'

কুসুম করুণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তো সবচেয়ে আগে বেরিয়েছি ভাভী। তুমি তখনও স্নানে যাওনি। আমিও তোমার গলায়ই দেখে গেছি।'

— 'ব্যাস ব্যাস!' ধমকে ওঠে প্রকাশ— 'আমি জানতাম তুমি কুসুমকে টার্গেট করবে। তোমার মুখ দেখতে ইচ্ছে করছে না আমার।'— বলে প্রকাশ উঠতে যায়। বিকাশ বলে— 'ভাইয়া এখানে চুপ করে বসো, চলে যেও না। হার আমার কাছে, চোরের ওপর বাটপারি আমি করেছি। মাকে, বাবুজীকে প্রমাণ সহিত সব জানিয়েছি। বাবুজী এখুনি আসবেন, তিনিই ফয়সলা করবেন, তুমি শান্ত হয়ে বসো। কেউ কোথাও নড়বে না, সবাই এখানে থাকো।'

ঘরের ভেতর সূঁচ পড়লে শোনা যাবে এমন নিঃস্তব্ধতা। একটু পরে পরমেশ্বর এলেন। তাঁর মুখ ভীষণ গম্ভীর, মুখে চিন্তার ছাপ। বিকালে বাড়ি ফিরে চামেলী আর বিকাশের কাছে সব শুনে, মোবাইলে তোলা ছবি দেখে তিনি স্তম্ভিত। এতদিন ধরে বাড়িতে এই কাণ্ড চলছে আর চামেলী সব গোপন করে রেখেছে তাঁর কাছ থেকে সেজন্য ক্ষুব্ধ হলেন। জল মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার পর তিনি জানলেন। অল্‌কার দুই দাদা তাঁর পরিচিত শুধু নয়, ঘনিষ্ঠ এবং অনুরাগীও বটে। ওমপ্রকাশ আর বেদপ্রকাশের মতো সজ্জন দুই ভাইয়ের একমাত্র ছোট বোন অল্‌কা যে এমন অ-সজ্জন হতে পারে একথা কে জানত? বড় ভাই ওম একদিন বলেছিল— 'মাস্টারজী, পরকাশ কা সাদী কে বারে মে কুছ সোঁচা? যদি ভাবেন এখন সাদী করাবেন তাহলে আমাদের বোনকে একবার দেখতে পারেন। ও শাহাগঞ্জ কলেজ থেকে বিএ পাশ করেছে, দেখতে ভালোই। আপনারা আমাদের স্বজাতি ব্রাহ্মণ, তাই বললাম।'

ওমপ্রকাশ, বেদপ্রকাশের বোনের খারাপ তো হওয়ার কথা নয়। চামেলী আর প্রকাশকে নিয়ে শাহাগঞ্জে মেয়ে দেখতে গিয়ে পছন্দ হলো। বিয়েও হয়ে গেল। তখন বোঝেননি

বাইরের রূপ দেখেছেন, ভেতরের রূপ অজানা রয়েছে। অবশ্য বেশিরভাগ লোক বাইরেটা দেখেই পছন্দ করে, ভেতর কেমন না জেনেই বিয়েসাদি হয়ে যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে ভেতরও সুন্দর পাওয়া যায়, নাহলে খুবই সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন তাঁদের হয়েছে।

— 'ওম আউর বেদ দোনো আর রহেঁ হ্যাঁয়।'

অল্‌কা যে ভয় পেয়েছে ওর কথাতেই বোঝা যায়— 'ভাইয়ালোঁগ কিঁউ আর রহে হ্যাঁয় বাবুজী?'

— 'কিঁউ কি ম্যায়নে বুলায়া হ্যায়।'

ওমপ্রকাশ, বেদপ্রকাশ এলো। সব শুনে, ছবি দেখে এর আগেও কুসুম আসার পর থেকে মেয়েটার প্রতি অল্‌কার বিজাতীয় বিতৃষ্ণার কাহিনি শুনে লজ্জায় অধোবদন হয়ে বসে রইল। এবাড়ির বড় ছেলে প্রকাশকে ছোটভাই ছবি আগে দেখায়নি। সে তো ঐ ছবি দেখে এখন পাগলের মতো ওম ভাইয়ার হাত ধরে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগল— 'আপনারা ওকে নিয়ে যান ভাইয়া। এই মুহূর্তে আমি ষড়যন্ত্রকারী বিকৃত মনের একজন মানুষের সঙ্গে বাস করতে পারব না।'

— 'আমি তোমার মনের অবস্থা, মাস্টারজীর পরেশানি বুঝতে পারছি সবই। মাস্টারজী কুসুমকে এনেছেন, পালন করছেন একথা শাহাগঞ্জেও অনেকে জানে। ওরা আমাদের বধাই দেয় এমন লোকের ঘরে বোনকে সাদি করিয়েছি বলে। গর্বে আমাদের বুক ফোলে। আর এখানে অল্‌কা সেই নিরীহ মেয়ে কুসুমকে অযথা নির্যাতন করে চলেছে। আজ তো আমার নিজেকে দোষী মনে হচ্ছে। মাস্টারজীর সংসারে অশান্তির কারণ আমার বোন। ছিঃ ছিঃ ! আমাকে বিশ্বাস করে উনি তোমার সাদি অল্‌কার সঙ্গে করিয়েছেন। আমি যে সকলের কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেলাম। ওকে নিয়ে যাবো প্রকাশ। অবিশ্বাসী পত্নীর সঙ্গে জীবন কাটানো যায় না। ওর আক্কেল ঠিকানায় আনা দরকার। যদি ও নিজেকে বদলাতে পারে, আর যদি তুমি ক্ষমা করতে পারো তখন দিয়ে যাবো। আজ ও আমাদের সঙ্গেই যাবে।'

ছোট দাদা বেদপ্রকাশ বলল— 'আমার ভাভী আর বৌ বলত অনেক সময় অল্‌কা ওদের হিংসে করে, কিন্তু আমরা দু'ভাই ওদের কথায় কান দিইনি, ভেবেছি, ওরাই ননদকে কাঁটা মনে করে। আজ বুঝলাম ওরা দুজন সত্যি কথা বলত। আমিও তোমার পক্ষে রায় দিচ্ছি। অল্‌কা স্বর্গ পেয়েছিল। স্বর্গ ওর ভালো লাগল না। এবার তাহলে হাড়ে হাড়ে বুঝুক কী হারিয়েছে। আমাদের মুখে কালি লেপে আমাদের ভালবাসা, সহানুভূতি তো খুইয়ে দিয়েছে, এখন ওর ভাভীরাও আগের মতো ননদকে তোয়াজ করে চলবে না আর। স্বামীর ঘর করতে না পেরে ফিরে আসা ননদকে ওরা তো আশ্রিতার নজরেই দেখবে। এটাই স্বাভাবিক। মাস্টারজীর পুত্রবধূ হওয়ার সৌভাগ্য ও নিজের দোষে হারালো। আমরা তো চোখে দেখে যাচ্ছি। অ্যাই অল্‌কা, চল। এখন আর কেঁদে লাভ নেই। আমাদের নাক-কান কেটে মুখে চুনকালি মাখাবার আগে ভাবা উচিত ছিল। মাস্টারজীর গোদ নেওয়া (পোষ্যকন্যা) মেয়েকে বাড়ির কাজের লোক বলে অপমান করেছিলি, এবার তোর কপালে কত অপমান অপেক্ষা করছে টের পাবি। চল, ওঠ।'

অল্‌কা শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামীর পায়ে পড়ে বারবার কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল— 'ম্যায়নে গলতি কিয়া, কসুর মাফ কর দিজিয়ে, বচন দে রহী হুঁ, আগে আউর কভি য়্যাসা নহী হোগা। মাজী, বাবুজী কৃপয়া মুঝে মাফ কিজিয়ে।'

কেউ উত্তর দিল না। কঠিন মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বেদপ্রকাশ হাত ধরে টেনে অল্‌কাকে আঙ্গন পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। — 'এক কাপড়ে যেতে হবে তোকে, ওখানে গিয়ে পুরনো কাপড় পরবি।'

ওমকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় পরমেশ্বর বললেন— 'আমি তোমাদের দুই ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ ওম, তোমরা যে আমার কথায় এখানে ওকে সাপোর্ট না করে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছ ওর ব্যবহারে তোমাদের মাথা কাটা গেছে, তার জন্য কৃতজ্ঞ। ওর ভাঙন শুরু হয়ে গেছে, কয়েকটা মাস বাড়ির সবাই মিলে অবহেলা করলে হুঁশ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আমি শুধু চাই ও ঠেক খেয়ে বদলাক। কিছু ঘাবড়িও না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সমানে খবর নেব।'

— 'জানি মাস্টারজী। আপনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই ওকে শাসন করব। আঘাত ফেরত আঘাত হয়ে নিজের উপর এলেই বুঝবে কতটা চোট লাগে। সেটাই করা হবে। আমরা জানি, স্যার আপনি কখনও বিচ্ছেদ চাইবেন না। সময় মতন অল্‌কা এখানে আসবে এও জানি। তাই বেদ বলেছে অল্‌কাকে বিবাহ বিচ্ছেদের ভয় দেখিয়ে পথে আনবে। ওর ভাবিরাও ইচ্ছা না থাকলেও একটু খারাপ ব্যবহার করবে এবার।'— বলে ওম একটু হেসে বলল— 'চিন্তা করবেন না, ক'টা মাস সময় পেলেই ওকে আমরা জন্মের মতো বদলিয়ে সভ্য করে দেব, কথা দিলাম।'

কুসুম কেঁদে অস্থির, ওর জন্য অল্‌কা ভাভী আর বড়ে ভাইয়ার বিচ্ছেদ হলো, ভাভী চলে গেল। ও নিজেকে অশুভ বলে মনে করছে। অনেক বুঝিয়ে ওকে শান্ত করা হলো। ওদিকে প্রকাশও একেবারে চুপচাপ হয়ে গেছে। মুখে হাসি দেখা যায় না। স্কুল আর সেবাদল ক্লাব নিয়ে পড়ে থাকে। চামেলীর বুক ফাটে, মুখে কাউকে কিছু বলতে পারেন না। ওনার সুখের সংসার সত্যিই ভেঙে গেল। এক একবার মনে হয়, কুসুম কি

সচমুচ অশুভ? তার পরই মনে হয়, ছিঃ এসব কী ভাবছি আমি? বহু চলে গেছে, বিকাশ ছুটিটা বাজেভাবে কাটিয়ে বেনারস ফিরে গেছে। সারাদিন তিনি একা।

পরমেশ্বর স্ত্রীর যন্ত্রণা বোঝেন, ছেলের মনের অবস্থাও অনুভব করেন। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। একটু কষ্ট হবে বর্তমানে, তবে ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এই সাময়িক কষ্ট সহ্য করতে হবে ওদের।

এলাহাবাদের নামকরা ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার রাজীব শ্রীবাস্তব তার অ্যাসিসটেন্ট জুনিয়র ল-ইয়ার কে কে সিংকে একটা কেস ব্রিফ করছিলেন। কেসটা ইউপি-র এক ইনফ্লুয়েন্সড ফ্যামিলির মেয়ের রেপ হওয়া নিয়ে। কে কে সিং এর আগে চারখানা রেপ কেস অত্যন্ত সাকসেসফুলি হ্যান্ডেল করে ভিক্টিমকে জিতিয়ে দোষীকে সাজা পাইয়ে রাজীব শ্রীবাস্তবের নাম বার অ্যাসোসিয়েশনে রৌশন করেছেন। তাই কে কে সিংয়ের হাতেই এবারের কমপ্লিকেটেড কেসটাও দিতে এতটুকু দ্বিধা করেননি অ্যাডভোকেট শ্রীবাস্তব। রেপ ভিক্টিম মেয়েটি মাইনর। বয়স ষোলো বছর। মেয়ের জ্যাঠা ইউ পি-র বর্তমান রুলিং পার্টির মন্ত্রী, বাবা ছোটোখাটো শিল্পপতি, রুলিং পার্টির সদস্য। ওকে কিডন্যাপ করে পাঁচ কোটি টাকা র‍্যানসম চাওয়া হয়েছিল। পাঁচদিন পর পুলিশ এক পরিত্যক্ত ওয়্যার হাউস থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। ওর উপর পাঁচদিন ধরে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে। পুলিশ ওদের নিজস্ব intel ধরে এগিয়ে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে, কিন্তু মূল পাণ্ডা পলাতক। জ্যাঠা মন্ত্রী মহোদয় রাজীব শ্রীবাস্তবের হাতে কেস দিয়েছেন। আর রাজীব তার আস্থাভাজন জুনিয়র কে কে সিংকে এ কেস লড়বার জন্য তৈরি করছেন। এই কেস একটা প্রেস্টিজ ফাইট। যেভাবেই হোক জিততেই হবে। কারণ রাজীবের প্রোফেশন্যাল কম্পিটিটার অ্যাডভোকেট যোশী অপোনেন্ট সাইডে ব্যাটিং করতে মাঠে নেমেছেন।

স্যারের ব্রিফিং শেষ হওয়ার পর জুনিয়ন লাইয়ারদের রুমে এক কাপ কফি নিয়ে বসে কে কে সিং। কফি পান করতে করতে ভাবে ওর সাকসেস, ওর প্রশংসা কি ওর প্রাপ্য? এই সবকিছুই তাদের দেওয়া অবদান যারা ওকে আজ এই স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছেন। রাজীব স্যার এলাহাবাদের এক নম্বর উকিল। ওর জুনিয়র হওয়া সহজ কাজ নয়। কিন্তু ও এই সুযোগ পেয়েছে ডক্টর আন্টির কৃপায়। স্যারের একমাত্র মেয়ের কোনও মতেই সন্তান হচ্ছিল না। আন্টি অবশেষে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে আই. ভি. এফ. করে যমজ বাচ্চা করিয়ে দিয়েছিল নির্বিঘ্নে। একটা ছেলে একটা মেয়ে। রাজীব স্যার আন্টির কৃতজ্ঞতা মেটানোর জন্যই সদ্য আইন পাশ করা ফ্রেসার ল-ইয়ার কুসুম কুমারী সিংকে এক কথায় নিজের টিমে জায়গা দিয়েছিলেন। আর কুসুম আজ অবধি একটা মামলায়ও না হেরে স্যারের বেস্ট জুনিয়রের স্বীকৃতি পেয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, স্যার ওকে রেপ কেসগুলোই বেশি দিচ্ছেন কেন? উনি কি তবে ওর অতীত জানেন? আন্টি হয়তো ওকে স্যারের টিমে ঢোকানোর জন্য বলেছে। আর উনিও ভেবেছেন, যে নিজে রেপ ভিক্টিম সে জানপ্রাণ দিয়ে অন্য ভিক্টিমের জন্য লড়বে। হয়তো এটাই ওর সাকসেসের কারণ।

কত বছর পার হয়ে গেল জীবনের ওপর দিয়ে। শুধু বেঁচে থাকার নাম যদি জীবন হয়, তাহলে এই জীবন ওর নিজের। কিন্তু প্রতিষ্ঠা, সাফল্য যদি জীবনের অঙ্গ হয় তাহলে ওর জীবনটা শুধুই কিছু দেবতুল্য মানুষের করুণা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতি মুহূর্ত ওরা মনের ভেতরে চলাফেরা করেন। বাবাজী, মাজী, ভাভী, ভাইয়া, ডক্টর আঙ্কেল, আন্টি— এরা সবাই যেন ওর রক্ত মাংস মজ্জায়, ওর শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশে গেছেন। এতকাল পরেও ও একটা ছোট্ট ঘটনাও ভোলেনি। ভোলেনি ওর নিজের মা-বাপ-বোনদের, ভোলেনি বলরাজকে, চৌরাহা চৌকের পিপল্ গাছের বেদিকে। তাহলে বাবুজী-মাজী, আন্টি-আঙ্কেলকে ভুলবে কেমন করে? একটু সময় পেলেই হরিয়াল ছুটে যায়, লখনৌ চলে যায় আপনজনের কাছে আপন ঘরে। অল্‌কা ভাভীর তিনটে বাচ্চার প্রিয় বুয়াজী (পিসি) যে ও! ভাভী যে দিন চলে গেল, সেই রাতে ওর মাথায় আর একবার স্যুইসাইডের পোকাটা কুটকুট করেছিল। কিন্তু সুমতি ওর শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত করেছে হৃদয়ের গভীর থেকে। ভাভীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার সঙ্গে ওর সুইসাইডকে কানেক্ট করে লোকে নানারকম রটনা করবে। বাবুজীর উঁচু মাথাটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। না, না। একাজ করা মস্ত অন্যায় হবে। ভগবানকে সমস্যা মিটিয়ে দেবার জন্য কেঁদে কেঁদে ডেকেছিল রাতভর। তিনি নাকি একটা দরজা বন্ধ করলে আর একটা খুলে দেন শুনেছে ছোটবেলা থেকে। ওর পিতাজী দরজা বন্ধ করেছিল, বাবুজী নিজের ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিলেন। তিনিই এই বিশ্রি সমস্যাও মিটিয়ে দেবেন। ঠিক তাই হলো। একমাস পর ভাভীর বড়ে ভাইয়া বাবুজীকে জানালেন, ভাভী মা হতে চলেছে। শাহাগঞ্জে ডাক্তার দেখিয়ে কনফার্ম হয়ে জানাচ্ছেন। তবে এখুনি নিতে আসার দরকার নেই, খারাপ রাস্তার ঝাঁকুনিতে ক্ষতি হতে পারে, তাই তিনমাস পার হলে

উনিই নিয়ে আসবেন।

শর্মা বাড়িতে সেদিন আনন্দের বান ডেকেছিল। সবাই ভাভীর সব অপরাধ মার্জনা করে দিয়েছিল। মাজী পুজোর ঘরে সুন্দর-কাণ্ড পাঠ করছিলেন সুর করে। আর ওর নিজের বুকে চাপা পাথরটা ধপ্ করে নেমে গিয়েছিল। তিনমাস পূর্ণ হতে বাবুজী আর বড়ে ভাইয়া গাড়ি ভাড়া করে গিয়ে ভাভীকে সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। এ যেন এক অন্য মানুষ। মাতৃত্বের আগমনে পরিবর্তিত এক অন্য ভাভী। এসে সবাইকে প্রণাম করে কুসুমকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাভী বলেছিল— 'ননদজী, তুম মেরী ছোটি বহন হো। মাফ কর সকোহী অপনি ভাভী কো? ম্যায়নে তুমকো তং কীয়া, ইতনা সঁতায়া, তুম নহন করতি রহী। কভি কিসিকে পাস মেরা শিকায়ত্ নহী কিয়া। কুসুম, তুম বহুত উঁচা হো আউর ম্যায় নীচ থী। মুঝে মাফ কর দো বহন। মেরী বচ্চে কী একলৌতি বুয়াজী, জরা মুসকুরা কে মেরী দিল মেঁ ঠণ্ডক ডালো জী।'— এরপর আর কোনওদিন ভাভী ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি, বরং আপন ননদ জ্ঞানে সম্মান দিয়ে চলেছে আজও। হরিয়ালয়ের বাড়িতে তখন সুখ আর শান্তি একসঙ্গে বিরাজ করছে।

ভাভীর প্রথম সন্তান ছেলে নর্ম্যাল ডেলিভারি হয়ে জন্ম নিল। বিকাশ ভাইয়া ফার্স্ট ক্লাশ পেয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট জব পেয়ে হিমাচলে পোস্টেড হলো। হরিয়াল গার্লস স্কুল নতুন নামে অ্যাফিলিয়েশন পেয়ে গেল, তবে বাবুজীর হল্ট স্টেশনের দাবি খারিজ করে দিয়েছে রেলওয়ে। তারপর ওর ১২ ক্লাশের বোর্ড পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। ইউ পি বারো ক্লাসের বোর্ডে কুসুম কুমারী সিং টপ্ করেছে। হরিয়াল গ্রাম জশন্ বের করেছে, আতসবাজির জুলুসে গ্রামের মানুষ মেতেছে। মাস্টারজীর বাড়ির সামনে ভিড় জমেছে, কত কিছুই যে হয়েছে ওকে ঘিরে, ভাবলে লজ্জাও লাগে, আনন্দও হয়। ডক্টর আঙ্কেল বাবুজীকে বলেছেন, কুসুম লখনৌতে এসে কলেজে পড়ুক, ওদের কাছে থেকে। প্রকাশ ভাইয়াও চায় কুসুম ভালো কলেজে পড়ুক, কিন্তু ও নিজে চায় না। ভাভীর বাচ্চা ছোট, ও চলে গেলে মা-জী, ভাভী দুজনেরই খুব মুশকিল হবে। তার চেয়ে ও শাহাগঞ্জ কলেজে ভর্তি হলে বাড়িতে থেকে পড়তে পারবে। বাচ্চাকে সামলাতে পারবে, মাজীর মুশকিল আসান হবে।

প্রকাশ রেগে বলল— 'টপার হয়ে তুই শাহাগঞ্জ কলেজে পড়বি? তোর মাথা খারাপ হয়েছে? শুনে নাও তুমি লখনৌ যাচ্ছো।'

তখন আর ও নিজেকে আশ্রিতা বলে ভাবত না, এ বাড়ির মেয়ে, ওদের বোন বলে ভাবতে ওরাই শিখিয়েছিল। তাই মুখ খুলে তর্ক করে নিজের ইচ্ছে জাহির করতে আর বাধা ছিল না। বড়ে ভাইয়াকে মুখের ওপর বলে দিল— 'তুমি যাই বল না কেন, এখন আমি শাহাগঞ্জ কলেজেই যাবো। পরে আইন পড়ার সময় লখনৌতে থেকে পড়ব। বাবুজীকে বলে দিয়েছি, কই বাবুজী তো জোর করেননি? হরিয়াল স্কুল থেকে যদি টপ করতে পারি তাহলে শাহাগঞ্জ কলেজ থেকেও অনার্সে ফার্স্টক্লাশ পেতে পারব, বুঝলে?'

প্রকাশ তবুও ছাড়ে না, বলে— 'রোজ ১৭ কিমি যেতে আসতে জিভ বেরিয়ে যাবে। পড়বি কখন আর মা-ভাভীকে সাহায্য করবি কখন?'

ও বলে— 'সব হবে। বাবুজী ট্রেকারের ব্যবস্থা করবেন। এখান থেকে আমি একা তো নই, আরও ৭-৮ জন ছেলে-মেয়ে যাবে। তুমি বেশি ভ্যানতারা করো না ভাইয়া।'

শাহাগঞ্জ কলেজ থেকেই পল সাইন্সে অনার্স আর কম্বিনেশনে হিস্ট্রি রেখে ফার্স্টক্লাস পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। ততদিনে ভাইয়ার ছেলে বড় হয়ে গেছে, ওকে চোখে চোখে রাখার দিন ফুরিয়েছে। আন্টির বাড়িতে সমাদরে থেকে 'বার অ্যাট ল' হয়ে বেরিয়ে রাজীব স্যারের জুনিয়র হয়ে আজ এখানে বসে আছে। ইতিমধ্যে ভাভীর একটি মেয়েও হয়ে গেছে। যাকে ও যত্ন করতে পারেনি তখন, এখন যখন বাড়ি যায়, তখন গোলগাল ডল পুতুলটাকে ঘাঁটে। এখন গৌরী আন্টির বাড়িতে নয়, একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে একাই থাকে। আঙ্কেলই ফ্ল্যাট ঠিক করে দিয়ে বলেছিল— 'তোমার একা থাকার ইচ্ছেতে আমি বাধা দিতে চাই না কুসুম। তুমি আজ পূর্ণবয়স্ক, সাবলম্বী মেয়ে। নিজের একটা ঘর সবাই আশা করে। তোমার আশা পূর্ণ হয়েছে আমরা তাতেই খুশি। অনেক সংগ্রাম করে তুমি সমাজে নিজের একটা মূল্যবান পরিচয় অর্জন করতে পেরেছ, ক'জন মেয়ে পারে বলো তো?'

— 'এতে আমার কোনও ক্রেডিট নেই আঙ্কেল। ক্রেডিট বাবুজীর আর আপনাদের। আমি তো শুধু একটু পড়েছি মাত্র। ঐটুকুই আমার অবদান। আমাকে এখানে পৌঁছানোর পথ আপনারা সুগম করে দিয়েছেন। তা না হলে আমি হয়তো আজ কোনও রেড লাইট এরিয়াতে ফ্লেশ ট্রেড করতাম।'

স্যারের দেওয়া নতুন মামলা নিয়ে বুঁদ হয়ে স্টাডি করছে কুসুম। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন ফাইল, চার্জশিট ফাইল, ধৃত দুই ব্যক্তির ফটো, এখনও পলাতক কিং পিনয়ের চেহারার স্কেচ বারবার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ খুঁটিয়ে দেখছে। কেন জানি মনে হচ্ছে এই মামলা রাজনৈতিক শত্রুতা থেকে উৎপন্ন। ভিক্টিম মেয়ের বর্ণনা থেকে আঁকা স্কেচের লোকটা কালো চশমা পরা। চোখ না দেখলে বোঝা কিংবা চেনা খুব মুশকিল হয়। কারণ, মানুষের চোখ কথা বলে। ঢাকা থাকলে কথা বোঝা যায় না। মেয়েটা কি

তাহলে লোকটাকে সব সময় কালো চশমা পরা অবস্থায় দেখেছে? তাহলে তো ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

বড় বড় ক্রিমিনাল ল-ইয়াররা শুধু পুলিশের উপর নির্ভর করেন না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে কনট্রাক্ট থাকে তাদের। রাজীব শ্রীবাস্তবেরও আছে রিটায়ার্ড ব্রিগেডিয়ার জশপাল সিংয়ের এজেন্সির সঙ্গে। এরা পুলিশের চেয়েও অনেক বেশি চ্যালেঞ্জ নিয়ে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে দেয়। রাজীব ইতিমধ্যে এজেন্সিকে কাজে বহাল করে দিয়েছেন। পুলিশও নিউজ পেপারে কালো চশমা লোকটার ছবি ছেপে ইনফর্মেশন চেয়েছে। এখনও খবর পাওয়া যায়নি। তার জুনিয়র মিস কে কে সিং এই ডিটেকটিভ এজেন্সিকে সঙ্গে নিয়ে কেস ইনভেস্টিগেশনে নেমেছে।

ফোনে যোগাযোগ করে কুসুম একদিন এলো ১৬ বছরের মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে। মা সঙ্গে করে ড্রাইং রুমে নিয়ে এলেন। ঠিক ওর মতোই মেয়েটা যেন নিজেকেই অপরাধী বলে ভাবছে। বিষণ্ণ, চোখের নীচে কালি পড়েছে নিদ্রাহীনতায়। কুসুম ওর মাকে বলল— 'ম্যাম, আমি একা ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।' —উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন— 'নিশ্চয়ই।' মহিলা চলে গেলে কুসুম ওর হাত ধরে বলল— 'নীলম, মুখ তোলো। আমার দিকে তাকাও। আমি নিজে একজন রেপ ভিক্টিম। ১৭ বছর বয়স ছিল তখন। তোমার মনের অবস্থা আমার চেয়ে আর কে বেশি জানবে? শরীর একটা মন্দির নীলম, শরীর ঈশ্বরের দান। যেখানে আত্মা থাকে সেখানে ঈশ্বরও বাস করেন, তাই শরীর কখনও অপবিত্র হয় না। আমি তোমার উকিল, আমাকে দেখে কি মনে হয় যে একদিন আমাকে কেউ বলাৎকার করেছিল? আমি আর পবিত্র নই?'

নীলম অবাক চোখে সুন্দর মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকে।— 'কিন্তু আমার কথা যে প্রচার হয়ে গেছে? সারা দেশ জেনে গেছে।'

— 'জানুক। কেউ তোমাকে তো দোষ দেয়নি। মানুষ অপরাধীর সাজা চাইছে, নীলম। আমি বেশি প্রশ্ন করব না। একটাই কথা জানতে এসেছে, যা কেস শিটে নেই। আচ্ছা, ঐ কালো চশমা পরা লোকটার মুখ তুমি দেখেছ, ওর চোখে কি সব সময় কালো চশমা থাকে? ও বেঁটে না লম্বা?'

— 'ঐ লোকটাকে দুবার দেখেছি, একবার দিনে একবার রাতে। দুবারই চোখে চশমা ছিল। ওর হাতে গালে লম্বা লম্বা সার্জিক্যাল স্টিচের নিশান আছে। তবে ও আমাকে রেপ করেনি, করেছে অন্য দুজন। ও ওই দুজনকে আদেশ করত। ও লম্বা, মাঝারি স্বাস্থ্য গায়ের রং গেঁহুয়া।'

— 'কী আদেশ করত?'

— 'মোবাইল থেকে নয়, পাবলিক কল বুথে কয়েন ফেলে ফোন করে বাড়িতে ধমকি দিত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকা নির্দিষ্ট স্থানে না রাখলে আমাকে মেরে ফেলবে, একথা বলত। প্রথম দুদিন কিচ্ছু করেনি আমাকে, খেতেও দিয়েছে। তৃতীয় দিনে খেতে দেয়নি, সেই রাতে লোকটা এসে আমাকে বলেছে, তোর বাপ টাকা দেয়নি, এবার তোকে মরতে হবে। অন্য ছেলে দুটোকে বলল, এখন তোরা ওকে নিয়ে মজা লুঠতে পারিস, তবে যাই করিস ওর হাত দুটো পেছনে বেঁধে করবি। হাত কী জিনিস জানিস না। সেদিনই ওরা আমার হাত বেঁধে...।'

কুসুমের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল... বলরাজ? নীলমের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। হাতে-গালে লম্বা লম্বা স্টিচের নিশান, হাত বেঁধে, হাত কী জিনিস জানিস না এই উক্তি, চোখের গর্ত ঢাকতে দিনে রাতে কালো চশমা, লম্বা, গমের মতো গায়ের রং... হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বলরাজ ছাড়া আর কেউ নয়। ও রেপ করবে কী করে? আমি তো নরুন দিয়ে ওর নিম্নাঙ্গ... ও মাই গড্! তুমি শয়তানটাকে শেষপর্যন্ত আমার হাতে এনে দিলে ঠাকুর!

কোর্ট আওয়ার্স শেষ হয়ে গেছে, রাজীব স্যার বাড়ি চলে গেছেন। উত্তেজিত কুসুমকে বললেন— 'বাড়িতে চলে এসো। গলা শুনে মনে হচ্ছে জবরদস্ত ক্লু পেয়েছে। দেরি করো না।'

ফিরে আসার পথে কুসুম উত্তেজনা দমন করে নিজেকে শান্ত করল। এখন উল্লাস নয় শুধু কাজ। গুন্ডা বলরাজ, ওর মাফিয়া ডন গুন্ডা চাচা— সব কটাকে যদি একসঙ্গে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারি, তবে শান্তি হবে। ওর স্থির বিশ্বাস বলরাজ পশ্চিম ইউ পি-তে ওদের গ্রাম বড়কা তালাও-এ আত্মগোপন করে রয়েছে। কারণ ওই অজ পাড়াগাঁয়ের নামও কেউ জানে না। এই গ্রামে বলরাজদের রাজত্ব চলে আসছে কোন অতীত থেকে। ওদের শাসন মেনে চলতে অভ্যস্থ হয়ে গেছে গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদ মানেই অত্যাচারিত হওয়া। তাই কারও বুকের পাটা নেই বলরাজকে চিনিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

প্রায় দেড় ঘণ্টা স্যারের বাড়ির চেম্বারে বসে সবিস্তারে আলোচনা হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে ডিটেকটিভ এজেন্টদের ঐ নাম না জানা বড়কা তালাও গাঁয়ে কিষানের ছদ্মবেশে খোঁজখবর নিতে যাওয়া। পাক্কা খবর পেলে পুলিশ যাবে। তার আগে রাজীব পুলিশকে কিছু জানাবেন না। কারণ অ্যারেস্টেড ছেলে দুটোর হয়ে মামলা লড়ার জন্য বহুত তাগড়া উকিল লাগানো হয়েছে, যার এক ঘণ্টার ফিজ দেবার ক্ষমতাও ঐ ছুঁচো দুটোর নেই। এর মানে ওদের পেছনে রাঘব বোয়াল কেউ একজন আছে। সে অনায়াসে পুলিশ কিনতে পারে। ব্রিগেডিয়ার সিং তার এক্স আর্মি জওয়ান ডিটেকটিভদের পাঠিয়ে গ্রাম ব্লক

করে রাখবেন, যাতে বলরাজ পালাতে না পারে। বুঝলে কুসুম কাউকে পুরো বিশ্বাস হয় না।

কুসুম বলে— 'সে জন্যই পুলিশ পার্টির সঙ্গে আমি নিজে যেতে চেয়েছি। ওর লুকিয়ে পড়ার জায়গাগুলো আমার থেকে ভালো আর কেউ জানবে স্যার? পেছনে যে ওরাই আছে তাতে সন্দেহ নেই।'

—'না। তুমি প্রতিশোধ নিয়ে নিয়েছ তুমিই বললে। আর নয়। এই মকদ্দমা আমিই লড়ব তোমার আইডেনটিটি গোপন রাখার জন্য। তুমি ওর যে হাল করেছ, তাতে ওরা কি তোমাকে পেলে ছেড়ে দেবে? আমার সূত্র খবর এনেছে, ওর চাচার বিরুদ্ধেও নতুন রুলিং পার্টি পাঞ্জাব বর্ডার দিয়ে ড্রাগ আমদানি নিয়ে অনুসন্ধান করছে। দ্যাখো, চাচা-ভাতিজা দুজনই জেলে যায় কিনা? নীলমের জ্যাঠা এখন কানুন মন্ত্রী, উনি চাচা-ভাতিজার জমজমাট কারবার বন্ধ করার উদ্যোগ নিয়েছেন, এই কারণেই প্রতিশোধের জন্য নীলম অপহরণ কাণ্ড।'

ড্রাগ, মার্ডার, অ্যাবডাকশন, রেপ, অ্যাবেটমেন্ট টু স্যুইসাইড অফ ফোর ওমেন— পাঁচটা মারাত্মক চার্জে জড়িয়ে ফেলেছেন। তথ্য প্রমাণ নিয়ে তৈরি রাজীব শ্রীবাস্তব। সাহস জুগিয়ে, মোটা টাকা দিয়ে গ্রাম থেকে কিছু সাক্ষী জোগাড় করে এনেছে ব্রিগেডিয়ার এজেন্সি। এই মামলা তার প্রেস্টিজ ফাইট। টাকা কামাবার জন্য লড়ছেন না, কুসুম আর নীলমকে ন্যায় বিচার পাইয়ে দেবার জন্য গ্যাঁটের কড়ি খরচ করে লড়ছেন। জিততে তাকে হবেই বাই হুক অর বাই ক্রুক। টাকা বহু কামিয়েছেন, আগামীতেও কত কামাবেন। কিন্তু এই মামলা জিতে যে আনন্দ পাবেন, সেটা তার আইনি জীবনে ক্যাপিটেল হয়ে থাকবে।

দুই পক্ষের দুধর্ষ লড়াই চলেছে প্রত্যেকটা শুনানির তারিখে। রাজীবের সাক্ষীরা নিজেদের মৃত মেয়ে, পুত্রবধূর পুরনো ফটো সঙ্গে নিয়ে এসে দেখিয়ে কেঁদেছে সাক্ষ্য দেবার সময়। সাক্ষ্য কুসুমও দিয়েছে জোর করে তবে কোর্ট

রুমে নয়, জজ সাহেবের চেম্বারে বসে বলার অনুমতি নিয়ে। মাস্টারজী, ডক্টর অরবিন্দ কুমার, ডক্টর গৌরী কুমারও গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্ত কুসুমের সঙ্গে তিনজন জজের সামনে বসে নিরালায় সাক্ষী দিয়েছেন। এই নিয়ম কোর্টের আছে, রাজীব তাই আবেদন করে মঞ্জুর করিয়ে রেখেছিলেন। অপোনেন্ট তাগড়া উকিল মশাইয়ের সমস্ত যুক্তি রাজীব খান খান করে ভেঙে দিয়ে বিজয়ের পথে যাচ্ছেন। তিনি বলরাজের জন্য আদালতের কাছে মৃত্যুদণ্ড দেবার আর্জি পেশ করলেন। রায় বের হবার দিন পুলিশ ব্যারিকেড করে মিডিয়ার ভিড় রুখেছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই নীলম নির্ভীক হয়ে সাওয়ালের জবাব দিয়েছে কোর্ট রুমে দাঁড়িয়ে। আঙুল তুলে তুলে দোষীদের সনাক্ত করেছে। কেস ওঠার আগে কুসুম ঘনঘন ওদের বাড়িতে গিয়ে নীলমকে সাহস যুগিয়েছে। ষোলো বছরের নীলমের ভয় দূর করে শক্তি এনেছে মনে। একথা স্যারও জানেন না, ও বলেনি ওনাকে।

শুনানি চলার সময় আড়াল থেকে ও বলরাজকে দেখেছে। কালো চশমাটা নেই, বোধহয় পুলিশ কেড়ে নিয়েছে। ডান চোখের স্থানে একটা অন্ধকার গর্ত। গালময় স্টিচের পুরনো দাগে ভরা মুখ। ও ওর পিতাজীকে, গ্রামের অন্যদেরও দেখেছে। ওর পিতাজীও ফটো নিয়ে এসেছিল। সাক্ষী দেবার সময় বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া মানুষটাও কেঁদেছে সেদিন। বলেছে, 'আমার মেয়ে ঘটনার পর ঘরেই এসেছিল হুজুর। আমিই ভয়ে ওকে ঘরে থাকতে দিতে পারিনি। বলেছিলাম কোথাও চলে যা। সেই যে চলে গেল আর আসেনি। হয়তো ও খুদখুশি করে মরে গেছে। বড় খুবসুরত, বড় ভালো মেয়ে ছিল ও।'— শুনে কুসুমের কেন যে চোখে জল এলো জানে না। বাপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও জাগেনি মনে, তবে কান্না এলো কেন কে জানে!

বিচারক বলরাজকে ফাঁসির আদেশ ঘোষণা করে আদেশপত্রে সই করে কলমের মুখ ভেঙে উঠে দাঁড়ালেন। কুসুমের মুখে আবার চাঁদের জ্যোৎস্না ফিরে এলো। ওরা পরে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেছিল, কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন। রাষ্ট্রপতি প্রাণভিক্ষার আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন। কুসুম এখন ফাঁসির দিনের অপেক্ষায় আছে। আর রাজীব শ্রীবাস্তব তার প্রেস্টিজ ফাইট জিতে মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন একথা নিজেই বলেছেন জুনিয়ারদের কাছে।

পরিশেষে

—'হ্যাঁরে কুসুম তুই কি সংসার পাতবি না? সাদির কথা বললে অন্য কথা শুরু করে দিস। আমরা আর কতদিন থাকব? তোর জীবন কী করে কাটবে বল তো? বয়স তো আর বসে নেই, সে বেড়েই চলেছে। তোকে একা রেখে কী করে যাই বল তো? শুনি কত ভালো ভালো ছেলে তোকে সাদির প্রস্তাব দিয়েছে। তুই খারিজ করে দিয়েছিস— কেন?

— 'আমি খুব ভালো আছি বাবুজী। একদম চিন্তা করতে হবে না। আমার দুই ভাইয়া-ভাভীজী আছে, ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে, একা নাকি আমি! আমার কাজের সঙ্গেই সাদি হয়ে গেছে বলে ভাবুন না। আপনি তো বলেন, কর্মই ধর্ম। আমি আমার কর্মকে সঙ্গী করে খুব সুখে শান্তিতে আছি। আজাদির স্বাদ অনুভব করছি বাবুজী, বিশ্বাস করুন। যত দিন আপনি আছেন, আমি নিজের জন্য নিশ্চিন্ত থাকব, কারণ নতুন জন্ম দিয়ে অলিখিতভাবে আপনিই আমার পিতা, আপনিই আমার ঈশ্বর। আমি তো ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে আছি। পিতার ছত্রছায়ায় বড় হয়েছি। আমার কিসের ভয়?'

পরমেশ্বর তর্ক করেন না। কুসুম ব্যক্তিত্বশালী পূর্ণবয়স্কা পরিণত নারী, ও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকবে এই কথা জানা হয়ে গেছে অনেক বছর আগেই।

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

সিনেমাওয়ালা ছবিতে পরান বন্দ্যোপাধ্যায়।

একপর্দা প্রেক্ষাগৃহের মায়া

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেকেই লক্ষ্য করেছেন গত দশ বছর ধরেই কী বাঙলা কী হিন্দি, কী বিদেশি চলচ্চিত্র দেখানোর এক পর্দায় (Single screen) যেখানে একটিই মাত্র ছবি দুপুর সন্ধ্যে রাত্রি মিলিয়ে দেখানো হতো সেইসব প্রেক্ষাগৃহগুলি একে একে যেন নিয়তি নির্দিষ্ট অলঙ্ঘ্যতায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সময়ের দাবিতে, দর্শক চরিত্র ও রুচির বিবর্তনের কারণে এটিই স্বাভাবিক পরিণতি। আজকের দর্শক হয়তো চলচ্চিত্র উপভোগ করার সময় আরও বেশি পারিপার্শ্বিক স্বাচ্ছন্দ্য অভিলাষী। এগুলি হতেই পারে। এর অন্তিম প্রতিক্রিয়ায়— দর্শকের প্রেক্ষাগৃহমুখী না হওয়া।

টি-ভি, ইউ টিউব বা ডিভিডি-তে ছবি দেখে নেওয়ার সহজ সুযোগ থাকাও আর একটি বড় কারণ। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব একদিকে যেমন ছবি যিনি বিভিন্ন হলে দেখাতে পাঠানোর (Distributor) ও যিনি হল মালিক বা ছবির প্রদর্শনের (exhibition) সঙ্গে যুক্ত তাঁদের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের ওপর প্রতিফলিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহের অবলুপ্তির পথে সক্রিয় ভূমিকাও নেয়। কিন্তু সেই অর্থনৈতিক কারণ ও আদায় উশুল নিয়ে এই নিবন্ধ নয়।

কলকাতার এসপ্ল্যানেড বা ধর্মতলা অঞ্চলটি সেই স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় থেকেই শহরের বিশেষ করে চলচ্চিত্রের দর্শক আকর্ষণের ক্ষেত্রে আজকের ভাষায় একটি SEZ (Special economic zone)-এর মতো স্পেশ্যাল এন্টারটেনমেন্ট জোন বা বিশেষ বিনোদন ক্ষেত্রের মর্যাদা পেত। সদ্য যৌবনাগত তরুণ তরুণীর মন একই অঞ্চলে আট দশটি প্রেক্ষাগৃহের চিত্র বিচিত্র সাজে সজ্জিত বহিরঙ্গ ও নায়ক নায়িকা, খলনায়কের নানান বিভঙ্গের বিশালকৃতির ব্যানারগুলি দেখে অনায়াসেই এক মোহগ্রস্ত পরিস্থিতির মোকাবিলায় আক্রান্ত হয়ে পড়ত। লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, গ্লোব, মিনার্ভা, টাইগার, রক্সি, রিগাল, এলিট প্রভৃতির সে এক সম্মিলিত হাতছানি!

একসময়ের চিত্তাকর্ষক নামধারী লাইট হাউস বহুকাল আগেই জামাকাপড় প্রসাধনীর বিক্রয় কেন্দ্রে পরিণত। এর পাশেই রয়েছে নিউ এম্পয়ার সিনেমা। এটি পরাধীন ভারতে (১৯৩২) প্রথমে

অপেরা রূপে থাকাকালীন এখানে রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত নটীর পূজা প্রদর্শনের বিরল গৌরবের অধিকারী। নিউ এম্পায়ার শুরুর সময় থেকে বরাবর হলিউড ছবি দেখালেও এখন সে রেওয়াজ নেই। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ সৌধের তালিকায় পড়া এই হলটি অধুনা নানাবিধ আইসক্রিম পার্লার, মদিরালয় ইত্যাদির সাহচর্যে এখনও টিকে আছে। মনে পড়ে এখানেই এক বছর ধরে চলেছিল কলকাতা কাঁপানো ভূতের ছবি 'exorcist'। প্রায়শই খবর আসত এত জন দর্শক অজ্ঞান হয়ে গেল। কখনও বা এতজন হলে ভয়ে কাঁপতে লাগল। এসব গালগল্প থাক। এই ছবি কোটি কোটি টাকা বিশ্বব্যাপী রোজগার করেছিল। আজকের ভারতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা নিয়ে প্রায় ১৮০০ ছবি নির্মিত হয়। সিনেমা যে আজ হেলাফেলার জিনিস এমন আর নেই। কোটি কোটি টাকার বিদেশি মুদ্রাও বহু বড় বাজেটের হিন্দি ছবি এখন দেশে নিয়ে আসে। প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য অনেক নান্দনিক গুণসম্পন্ন ছবিও এখন দেশের বাইরে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বিশ্বের এমন একটি চিত্ররূপময় নান্দনিক সৃষ্টির প্রকাশস্থলগুলির ক্রমিক অবলুপ্তি কেমন একটা করুণ নস্টালজিয়ার জন্ম দেয়। এটি সে অর্থে নিতান্তই সেই বিগত শতাব্দীর ৬০ থেকে ৯০-এর দশক পর্যন্ত যারা প্রেক্ষাগৃহমুখী হতেন তারা খানিকটা ভাগ করে নিতে পারতেন। সদ্যই কাগজে বেরোল এলিট সিনেমা ১ জুন থেকে আর পর্দা ওঠাবে না। এক পর্দা সিনেমা হলের বিলয়ের কথা বলতে গেলে তাদের সঙ্গে যুক্ত বিরল গৌরবগাথাগুলিরও তো কিছুটা উল্লেখ করতে হবে।

ইয়োরোপ বা হলিউডে সিনেমা বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে জাঁকিয়ে বসলেও স্বাভাবিক কারণে একটি পরাধীন দেশে তার নির্মাণকার্য একটু দেরিতে শুরু হয়। সেই অর্থে ১৯৩১ সালে বিলিতি প্রযুক্তিবিদ বি এন সরকার-এর নিউ থিয়েটার্স ও ১৯৩৪ সালে হিমাংশু রায়ের 'বম্বে টকিজ স্টুডিও' ভারতে চলচ্চিত্র নির্মাণের পথিকৃতের মর্যাদা নিশ্চয় দাবি করবে। কিন্তু এই সমস্ত ছবির অভিনেতা অভিনেত্রী কলাকুশলীরা তো তখন নিজেদের একটি সম্পূর্ণ নতুন যৌথ শিল্প মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত করার, তাকে আয়ত্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। তাঁরা নিয়ম করে দেখতেন বিদেশি ছবি। আর তাঁদের নান্দনিকতাবোধ নির্মাণের অনুশীলন কেন্দ্র ছিল এই আজকের বিলীয়মান ধর্মতলার প্রেক্ষাগৃহগুলি। সত্যজিৎ রায়ের লেখালিখি থেকে জানা যায়, তিনি নিয়মিত মেট্রো বা গ্লোব সিনেমায় রাতের শো'তে হলিউডি ছবি দেখতে যেতেন। উত্তমকুমার যেতেন তাঁর গুরু Ronald Colman-এর ছবি দেখতে। এই দেখা থেকেই Random Harvest-এর ছায়ায় সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালির সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ রোমান্স 'হারানো সুর'।

দ্য বাইসাইকেল থিপ ছবির পোস্টার।

মেট্রো সিনেমায় তাঁর বাবা চিফ অপারেটর বলাইবাবু হওয়ায় ছেলের নিজেকে তৈরি করতে বাড়তি সুবিধা হয়েছিল। কলকাতা আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসবের ছবিগুলিও এই হলগুলিতেই তখন প্রদর্শিত হতো। কেননা তখন তো মাল্টিপ্লেক্স ছিল না। এই উৎসবেই একবার একটি অবিস্মরণীয় দৃশ্যের সাক্ষী হয়েছিলাম, আজ হারিয়ে যাওয়া মেট্রো সিনেমায়। সেবার জাপানের বিখ্যাত পরিচালক ওজুর The boy ছবিটি সন্ধের শোতে দেওয়া হয়েছিল। তখন ডিভিডি নেই যে ছবি না দেখতে পেলে কিনে নিলেই হবে। তিন ঘণ্টার প্রলম্বিত ছবি ভাঙার পর আলো জ্বলতেই বিস্ময়ান্বিত হয়ে দেখলাম, মহীরূহ সদৃশ সত্যজিৎ রায়কে। একটি সাধারণ ঢোলা পাঞ্জাবি পাজামা পরে রয়েছেন। হলে যেন একটি চাপা কলতান শোনা যেতে লাগল। আশপাশ থেকে অঙ্কুর বেরোনোর মতো পরপর উঠে দাঁড়াচ্ছেন বসন্ত চৌধুরী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার,রবি ঘোষ, ছায়াদেবী, বিকাশ রায়ের মতো আরও কত না বিখ্যাত অভিনেতা। মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাচ্ছেন চলচ্চিত্রের পুরোধা পুরুষটিকে। এতবড় এক জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে হয়তো ৩৫ বছর আগে খরচা

ম্যাকানাস গোল্ড ছবিতে গ্রেগরি পেক এবং ওমর শরিফ।

পড়েছিল টিকিটের দাম হিসেবে বেশি হলে ২০ টাকা। এখন একটা সিনেমা মাল্টিপ্লেক্স-এ তাও আবার সময় ভেদে দামের তফাত নিয়ে ন্যূনতম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। টিকিট কাটারও হ্যাপা উচ্চ প্রজাতির মোবাইল ফোনে আবদ্ধ। বহু সিঁড়ি, escalator ভেঙে সেখানে প্রবেশ করতে হয়। বাজার অনুযায়ী জানি না, দাম বেশি কিনা। তবে সিনেমার যারা আপামর দর্শক সেই বয়ঃসন্ধির তরুণ-তরুণীরা কি এত টাকা জোগাড় করতে পারে? না পারলে তো তারা মায়ালোক থেকে বাদ পড়ে গেল!

ফিরে যাই আগের কথায়। এই বন্ধ হওয়া মেট্রোতেই দর্শক একদিন ছায়াছবির ইন্দ্রজালের সন্ধান পেয়েছিলেন— 'বেন হুর' (রথ ছোটানোর দৃশ্য) বা কুয়ো ভ্যাডিসে। গ্লোব সিনেমায় উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সময় বরাবর বিস্ফারিত নেত্রে স্বগোত্রীয়দের সঙ্গে রাস্তা থেকে দর্শক হয়েছিলাম রানি ক্লিওপেট্রার বিস্ফোরক শরীরি সৌকর্যের। রিচার্ড বার্টন (যিনি আবার ক্লিওপেট্রা রূপী এলিজাবেথ টেলরের স্বামীও বটে) ও বিশ্ববিশ্রুত প্রবীণ অভিনেতা রেক্স হ্যারিসনের অতিকায় সব পোস্টার এক বাক্যহীন কুহকের সৃষ্টি করেছিল। বাড়ি থেকে দেখানো হয়েছিল তৎকালীন সীমিত প্রযুক্তির যুগে তাকলাগানো Ten Commandments। অনেক পরে ৭০-এর দশকে ভারতের সর্বকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিনোদন সফল ছবি 'শোলে' এই এলিট ও আগেই মৃত জ্যোতি সিনেমার তৎকালীন স্টিরিওফোনিক সাউণ্ডে সব রেকর্ড ভেঙে কয়েক বছর চলেছিল। বহু মানুষ রোজই জ্যোতি সিনেমায় গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরতেন 'হাউসফুল'। এলিটে অমিতাভ বচ্চনের ৮৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শাহেনশাহ'র লাইন পড়েছিল মেট্রো সিনেমা ছাড়িয়ে। পুলিশকে যানবাহন সামলানোর সঙ্গে হাল্কা লাঠি চালাতেও হয়েছিল। জনতা সিনেমার ভালোবাসায় খুশি মনে তা মেনে নিয়েছিল। চলচ্চিত্রপ্রেমীদের একটি যুগান্ত ঘনিয়ে আসছে বলেই যেন নানা স্মৃতি ভিড় করে আসছে। আজকের প্রবীণরা কি ভুলতে পারবেন এলিট সিনেমায় দর্শকদের Mckanas gold-এর স্বর্ণ অভিযান বা Guns of Navarone-এর স্মৃতি। মনে রাখতে হবে ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর '৭০-এর দশক অবধি যুদ্ধ নিয়ে মানুষের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তেমনই ছবি 'Bridge on the River Quai' গ্লোব সিনেমার পর্দা কাঁপিয়ে ছিল বহুদিন। তখন তো দেশে সাহেব ছিল না। ছবিগুলি মধ্যবিত্ত বাঙালি দর্শকের, হবু ছবি নির্মাতাদের রুচি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বলা যেতে পারে।

এক-পর্দা প্রেক্ষাগৃহের অবসান অনেকটা যুদ্ধের সময় পোড়ামাটি নীতির মতো দ্রুত ধূলিসাৎ করে দিয়ে যাচ্ছে তাকে

ঘিরে থাকা স্মৃতির সৌধগুলিকে। রিচার্ড অ্যাটেনবরোর রেকর্ড অস্কারে ভূষিত জাতির পিতা গান্ধীকে নিয়ে ৫ ঘণ্টার চলচ্চিত্র 'গান্ধী' বিতর্কহীন ভাবে দীর্ঘদিন অধুনা নীরব গ্লোব সিনেমাকে কলরবমুখরিত রেখেছিল। এই অবলুপ্তি পর্বে কলকাতার শেষ উন্মাদনা শতাব্দী শেষের 'The Titanic' দিয়ে শেষ করব। এটিও বছর পার করা ছবি। আজকের মাল্টিপ্লেক্সওয়ালারা কেউ দম রেখে বলতে পারবেন যে তারা একটি ছবিকে এক বছর চালাতে পেরেছেন?

আসলে এসবই কালের গতি, তবে তার পদচিহ্নকে তো এড়াবার উপায় নেই। চিন্তাস্রোতে তার উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। আর তা যে করা যায় না তার অকাট্য প্রমাণ রাখলেন যশস্বী পরিচালক শ্রী কৌশিক গাঙ্গুলী। একালে সিনেমা হলগুলির অপসৃয়মান মায়ায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছেন কৌশিক। আস্ত একটা হারানো দিনের মেঘলা আকাশের বেদনাময় ছবি 'সিনেমাওয়ালা' উপহার দিলেন চলচ্চিত্রপ্রেমীদের। একটি দীর্ঘ কালপর্বের সাক্ষী হয়ে পথ প্রান্তে দাঁড়ানো আটপৌরে আবহের একপর্দার প্রেক্ষাগৃহের আবেদন যে সর্বজনীন হতে পারে, তা প্রমাণ করল প্রথম ভারতীয় হিসাবে তাঁর Unesco প্রবর্তিত International Council for Film Television & Audio Visual Communication (ICFT) Paris & Unesco -এর প্রবাদপ্রতিম ইতালীয় পরিচালক ফ্রেডরিকো ফেলেনির (La Dolu Vita খ্যাত) নামাঙ্কিত সেরা পরিচালকের পুরস্কারটি জিতে নেওয়ায়। দেশের মধ্যে Filmfare (eastern) -এর দেওয়া সেরা ছবি, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতার মতো সমস্ত বড় পুরস্কারে ছবিটি ভূষিত। ছবির মুখ্য চরিত্রে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যি সত্যিই ডিজিটাল সিনেমার কাছে হেরে যাওয়া অর্থনৈতিক ভাবে যত না মানসিকভাবে তার চেয়ে ঢের বেশি সর্বস্বান্ত এক মফসস্‌ল প্রেক্ষাগৃহের মালিককে অবিস্মরণীয় করে রাখলেন। প্রেক্ষাগৃহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অন্তিমলগ্নে তিনি হলে আগুন লাগিয়ে দেন।

ছবিতে তাঁর কর্মজীবনের চিরসঙ্গী হরি তার প্রাণপ্রিয় প্রোজেক্টরটি যখন বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তেই আত্মহত্যা করে। ওপরতলার ব্যালকনির আসনগুলির মধ্যপথ দিয়ে যখন প্রজেক্টরের আলোয় বাতাসে ভাসমান ধূলিকণাগুলি ঝিকমিক করে উঠত, সৃষ্টি হোত এক অলীক নক্ষত্রপুঞ্জের গতিপথ। এই রশ্মিই প্রলম্বিত হয়ে আছড়ে পড়ত পর্দায়। জন্ম হতো কল্পলোকের। সারিবদ্ধ আবিষ্ট দর্শককূল পর্দার অভিনেতাদের কখনও আনন্দের কখনও বেদনায় বিদ্ধ হয়ে অশ্রুপাত করতেন। দর্শক মনে তৈরি হতো এক স্মৃতির ইমারত। সেই প্রজেক্টর আজ অতীত। কিন্তু তার গমন পথের স্মৃতি বিশেষ করে কিশোর বা তরুণ মনে এক স্থায়ী আসন নির্মাণ করেছে।

এক যৌথ নান্দনিক সৃষ্টি হিসাবে চলচ্চিত্রই আমাদের অতীতের সবথেকে বুদ্ধিদীপ্ত সংরক্ষণ মাধ্যম। এই সূত্রে চলচ্চিত্রের এক ধরনের ত্রিমাত্রিকতা রয়ে যায়। যেমন ছবি ও দর্শকের মধ্যে যে সংযোগ ও তজ্জনিত অনুভূতির নির্মাণ। দ্বিতীয়ত, ছবিটি নিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে তার কিছুটা পুনর্নির্মাণ। চলচ্চিত্রের বিস্তৃত

শোলে ছবিতে সঞ্জীবকুমার এবং আমজাদ খান।

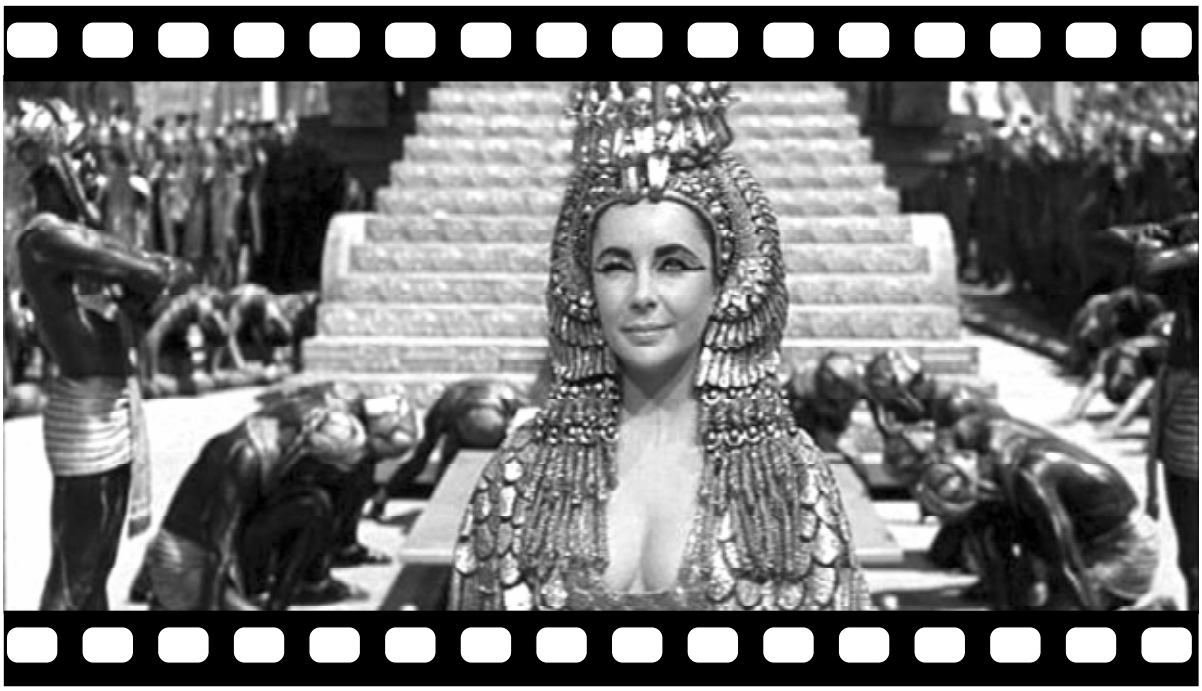

ক্লিওপেট্রা ছবিতে এলিজাবেথ টেলর।

দিগন্ত উন্মোচনে এর বিশ্বজননীতা অসীম। মানবিক আবেগ, বেদনা, ভালোবাসা, রোমান্টিকতা কী অনায়াসে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে চলচ্চিত্র বাহিত হয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠে তা আর চলচ্চিত্রপ্রেমীকে বলে দিতে হয় না। সে Mother India -তেও কাঁদে, Bycycle Thief এও কাঁদে, পথের পাঁচালীতেও ভেসে যায়।

দীর্ঘদিন অপসৃত হয়ে গেছে যে সময় সেই সময়ের ছবি আজ দেখলে অতীত সময়কালীন পরিবেশ, আবেগ, আচরণকে আমরা বর্তমান মানসিক স্তর থেকে বিচার করি, তাকে যেন ছুঁতে পারি। আজকের পরিবেশে অনেক কিছু হয়তো অবিশ্বাস্য মনে হয়। এখানেই একটি প্রশ্ন ওঠে অতীতের মূলত প্রধান ধারার যে হিন্দী ছবিগুলি সারা ভারতের দর্শককে (দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশ ছাড়া) মাতিয়ে রাখত, সেখানে কিছু উপাদান হয়তো আগে থেকে মজুত রাখা হতো। ন্যায়ের পথে চলতে গিয়ে বাবা বিপুল দারিদ্র্যে মারা গেলেন। মা কাজের লোক হয়ে ছেলে মেয়েদের বড় করলেন। তারা ভিলেনকে পরে চিনল। প্রতিশোধ নিল। পরিবারের সম্মান বাঁচানো বা 'ইয়ে শাদি নেহি হো সকতি' ইত্যাদি সংলাপ বারবার বলা বা আইনের হাত ভীষণ লম্বা' ইত্যাকার সাবধানবাণী যে আসবে তা যেন দর্শক জানত, সবই যেন নিয়তিনির্দষ্ট। তাই ঠিক সময়ে নাচে, গানে নাগাড়ে কান্না ও খোলামেলা প্রেমের দৃশ্য বা তীব্র ধ্বনিময় সংঘর্ষ ও মুষ্টিযুদ্ধ তারা চুটিয়ে উপভোগ করত। তারা যে বোকা ছিল তা ভাবা ভুল। বিখ্যাত কবি Collridge বলেছিলেন 'willful suspension of disbelief' ইচ্ছে করে অবিশ্বাস্যকে বিশ্বাস করা। কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের প্রবণতাকে স্থগিত করে রাখা। এটা হয়তো তারা জানত। হরলিক্সের বিজ্ঞাপনে যেমন সম্পূর্ণ পুষ্টির দাবি করা হয়। ৬০ থেকে ৮০-র দশকের মূল ধারার হিন্দি ছবি ছিল এই সম্পূর্ণ বিনোদন। অনেক চলচ্চিত্র বোদ্ধাই নাক সিঁটকে বলতেন Melodrama। কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণ সচেতনভাবে এই মেলোড্রামাকে গ্রহণ করত। আসলে মানুষের জীবন ছিল অনেক জটিলতাহীন। তখন প্রতিদিনের আচরিত গড়পড়তা জীবন প্রণালীর থেকে অতিনাটকীয়তাই, অবদমিত ইচ্ছার পূর্ণতাই তারা উপভোগ করত। আজকের চলচ্চিত্র হয়তো অনেক বেশি বাস্তবের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু কোথায় গেল গল্পের সেই বাঁক নেওয়া, ঘটনার আকস্মিকতা, কাকতালীয়ভাবে হারানো ভাইয়ের মিলন বা আবেগের উত্তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করা। এমনও বলতে শোনা গেছে যে, প্রতিদিনের জীবন তো আমাদের সঙ্গী আমরা অতিকথন ভালোবাসি। জীবন একঘেয়ে, অতিকথন অনিশ্চয়তা ভরা। Glorious uncertainity of life হয়তো তারা বোঝাতে চাইত।

জটিলতাহীনতার যে উল্লেখ অতীত জীবন প্রসঙ্গে এসেছিল সেখানে কিন্তু আমরা চলচ্চিত্রের দর্শক হওয়ার আগে আজকের মতো কখনই এত ছানবিন করতাম না। এত রেটিং, সমালোচকের পছন্দ, সোশ্যাল মিডিয়ার অভিমত, এত কানাকানি ছিল না। অতীতের সিনেমা দেখতে যাওয়া ছিল বাস্তবে এক অবিমিশ্র আনন্দের হাতছানি। সেখানে চলচ্চিত্রের গুণমান মর্যাদা অত কঠিন মানদণ্ডে আগেভাগেই বিচার্য ছিল না। তাই আজকের সিনেমা বহু

ক্ষেত্রেই হয়তো অত্যন্ত চিন্তাপ্রসূত বিনোদন, কিন্তু তার নিজস্ব ম্যাজিকটি অজান্তেই অপহৃত হয়ে গেছে। অতীত চলচ্চিত্রের নির্মাতারা দর্শককে তাদের ছবির অংশীদার করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। চলচ্চিত্রীয় আবেগ যাতে সঠিকভাবে সঞ্চারিত হয়ে দর্শককে একাত্ম করতে পারে তার আয়োজনে কোনও ত্রুটি থাকত না। তাঁরা বুঝিয়ে দিতেন এটি চলতি জীবন নয়, কিছু একটা বিবৃত করা হচ্ছে। সেখানে অতি অভিনয় থাকতে পারে। অভিনেতা একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতেন। একে অনেকে যাত্রা বলে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু এই উপলব্ধি বা চুলচেরা বিচারের দায় তন্নিষ্ঠ দর্শকের ছিল না। সে তো সাংস্কৃতিক বোদ্ধার ভূমিকায় নামেনি। বাস্তবে এই বোদ্ধাশ্রেণী কখনওই নিজের সামাজিক অবস্থান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনও সাদামাটা আবেগমথিত হাসি কান্নায় ভরা চলচ্চিত্রের সঙ্গী হতে পারেনি। তারা হয় নিজেদের আমিত্বকে সরিয়ে সিনেমায় আসতে ব্যর্থ হতো নয়তো তা উদ্দেশপ্রণোদিতভাবেই চাইত না। ছবির বাস্তব অনুষঙ্গ বা দৃশ্যের ওপর তারা এতই গুরুত্ব দিত যে ছবির অন্তর্নিহিত বক্তব্য যা মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয়তার ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তারই বাহক ও অত্যন্ত প্রাচীন তা তাদের উপলব্ধির বাইরে থেকে যেত। এই অবহেলিত দর্শকরাই ভরিয়ে তুলতেন এক পর্দার চলচ্চিত্রালয়গুলি। সেখানেই বন্দি হয়ে আছে অগণন দর্শকের চলচ্চিত্র কুশীলবদের চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গী হয়ে নিজেকে হেলায় হারিয়ে ফেলার অকথিত কাহিনি। তাঁরা দৈনন্দিনতাকে এড়িয়ে সিনেমার হাতে নিজেদের নিশ্চিন্তে সঁপে দিয়েছিলেন। আজকের আমরা অনেক বেশি জানি। আর যত কিছু জেনে ফেলেছি তাকে তো আর ভুলে যেতেও পারি না, তাই সিনেমা এখন আমাদের অধীনে। অতীতের সিনেমা তার দর্শককে পুরোপুরি অধিকার করে নিত। দর্শকের তাতে কোনও আপশোষ ছিল না। সে যৌথভাবে চলচ্চিত্রীয় নৌকার যাত্রী হয়ে যেত। এখনকার আমরা নির্মোহ দর্শক।

অমিতাভ বচ্চন একটি চলচ্চিত্র উৎসবে একবার বলেছিলেন, ‘একটি অন্ধকার পরিসরে এক বিরাট সংখ্যক মানুষ কেউ কাউকে না চিনে পাশাপাশি বসে পর্দায় প্রক্ষিপ্ত একই সুখ-দুঃখের শরিক হয়ে কখনও হাসছেন কখনও কাঁদছেন এই কাজ সফলভাবে করার ক্ষমতা চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোনও শিল্পমাধ্যমেরই নেই।’

প্রজেক্টর ডিভিডি-কে জায়গা করে দিয়ে হারিয়ে গেলেও ঐ ডিভিডিতেই কিন্তু ধরা পড়ে আছে সেই বিস্মৃত সময়। আজকে প্রথমে অভিভাবকের হাত ধরে দেখা, পরে বন্ধুদের সঙ্গে নির্ভেজাল আনন্দে উপভোগ করা বা প্রথম প্রেমিকার সান্নিধ্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম বা পরে অর্ধাঙ্গিনীর সঙ্গসুখে উপভোগ করা চলচ্চিত্রগুলির আবারও মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে ফিরে দেখার। এটি নোবেল বিজয়ী মার্কেসের প্রিয়তম বিষয় Reliving the lost day's এরই আর এক নাম। কত যুগ আগে দেখা চলচ্চিত্রগুলির পুনর্দর্শনে অনর্গল হয়ে যাবে স্মৃতির অবরুদ্ধ দরজা। সুযোগ থাকবে সেই সময়ে নিজের জীবন ও তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আত্মজ, সুহৃদ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের যাপিত জীবনের অনুষঙ্গগুলিও নতুন করে স্মরণে আনার। কিন্তু থাকবে কি প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকার ঘেরা চার দেওয়াল আর যৌথ উপভোগের অনাবিল আনন্দ? না। এক একটি এক-পর্দার ছবিঘরের অবসৃত হওয়া তাই বাঙালির যৌথ স্মৃতির মৃত্যু। এই নিরুদ্দেশ সময়কে জীবনে আবার ক্ষণিকের অতিথি করতে মন তাই সক্রিয় হয়ে ওঠে।

শুরুতে উল্লিখিত কলকাতার বিশেষ বিনোদন ক্ষেত্র ধর্মতলা অঞ্চলের গরিষ্ঠাংশ সতীর্থের মৃত্যু-সাক্ষী নিউ এম্পায়ার, রক্সি, রিগ্যাল, প্যারাডাইস প্রেক্ষাগৃহ আন্তর্জাতিক নাম বহন করে এখনও রয়ে গেছে। ও তল্লাটে গেলে অতীতকে অন্তত একবার ছোঁয়ার অনুভব প্রবীণদের হবেই। রক্সি সিনেমার দিকে তাকালে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আপতকালীন সময়ে ‘হল’ কর্তৃপক্ষ আশ্রয় দিয়েছিলেন মিত্রশক্তির আমেরিকান সেনাদের। ১৯৪৩ সালে যুদ্ধের মধ্যগগনে অশোককুমার অভিনীতি ‘কিসমত’ এখানে চলেছিল ১০৮ সপ্তাহ। অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি— দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং নেতাজী। এসবই নথিভুক্ত আছে। একটু নজর কি দেওয়া যায় না? বিশ্বে এমন সংরক্ষণ-নজির ভুরি ভুরি। আমাদের মুম্বই তো পেরেছে তার অতীতকে ধরে রাখতে। আমরা পারি না?

শুভ দুর্গাপূজার প্রীতি

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

— জনৈক শুভানুধ্যায়ী

মশাল হাতে সিংহপুরুষ

জহর মুখোপাধ্যায়

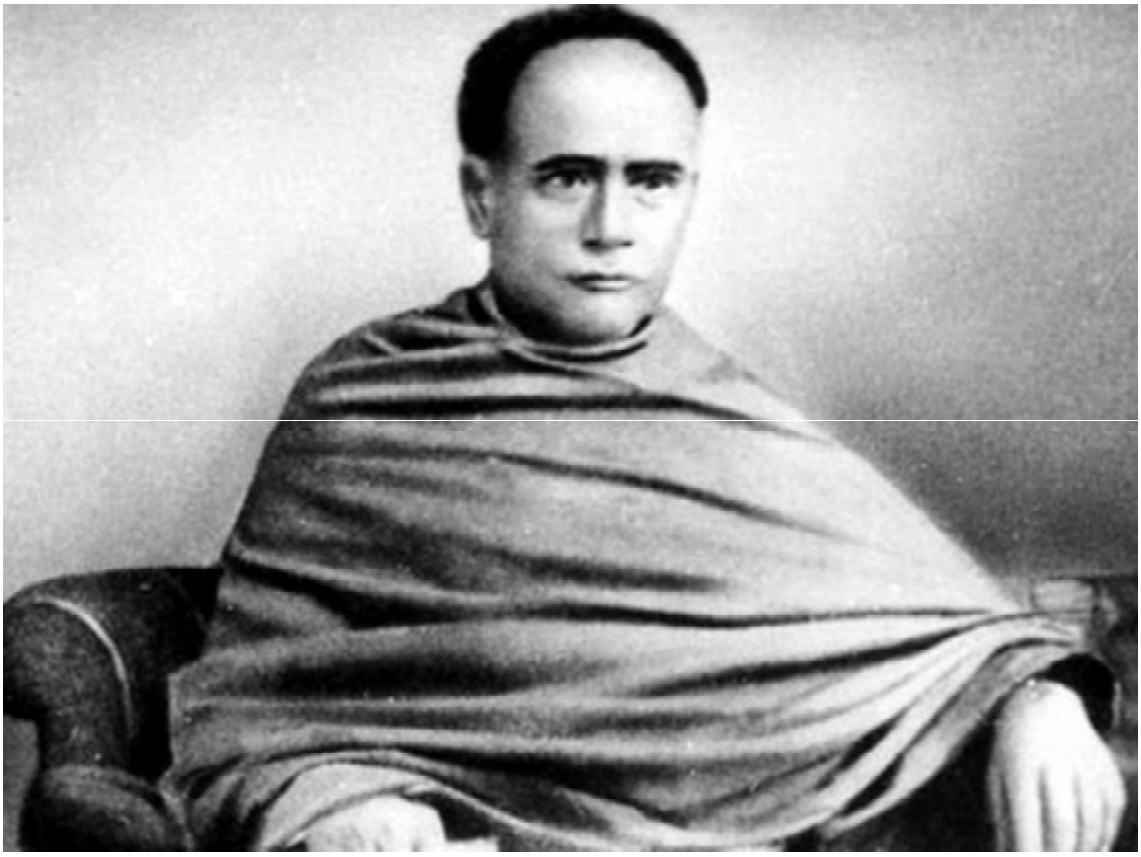

১২৭৯ সালের আষাঢ় মাস। ইংরেজি ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের জুন। কলকাতার উত্তরে একটি বাড়ি। সকাল থেকেই সানাইয়ের মিহি সুর বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আজ যে বিদ্যাসাগরের মেয়ের বিয়ে। মধ্যম কন্যা কুমুদিনীর সঙ্গে চব্বিশ পরগনার রুদ্রপুর নিবাসী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে। ইনি মানভূম-পুরুলিয়ার সরকারি হৌসে সাব রেজিস্ট্রার। এক পরিবারের সঙ্গে আর এক পরিবারের মেয়ের বিয়ে দিয়ে আত্মীয় স্বজনের সীমা বৃদ্ধি করতে চাইলেও বিদ্যাসাগরের মনে শান্তি নেই।

পাঁচ সন্তানের মধ্যে নারায়ণচন্দ্র শুধু জ্যেষ্ঠ নয়, একমাত্র পুত্র। এত বড় আকাশে তারা একটি মাত্র ফুটলেও সূর্যের আলো এসে পড়েনি। অভিমানে ক্ষতবিক্ষত পিতা নানা কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। ভাবছেন, মায়ের তনয় মায়ের তো নয়। আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাড়ির একটি ঘরের জানালার সামনে বসে নিশুতি রাতে লিখে চলেছেন তাঁর ইচ্ছাপত্র বা উইল। চারিদিকে নিস্তব্ধ। ঘুমে অচৈতন্য চরাচর। শুধু জেগে আছেন বিদ্যাসাগর। একমাত্র পুত্রই শুধু তাকে আহত করেনি, সমাজে পুরনো ধ্যানধারণা, নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহে নতুন জোয়ার আনতে গিয়ে তাঁকে বারংবার বাধা দিয়েছে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ। বৈমাত্রেয়র মতো আচরণ করেছে ইংরেজ শাসক। মাটির সন্তানদের কাছ থেকে ছলে-বলে কৌশলে বশ্যতা আদায় করে আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে করুণা। লোভী

জমিদার শ্রেণীর কিছু মোসাহেবি বাবু সম্প্রদায় ফুলেফেঁপে লাল না হলেও কুবেরের স্বপ্ন দেখেছেন। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছিটেফোঁটা দয়াদাক্ষিণ্য কুড়োতে নেমেছেন তাঁর স্বজনেরাও। মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে, এর মধ্যে বিষয় সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারায় নেমেছেন তিনি। জীবন বীক্ষণে দৃষ্টিপাত করেছেন।

১৮৭৫ সালের ৩১ মে এই উইল অথবা ইচ্ছাপত্র রচনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি। বিশুদ্ধ মার্জিত বাঙলা ভাষায় রচিত উইলখানি দেখে কলকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব রেজিস্ট্রার শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ঘোষ চমৎকৃত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের লিপি কুশলতায় মনীষার দীপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। আপন পর নির্বিশেষে দীনদরিদ্র মানুষরা সাগরের মহৎ রূপ দর্শন করেছিলেন।

অর্থের তারতম্য বিচার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বিভক্ত এই উইল। সর্বোচ্চ টাকার অধিকারী ছিলেন পিতৃদেব ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই পিতৃদেবের সহোদর ভ্রাতৃগণ। এইভাবে পঁয়তাল্লিশজনকে নির্দিষ্ট হারে মাসোহারা দেবার নির্দেশ। এই উইলে মহামান্য আদালতের স্বীকৃতি পাওয়ার কিছুদিন আগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়িতে আবার বিয়ে। ১২৮২ সালের ৩০ আষাঢ় অথবা ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই তৃতীয় কন্যা বিনোদিনী দেবীর সঙ্গে সূর্যকুমার অধিকারী গাঁটছড়া বাঁধলেন। নতুন জামাই বিএ পাশ। তার উপর শক্তপোক্ত গড়ন। জহুরির চোখে পড়লে যেমন হয়। শ্বশুর এবং জামাতা মণিকাঞ্চন বলে যাকে। পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে হৃদয়ের শত যোজন দূরে ঠেলে দিয়ে সূর্যবাবুকে পুত্রস্নেহে আরও বেশি করে ঢেলে দিলেন। উইলে সকলের জন্য বিগতিল ধারায় ব্যয়বরাদ্দ ঘোষণা হলেও শুধুমাত্র পঁচিশ নম্বর অনুচ্ছেদটি পড়ে একলাফে চোখ দুটি কপালে উঠে গেল নারায়ণচন্দ্রের। এ তো স্বর্গ থেকে পতন। পিতা-পুত্রের মাঝখানে এমন শক্ত প্রাচীর! পুত্রের কর্তব্যে ত্রুটি সংশোধিত হলো না বলে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন? বুকের ভিতরে প্রবল বেগে ঝড় বয়ে চলেছে। থামার লক্ষণ নেই। বিশ্বাস ভালোবাসা সন্তানের ওপর নির্ভরতা মূল্যবোধের খুঁটিগুলি একে একে মুখ থুবড়ে পড়েছে সেই ঝড়ে। বিদ্যাসাগর নিজের হাতে লিখে চলেছেন—

''আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী। এজন্য ও অন্য অন্য গুরুতর কারণবশত আমি তাহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশত বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং তিনি চতুর্বিশধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।''

এই উইল রচনার পরে বিদ্যাসাগর বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। অনুতাপে দগ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলিতে একের পর এক দুঃখসংবাদ এসে ঘিরে ধরেছে। ১২৭৯ সালের ২৩ মাঘ বা ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি বারাণসী ধামে বিদ্যাসাগরের বড় জামাই গোপালচন্দ্র সমাজপতি কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইনি বিদ্যাসাগরের ভাগ্নে বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাশীতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন প্রাণহীন দেহ নিয়ে। জামাতার মৃত্যুসংবাদ তীরের মতো ছুটে এসে বিদ্যাসাগরের হৃদ্‌পিণ্ডে কোমল স্থানে এমন আঘাত হেনেছিল যে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু শোকাতুরা কন্যার সামনে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে নিজের বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। জামাতা গোপালচন্দ্রকে সন্তানের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। বড় মেয়ে হেমলতার বৈধব্যবেশ দেখে বিদ্যাসাগরের বুক ফেটে যেত। কন্যার একাদশীর দিনে তিনি নিজেও অন্নজল গ্রহণ করতেন না। এমনকী দু-বেলার আহার পর্যন্ত দূরে ঠেলে দিয়ে কন্যার স্নেহে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই ভাবে একদিন কন্যার হাতে সংসারের সর্বময় দায়দায়িত্ব তুলে দিয়ে নীরবে অশ্রুপাতের সময়টুকু মুছে দিয়েছিলেন।

পুত্র নারায়ণচন্দ্রকে বিসর্জনের বার্তায় বাড়ির অন্দরমহলে আগুনের মতো এক ঝলক গরম বাতাস ছড়িয়ে পড়েছিল। জননী দীনময়ী দারুণ মনস্তাপে ভেঙে পড়েছিলেন। পাঁচটি সন্তানকে কোলে পিঠে আগলে রেখে নিঃশব্দে স্বামীর সংসার সামলেছেন। যাঁরা কাছে ছিল কাছে থেকেও নিঃস্বার্থ ত্যাগ জানতে পারেনি কোনওদিনও। ঘর থেকে দু-পা ফেলে বাইরে এসে চোখ দুটি মেলে এই পৃথিবীর এত আলো দেখা হয়নি প্রাণভরে। সদা ব্যস্ত কর্মবীর তেজস্বী দানশীল মানুষটির সামনে দু-দণ্ড বসে মনের কথা উজাড় করে কখনো দিতে পারেননি। কিংবা দুজনায় দুজনেতে মগ্ন হয়ে প্রাণের বীণায় দ্বৈত সংগীতের মীড় খুঁজে পাননি। এমনকী দীনময়ীর প্রতি বিদ্যাসাগরের অমনোযোগিতা কিংবা চেনাজানার পরিসরটুকু ঘরের আড়াল ভেঙে যেতে পারেনি ঘরের বাইরে। পর্দার আড়ালে বড় একা হয়ে নিজের কথা নিজেই শুধু ভেবেছেন। দিন নেই, রাত নেই, এলেমেলো চিন্তারও শেষ নেই। এইভাবে অন্তঃপুরে অন্তরীণ থেকে ব্যর্থতায় হতাশায় ভেঙে পড়েছেন প্রতিমুহূর্তে। ১২৯৫ সালের ৩০ শ্রাবণ বা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ আগস্ট মৃত্যুর কিছুদিন আগে জীবনের বোঝা লাঘব করার উদ্দেশ্যে দীনময়ী কপালে করাঘাত করতে শুরু করেন। বড় মেয়ে হেমলতা ছুটে এসে বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, মা কী বলিতেছেন শুনুন। কপালে করাঘাত আর কিছু নয়, পুত্রের জন্য শুধুমাত্র গর্ভধরিণীর করুণা ভিক্ষা। মৃত্যুদুয়ারে দাঁড়িয়ে দয়িতের সামনে শেষ আর্জি। সেদিন আশ্বাস পেয়ে সতী হাসি মুখে জীবনের কাছে বিদায় জানিয়ে গেলেন।

অস্তাচলের পানে চেয়ে এইভাবে ষোলটি বছর। শেষমুহূর্ত

পর্যন্ত উইলে একটি শব্দ পরিবর্তন করেননি বিদ্যাসাগর। বরং তাঁর উল্টোদিকের ছবিটা পরিষ্কার দেখা যায়। উইলের রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধন-সম্পত্তির সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ, এর জন্য তিনি লিখে যান স্পষ্টভাষায়— 'আমি স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমার সম্পত্তির অন্তিম বিনিয়োগ করিতেছি। এই বিনিয়োগ দ্বারা আমার কৃতবান সমস্ত বিনিয়োগ নিরস্ত হইল। চৌগাছানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ, পথিরানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদনাথ সিংহ, আমার ভাগিনেয় পসপুর নিবাসী শ্রীযুত বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়— এই তিনজনকে আমার অন্তিম বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত করিলাম। তাহারা এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী যাবতীয় কার্যনির্বাহ করিবেন। আমি অবিদ্যমান হইলে আমার সমস্ত সম্পত্তি নিযুক্ত কার্যদর্শীদিগের হস্তে যাইবেক। এক্ষণে আমার যে সকল সম্পত্তি আছে, কার্যদর্শীদিগের অবগতির নিমিত্তে তৎসমুদয়ের বিবৃতি এই বিনিয়োগপত্রের সহিত গ্রথিত হইল।

বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবী।

— (স্বাক্ষর) শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ সাল। ইংরেজি ৩০ মে, ১৮৭৫।

এখানে বলা আবশ্যক, নারায়ণবাবু প্রকৃতপক্ষে পিতার বিষয়-সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত হতে পারেন কিনা, সেই লক্ষ টাকার প্রশ্নের মীমাংসা হবে কিনা, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে নারায়ণচন্দ্র আদালতের আঙিনায় এসে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। পাল্লা ভারী ছিল বর্তমানের দিকে। শেষ রায়ে বিজয়ের হাসি নারায়ণচন্দ্রের মুখে শোভা পেলেও সিংহহীন গুহার সামনে দাঁড়িয়ে কেশর দুলিয়ে গর্জন শুনতে পেলেন স্মৃতির সরণী থেকে। মানুষটি যে আর কেউ নয়, বিদ্যাসাগর। স্মরণে বরণে শিরোপায় পিতৃসত্য। রামায়ণ-মহাভারতের দেশ ভারতবর্ষ। পিতৃপুরুষের পরম্পরা বয়ে চলেছে বংশধারায়। তাদের মহৎ দৃষ্টান্তগুলি পরবর্তী বংশধারায় ভালোমন্দের উপর দিয়ে আলোকপাত করে চলেছে। বাড়ির কর্তার চোখের সামনে থেকে শত যোজন দূরে গেলেও ছেলের মনের গহীনে তাঁরই ছায়াপাত হয়ে চলেছে। তাঁরই একাগ্রতা, দৃঢ়তা, মেধা এবং অপার করুণা পাখির চোখ মনে করে এগিয়ে চলেছেন নারায়ণচন্দ্র। নিজের চেষ্টায় সাব রেজিস্ট্রারের চাকরি জুটিয়ে নিলেন। কাজে যোগদান করেও বীরসিংহের গ্রামের বাড়িতে যেতেন। আবার মাঝেমধ্যে কলকাতায় বাবার কাছে। দিনকয়েক থেকে আবার গ্রামের বাড়িতে। বাবার কাছে থেকেও পিতা-পুত্রের বাক্যালাপ হতো না। শুধু অনুভবে জড়িয়ে থাকতেন। শোণিতে শোণিতে বার্তা বয়ে চলেছে যেখানে, সেই স্বাভাবিক মমতা অথবা অপত্য বড় সহজ পদার্থ নয়। কর্তব্য অনুরোধে ছেলেকে বিসর্জন দিলেও উইলের লেখাগুলি পার হয়ে বারেবারে সে ডেকে চলেছে হৃদয়ে লুকিয়ে থেকে।

এত যে ভীষণ তাঁর মধ্যে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো এক অনাবিল আনন্দের ঘটনা। সত্তর বছর জীবন সফরে বিদ্যাসাগরের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বিধবা বিবাহ। খ্যাতি অখ্যাতি যত হোক, যা হোক তা হোক, ঝড়ঝাপটা অনেক এসেছে ধেয়ে, তার মধ্যে সংকল্পের জ্বলন্ত প্রদীপটাকে দু-হাতে আড়াল দিয়ে আগলে রেখেছেন। এমনকী নিজের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্রকে এক বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে মাইল ফলক তৈরি করেছেন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নবদিগন্তের আলোর স্বপ্নে যাত্রা শুরুতে থমকে গেলেন। বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একজন ছেলেবেলার সহচরী ছিল। সেই সহচরী কোনও প্রতিবেশীর কন্যা। বিদ্যাসাগর মেয়েটিকে বড় ভালোবাসতেন। বালিকাটির বিদ্যাসাগরের বাড়িতে সর্বদা যাতায়াত ছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় ঠাকুরদাসের হাত ধরে যেদিন কলকাতায় পড়তে আসেন, ইত্যবসরে বালিকার বিয়ে হয়ে যায়। খেলাঘর ভেঙে শ্বশুর বাড়ি। স্বামীর ঘরসংসার। তার সরল অপরিণত নরম মনের উপরে মস্ত এক পাথর চাপা দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠানো হলো। বিয়ের কয়েক মাস পরে মেয়েটির সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল। সে এখন একা। সংসার দরিয়ায় ভাসমান খড়কুটোর মতো দিশাহীন। বৈধব্য সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো যথাস্থানে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে এলেন। প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে গিয়ে কুশল খবর সংগ্রহ তাঁর স্বভাব ছিল। এবার তার বাল্যসহচরীর ঘরে প্রবেশ করতেই শুনতে পেল সারাদিন নিরন্ন উপবাস। সেদিন যে একাদশী। শূন্য সিঁথির মধ্যে স্বামী লুকিয়ে থাকেন। তাঁর কথা ভেবে সর্বস্ব কৃচ্ছ্রসাধন। সেদিন কেন যে মেঘ উড়ে এসে ঢেকে দিল

বিদ্যাসাগরের হৃদয় আকাশে। দরবিগলিত চোখে দু-হাত চাপা দিলেন। মনে মনে স্থির করলেন এর একটা বিহিত নিশ্চয়ই করবেন। যত ঝড় উঠুক, বিঘ্ন বাধা আসুক, নীড় ভাঙা আহত এক প্রাণের পাখিদের ঠাঁই দেখাবেন। সেদিন এমন কী আর বয়সে। জীবনপদ্মের কুঁড়ি সম্পূর্ণ প্রস্ফূটিত হয়নি। তবু এক দুর্বার তেজস্বী কিশোরের দুটি চোখ জ্বলে উঠেছিল আধুনিক ভারতবর্ষের স্বপ্নে। জাতীয় সত্তার অনুভবে।

পিতা-মাতার প্রতি তাঁর ভক্তি এবং বিশ্বাস ছিল অগাধ। বলতে গেলে বুকের দুই পাশে দুই হৃদপিণ্ডে স্থান ছিল দুজনের। সেখানে থেকেও বিদ্যাসাগরের মনের আকাশে মেঘ উজাড় করে দিয়েছে ওরা। ভাবীকালের দিকে চেয়ে সঠিক দূরদৃষ্টি ছিল না ঠাকুরদাসের। নারায়ণচন্দ্র লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিলেন না। পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তির আগেই তাঁর বিদ্যাযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্রের দু-ভাই হরচন্দ্র আর হরিশচন্দ্র নিয়তির খোরাক হয়ে কলেরায় মারা যান। পুত্রশোকে কাতর ঠাকুরদাস ছেলের পরমায়ু ছিল না বলে মনকে সান্ত্বনা দিলেও কলকাতায় থেকে ভালো ডাক্তারের অভাব একবারও স্বীকার করলেন না। দেশটা যে সেই মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণায় আটকে রয়েছে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারলেন না। দু-দুটো ছেলে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার আগে ঝরে গেলেও সম্যক উপলব্ধি হলো না ঠাকুরদাসের। অন্ধ আবেগবশত তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। বললেন, নাতিটাকে আর কখনও কলকাতায় পাঠাবেন না। কলকাতায় গেলে যমরাজের রান্নাঘরে ঢুকে যাবে। প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। এমনকী ছেলে ঈশানচন্দ্রকেও বাধা দিলেন। বিদ্যাসাগরের স্ত্রী দীনময়ী দেবীও গ্রামে মাটির ঘরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্নিমেষে চেয়ে থাকতেন একান্ত মানুষটির জন্য।

ঠাকুরদাসের সামনে দাঁড়িয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করেও ভ্রান্ত ধারণার প্রাচীর ভাঙতে পারলেন না। যাকে বলে একরোখা গোঁ। হতাশ বিদ্যাসাগর। নিজের বাড়ি থেকেই সরস্বতীর আসন গুটিয়ে নিলে পরিণামে ভালো হবে না। নারায়ণের বয়স যখন ষোলকলা পূর্ণ হলো বাগদেবী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে দিন থেকে। ফলে পড়াশুনায় 'ন যযৌঃ ন তস্থৌঃ' অবস্থা। গ্রামের পাঠশালা পার হতে নারায়ণ পারল না। পিতামহের অন্ধ স্নেহে এবং মাত্রাতিরিক্ত আবেগে নারায়ণ যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারছে না, এ যাতনা বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারছেন না। আহত পাখির মতো নিজের কাছে ডানা ঝাপটে মরলেও কেউ বুঝল না। জানল না, কী যে মনের ব্যথা। অন্ধকারে ঘুমিয়ে থাকা আপনজনদের ঘুম ভাঙল না। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলি থেকে আলো এসে পৌঁছতে পারল না গ্রামবাংলার মানুষের চোখে। কিন্তু বিদ্যাসাগর যে আলাদা মানুষ। যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়েও ময়দান ছেড়ে যাবার পাত্র নন। সময় বুঝে একদিন নারায়ণকে ঠাকুমা ঠাকুরদার কবল থেকে হাইজ্যাক করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। সোজা এসে ঢুকলেন সারস্বত আঙ্গিনায়। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে বিদ্যালয় বিভাগে ভর্তি করে দিলেন নারায়ণচন্দ্রকে। বীণাপানির চরণ ছুঁয়ে বিদ্যাযাত্রা আরম্ভ হলেও কিছু দূরে গিয়ে যাত্রাভঙ্গ করলেন নারায়ণচন্দ্র নিজে, অস্থির হয়ে। বছর না ঘুরতে পড়াশুনায় অমনোযোগী হয়ে উঠলেন নারায়ণচন্দ্র। কিন্তু বাবা যে অতন্দ্র প্রহরীর মতো হলেও মনোবিহঙ্গের পায়ে বেড়ি দেবেন কীভাবে। নারায়ণচন্দ্র একদিন পালিয়ে গেলেন সেই গ্রামের বাড়িতে।

নারায়ণচন্দ্র পড়াশুনায় ইতি টানলেও বাংলাদেশের নরনারায়ণের সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর আরও বড় এক রণাঙ্গনে দাঁড়ালেন এসে। কলকাতায় মেট্রোপলিটান স্কুল এক মহৎ কীর্তি বিদ্যাসাগরের। মশাল হাতে নিয়ে অন্ধকার ছিঁড়ে ফেড়ে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলেন।

ইতিহাস রচনায়ও উপকরণ থাকে। যে কোনও মহৎ সৃষ্টির উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে অনেক অজানা তথ্য জানা যায়। ১২৭১ সালে অথবা ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের কিছুদিন আগে কতিপয় বঙ্গসন্তানের উদ্যোগে গড়ে ওঠে এক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট। এর উদ্দেশ্য হাতে-কলমে কাজ শিক্ষা করে যুবকদের আত্মনির্ভর করা। কিন্তু সূচনাতেই নানা মুনির মত পার্থক্যে ট্রেনিং স্কুল মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ইঁট-কাঠ-বাঁশের বেড়ার বেহাল চিতাভস্মের উপর দিয়ে বিদ্যাসাগরের বিজয় কেতন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের জন্ম হয়।

শৈশবে কার না হাবাগোবা অবস্থা থাকে। ছোট্ট একটা বিজের মধ্যেই তো মহীরূহ ঘুমিয়ে থাকে। মেট্রোপলিটন স্কুলও সেদিন আঁতুড় ঘর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভার একা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে এসে পড়ে। এজন্য তাঁকে অঢেল অর্থ এবং সামর্থ ঢেলে দিতে হয়েছিল। তাঁর উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ মানুষের ঢল কোথাও যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেই উদ্দেশে বিদ্যালয়ের মাইনে একেবারে উঁচু শ্রেণী থেকে নিম্নধাপ পর্যন্ত তিন টাকা নির্দিষ্ট হলেও কাঁচা পয়সা হাতে কোথায়? পাশাপাশি বিনা মাইনেতেও পড়াতে হতো। তা বলে কি পড়াশুনা অধ্যবসায় শিথিলতা, বরদাস্ত নয় একেবারে। নিজে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শিক্ষা বাগিচায় যতটা নতুন নতুন ফুল ফোটানো যায়, একেবারে যারা অবুঝ, কিছু বোঝে না সেই কুঁড়িগুলিকে প্রস্ফূটিত করে নির্যাস বিলিয়ে দিলেন সমাজের অভ্যন্তরে। অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে বসে সারাক্ষণ নির্নিমেষে চেয়ে শুনতেন পড়ুয়াদের প্রাণের কলতান। পড়াশুনার সঙ্গে শৃঙ্খলা, পরস্পর সহমর্মিতা, সর্বোপরি দেশ এবং জাতির প্রতি আগ্রহ — এমন অনন্যপূর্ব শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে মেট্রোপলিটন একটা সম্ভ্রান্ত

মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউশন (মেন)

ইংরেজি বিদ্যালয় হিসাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর ভগীরথের মতো আগে আগে যেতেন। অনেক বাধাবিঘ্নের প্রাচীর ভেঙে এগিয়ে যেতেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১২৭১ সালের ১ চৈত্র অথবা ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মার্চ স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান। বিদ্যার্থীদের সাফল্যের নিরিখে পারিতোষিক প্রদান। সভায় বড়লাট লরেন্স এবং তাঁর পত্নী অলংকৃত হয়ে বসেছিলেন, হঠাৎ সেখানে খর্বাকৃতি ধুতি চাদরে বিভূষিত এক ব্যক্তির প্রবেশ। শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকে সম্মান জানালেন। মানুষটি যে স্বয়ং বিদ্যাসাগর। অসংখ্য তারার মধ্যে কোনটা যে ধ্রুবতারা সভায় উপস্থিত সকলে ঠিক চিনতে পেরেছেন। বাবু কেশব সেন, বাবু এম এম ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে বিদ্যাসাগর মেধাবী শিক্ষার্থিনী একজনের গলায় সোনার হার পরিয়ে দিয়ে লেখাপড়ায় উৎসাহ দান করেছিলেন।

সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে তিনি করুণায় বিগলিত হয়ে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নারায়ণের প্রাণের দেবতার সেবায় পাশে কাউকে না দেখলেও ঝড়ের পাখিকে তিনি আগলে ধরতেন বুকের কাছে। ১২৭৩ সালে বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ ইংরেজি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন, দেশব্যাপী এক দুর্ভিক্ষে আতঙ্কিত মানুষ। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া স্পর্শ করতে পারেনি ক্ষমতার অলিন্দে দণ্ডায়মান সাহেবদের। ঝড়ে যত বক মরে ফকিরের কেরামতি ততো বাড়ে। বিদেশি শাসকেরা সেই দুঃসময়ে উদাসীন থাকায় কত লোক অন্নাভাবে লতাপাতা কচুসেদ্ধ খেয়ে মৃত্যুর দুয়ারে এসে লুটিয়ে পড়ে আছে। ছেলে-মেয়েদের ফেলে রেখে কত মা জঠরজ্বালায় উন্মাদের মতো শহরের দিকে ছুটে চলেছে। পথে অনেকেই জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। মৃত্যুর মিছিল ধনী মানুষের বুকের পাথর ভাঙতে না পারলেও সমব্যথী মানুষ মাত্রেই চমকে উঠেছিলেন। হায় হায় করেছিলেন এত মানুষের মৃত্যু দেখে। প্রথমত বিদ্যাসাগর মহাশয় দারুণ এই দুর্ভিক্ষের খবর পেয়েছিলেন একটু দেরিতেই। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একজন সংবাদদাতা কাতর কণ্ঠে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আবেদন করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই দুঃসংবাদ গ্রাম থেকেও জানতে পারেন। করুণার প্রতিমূর্তি তখন কি আর স্থির থাকতে পারেন? নিরন্নের মুখে অন্ন তুলে দিতে বিভিন্ন স্থানে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করলেন। বীরসিংহ গ্রামে ভগবতীদেবীর উদ্যোগে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা। এইভাবে রোজ পাঁচ থেকে ছশো লোকের উদরপূর্তি। ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করে অভুক্ত মানুষজনকে অন্নদান। এমনকী দুঃসহ ভয়ে আতঙ্কে স্বামী সন্তান ফেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে যারা তাদের ফিরিয়ে এনে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বহন করতেন বিদ্যাসাগর। আসন্ন সন্তানসম্ভবা নারীদেরও ব্যবস্থা করতেন। এ লড়াইয়ে তিনি পিছু হটতে জানতেন না। এমনকী এমন স্বপ্ন কখনও দেখতেন না যে এ লড়াইয়ে তিনি ময়দানে ধরাশায়ী হয়ে রয়েছেন। দাঁতে দাঁত চেপে মাথা তুলে আকাশের দিকে সগর্বে চেয়ে বলেছেন— এ লড়াই জিততে হবে। অন্নহীন মানুষের বুকের ভিতর থেকে আতঙ্কের মেঘ সরিয়ে দিতে হবে যে কোনও প্রকারে।

এত ব্যস্ততার মধ্যেও কলম থেমে নেই। সম্পূর্ণ নিজের

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090
9748978406

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

উদ্যোগে একটা প্রেস এবং বুক ডিপোজিটরি গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে গেলে পাওয়া যাবে অরূপরতন। আলমারির তাকে তাকে বইয়ের তথ্য ভাণ্ডার। বিদ্যাসাগর যার নামকরণ করেছেন সংস্কৃত মুদ্রণ যন্ত্র। পাশাপাশি বিনিদ্র রজনী ধরে লিখে চলেছেন। কার্যোপলক্ষ্যে বর্ধমানে গিয়েও নীরবে নিভৃতে বসে লেখায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। সেক্সপিয়রের 'কমিডি অব এরারস্' অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস লিখে ফেলেছেন। বিদেশি ভাব ও ভাষাকে তিনি কেমন করে বঙ্গীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত করেছেন। ফলে ভ্রান্তিবিলাস একখানি উচ্চাঙ্গের বাংলা উপন্যাস হিসেবে সমকালের আবেদনে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ। উত্তরচরিত ও অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক দুটি প্রকাশ করেন। বই দুখানির সারাংশ লেখা হয়েছিল। বাংলা ভাষায় লেখা উপক্রমণিকাটুকু পাঠকের কাছে উপাদেয়। বিদ্যাসাগরের কলম থেকে মধুর কোমল বাক্য নির্যাস। এর পরও বিরাম নেই। শিশুপাল বধ, কাদম্বরী, কিরাতার্জুনীয়, রঘুবংশ, একের পর এক বই প্রকাশ করে সাহিত্য বাগিচায় নতুন নতুন কুঁড়ি ফুটিয়ে চলেছেন। যার নির্যাস মহাকালের কালিমা মুছে দিয়ে অমলিন হয়ে আছে এই সময়েও।

এইসব গ্রন্থের মুদ্রণ যন্ত্র বা সংস্কৃত বুক ডিপোজিটরি কেন্দ্রটি বিদ্যাসাগর গড়ে তুলেছিলেন অনেক স্বপ্ন নিয়ে। অনেক শ্রম-মূলধন এবং ঘাম নিংড়ে দিয়ে যে সংস্থানটি দাঁড়িয়েছিল একদিন সেখানেই ফাটল দেখা গেল। ১২৭৬ সালের ২৫ শ্রাবণ অথবা ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ৯ আগস্ট বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণবাবুর কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে এলেন। মাত্র চার হাজার টাকায় সংস্কৃত প্রেসের সিংহভাগ বিক্রি করে দেবেন। অবশিষ্ট অংশটাও কালীচরণ ঘোষকে একই মূল্যে দিয়ে দেবেন। এই ছাপাখানার খ্যাতি এবং শ্রীবৃদ্ধি মানুষের চোখের গভীরে লুকিয়ে থাকলেও বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনী শক্তিও যে প্রকাশিত হয়েছিল। অক্ষর যোজনার এমন সুবিধা তৈরি করে দিয়েছিলেন যার নাম হয়েছিল 'বিদ্যাসাগর সার্ট।'

রাজকৃষ্ণবাবুর মুখেই শোনা গেছে, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পাওনা টাকার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা দেওয়ার পরিণামে ছাপাখানার অংশ বিক্রি করে বিদ্যাসাগর আত্মসম্মান রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে ঘরে এবং বাইরে অসংখ্য অজস্র মানুষের বারংবার আঘাতে নিঃশব্দে নীরবে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ যেভাবে শুরু হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে জীবনপদ্মের পাঁপড়িগুলিকে অসীম আলোর দিকে বিদ্যাসাগর মেলে ধরেছিলেন। অভিমানে ক্ষতবিক্ষত হয়েও চারত্রিক গুণাবলিকে রক্ষা করেছিলেন অরূপরতনের মতো।

অবিরত অপূর্ণ মানুষ। জীবনযুদ্ধে অতন্দ্র সাহসে জেগে থেকে চেয়ে দেখার মতো প্রক্রিয়ার অভাবে বহু মানুষ যে সমাজে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারছে না। এমনকী বাঙালি জাতিসত্তার প্রয়োজনে সামনে আসতে পারছে না এই অভিমানে বিদ্যাসাগরের অন্তরে গভীর অনুভব থেকে আগুনের ঝলক নিঃশব্দে উৎসারিত হয়ে উঠত।

ছেলে বিধবা বিয়ে করলেও এই বিধবা বিয়ে নিয়ে কত কাণ্ড। বিদ্যাসাগরের নিজের গ্রামেই অনুষ্ঠেয় একটি বিধবা মেয়ের বিয়ে তার মহানুভব এবং উদার ভাবধারায় দারুণ আঘাত হেনেছিল। ১৮৬৯ সাল। ক্ষীরপাই নিবাসী মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেঁচকাপুর বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত কাশীগঞ্জ গ্রামের মনোমোহিনী নামে অপরূপা এক ব্রাহ্মণ বিধবাকে বিয়ে করতে উদ্যোগী হলেন। সেই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। কিছুদিন আগে ঠাকুরদাস কাশী গিয়েছেন। বাবার অবর্তমানে বাড়ির কর্তা বলতে বড় ছেলেটি। মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই গ্রামের হালদার পরিবারের ভিক্ষাপুত্র। হালদারবাবুরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করলেন, এ বিয়ে যাতে না হয়। সব কথা শুনে বিদ্যাসাগর তাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন, এ বিয়ে কোনওভাবেই হবে না। নিজে বিধবা বিবাহের ভগীরথ হয়েও কেন যে বাধা দিতে সম্মত হলেন এ রহস্য জানা যায় না। মনোমোহিনী এবং তাঁর মাকে নিজেদের গ্রামে ফিরে যেতে বললেন বিদ্যাসাগর।

সেদিন বর্ষাকাল। মেঘমন্দ্রিত আকাশে একেবেঁকে বিজুরি ছুটছে। চমকে উঠছে মানুষ ভয়ে অসলতায় দরজা বন্ধ করে ঘুমে অচেতন হয়েছে গৃহবাসী। কিন্তু নিশুতি রাতে বিদ্যাসাগরের ঘুম ভেঙে গেল। কান পেতে শুনলেন প্রতিবেশী কারও বাড়ি থেকে শঙ্খ আর উলুধ্বনি ভেসে আসছে। বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে মেয়েদের তাজা ফুসফুসের হাসি আর কররোল শোনা যাচ্ছে। ভোর না হতে প্রতিবেশী গোপীনাথ সিংহের মুখে শুনলেন মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় আর মনোমোহিনীর চার হাত এক হয়ে গেছে।

এ ঘটনা রূপকথার মতো শোনালেও বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও জানতে পারলেন এর নেপথ্যে ঘুঁটি সাজিয়েছেন মধ্যমভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন এবং পুত্র নারায়ণচন্দ্র। এমনকী মা ভগবতী দেবী এবং দীনময়ী দেবীও যে এই ঘটনা চাটনির মতো মধুরেন সমাপয়েৎ করেছিলেন— সে বিষয়েও নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন তিনি।

পরদিন ভোর হলো। বিদ্যাসাগর সবাইকে ডেকে বললেন, নিদ্রিত আছ যারা জেগে ওঠো। আমার কথা শোনো। আমি বীরসিংহ গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। মনপাখি উড়াল দিয়েছে। আর হেথা নয়। কথা দিয়েও কথা রাখতে পারলাম না আমি। এ লজ্জা শুধু আমার। মনোবেদনার কেউ নেই। ফিরব না। ফিরে আসবো না কোনওদিন।

বিদ্যাসাগর ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। পরনে আটহাতি

ধুতি। গায়ে আড়াআড়ি ভাঁজ করা চাদর। পায়ে চটি। দুহাতে দুটি ব্যাগ। লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে চলেছেন। পিছু পিছু মা-ভাই-স্ত্রী গ্রামবাসী অনেকেই। কারও কথা শুনলেন না। জননী এবং জন্মভূমি সবথেকে প্রিয় বিদ্যাসাগরের কাছে। গ্রামের স্কুল বাড়ি ঘরে তিনি কোথায় নেই। সব কিছু পিছে রেখে তিনি এগিয়ে গেলেন। শুধু স্মৃতিটাই চলার পথে সঙ্গী হয়ে রইল। এ ঘটনার পরেও বাইশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। গ্রামে ফিরে আসনেনি। সামনে আরও বড় কর্মক্ষেত্র। অন্বেষার দৌড় শুরু করেছেন। রেসের ঘোড়া কোনোদিন পেছনের দিকে চেয়ে দেখে না। অপস্রিয়মাণ পথ মুখ লুকায় পায়ের নীচে দিয়ে। টগবগে গতিপথই যার প্রাণশক্তি।

কলকাতায় ফিরে এসে বিদ্যাসাগর একটি খবর পেলেন। ছেলে উপযুক্ত হলে ঘর এবং ঘরনি প্রয়োজন হয় দুটোরই। ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ অথবা ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার, পুত্র নারায়ণবাবু বিধবা বিবাহ করেন। পাত্রী শ্রীমতী ভবসুন্দরী। বাবার নাম শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। নিবাস কৃষ্ণনগর। বয়স তেরো বছর। কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার আগেই বর্ণ-গন্ধ স্বাদে অনাঘ্রাত মেয়েটি বাপের বাড়িতে ফিরে এসেছে বিধবা হয়ে। খবর শুনে নারায়ণবাবু স্বয়ং উপস্থিত পাণিপ্রার্থী হয়ে। এই বিয়ের আগে নারায়ণবাবু বাবাকে এইভাবে বলেছেন— 'আমার এমন কোনও গুণ নাই যে আপনার মুখ উজ্জ্বল করিব, তবে আপনার জীবনের মহৎ ব্রত বালবিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া বালবিধবার ভীষণ বৈধব্যযন্ত্রণা দূর করা। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্যায়ত্ত। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে আমার জীবন ধন্য হইবে, আর তাহা হইলে বোধহয় আপনার সদর্ভিপ্রায়ের বিপক্ষবাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিব না।'

মেয়েটির মা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে বীরসিংহ গ্রামে উপস্থিত। সেদিন ভোরের বেলা। ভবসুন্দরীর মুখে ভোরের প্রথম আলো দেখে সেই যে নারায়ণের চোখের গভীরে ডুবে গিয়েছিলেন উঠতে পারলেন না আর। নারায়ণবাবুর পিতৃব্য বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সামনে পুনর্বিবাহ দেবার প্রস্তাব পাড়েন। কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়েটির মায়ের চোখের জলের কথা না ভেবে ভোরের আলোর কথা ভেবে নারায়ণবাবু বিয়ে করতে রাজি হলেন। একটি বিধবা মেয়েকে নিয়ে এমন স্বপ্ন আগে কখনও দেখেনি পাত্র নিজেও। খবরটা বিদ্যাসাগরের কাছে যেতেই কোনও বিরূপ লক্ষণ প্রকাশ পেল না। বরং বাড়ির আর সবাই অন্যমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু ততক্ষণে মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে। বরং খুশি হয়ে বিদ্যাসাগর ছেলে এবং বৌমাকে কলকাতায় এনে ঘটা করে বিয়ে দিতে চাইলেন। মৃজাপুর নিবাসী ডিভিসনাল কালেক্টর কালীচরণ ঘোষের বাড়িতে এই শুভ বিবাহ সম্পন্ন হলো। বিদ্যাসাগরের চরিত্রে এ এক বিচিত্র ঘটনা। দু-পায়ে আলতা রাঙা, কপালে সদ্য এয়োতির জ্বলজ্বলে আবেদন। বেনারসীর আচ্ছাদনে মোড়া সলজ্জা ভবসুন্দরী শ্বশুরবাড়িতে এলে তেমন সাড়া পড়ল না। কেউ উলুধ্বনি দিয়ে নববধূর পথ নব আনন্দে ভরিয়ে দিলেন না। কেউ বাজায়নি শাঁখ। নারায়ণের মা-ঠাকুমা কাকা সরে গেছেন অনুষ্ঠান থেকে। শুধুমাত্র তারানাথ তর্কবাচস্পতির স্ত্রী নববধূকে বরণ করে ঘরে তুললেন। বিদ্যাসাগর আনন্দ পেলেন। বিধবা বিবাহ নিয়ে যে বৃহৎ রণাঙ্গনে পা রেখে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন পাশে সহযোদ্ধা নারায়ণকে দেখে খুশি হলেন। অথচ তখনও তিনি জানতেন না এই একমাত্র ছেলেকেই দু-চোখের সীমানা থেকে দূরে ঠেলে দিতে বাধ্য হবেন।

যারা কাছে ছিল তারা চলে গেলে সংসারে প্রধান মানুষটিও কি শান্তিতে দিনপাত করতে পারেন? মাত্র কিছুদিন আগে শিক্ষা বিভাগের কেষ্ট-বিষ্টুদের বিরুদ্ধে নিজের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। ১২৬৪ সালে অথবা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হেলিডে সাহেবের আদেশে অনেক জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় তৈরি করেন। হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার স্কুল ইন্সপেক্টর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রামগুলিতে লেখাপড়া শিক্ষায় বিশেষভাবে দৃষ্টি দিলেন। বাঙালি সমাজের গভীরে ঘুরঘুটে অন্ধকারে শিক্ষা এবং জীবনযাপনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো উদার হাতে ঢেলে দিতে চেয়েছেন। ঠিক তখনই অনিবার্য সংঘাত। বীরসিংহের সিংহপুরুষটি কেশর দুলিয়ে জেগে উঠেছেন স্ব-বিক্রমে। আত্মবিশ্বাস এবং চেতনায় টইটম্বুর হয়ে তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের বিরুদ্ধে ছোটলাট বাহাদুরের কাছে অভিযোগের প্রমাণপত্র দাখিল করেন। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাপনার শীর্ষে নৈবেদ্যের মাথায় আতার টুকরোর মতো বসে অআছেন যিনি বৈমাত্রেয় আচরণে সিদ্ধ। তিনি কৌশলে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তার সঙ্গে সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির বন্ধন অটুট রেখে বিদ্যাসাগরকে কাজ করার পরামর্শ দিলেন। স্বজাতি এবং শাসনের প্রয়োজনে সাহেবদের অসাধ্য এমন কোনও কাজ নেই। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় স্বয়ং ছোটলাট সাহেবও যে জল ঢেলে দিলেন বুঝতে পেরে রাগে দুঃখে অভিমানে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এবং স্কুল দপ্তরের ইন্সপেক্টর পদ ছেড়ে দিয়ে ঝাঁপ দিলেন এক অনিশ্চিত উত্তাল জীবন দরিয়ায়। যশ, অর্থ প্রতিষ্ঠার বৃহৎ সিংহাসন থেকে নেমে এসে মিশে গেলেন হাহাকার দীর্ণ দুঃখ, দুর্দশা সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে। আরও বড় লড়াইয়ের জমিতে পা রেখে চেয়ে দেখলেন আকাশের দিকে। বস্তুত ফাঁকা বন্ধুর ময়দানের উপর দিয়ে শীতল হাওয়া দৌড়ে এসে, মেঘ উড়ে এসে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিষণ্ণ কাহিনি লেখা হলো সেদিন থেকেই।

১২৭৬ সালের ১০ ফাল্গুন অথবা ১৮৭০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি, রবিবার। বেলা তিনটেয় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো

ঘটনা। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন থেকে বিদায় নিলেন। যে বন্ধুর কাছে বিদ্যাসাগর মহাশয় তোতাপাখির মতো ইংরেজি শিখেছেন, পরে পারদর্শিতা লাভ করেছেন। শতগুণে বিকশিত দুর্গাচরণ, চরণচিহ্ন এঁকে রেখেছেন সমাজের অগণন মানুষের কাছে। তাঁর উদার হৃদয়ের নির্যাসে আপ্লুত হয়ে কখন যে চিকিৎসা বিদ্যাতেও বিদ্যাসাগর পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, শত শত আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দু-হাত বাড়িয়ে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ডাক্তার নীলমাধব মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। ১২৭৭ সালে বিদ্যাসাগরের আর এক পরম অকৃত্রিম সুহৃদ, বর্ধমানের মহারাজ প্রতাপচন্দ্র লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত হলেন। একে একে নিভেছে দেউটি। আর এক বিখ্যাত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বাঙালি জাতির সামনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের জন্য জীবনপাত করে চলেছেন। বিদ্যাসাগর স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে হাজার টাকা দিলেন। বাঙালি সমাজে সভা সমিতিতে দান করলেন, বিদ্যাচর্চা এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অর্থ ঢেলে দিলেন। এইভাবে সকাল সন্ধ্যা শত কাজের মধ্যে দিয়ে কখন জীবন সূর্য অস্তাচলের পানে ঢলে পড়েছে খেয়াল ছিল না। শরীরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারটুকুও বেশ কমে গিয়েছে। তা হলেও মনকে জাগিয়ে রেখেছেন। চেতনাকে ঘুম পাড়াতে পারেননি।

১৮৬৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর, রবিবার। এক বিদেশিনী শিক্ষানুরাগী মিস মেরি কার্পেন্টার, বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতীয় স্ত্রী লোকেদের লেখাপড়া শিখিয়ে নতুন দিনের আলো দেখাবেন। ব্রিস্টেলে এর পিতা পাদরি কারপেন্টার সাহেবের বাড়িতে রাজা রামমোহনের মৃত্যু হয়। পদ্মপাতায় জল যেমন। কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মারা গেলেন। শুধু শ্মশান বন্ধুর অধিকারটুকু দিয়ে গিয়েছিলেন রামমোহন। সেই সূত্র ধরে কলকাতায় এসে মিস মেরি কার্পেন্টার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে উত্তরপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাত্রা করলেন। সেই সময়ের শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অ্যাটকিনসন সাহেব এবং স্কুল ইন্সপেক্টর উড্রোসাহেবও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শন করে ফেরার পথ ধরলেন। কিন্তু ওদের পিছু পিছু আর একজন। সে কেবল কাছে ডাকে। বালি স্টেশনের কাছে এসে বিদ্যাসাগরের গাড়ি হঠাৎ উল্টে গিয়ে ধাক্কা মারে এক গাছের গুঁড়িতে। হতচকিত হয়ে ছিটকে পড়ে প্রচণ্ড আঘাতে বিদ্যাসাগর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তাঁর যকৃতে দারুণ চোট লেগেছিল। মিস কার্পেন্টার হাহাকার শব্দে তৎক্ষণাৎ বিদ্যাসাগরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অস্থিরভাবে চারপাশে দেখলেন। চারদিক থেকে লোক ছুটে এসেছে। মিস কার্পেন্টার পথের মধ্যে বসে বুকের কাছে বিদ্যাসাগরকে টেনে নিলেন। আহত এক পরোপকারী ব্যক্তিকে কোমল পরশ দিয়ে সংগোপনে অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলেয়ে দিলেন। নিজের রুমাল ভিজিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে সমবেদনায় হৃদয় ঢেলে দিলেন। বিদ্যাসাগর আচ্ছন্নতার মধ্যেও চোখ দুটি মেলে একবার দেখে আবার ডুবে গেলেন অন্ধকারে। অনেক কষ্টে কলকাতায় কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতে নিয়ে এসে ডা: মহেন্দ্রলাল সরকারকে খবর দেওয়া হলো। যথাসময়ে রোগী দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, বিদ্যাসাগরের লিভারে প্রচণ্ড চোট লেগেছে এবং রক্তক্ষরণ হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর শুনে হিতৈষী বন্ধুবান্ধবেরা ছুটে তাঁকে দেখতে এলেন। সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে চেনা-অচেনা মানুষের ভিড়ে ভরে গেল। দীর্ঘদিনের চিকিৎসায় কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু যে মারণ রোগে জীবন থেকে বিদায় নিয়ে চিরতরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন, সেই কালধ্বনি পিছু নিয়ে এসেছে এই ঘটনা থেকেই। বলতে গেলে এখান থেকেই মৃত্যুবীজ নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধে ছিল শরীরের মধ্যে। ভীমবলে বলীয়ান হয়ে যিনি এগিয়ে যেতেন অসহায় মানুষের দুঃখ মোচনে তাঁর শরীরের সমস্ত রোশনি নিভতে শুরু করল। প্রায় সময়ে মাথা ব্যথা। বদ হজম, পেটের রোগ। খাদ্যে অরুচি নানা উপসর্গ। সমস্ত রকম অসুস্থতাকে ছাপিয়ে একদিন উঠে দাঁড়ালেন বিছানা থেকে। ভীমবলে বলীয়ান বিদ্যাসাগর এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে হাওয়া বদলের তাগিদে ফরাসডাঙ্গা, বর্ধমান কানপুর নানা জায়গায় ঘুরে ফিরে এলেন সেই কলকাতায়। যেখানে হৃদয় বাঁধা পড়ে আছে তিলত্তমার প্রেমে।

১২৮৪ সাল বা ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্বশেষ কন্যা শরৎকুমারীর বিয়ের ব্যবস্থা হয়। পাত্র কার্তিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে হোমযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিয়ের পরে মেয়ে-জামাই বাদুড়বাগানের বাড়িতেই থাকতেন।

শরীর যে আর কর্মক্ষমতা ধারণে অক্ষম বুঝতে পেরেছেন। মাতৃশোক, পিতৃশোক, প্রিয় জামাতার শেষ যাত্রা, প্রিয়তমা পত্নী দীনময়ীর দিন শেষ— একের পর এক মৃত্যু মিছিল দেখে দুর্বার তেজস্বী পুরুষ শোণিতশূন্য চলচ্ছক্তিহীন হয়ে নিঃসঙ্গতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আসন্ন গোধূলির বিষণ্ণতা কেমন দিনের আলো নিভিয়ে দিতে শুরু করেছে হয়তো উপলব্ধি করেছেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে যে মহালগ্ন ফেরাবে কেমনে। শেষ মুহূর্তে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার সলজার সাহেব রোগশয্যায় বিদ্যাসাগরকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন। গভীর শোকচ্ছায়ায় স্তব্ধতা নেমে এলো। ২৯ জুলাই ১৮৯১, রাত্রি এগারোটার পরে করুণার সাগর বিদ্যাসাগরের জীবননাট্যের যবনিকা নেমে এলো। ▮

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

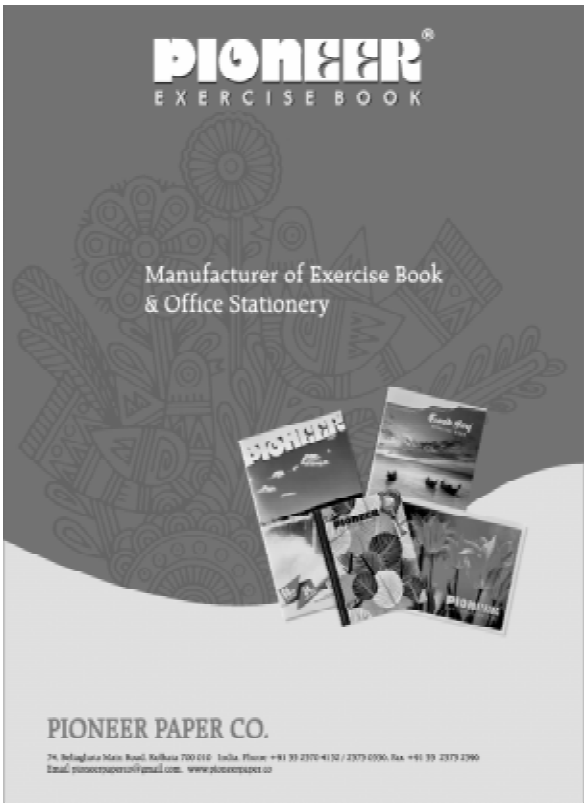

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

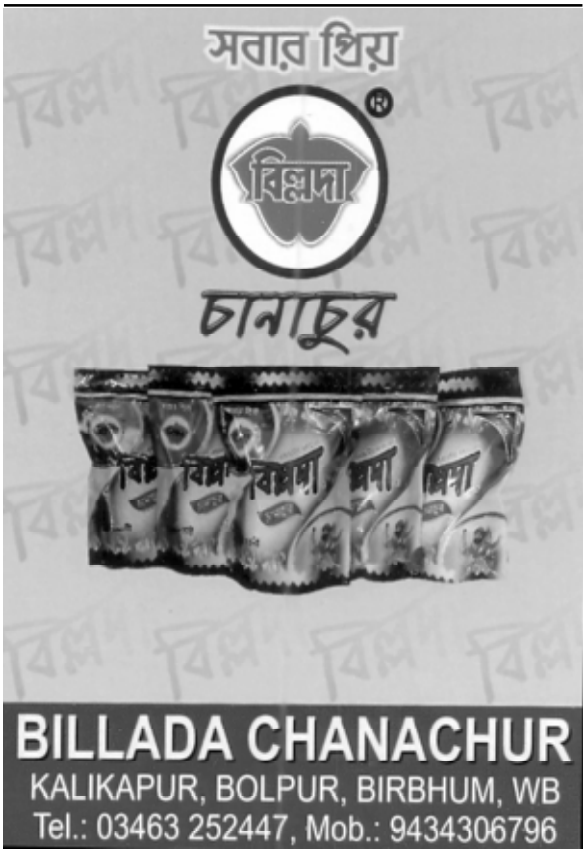

রাজনীতিতে ভক্তি, ভীতি ও ভ্রষ্টাচার : গণতন্ত্রের অন্তরায়

ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

জাতপাত, ধর্মীয় বিভেদ ও আঞ্চলিকতাবাদের প্রসার ভারতীয় রাজনীতি ও সমাজজীবনের উপর বিভেদপন্থী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ দুজনেই জাতীয় বিকাশের জন্য দুটি মূল সূত্র চিহ্নিত করেছেন। একটি হলো আত্মশক্তি ও সংগ্রামী চেতনা, আর অন্যটি হলো সাধারণ মানুষের মানোন্নয়ন। অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষকে উন্নয়নের পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। অন্যদিকে স্বামীজী বরাভয় মন্ত্রে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন। স্বামীজী বলেছিলেন, 'কোনও কিছুতেই ভয় পাইও না। যে মুহূর্তে তোমাদের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্তেই তোমরা শক্তিহীন।'

উনিশ শতকের শেষ দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দুর্বলতা অনুসন্ধান করে ভক্তি ও দাসত্ববোধকে কশাঘাত করেছিলেন। তিনি বিত্তবান ও বিত্তহীন ভারতীয় সমাজের চরিত্রগত বিভেদ ও বৈষম্য তুলে ধরেছিলেন। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি এই বৈষম্য অনবদ্য ভাষায় শ্লেষের সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্গদেশের কৃষক শীর্ষক রচনায় ভূস্বামী সম্প্রদায়ের শোষণের কথা বলতে গিয়ে মানুষ মানুষের মাংস ভক্ষণের কথা মন্তব্য করেছেন। আর সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কীভাবে ইংরেজ শাসকদের প্রতি আনুগত্যবোধের জালে আবদ্ধ ছিলেন তার চিত্তাকর্ষক বর্ণনা মেলে 'ইংরাজ স্তোত্র' নামক লেখায়। রায়বাহাদুর, কাউন্সিলার হওয়ার জন্য বিত্তবান মানুষেরা ইংরেজ প্রভুর কাছে আকুতি মিনতি করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসীকে ইংরেজের প্রতি দাস্যভাব ত্যাগ করে 'বৃষসুলভ' আচরণের নির্দেশ দেন। আর তাঁর লেখা 'বন্দে মাতরম্' সংগীত জাতীয় সংগ্রামের রণধ্বনিতে পরিণত হলো।

ড. বি আর আম্বেদকর

এরপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা পেল। তিন বছর ধরে গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য ও শাসনবিধি রচনায় ব্যস্ত রইল। অবশেষে ভারত গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত হলো। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রে ও রাজ্যে গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও পরিবেশ। তিনটি ব্যাধি ভারতীয় সমাজে ও জনমানসে প্রবলভাবে সংক্রমিত হয়েছে। এগুলি হলো— ভক্তিবাদ, ভয়ভীতি আর দাসত্ববোধ। স্বাধীনতার পূর্বেই জাতীয় আন্দোলনের সময় এই সব নেতিবাচক প্রবণতার স্ফুরণ ঘটে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড: বি আর আম্বেদকর সংবিধানসভায় প্রদত্ত ভাষণে (২৫ নভেম্বর, ১৯৪৯) খোলাখুলি জানালেন যে, ভারতে রাজনীতির আঙ্গিনায় যে আনুগত্য ও ভক্তিভাবের প্রবল বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, সারা বিশ্বে আর কোথাও এমন নজির নেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই ব্যাধির প্রকোপ আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর মতে, দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের জালে আবদ্ধ থাকায় ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস ও প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্ষয় হতে থাকে। তাই নির্ভীক চিত্তে

এগোনোর স্পৃহা অবদমিত হয়। আম্বেদকর ভারতের রাজনৈতিক অবক্ষয়কে মানসিক বৈকল্যের স্বাভাবিক পরিণতি বলে চিহ্নিত করেছেন। আম্বেদকরের ভাষায়, "In India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero worship plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world"। এই ভক্তিবাদী রাজনীতির প্রধান দৃষ্টান্ত ছিলেন গান্ধীজী ও মহম্মদ আলি জিন্না। স্বাধীনতার পূর্বে জাতীয় কংগ্রেসে গান্ধীজীই ছিলেন শেষ কথা। গান্ধীজীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে কেউ রেহাই পাননি। তাঁর পথ ও পন্থা নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। অসহযোগ আন্দোলনের কথা ভাবুন। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে ইসলামিয় খিলাফতের দাবিকে মিলিত করে তিনি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ আন্দোলনের সূচনা করলেন। এর পরিণাম হলে ভয়ঙ্কর। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল ধরে। দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রকোপ বাড়ল। মহম্মদ আলি, শওকত আলির মতো গান্ধীজীর অনুগামী মুসলমান নেতারা বিপক্ষে চলে গেলেন। কিন্তু কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজী ভজনায় অবিচল থাকলেন। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে কংগ্রেসে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। তিনি ছিলেন আপোশহীন সংগ্রামী রণকৌশলের প্রবক্তা। শেষপর্যন্ত তাঁকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়। রাজাগোপালাচারী শ্লেষযুক্ত মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা গান্ধীজীর নিরাপদ নৌকায় থাকতে চান, ফুটো নৌকার যাত্রী হতে চান না। আবার মধ্যপ্রদেশের প্রধানমন্ত্রী এন বি খারে কংগ্রেসের সমালোচনা করায় তাঁকে গদিচ্যুত করা হয়।

আম্বেদকর শুধু গান্ধীজীকে নয়, মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তাঁর মতে, গান্ধীজী ও জিন্না দুজনেই ছিলেন একরোখা (ego centric) চরিত্রের। গান্ধীজী নিজেকে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের একমাত্র কাণ্ডারি বলে মনে করতেন, আর জিন্না নিজেকে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রবক্তা হিসাবে জাহির করতেন। মুসলমান রাজনীতির তিনিই শেষ কথা। ভাগ্যের পরিহাস, গান্ধীজী ও কংগ্রেস নেতাদের ভুলভ্রান্তি জিন্নাকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কংগ্রেসের ব্যবধান বাড়তে লাগল ও কংগ্রেস সংঘাতের পথ বেছে নিল, তখনই ব্রিটিশের কাছে জিন্না প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। গান্ধী ও জিন্নার অনমনীয় মনোভাব জাতীয় রাজনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করল। পরিণামে দেশব্যাপী হিংসার আগুন জ্বলে উঠল। অহিংসার পূজারি গান্ধীজী দেখলেন ভারত অগ্নিগর্ভ ও রক্তস্নাত।

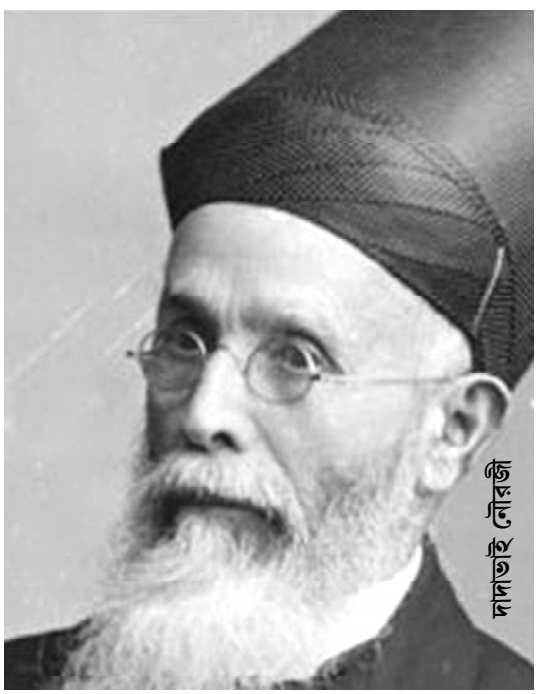
দাদাভাই নৌরজী

স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম প্রধানমন্ত্রী নেহরুর আমলে গণতান্ত্রিক নিয়মবিধি কিছুটা বহাল ছিল। তবে নেহরুকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস দলের নেতা-কর্মীরা নেহরু-ভজনা শুরু করেন। নেহরু অবতারের পর্যায়ে উন্নীত হন। অনেক আগে ১৯৩৭ সালে নেহরু 'চাণক্য' ছদ্মনামে রচিত মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, নেতার বন্দনা সুস্থ রাজনীতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে নেতার মনে অহমিকাবোধ দেখা দিতে পারে এবং একনায়ক হওয়ার বাসনা জাগতে পারে। নেহরুর পর কংগ্রেস দলে এমনটাই হয়। তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস দলে নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই পরিণতি পারিবারিক গণতন্ত্র। ১৯৭৫ সালে নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য সারা দেশে গণতন্ত্রের বনিয়াদ ধ্বংস করেন। এই সময়ে ইন্দিরা-ভজনার মাত্রা চরমে ওঠে। কংগ্রেস সভাপতি দেবকান্ত বড়ুয়া সোচ্চারে বললেন, 'ইন্দিরাই ভারত' (Indira is India)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন হলো। বিচারব্যবস্থার উপর আঘাত নামল। ইন্দিরাপুত্র সঞ্জয় অসাংবিধানিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হলেন। ১৯৭৭ সালে ইন্দিরা ক্ষমতাচ্যুত হলেও ১৯৮০ সালে পুনরায় ক্ষমতায় বসলেন। এরপর ১৯৮৪ সালে ইন্দিরার প্রয়াণের পর তাঁর পুত্র রাজীব সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসলেন। রাজীবের প্রয়াণের পর কিছুদিন পরিবারতন্ত্রের দাপট কমেছিল। কিন্তু ১৯৯৮ থেকে বিশ বছর ধরে রাজীবপত্নী সোনিয়া কংগ্রেস দলের সভানেত্রীর পদে বহাল ছিলেন। কংগ্রেসের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। মহাত্মা গান্ধী একবছর

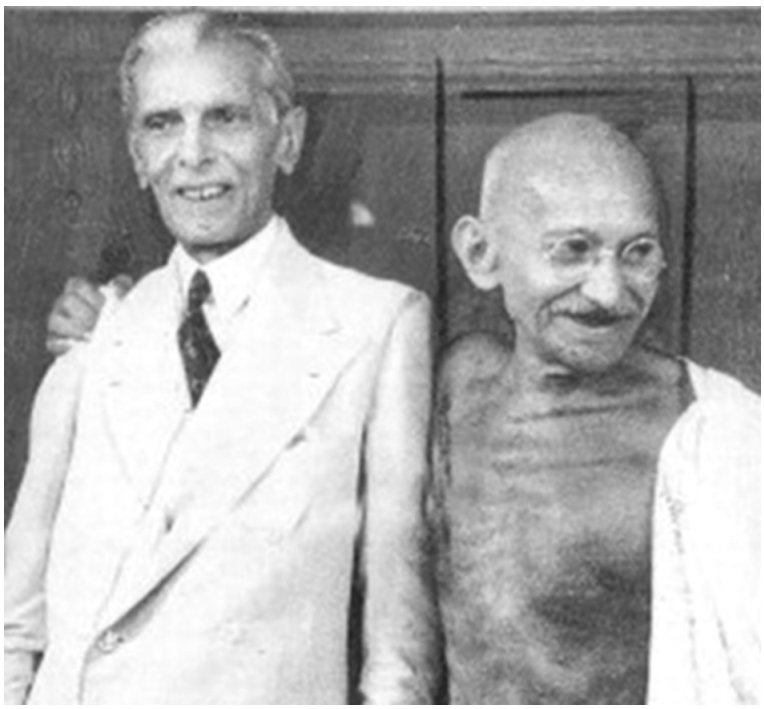

জিন্না ও গান্ধীজী

কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন। ২০১৭ সালের শেষদিকে সোনিয়াপুত্র রাহুল গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি পদে বসেছেন। জাতীয় কংগ্রেসের চত্বরে এখন রাহুল-বন্দনার দাপাদাপি চলছে।

কিন্তু শুধু কংগ্রেস দল নয়। সোশ্যালিস্ট পার্টি, আরজেডি প্রভৃতি দলে পরিবারতন্ত্র আসর জমিয়েছে। মজার কথা, যে আম্বেদকর রাজনীতিতে ভক্তিবাদের তীব্র বিরোধী ছিলেন, তাঁর ভিত্তিতে গঠিত বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী সমর্থকদের ভজনায় আপ্লুত। পশ্চিমবঙ্গেও ক্ষমতাসীন দলের মহানেত্রী সমর্থকদের ভক্তিরসে আপ্লুত। সরকারের সব কাজকর্ম তাঁর অনুপ্রেরণায় চলছে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডা: বিধানচন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণায় কি সমস্ত কাজকর্ম চলত? তোষামুদেরা ক্ষমতাসীন নেতা-নেত্রীদের ভজনা করেন নিজেদের স্বার্থে, নেতা-নেত্রীর মর্যাদার জন্য নয়।

আবার ফিরে আসি আম্বেদকরের ভাষ্যে। স্বাধীনতা, সমতা ও সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মুক্ত চিন্তার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। তাঁর ভাষায় শিক্ষার প্রসার, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও আন্দোলন এই তিনের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা সম্ভব। অনেক আগে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া ভাষণে ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য বাক্‌স্বাধীনতা ও সংগঠিত প্রচেষ্টার কথা বলেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে আমলাতন্ত্র ছিল সর্বশক্তিমান। এই আমলাতন্ত্রের কঠোর শাসন প্রতিহত করে জাতীয় আত্মবিকাশের কথা বলেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। আর স্বাধীন ভারতে কী দেখছি? গণতন্ত্রের পোশাক পরে ক্ষমতাসীন দলগুলির দাপট ও নিয়ন্ত্রণ চরমে উঠেছে। ভোটে জেতার জন্য ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির পাশাপাশি অর্থশক্তি ও পেশীশক্তির নির্লজ্জ প্রসার ঘটেছে। এমনটা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ বামফ্রন্টের শাসনে। দলতন্ত্রই হয়ে উঠেছিল শেষ কথা।

ভাবতে পারেন, পেশাদারি রাজনৈতিক দলের নেতারা অনৈতিকভাবে ক্ষমতায় বসেন আর সংবিধানের নামে মন্ত্রগুপ্তির শপথ নেন। কিন্তু তারপরেই গণতন্ত্র ও সংবিধানকে লঙ্ঘন করতে সচেষ্ট হয়। মুখে ধর্ম ও মানবিকতার কথা বলতে শোনা যায় আর প্রতিনিয়ত অধার্মিক ও অনৈতিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। 'সত্যমেব জয়তে'র আড়ালে 'মিথ্যামেব জয়তে' প্রকট হয়ে উঠেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক সমতার বুলি আউড়ে ধর্মীয় ও সামাজিক বিভেদকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচন যেন সত্যই মহাভারতের যুদ্ধের আকার নেয়। কংগ্রেস সভাপতি নিজের অজান্তে ২০১৯ সালের নির্বাচনকে মহাভারতের যুদ্ধের প্রতিরূপ বলেছেন। মিথ্যাচার, শঠতা, পেশীশক্তির দুঃসহ আস্ফালন, জাতপাত ও আঞ্চলিকতার ভেদাভেদের বিষবাষ্প, যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা দূর করে দেশের সংস্কৃতি ও সংহতি সুনিশ্চিত হোক, অন্ধকার বিদীর্ণ করে নবভারতের উদয় হোক। দেশ ও সমাজকে টুকরো টুকরো করার হীন অপচেষ্টার সমূলে বিনাশ ঘটুক। উনিশ শতকের ভারতের জাতীয়তাবাদের ঊষালগ্নে প্রাজ্ঞ মহান ব্যক্তি দাদাভাই নওরোজি তিনটি গলদের কথা বলেছিলেন—রাজনৈতিক দারিদ্র্য (Political Poverty), অর্থনৈতিক দুরবস্থা (Economic Poverty) ও নৈতিক অবক্ষয় (Moral Povety)। বর্তমান ভারতের দুঃসহ পরিস্থিতির মূলে নৈতিক অবক্ষয় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। এখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নীতি নৈতিকতাহীন। ঘরে বাইরে সংকট সৃষ্টির অশুভ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। স্মরণে রাখা প্রয়োজন, আপাত ভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতের মর্মবাণী হলো ঐক্য, ভারতমাতা হলো ঐক্য ও সংহতির প্রতীক। এককালের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতের অন্তর্নিহিত মৌলিক ঐক্য প্রসঙ্গে লিখেছেলেন, 'India and Hinduism are organically related like body and soul'। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভারত ও ভারতবাসীর এই অবিভাজ্য ঐতিহ্যকে নস্যাৎ করতে চাইছে ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠীগুলি। অশুভ মহাজোটের ডাক এরই পদধ্বনি।

■

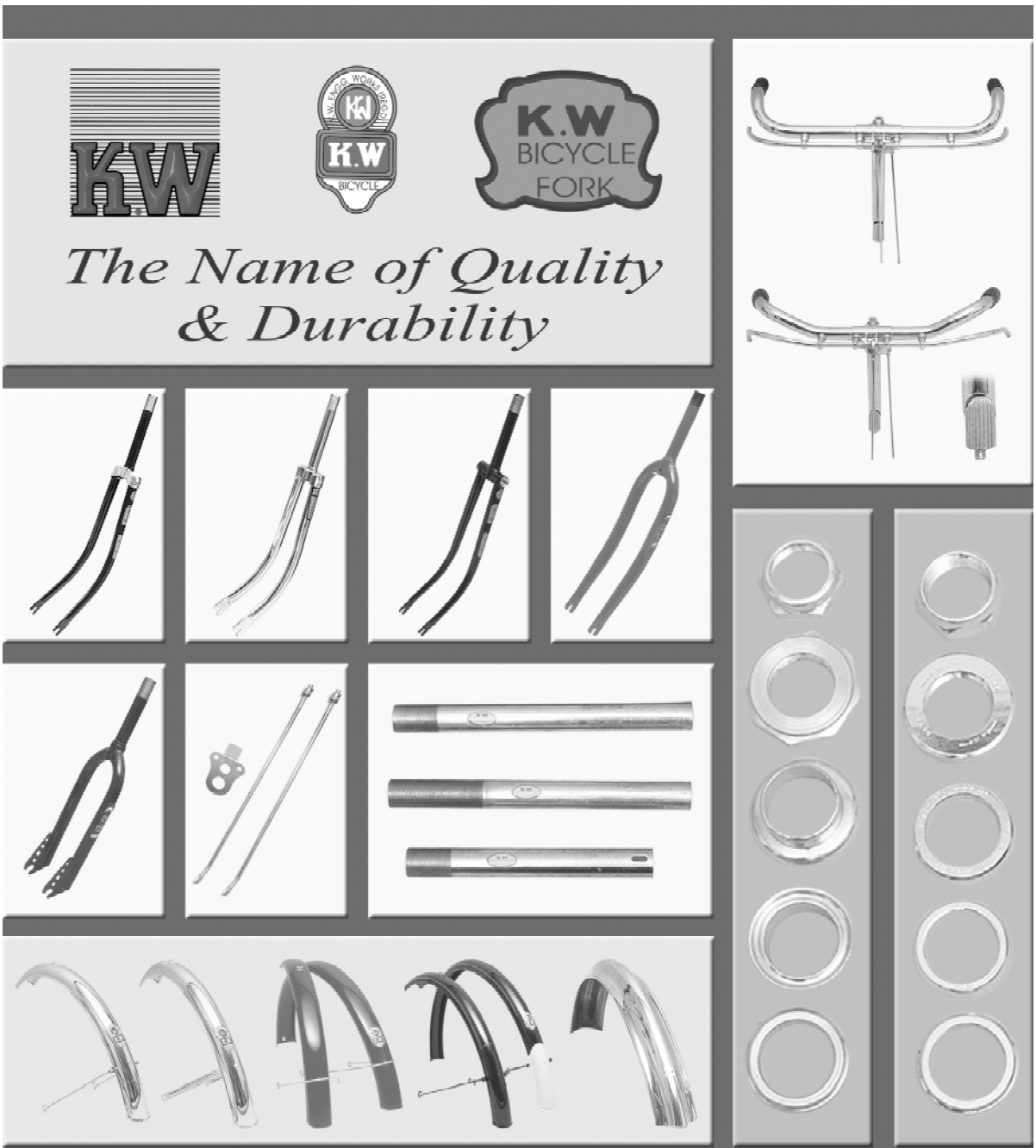

K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

With Best Compliments From :

emami

EMAMI PAPER MILLS LIMITED

AN IS0 9001 : ISO 14001 : 0HSAS 18001 CERTIFIED COMPANY

Manufacturers of

International Quality Packaging Board

Coated Grey Back Board, Folding Box Board and SBS Board (White)

High Quality White and Pink Newsprint

S. S. Maplitho, Writing & Printing and Ledger Paper.

* * *

Registered Office :

1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, ACROPOLIS, Unit No. -1
15th Floor, Kolkata - 700 107, (West Bengal)
Phone : 6627-1300/1301, Fax : (033) 6627-1338
E-mail : emamipaper@emamipaper.in
Website : www.emamipaper.in

FOR BUSINESS ENQUIRY - CONTACT :
Mr. Soumyajit Mukherjee, Asst. Vice President (Marketing and Sales),
Mob. +91 9051575554, E-mail : soumyajit@emamipaper.in

Unit Gulmohar
R. N. Tagore Road
Alambazar, Dakshineswar
Kolkata - 700 035 (West Bengal)
Phone : 2564-5412/5245/ 65409610-11
Fax : (033) 2564-6926
E-mail : gulmohar@emamipaper.in

Unit Balasore
Vill. - Balgopalpur
P. O. Rasulpur,
Dist. - Balasore (Odisha) - 756 020
Phone : (06782) 275-723/779
Fax : (06782) 275-778
E-mail : balasore@emamipaper.in

উপন্যাস

হাতি ঘোড়া পাল কী

জিষ্ণু বসু

বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান হলো। সোপানের কাছে আজকের সকালটা ভীষণ ভীষণভাবে অন্যরকম। প্রথমে তো গণদেবতা এক্সপ্রেস ধরার জন্য এত সকালে উঠতে হবে শুনে বিরক্ত লাগছিল সোপানের। কিন্তু আজ সকাল হওয়ার অনেক আগেই কে যেন ওকে জাগিয়ে দিয়েছিল, 'সোপান কি রে ওঠ, উঠে পড়! যাবি না? দ্যাখ ভোরটা কত সুন্দর।'

সকালের আলো তখনও ভালো করে ফোটেনি। সোপান উঠে পড়ল, ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে একেবারে ছাদে উঠে গেল। উঠে অবাক হয়ে গেল, কী সুন্দর পাখির ডাক। আম গাছে, বাতাবি লেবু গাছে, অশোক ফুলের গাছে কত কত পাখি! কী অদ্ভুত কলরব। সব পাখিরা কী এত বলছে? ছাদে উঠে এক অপূর্ব অনুভূতি হলো সোপানের। ঊষা!

এই সময়টাকেই তো দাদাই বলতেন ঊষা।

'ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা,
খনা বলে সেই তো ঊষা।'

কবিতা করে বলতেন দাদাই। ভাবতেই বুকের ভেতরটা কষ্টে ঢুকরে উঠল, গলার কাছটা একটা কান্না দলা বেঁধে। আজ চার বছর হলো দাদাই পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। তখন সোপান ক্লাস সিক্সে পড়ত। মা বলেছিলেন, দাদাই তারা হয়ে গেছে। সোপান তখন তো বড়, মানুষ মারা গেলে সে ফিরে আসে না সেটুকু বুঝতে শিখে গেছে সে। তবু যেন মায়ের কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করত। অনেকদিন সন্ধ্যায় ছাদে উঠে খুঁজতে চেষ্টা করত নতুন কোন তারা। কিন্তু আজ একদম দেরি করলে চলবে না। মনে হতেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এল সে।

মা প্রস্তুত হয়ে এসে অবাক, সোপান জামা-কাপড় পরে একেবারে প্রস্তুত। সঙ্গে নিয়েছে ওর প্রিয় জলপাই রঙের কিট্স ব্যাগ। ব্যাগ গুছোতে অবশ্য দিদি অনেকটাই সাহায্য করেছে। সত্যি দিদিটার হাতে জাদু আছে। বাবাও যখন ট্যুরে যান, তখনও তুলির ডাক পড়ে। বাবা দিদিকে আদর করে বলেন, 'তুলতুলে'।

বাবার ট্যুরের আগেরদিন সন্ধ্যায় অবধারিতভাবে ডাক আসবে, 'তুলতুলে, মা দ্যাখ তো আমার লাগেজটা একটু ম্যানেজ করতে পারিস কিনা?'

দিদি পড়াশুনা ছেড়ে এসে বাবার লাগেজ নিয়ে গুছোতে শুরু করে। এত এত জামাকাপড়, ছোট বড় কাজের জিনিস ঠিক সাজিয়ে গুছিয়ে ভরে দেবে স্যুটকেসে।

আজকাল বাবা ঠাট্টা করে দিদিকে 'ভৈরবী'ও বলেন। কারণ এখন দিদির ঘরে মানুষের হাড়গোড় ভরা থাকে। দিদি মেডিক্যাল কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রী। তাই সারাদিন মোটা মোটা বই আর মানুষের হাড় মিলিয়ে পড়া দেখে বাবা হাসতে হাসতে বলেন, 'তন্ত্র সাধনা চলছে? ভৈরবী সাধনা ছেড়ে একটু প্রসাদ নিয়ে যাবেন কি?'

দিদিও বই থেকে মাথা না তুলেই বলে, 'কী আছে প্রসাদে?'

বাবাও বাধ্যের মতো বলেন, 'বেশি কিছু না, সামান্য একটু ফিশফ্রাই আর রাশিয়ান স্যালাড। তার মধ্যে সোপান অলরেডি দু-পিস সাঁটিয়ে দিয়েছে।'

দিদি, 'যাচ্ছি' বলেই লাফিয়ে চলে আসে। টেবিলে বসতে যাওয়ার আগেই মায়ের চিৎকার, 'এই তুলি, সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে আয়। হাইজিনের বিন্দুমাত্র সেন্স নেই! তোকে দেখে কেউ বলবে একটা ডাক্তারির স্টুডেন্ট?'

বাবা মিটি মিটি হাসতে হাসতে মুখ নীচু করে খেতে খেতে বলেন, 'না, তোর মাকে দেখে মনে হয়!'

মা চোখ বড় বড় করে তেড়ে আসেন, 'তোমার আস্কারাতেই বাচ্চা দুটো দিনদিন ...

দিদি হাত ধুয়ে এসে টেবিলে বসতে বসতে দু-হাত উপরে তুলে বলে, 'ঠিক আছে, শান্তিঃ শান্তিঃ।'

সোপান মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে কিছুদিন মামাবাড়ি গিয়ে থাকবে। সেটা বহুদিন থেকেই ঠিক হয়েছিল। প্রথমে কথা ছিল, দিদিও ক'দিনের জন্য যাবে। কিন্তু দিদির ফার্স্ট ইয়ারের পরীক্ষা জুন মাসে, তাই ও যাবে না। দিদি থাকলে সোপানের একটা আলাদা সাহস আসে। কিন্তু মুখে সেটা কখনো বলে না।

এবারও সোপান একটু আপত্তি করেছিল, 'তুই কেন যাবি না? এমনিতেও তো সারাদিন হোয়াটস্ আপ করিস! চল না...'

দিদি একটু ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, 'তুই নিজের চরকায় তেল দে! আমার পড়া তুই বুঝবি?'

তারপর কী একটা দুষ্টুমি মাথায় এল, গালে টোল ফেলে একটু হেসে বলল, 'অকালীপুরে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। হোয়াটস্ আপ করা যাবে না, তাই যাব না।'

সোপান তারপরেও গজগজ করছিল, 'এই জন্য তোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ডাক্তারনি হবে তাই বড় ঘ্যাম হয়েছে! দেখিস তোর কী হয়!'

বাবা মধ্যস্থতা করতে আসেন হাসতে হাসতে। সোপানের মাথায় হাত দিয়ে বলেন, 'বাবা, দিদিকেও নিয়ে গেলে আমাকে রান্না করে কে খাওয়াবে? দিদিকে ছেড়ে দে।'

আজ ভোর থেকে কিন্তু দিদি সোপান আর মায়ের জন্য গরম গরম হালুয়া আর পরোটা তৈরি করেছে। ওদের ট্রেনে যাওয়ার জন্য হটপটে ভরেও দিয়েছে। তবে তৈরি হওয়ার পরেই সোপান একটু হালুয়া খেয়ে নিয়েছে। সকাল সকাল এক কাপ দুধ, মোটা চা আর ঘি চপচপ হালুয়া খেয়ে মনটা ভরে

গেল।

এদিকে বাবা তাড়া দিচ্ছেন, 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। এরপর ট্রেন মিস করবে তোমরা।'

গণদেবতা এক্সপ্রেসের আরেক নাম 'হুল এক্সপ্রেস'। ট্রেনে উঠে সিটের নীচে বড় লাগেজটা ঢুকিয়ে দিল সোপান। নিজের কিটস্ ব্যাগটা উপরের বাঙ্কে তুলে দিয়ে ধপাস করে সিটে বসে পড়ল। আরাম করে বসে সোপানের মনে প্রশ্ন এল— 'মা কী মজার নাম দেখেছে ট্রেনটার? হুল, হুল ফোটাবে নাকি?'

মা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'সে কি রে, তুই হুল মানে জানিস না?' তারপর যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোদের বা কী দোষ? নিজেদের দেশের বিষয়ে কতটুকুই বা পড়ানো হয় ইতিহাসে?'

সোপান একটু লজ্জা পেল, 'কী মানে গো হুল কথাটার?'

'হুল একটা সাঁওতাল শব্দ, মানে হল বিদ্রোহ। ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রথম বিদ্রোহ করে ছোটনাগপুর মালভূমির সাঁওতালরা। তাই সিধু-কানুর সেই বিদ্রোহকে ওখানকার ভাষায় হুল বলা হয়।'

ট্রেন ছেড়ে দিল। জানলার বাইরে থেকে বাবা হাত নাড়তে নাড়তে ক্রমশ ছোট হয়ে গেলেন।

উল্টোদিকের সিটে বসেছে একটি পরিবার। বাবা, মা আর দুই বোন। শ্রাবণী আর সর্বাণী। শ্রাবণী ক্লাস ফাইভে পড়ে, সর্বাণী মোটে ক্লাস থ্রিতে। সর্বাণীরা পূজা দিতে যাচ্ছে তারাপীঠে। ওরা রামপুরহাটে পৌঁছেই পুজো দিতে যাবে, তাই সকালে কিছু খাবে না। সেই নিয়ে সর্বাণীর খুব আপত্তি।

'কেন একটু কিছু খাওয়া যাবে না? তারা মা তো আমাদের সবাইকে খুব ভালোবাসেন। সকালে দু-চামচ গুঁড়ো দুধ খেলে কী হয়?'

ওদের সঙ্গে মজা করতে করতে সময় কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে এক ভদ্রলোক মায়ের নাম ধরে ডাকলেন।— 'তুহিনা না? কোথায় যাচ্ছিস?'

মা ফিরে দেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন— 'শুভায়ু, শুভায়ু চ্যাটার্জি। কেমন আছিস? বাব্বা কতদিন পরে দেখা! তুই কোথায়?'

'আরে আমি এই ট্রেনের সাপ্তাহিক যাত্রী। বিশ্ব ভারতীতে চাকরিও প্রায় ২০ বছর হয়ে গেল। কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট আছে, সপ্তাহে একদিন ফিরি।'

মা এতদিনের পুরনো বন্ধুকে পেয়ে খুব খুশি। 'কিরে, না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়েছিস, তা বলে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবি না?'

শুভায়ুবাবু থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা বাব্বা, তোকে খোঁজার তো কত চেষ্টা হয়েছে। আমাদের তো হোয়াটস্ অ্যাপ গ্রুপও হয়েছে। তুই কি ফেসবুকে আছিস?'

'না আমি কেবল ফেস টু ফেস দেখা করি। তবে আমার মেয়ে আমার ফোনে হোয়াটস্ অ্যাপ ডাউনলোড করে দিয়েছে। হোয়াটস্ অ্যাপ অ্যাকাউন্টস একটা আছে বটে, তবে...'

'আরে তাই তো, তোর কথা জানাই হলো না। তুই কী করছিস?'

'আমি স্কুলে পড়াচ্ছি। বারুইপুর রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়। এম-এ করেই তো বিয়ে পাশ করে ফেললাম।' বলেই মা হাসতে থাকেন।

'সত্যি এনসিয়ান্ট হিস্ট্রিতে তোর ধারেকাছে আমরা কেউ ছিলাম না।' এবার উনি সোপানের দিকে ফিরলেন, 'এইটি বুঝি তোর ছেলে?'

মায়ের ইঙ্গিতে সোপান ওনাকে নমস্কার করতে যাচ্ছিল। উনি ওকে ধরে ফেলে গাল টিপে আদর করলেন, 'না, না, এই ট্রেনের মধ্যে পায়ে হাত দিতে হবে না। সত্যি তুহিনা তুইও আছিস, এখনকার দিনে...'

মা শান্ত গলায় বললেন, 'কেন, এখন কি এমন সাহেবি যুগ এসেছে? ছোট থেকেই তো বড়দের সম্মান দিতে শিখবে।'

'বেশ বেশ! তা যাচ্ছিস কোথায় মা-বেটায়?'

'মামার বাড়ি। মানে আমার বাবার বাড়ি। অকালীপুর।'

'সেটা কোথায়?'

'রামপুরহাট থেকে যেতে হবে কয়েক কিলোমিটার। আমি দু'দিন থাকব। আমার স্কুল খুলে যাবে। সোপান দিন পনেরো থাকবে।'

রামপুরহাট স্টেশনে ছোট মামা ওদের নিতে এসেছিলেন। সঙ্গে তরুণ নামে এক বন্ধুকে নিয়ে। তরুণ মামার সঙ্গে কয়েক মিনিটেই বন্ধুত্ব হয়ে গেল সোপানের। তরুণই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। এমনিতে আকালীপুরে আসতে গেলে বাসে করে ভদ্রপুরে নামতে হয়। সেখান থেকে অটো করে পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগে আসতে। তবে আজ তো ওরা সোজা গাড়িতে এলো। ওদের তাই সময় অনেক কম লাগল। ৪০ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল মামাবাড়ি।

গ্রামের একটা ছোট্ট নদী আছে, ব্রাহ্মণী। কী সুন্দর নাম। এখন গ্রীষ্মকাল তাই ব্রাহ্মণীর জল খুব কম। নদীর তীর থেকেই ঘন সবুজ রেখা গ্রামের ভেতরে চলে গেছে।

সোপানরা আসবে বলে বড় মামা, মেজ মামাও বাড়িতে আছেন। বড় মামার রামপুরহাট স্টেশন রোডের উপর আসবাবপত্রের দোকান। মেজমামা স্কুলে গণিত পড়ান। মেজমামার সুন্দর দাড়ি, দারুণ সৌম্য চেহারা। গলার স্বরও গম্ভীর, যেন টিভিতে কেউ খবর পড়ছে। বড়মামা একটু রোগা ভোগা। ধুতি আর ফতুয়া গায়ে একেবার সামনের দরজার এসে ওদের নিয়ে গেলেন। দাদুকে কে যেন খবর দিয়েছে, 'পুনপুনি এসে গেছে।'

পুনপুনি মায়ের ডাক নাম। এখন প্রায় কেউই বলে না। সোপানের শুনে খুব হাসি পায়। দাদুর বেশ বয়স হয়েছে। হাতে একটা সুদৃশ্য বেতের লাঠি। সোপানকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। 'দাদুভাই তো জেন্টলম্যান হয়ে গেছে, কী সুন্দর দেখতে হয়েছে রে পুনপুনি তোর ছেলেটা! চলো চলো দাদু ভেতরে চলো।'

মামিরাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। মাকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে বলল, 'মায়ের শরীরটা ক'দিন ভালো যাচ্ছে না। আজও সকাল থেকে শুয়েই আছেন।'

'কেন কী হয়েছে মা'র? চলো তো দেখে আসি। ইস! আমাদেরই দোষ। কোনও খবরাখবরই রাখি না। ছিঃ ছিঃ!'

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সোপানও গেল দিদার ঘরে। গিয়ে তো ওরা অবাক, ওরা ঘরে ঢোকার আগেই দিদা হাতে একটা থালা নিয়ে বের হয়ে আসছেন। লালপাড় সাদা শাড়ি, মাথা ভর্তি সাদা ঘন চুল, মাঝখানে মোটা লাল সিঁদুর। পেছনে পেছনে একজন দিদি আসছিলেন। দুই মাসি তো দেখেই হা-হা করে উঠলেন। 'মা তুমি এসব কখন করলে, তুমি উঠলে কেন?'

দিদা সোপানের গালে একটু আদর করে বললেন, 'দাদুভাই আসছে আর আমি একটু ক্ষীরের নাড়ু করব না? তাছাড়া আমি তো কিছুই করি না, করেছে তো এই যশোদা। যশোদাই তো আমার সব।'

মা একটু উদ্বিগ্ন হয়েও বললেন, 'কিন্তু তোমার হয়েছে কী? ক'দিন নাকি উঠতে পারোনি, শুয়ে আছ?'

'আর বলিস না, হার্টের কী একটা হয়েছে। ডাক্তারই বলেছে ক'দিন একটু কম নড়াচড়া করতে। আরে বয়েসটা তো হলো। মানুষ তো আর অমর নয়, কোনও একটা কিছু তো হবেই। আজ তো বেশ ভালোই লাগছে।'

মেজমাসি তখন দিদাকে ধরে ফেলে বললেন, 'না, দাঁড়াও। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না মা, আমরা সবাই এখানে আসছি। তুমি খাটে বস।'

দিদার দোতলার ঘরের সামনে একটা ঝোলানো বারান্দা। বারান্দাটাকে ছাতার মতো ঢেকে আছে একটা আমগাছ। হিমসাগর আমের গাছ। বড় বড় আম হয়ে আছে। ঝুলে পড়া ডালগুলো থেকে কী সুন্দর একটা গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। ওই বারান্দায় নীচের পুকুর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সবাই দিদাকে ঘিরে বসল।

নিজের থেকে গ্লাসে গ্লাসে করে ঠাণ্ডা আমপানা এলো, ভাজা মৌরির মশলা দেওয়া আমপোড়া সরবত। তার আগেই দিদার তৈরি ক্ষীরের নাড়ু চার-পাঁচটা খেয়ে নিয়েছে সোপান। কী অপূর্ব স্বাদ সেই নাড়ুর, মুখে দিলেই যেন গলে যাচ্ছে। আর এক অনাবিল অনুভব। সত্যি, দিদার হাতে যাদু আছে।

মেজমামার দুই ছেলে, দুজনেই সোপানের থেকে ছোট। বড় ছেলে ঋক এবার ক্লাস এইটে উঠেছে, ছোট ছেলে ঋজিক এখন ক্লাস সিক্সে। বড় মামার একই মেয়ে টিপ, ভালো নাম দেবাদ্রিতা। টিপের এবার ক্লাস নাইন হলো।

টিপ দু-হাতে দুটো থালা নিয়ে ঢুকল। একটিতে সদ্য কাটা লাল তরমুজ, অন্যটাতে বেল আর চালকুমড়োর মোরব্বা। একেবারে জমে গেল আসর।

কীভাবে যে সময় কেটে যাচ্ছে! দিদার কী একটা কথা শুনে সবাই যখন হো-হো করে হাসছে, হঠাৎ ছোট মামা ঢুকে ছন্দপতন করল।

'কি গো দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হবে না? তরুণদা এসে গেছে। তরুণদা আজ খেয়ে তারাপুরে যাবে। ৪টে থেকে শাখা।'

সবার যেন সম্বিৎ ফিরল।

'হ্যাঁ গো সত্যি তো, গল্পে গল্পে কত বেলা হয়ে গেল। ও পুনপুনিদি, তুমি একটু স্নান করবে তো? এতোটা পথ ট্রেনে গাড়িতে এলে....'

'ঠিক বলেছ, আমি চট করে রেডি হয়ে আসছি! চল বুকাই স্নান করে নে।' মা আদর করে সোপানকে ওই নামে ডাকে। মা উঠে পড়েন। যেতে যেতে বলেন, 'আচ্ছা, ওই তরুণ ছেলেটা কে রে? এত সুন্দর ব্যবহার। আমি তো ভেবেছিলাম তোমাদের নতুন ড্রাইভার।'

বড় মামি বললো, 'না, না। তরুণ তো প্রচারক। আমাদের পুরনো ড্রাইভার হেমন্তদার ক'দিন ধরে জ্বর হয়েছে। তাই আজ তরুণ গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেছে।'

মা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'প্রচারক? কিসের প্রচারক?'

'আর এস এসের প্রচারক।' ছোট মামা বলেন।

'আর এস এস? সেটা কী রে?'

'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। পরে বলবক্ষণ বুঝিয়ে। এখন চলো তাড়াতাড়ি চিতল মাছের ঝোল ঠাণ্ডা হয়ে গেলে বাবা আমাদেরই ঝোল বানিয়ে দেবে।'

ছোট মামার কথা শুনে সবাই হেসে উঠল। ঋজিক সোপানকে এসে বলল, 'চলো বুকাইদা তুমি আমাদের ঘরেই থাকবে। আমাদের ওখানে স্নান করবে।' বলেই কিছু বোঝার আগেই সোপানের কিটস্ ব্যাগটা কাঁধে তুলে চলল ওদের ঘরের দিকে।

আজকের দুপুরের খাওয়াটা সোপানের সারা জীবন মনে থাকবে। দাদুর বাড়ির নীচের তলায় লম্বা বারান্দা। চকচকে লাল মেঝে আর কালো বর্ডার। সবাই বসেছে একসঙ্গে। সেটাই দাদুর নির্দেশ। মেয়েরাও মুখ্য পদগুলো পরিবেশন করার পরে থালায় খাবার নিয়ে বসে পড়বে। বাকি পদ যে যার নিজে হাতে নিয়ে নেবে। শুধু খাবারের পাত্রটা চক্রাকারে ঘুরবে। আজকের মেনুতে ছিল যুক্তি ফুল ভাজা, পোস্তর বড়া, অড়হর ডাল, মোচার ঘণ্ট, চিতল মাছের পেটির পাতলা ঝোল আর কষা কষা চিতল মুইঠ্যা। তারপর রসনায় তৃপ্তি হেতু আমের চাটনি আর চিনি পাতা দই। সোপান চিতল মাছের মুইঠ্যা আগে খেয়েছে। মাও বানাতে পারেন। অদ্ভুতভাবে তৈরি হয়। পুরো কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল। মাছের পিঠের শক্ত দিকটা আলু দিয়ে মেখে মুঠো মুঠো করে ফুটন্ত জলের মধ্যে দিলেই শক্ত রবারের মতো হয়ে যাবে। অনেকটা দোকানের চিকেন সসেসের মতো। এটা নাকি পূর্ব বাংলার রেসিপি। আসলে মায়েরা ওপার বাংলার তো, তাই এসব খুব ভালোবাসে। করতেও পারে।

যেমন এপার বাংলার স্পেশাল পোস্ত। বড় মামিমা বাঁকুড়ার মেয়ে। পোস্ত, পেঁয়াজ আর নারকেল দিয়ে যে বড়াটা করেছিলেন তা এক কথায় অসাধারণ। সোপান দুটো খাওয়ার পরেও মনে হচ্ছিল আর একটা খায়। কিন্তু মা একবার চোখ বড় বড় করাতে আর বলার সাহস হলো না। তাছাড়া চিতল মাছের পেটির ঝোলের সুগন্ধে পরিবেশ ম-ম করছিল। তাই এগিয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল।

সোপান লক্ষ্য করল তরুণ মামা যেন ইচ্ছে করেই ওর পাশে এসে বসল। সকাল থেকেই বেশ বন্ধুত্বের মতো হয়েছিল। একটা শ্যাওলা রঙের পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা পরেছে তরুণ মামা। একদম সাধারণ পোশাক আর শান্ত ব্যবহার। কিন্তু সোপান একটা মিষ্টি ব্যক্তিত্বের স্পর্শ অনুভব করল যেন। খেতে খেতে আস্তে আস্তে প্রশ্ন করছিল সোপানকে। কোথায় থাকে, কোন ক্লাসে, কোন স্কুল, হবি কী? এইসব আর কী।

খেতে খেতে হঠাৎ মা বলে উঠলেন, 'সত্যি বৌদি, তোমাদের এখানে শুধু ভাত আর ডাল দিয়েই খাওয়া যায়। কী মিষ্টি ভাত গো!'

দিদা মিটি মিটি হাসছেন, 'আমরা তো এখনও ঢেঁকিছাঁটা চালই খাই। আর সত্যি বলতে কী, এর জন্য বৌমাদেরই ভালো বলতে হবে। ভাতটা মাটির হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে করে আসছে। সত্যি এমন দুটো বউমা পেয়ে আমার গর্ব হয়।'

মেজ মামিমা ফোড়ন কাটেন, 'ভালোও হয় খিড়কি পুকুরের জলে।'

মা-র হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল, 'আচ্ছা মা, তোমার তো তিনটে বউমা পাওয়ার কথা। ছোটটার বিয়ে কবে দেবে। ওর প্র্যাকটিসও তো ভালোই জমে উঠেছে।

শুনে তরুণমামা যেন বল পেয়ে গেল। খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'একদম ঠিক দিদিভাই। আপনি এবার আপনার এই থাকার মধ্যেই ডাক্তারের বিয়ে দিয়ে যান। নাহলে বেচারার গতি হচ্ছে না।'

ছোটমামা লজ্জা পেয়ে যায়, 'তরুণদা আমার সর্বনাশ করা ছাড়া তোমার আর কোনও কাজ নেই, না? ছাড়ো না।'

তরুণদা জল গড়ানো হাসি হাসছে, 'আছে, আরও অনেক কাজ। তবে আপাতত কাজ ডাক্তারের একটা ভালো কম্পাউন্ডারের ব্যবস্থা করা।'

খেতে খেতে সব্বাই হেসে উঠল। টিপ চাটনির আমের আঁটির টুকরো চুষতে চুষতে বলল, 'কাকাইয়ের বিয়েটা এবছরই দিতে হবে। নাহলে তিন বছর পরে।'

সবাই একেবারে চুপ। কী অদ্ভুত কথা! এবছর না হলে তিন বছর পরে কেন?

তরুণদাই রহস্য ভাঙল, 'আরে বুঝতে পারছ না, ম্যাডামের আগামী বছর মাধ্যমিক, তারপর উচ্চমাধ্যমিক। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে না?'

টিপ প্রতিবাদ করে, 'তরুণকাকু ভালো হবে না কিন্তু। তোমাকে বিশ্বাস করে বললাম আর তুমি এরকম বিট্রে করলে?'

আবার একটা হাসির রোল। হাসি একটু থামতেই মা বলে উঠলেন, 'তরুণের পড়াশুনা কোথা থেকে?'

'আমি উত্তরবঙ্গের ছেলে, গ্র্যাজুয়েশন কোচবিহার বি. এন. শীল কলেজ থেকে। তারপর মাস্টার্স করলাম যাদবপুর

NAVYUG®

BSCIC Certifications BSCIC Private Limited

IS : 2494 CM/L NO. 9065679

VINÇOTTE

ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009

B0089/0104:0807

QUALITY SPEAKS ITSELF

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF:
V, COGGED & POLY BELTS
FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE APPLICATION

Recognised Export House by Govt. of India

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009
Ph.: 0181-2420551-552-053-054 Fax : 0181-2420553
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

C ®
BRAND

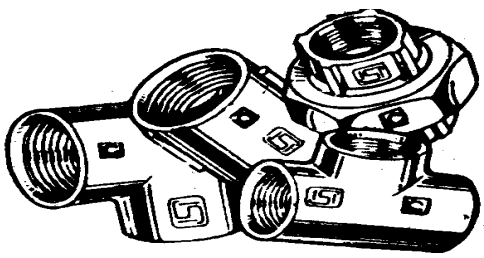

ISI
MARKED

**HIGH GRADE
MALLEABLE IRON
HOT GALVANISED
PIPE FITTINGS**

MFD. BY. Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.

CRESCENT ENGG. CORP.

G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।'

'বাঃ! তোমার বিষয় কী ছিল?'

'ফিজিক্স।' এবার তরুণমামা একবার ঘড়ি দেখে বলল, 'দিদি আমি উঠে পড়লাম। একটু দূরে যেতে হবে। প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।'

সকলেই এক এক করে উঠে হাত ধুতে চলে গেল। তরুণমামার বাইক পুকুরের ধারে রাখা ছিল। দাদুর বাড়ির পুকুরের পাড়টা একেবারে দেখার মতো। দাদু নিজে হাতে বেছে বেছে ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। তাই সারা বছরই পুকুরের চারদিকে কোনও না কোনও ফুল ফুটে থাকে। মাটিতে ছড়িয়ে থাকে। বাঁধানো ঘাটের দুদিকেই গন্ধরাজ, জুঁই, কুন্দ, মাধবীলতা আর কামিনী গাছ। তাই বাঁধানো ঘাটে বসলে ফুলের গন্ধে মন ভরে যায়। পুকুরের ধারে বড় বড় ফুলের গাছ। এখন গ্রীষ্মের ফুল জারুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া আলো হয়ে আছে। পূর্বদিকে সব বর্ষাঋতুর ফুলের গাছ। অমলতাস, শিরিষ আর চাঁপা গাছের বন। পশ্চিমদিকে শরৎকালে পুকুরপাড় শিউলি ফুলের আলপনা হয়ে থাকে ঘাসের উপর। শীতের ফুলের গাছ অনেক যত্ন করে যোগাড় করে এনেছিলেন দাদু। ম্যাগলোনিয়া, লাল ফুলে ভরা পালসেটিলা আর ছাতিম। দক্ষিণ দিকে বসন্তের গাছ। সেদিকেই সবচেয়ে বেশি সংখ্যা। গাছ বাড়তে বাড়তে দক্ষিণ থেকে পূর্ব দিকে, পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে গেছে। কী গাছ নেই, বসন্তের রক্তপলাস, শিমুল, বনপলাশ, হলুদ পলাশ, অশোক— সব গাছ একটা দুটো করে লাগিয়েছে দাদু। পুকুরের ঘাটে জামগাছের নীচে দাঁড়িয়ে এইসব খুব উৎসাহ নিয়ে বলছিল ছোটমামা। তরুণমামা বাইকের উপর বসে সব শুনছিল।

উপরের দিকে তাকিয়ে তরুণদা বলল, 'কিন্তু গাছে জাম পেকে কালো হয়ে আছে। পাড়ছো না কেন ডাক্তার? আর ফল পড়ে ঘাটটাও নোংরা হয়ে যাচ্ছে।'

ছোট মামাও উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক কথা। কিন্তু পাড়ার লোক পাওয়াই মুশকিল। দেখি...'

তরুণমামা মোটরবাইক স্টার্ট দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, কাল রামপুরহাট থেকে এক চ্যাংড়াকে নিয়ে আসব পাড়ার জন্য। কাল সকালে শাখার পরে জামোৎসব হবে।'

সোপানরা প্রায় একযোগেই বলে উঠল, 'চ্যাংড়া? চ্যাংড়াটা কে?'

তরুণমামা জিব কেটে বলল, 'ও হো! এটা আমাদের কোচবিহারের ভাষা। কাল সকালে জাম পাড়ার জন্য একজন ছেলেকে নিয়ে আসব। চ্যাংড়া মানে ছেলে। আজ আসি রে, রাজকন্যা রাজপুত্ররা। ডাক্তারেরও চেম্বারের সময় হয়ে গেল।'

বলেই তরুণমামা মোটকবাইকের কান পাকিয়ে চলে গেল। তারপর ব্রাহ্মণী নদীর উপরের লোহার পুল পার করে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তরুণমামা চলে যাওয়ার পর সোপান একটু শুয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা অনেকটা গড়িয়ে গেছে। চোখেমুখে জল দিয়ে বেরিয়ে দেখল, টিপ চা তৈরি করছে বড়দের জন্য। 'ছোটমামা কোথায়?' সোপান প্রশ্ন করে।

'কাকাই তো চেম্বারে চলে গেছে। ভদ্রপুর বাজারে চেম্বার। ৪টের মধ্যে পৌঁছে যায়। তুমি চা খাবে?'

'চা! খেতে পারি, কিন্তু ঋক আর ঋজিক কোথায়?'

টিপ কাপে কাপে চা ঢালছে। চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'ওরা তো শাখায় গেছে। ওই তো সামনে মাঠে।'

'শাখা? সেটা আবার কী?'

'শাখা, সঙ্ঘের শাখা।' বলেই টিপ বুঝল সোপান বুঝবে না, ওই তো শিবের দালানের সামনে হচ্ছে। যাও না গিয়ে দেখ না।'

সোপান জানলা দিয়ে একটু উঁচু হয়ে দেখল, ছেলেরা মাঠে জড়ো হয়েছে। 'আমি চা খাব না', বলে তাড়াতাড়ি করে দোতলার বারান্দা হয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে টুক টুক করে চলে এল মাঠে। গিয়ে দেখল, মাঠে একটা লাঠির মাথায় একটা পতাকা লাগানো আছে, আর ছেলেরা তার সামনে খেলা করছে। ঋক হাতে একটা ছোট হুইসিল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর ছেলেরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে কী যেন একটা খেলছে।

একদিকের ছেলেরা বলছে— 'হাতি ঘোড়া পাল কী'

অন্যদিকের দল আরও জোরে চেঁচিয়ে বলল, 'জয় কানাইয়া লাল কী'।

'হাতি ঘোড়া পাল কী / জয় কানাইয়া লাল কী' বলেই খেলা শুরু হলো।

দুটো দলের মাঝখানে একটা রেখা। সেই রেখার উপর রাখা আছে একটা লাল রঙের বল। দুই দলের একজন একজন করে ডাকছে। আর তারা ছুটে এসে বলটা নিয়ে কে আগে নিজের স্থানে ফিরতে পারবে। এরপরে আরও দুটো খেলা হলো। সোপানের দেখে অবাক লাগল, এতটুকু ঋক কেমন এতজন ছেলেকে খেলাচ্ছে। তার মধ্যে চার-পাঁচজন তো ওর থেকেও বেশ বড়। ওরা সবাইকে দুটো ভাগ করে দাঁড় করাল। হঠাৎ ওর চোখ গেল সোপানের দিকে। ও ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদাভাই তুমি কবাডি খেলবে?'

কবাডি স্কুলে দু-একবার খেলেছে বটে সোপান, তবে ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো কখনোই খেলেনি। তবু রাজি হয়ে গেল সোপান। সোপান সরাসরি খেলার দলে যোগ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঋক এসে বাধা দিল, 'দাদা তোমাকে ধ্বজপ্রণাম

করতে হবে।'

তারপর ওই গৈরিক পতাকাটির সামনে এসে এক অদ্ভুত পদ্ধতিতে বুকে হাত দিয়ে এক-দুই-তিন বলে ধ্বজপ্রমাণ করল। তারপর খেলতে নিয়ে এল। এই মজার আচরণে সোপানের একটু হাসিই পেল।

আজ কবাডি খেলে সোপানের ভীষণ আনন্দ হলো। প্রায় পনেরো মিনিট খেলে। একেবার ঘেমে নেয়ে সবাই এক জায়গায় গোল হয়ে বসল। সবাই নিজের নিজের পরিচয় বলল একবার করে। কলেজে পড়াশুনা করে একজন দাদাও সঙ্গে ছিল। পরিচয়ের পরে সকলে মিলে গাইল, 'ভারত আমার ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো।' পরিবেশটা ভীষণ সুন্দর হয়ে উঠল। একটি বাচ্চা ছেলে কী সুন্দর একটা সংস্কৃত শ্লোক বলল, তারপর তার মানে বলল, আবার ওই শ্লোকটি আবৃত্তি করল। ওই কলেজে পড়া দাদাটার নাম সৌম। সৌমদা এরপর ক্ষুদিরাম বসুর জীবনের উপর সুন্দর কাহিনি বললেন। শুনে সোপানের চোখও কেমন ছলছল করে উঠল। এবার সকলকে ওঠার জন্য কী একটা কম্যান্ড দিল ঋক। ছোট বড় সকলে একসঙ্গে উঠে পড়ল ওই ছোট্ট ঋকের কম্যান্ড শুনে। সবাই একটা বিশেষ ভঙ্গিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। একটা হুইসিলের সিটির সঙ্গে পিছন থেকে এসে কয়েকটা সারি দিয়ে দাঁড়াল সেই গৈরিক পতাকার সামনে। এবার সোপানের বেশ মজাই লাগল। এরপরেই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল। একটা ছোট্ট সিটির সঙ্গে সঙ্গে সকলে বুকে হাত দিয়ে একটা সুরেলা ভঙ্গিতে প্রার্থনা করল। সোপান ক্লাস সেভেন আর এইটে সংস্কৃত পড়েছিল। সংস্কৃত প্রার্থনার মানে সামান্যই বুঝতে পারল। তবে সেটা যে দেশমায়ের প্রতি প্রার্থনা এইটুকু পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল। সে। শাখা শেষ হবার পরে আবার ছোট ছেলেরা চেঁচিয়ে বলতে লাগল—

'হাতি ঘোড়া পাল কী
জয় কানাইয়া লাল কী।'

বলতে বলতে গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সোপান দেখল ঋক সেই ে গোরুয়া পতাকাটা ভাঁজ করে একটা ে গোরুয়া রঙের ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে, পতাকার লাঠিটা ডান বগলে নিয়ে তার দিকেই আসছে। 'বুকাইদা কেমন লাগল আমাদের শাখা?'

'কী, কী নাম বলিস তোরা এটাকে?'

'শাখা, সঙ্ঘের শাখা।'

তারপর ঋক বলতে থাকল কী হয় শাখায়। কীভাবে শারীরিক প্রশিক্ষণ হয়। কত কত গান শেখে। সংস্কৃত শ্লোক, যাকে শাখার ভাষায় বলে সুভাষিত। দাদা এত কিছু বলে ফেলল, ঋজিক কিছুই বলতে পারছে না। ও এবার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি তেরোটা সূর্য নমস্কার করতে পারি বুকাই দা। কাল দেখাব তোমাকে।'

বাড়িতে এসে দেখল, বড় মামি তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছেন। ওরা তিনজন ভালো করে হাত-পা ধুয়ে ঢুকল। পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে নিল সোপান। ঘরে এসে দেখে ঋক আর ঋজিক স্বামী বিবেকানন্দর বড় ছবিটার সামনে চুপচাপ বসে আছে। মেরুদণ্ড সোজা করে হাতদুটো সোজা করে বসে আছে। ধ্যান করছে। সোপান কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘরের পরিবেশ দেখে আর কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করল না। ও কিছু না বলে ওদের পেছনে বসে পড়ল। মেরুদণ্ড সোজা করে বসল, ওদের মতো করে হাতের মুদ্রা করে একবার বিবেকানন্দের ছবির দিকে তাকাল। তারপর চোখ বন্ধ করে শান্ত হয়ে বসল।

পড়ার টেবিলে গিয়ে দেখে দেবাদ্রিতাও এসে বই খুলে বসে গেছে। ঋক আর ঋজিকও বইয়ের ব্যাগ নিয়ে বসল।

মেজমামি বললেন, 'সোপান তুমিও বোসো টেবিলে। এখানেই সন্ধ্যার খাবার দিয়ে দেব। বলতে বলতেই চলে এল চার বাটি মুড়ি। একেবারে বড় জামবাটি ভরা ঘরে ভাজা একটু লালচে মুড়ি। সেই সঙ্গে একটা বাটিতে বাদামভাজা, একটা বাটিতে কয়েক টুকরো মিছরি আর একটা থালায় লম্বা লম্বা করে কাটা শশা। বহুদিন পরে এত সুন্দর সন্ধ্যার জলখাবার খেল। বড় মামি এরপর দিয়ে গেলেন চার গ্লাস ভর্তি গরমাগরম দুধ।

সোপান সাধারণত কলকাতায় দুধ খায় না। ও বলল, 'মামি আমি দুধ খাব না।'

মামি হেসে বললেন, 'এ আমাদের বাড়ির গোরুর দুধ। খেয়ে দেখ, ভালো লাগবে।'

তবু সোপানের দ্বিধা, 'আমার কেমন গন্ধ লাগে দুধে।'

'লাগবে না, লাগবে না। খেয়ে নাও।' বলেই মামি রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

ততক্ষণে তিন ভাই-বোন দুধে চুমুক দিয়ে দিয়েছে। রিজিকের ঠোঁটের উপর দুধের গোঁফ হয়ে গেছে। দেখে হেসে ফেলল সোপান। সোপান একটু গন্ধ শুঁকে নিয়ে এক চুমুক দিল। বাঃ, দারুণ খেতে তো! দু-তিন বার দুধ খেয়ে সোপান যেন ভেতর থেকে বলে উঠল, 'কী ভাল খেতে। আমি তো ভাবতেই পারিনি।'

ঋজিক হাততালি দিয়ে উঠল, 'আমাদের সোনালি গাইয়ের দুধ, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো দুধ।'

'তোমাদের ক'টা গোরু আছে?'

ঋজিক আর কাউকে বলতে দেবে না। ও বলে চলে,

'সাতটা। তার মধ্যে আমাকে সবচেয়ে ভালোবাসে সোনালি গৌ।'

দেবাদ্রিতা নাইনে ওঠার পরে একটু সিরিয়াস হয়ে গেছে, এত কথার মধ্যেই ও বই খাতা খুলে অঙ্ক শুরু করে দিয়েছে।

'সোপানদা তোমারও তো মেকানিক্স ছিল। এই অঙ্কগুলো একটু দেখবে?'

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই তিন ভাই-বোনের টেবিলে একেবারে পিন পড়ার শব্দ না হওয়ার মতো নিস্তব্ধতা। একটু পরে ঋজিক কী একটা কবিতা মুখস্থ করার জন্য একটা গুনগুন শুধু শোনা গেল।

আজ সন্ধ্যায় সোপানের মাথাটাও যেন সুপার কম্পিউটারের মতো কাজ করছিল। একটার পর একটা মেকানিক্সের প্রব্লেম, যেগুলো টিপের আটকে গিয়েছিল, ঝপঝপ করে করে ফেলল। এত ভালো অঙ্ক করে সোপানের নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না।

দেবাদ্রিতা তো খুশিতে ডগমগ, 'ইস্ট হো ইয়া ওয়েস্ট, সোপানদা ইজ দ্য বেস্ট।'

এর মধ্যেই মেজমামি ঘরে ঢুকলেন। 'চলো চলো খেতে চলো। সব্বাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

ঋজিক উঠে গিয়ে মায়ের আঁচল ধরে বলল, 'মা, সেইটা কি হয়েছে আজকে?'

মেজমামি একটু হেসে রহস্য করে বললেন, 'চলো দেখি, তোমার আইটেম রেসিপি হয়েছে কিনা!'

টিপ, সোপান, ঋক, ঋজিক এসে দেখল সবাই দাদুকে মাঝখানে রেখে দুপুরের মতো বসেছে। মাঝখানে রাখা সব খাবার। ভাত, রুটি, তরকারি, শশা, পেঁয়াজ, লঙ্কা কাটা। ঋজিক লাল মেঝেতে পা দিয়েই একবার এগিয়ে এসে দেখে নিল বড় গামলাতে কী রাখা আছে। তারপর মেজমামিকে জড়িয়ে খানিকটা নেচে নিল, 'আমার মা, সোনা মাটা, আমার মাম মামটা! জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সীটা!'

মেজমামি ওর হাত ছাড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ বায়না করেছ, আর সোপান দাদা এসেছে তাই করা হয়েছে। কাল আবার কিছু বায়না করলে কাঁচকলা খাবে।'

ঋজিক পাঁঠার মাংস খেতে খুব ভালবাসে। কিন্তু এবাড়িতে পাঁঠার মাংসের একটু বিশেষ ব্যবস্থা লাগে। মা কালীর সামনে এক কোপে বলি দেওয়া মাংস ছাড়া নাকি খাওয়া উচিত নয়। দাদু বলেন, 'এক কোপে কাটা মাংস ছাড়া অন্য মাংসকে বলে 'বুথা মাংস', তা খেলে শরীর মনের ক্ষতি হয়। ছোট মামার চেম্বারের কাছেই একটা দোকান আছে, 'মা তারা মিট শপ'। কার্তিক ঘোষ না কার একটা দোকান। ওখানে সকাল সন্ধ্যা মা কালীর পুজো দেয় পুরোহিত। আজ মেজমামি ফোন করাতে ছোট মামা একটি ছেলেকে দিয়ে মাংস কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

তবে দাদু, দিদা আর বড় মামা মাংস খাবেন না। তাদের জন্য ছানার ডালনা করা হয়েছে। বড় মামা যোগাসনের দিকে ঝোঁকার পর থেকে একটু একটু করে আমিষ ছাড়ছেন। সেই নিয়ে বড়মামির সঙ্গে একটু আধটু রাগারাগিও হয়েছে। তবে বড়মামা ইলিশ মাছটা এখনও ছাড়তে পারেনি। আগে বড়মামা বলতেন, 'ইলিশ মাছ নষ্ট করা একটা সামাজিক অপরাধ।' তবে যোগাসনে মগ্ন হওয়ার পরে ওসব আর বলেন না।

মাকে এত খুশি বহুদিন দেখেনি সোপান। আজ সারাদিন অনেকবার মনে হয়েছে মা যেন ছোট্ট মেয়ে হয়ে গেছে। এখন ইচ্ছে করেই যেন সোপানকে একটু ধাক্কা দিয়ে বসলেন মা, সোপান একটু অবাক চোখে তাকাতেই মা চোখে ইঙ্গিত করলেন মাংসের পাত্রের দিকে। চোখের ভাষায় বললেন, কি বুকাইবাবু? মটন তো তোমারও খুব প্রিয়!'

সোপান যেন একটু লজ্জা পেল, মা সেটা বুঝতে পেরে কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললেন, 'আচ্ছা বড়বৌদি, তোমরা দুপুরে রাত্রে সকলে একসঙ্গে খেতে বস?'

'না, না। দুপুরে তো তোমার দাদারা থাকে না। তাই সংসার ঠেলে যার যখন সময় হয় খেয়ে নিই। তবে, এই রাত্রের খাওয়া সবাই একসঙ্গে খাই। এই একটা সময়ই তো বাড়ির সকলে একসঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ পায়।'

খাওয়া শুরু হল। সোপান মাংস, রুটি আর স্যালাড নিল। মাংসটা এককথায় অসাধারণ হয়েছে।

দিদা একদম গরম-গরম রুটি পছন্দ করেন। তাই যশোদা দিদি একবার একটা হাতেগরম রুটি দিয়ে গেল। দাদু দিদার সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করে বললেন, 'পুনপুনি তোর মা'র এই দুটোই বিলাসিতা। হাতে গরম রুটি, আর আমার উপর গরম গরম ভাষণ।'

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে। দিদা প্রথমে একটু রাগ করতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলেন।

খেতে বসে যে এত আনন্দ হতে পারে, আর বয়সে বড়, বয়সে ছোট সবাই মিলে হাসি মজা করা যায় দেখে সোপান

smc
Moneywise. Be wise.

SMC WISHES YOU A
HAPPY DURGA PUJA

Call Toll-Free
1800 11 0909
www. smctradeonline.com

Broking - Equity, Commodity & Currency | Wealth Management | Insurance Broking | Real Estate Advisory | Mortgage Advisory | Distribution of IPOs, Mutual Funds, FDs & Bonds | Investment Banking | NBFC Financing | PMS | Institutional Broking | Clearing Services | NRI & FPI Services | Research

DELHI | MUMBAI | KOLKATA | AHMEDABAD | CHENNAI | BENGALURU | DUBAI

SMC Global Securities Ltd., CIN No.: L74899DL1994PLC063609 | REGISTERED OFFICE: 11/6-B, Shanti Chamber, Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel +91-11-30111000 | SMC Comtrade Ltd., CIN : U67120DL1997PLC188881

NSE INB/INF/INE 230771431, BSE INB/INF 011343937, MSEI INB/INF 260771432 INE 260771431, CDSL/NSDL-IN-DP-130-2015 (SMC Global Securities Ltd.), NCDEX/MCX (8200)/NMCE/ICEX-INZ000035839 (SMC Comtrade Ltd.), PMS INP000003435 (SMC Investments and Advisors Ltd.) IRDAI Regi: No: DB 272/04 License No. 289, Valid upto 27/01/2020 (SMC Insurance Brokers Pvt. Ltd.), Merchant Banker INM000011427 (SMC Capitals Ltd.)

Investment in securities market are subject to market risks, read all the related documents carefully before investing

Follow us on

পুরো মোহিত হয়ে গেছে। নিজেদের বাড়ির মধ্যে এত আনন্দ লুকিয়ে থাকে!

দুই মামি সবাইকে নিয়ে বসে পড়েছেন। দিদা জোর করে যশোদা দিদিকেও বসিয়ে দিলেন খেতে।

কথায় কথায় মেজমামা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল তোর কী প্ল্যান পুনপুনিদি?'

'কাল ভাবছি সকালে একবার আকালী মায়ের মন্দিরে যাব।' বলেই একবার বড়মামার দিকেও তাকালেন, 'তবে তোমরা যদি অন্য কিছু বলে তো...'

বড়মামা বললেন, 'সে তো ভালো কথা! তা মায়ের কাছে যেতে যখন মন করেছে যা না কাল সকালে। তবে খুব সকাল সকাল যেতে হবে। গ্রীষ্মকালে পুজো একটু তাড়াতাড়ি হয়।'

মা সোপানকে বললেন, 'চল, কাল সকালে মায়ের পুজো দিয়ে আসি। এখানের খুব জাগ্রত দেবী।'

মেজমামা যোগ করলেন, 'ঠিক! এই মন্দির বানিয়েছিলেন মহারাজ নন্দকুমার। উনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই ব্রাহ্মণী নদীর ধারে বানিয়েছিলেন।'

'মহারাজ নন্দকুমার নামটা খুব চেনা চেনা লাগছে।'

মা শুনেই একেবারে ধমকে উঠলেন, 'কিরে তুই মহারাজ নন্দকুমারের নাম মনে করতে পারছিস না? ছিঃ ছিঃ, কি রে তুই?'

মেজমামা মাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দিদি, এটা এদের কোনও দোষ নেই। আমাদের দেশের ইতিহাসটাই এমনভাবে পড়ানো হয় যে দেশপ্রেমিক মনীষীদের কথা জানতেই পারছে না।'

মহারাজ নন্দকুমারের এই ভদ্রপুরেই জন্ম। উনি কালেক্টর ছিলেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য রাজার ফাঁসির আদেশ হয়েছিল হেস্টিংসের ষড়যন্ত্রে। লন্ডনের কোর্টে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ রদ হয়েছিল। কিন্তু জাহাজে করে আসতে আসতে কোম্পানি রাজা নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। সেই রাজা এই মন্দির বানিয়েছিলেন এক রাত্রের মধ্যে। তাই মন্দিরের চূড়া আর ছাদ সম্পূর্ণ হয়নি।

মেজমামার কথা শেষ হতেই মেজমামি যোগ করলেন, 'মজার বিষয় হলো, এই মন্দিরের বিগ্রহের সঙ্গে মহাভারতের যোগ করে দেবীর নাম গুহ্যকালী। ইনি বীর জরাসন্ধের উপাস্য দেবী ছিলেন। এখানকার পূজাপদ্ধতিও ভিন্ন।'

ছোট মামা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন। এবার খানিকটা আপনমনেই বললেন, 'সত্যি আমাদের দেশের কোণায় কোণায় কত বিস্ময়, কত রহস্য জড়িয়ে আছে।'

ঠিক হলো কাল ভোর ভোর ওরা মা আকালী মন্দিরে যাবে পুজো দিতে। মেজমামা, ছোটমামা দুজনেই যাবেন। মেজমামি পুজোর যোগাড় সকালেই করে নিয়ে যাবেন মাকে নিয়ে।

রাতে শোয়ার সময় উপরের ঘরের থেকে একটা কী যে ফুলের সুন্দর গন্ধ আসছিল। নীচে পুকুরের থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝেমাঝেই ওই ফুলের সুগন্ধ বয়ে নিয়ে আসছিল। গন্ধটা কোন ফুলের?'

ঋক বলল, 'হাসনুহানা। ছোট কাকাই এই গাছ লাগিয়েছে গতবছর। দারুণ না গন্ধটা?'

খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো আসছিল। নারকেল পাতা আর সুপারি পাতার ছায়া চাঁদের আলোয় বিছানায় কাঁপছে। হাসনুহানার গন্ধে কখন ঘুম এসে গেল।

আকালী মায়ের মন্দির যেতে যেতে ৬টা বেজে গেল। ব্রাহ্মণী নদীর ধারে মন্দির পরিসরটা একেবারে হাতে আঁকা ছবির মতো। গ্রীষ্মের নদী একেবারে ক্ষীণ হয়ে গেছে, ঘন সবুজ ঘাসের গালিচা একেবারে নীচ থেকে মন্দিরের ঘাট পর্যন্ত উঠে এসেছে। মন্দিরের নির্মাণ যে অসম্পূর্ণ তা এখনও দেখে বোঝা যায়। দেবীর আদেশ ছিল এক রাত্রের মধ্যে মন্দির সম্পূর্ণ করতে হবে। কিন্তু চূড়ার অংশ নির্মাণকর্মীরা রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারেনি। তাই অসম্পূর্ণই থেকে যায়। কিন্তু মন্দিরের চবুতরাতে বসলে একটা অপার্থিব শান্তি। ধুনো, চন্দন আর ফুলের গন্ধ একটা পবিত্র পরিবেশ, দূরে সকালের নরম আলোতে স্নান করা আমবাগান। মা আর মেজমামি লালপাড় সাদা শাড়িতে এসেছেন, মা একটা শাড়ি এনেছিলেন কলকাতা থেকে মা আকালীকে পুজো দেবেন বলে। তার সঙ্গে পাঁচরকম ফল, আলতা, সিঁদুর, শাখা-পলা, নোয়া সবই আনিয়েছেন ছোটমামাকে দিয়ে। মামি সুন্দর করে ফল, মিষ্টি, ধূপ দীপ দিয়ে ডালা সাজিয়েছেন। পুজো শুরু হলো। সকালের পুজোতে খুবই কম যাত্রী থাকে। তাই ফাঁকায় ফাঁকায় মনের মতো করে পূজো করতে পারলেন মায়েরা। পুজোর শেষে চরণামৃত আর কাটা ফল, সন্দেশ প্রসাদ নিয়ে সোপানরা মন্দির থেকে বের হলো। সকালে শোভা সর্বত্র। গ্রামের নিত্য জীবনও শুরু হচ্ছে। চাষের ক্ষেতে যারা যাওয়ার, তারা ইতিমধ্যে মাঠে নেমে গেছেন। শুধু দু-একজন রাখাল গোরু নিয়ে মাঠে যাচ্ছে। যাঁরা শহরে কাজে

যাবেন তারাও বেরিয়ে পড়েছেন বাস ধরার জন্য।

পায়ে পায়ে ওরা মামাবাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। দূর থেকে সোপান শুনতে পেল ঋজিক চিৎকার করছে, 'দাদা এদিকে এসো, আমাদের গোশালা দেখে যাও।'

মেজমামা হেসে বললেন, 'সত্যি দর্শনীয়ই বটে, দাদা একটা বড়সড় গোয়ালঘর বানিয়েছে। ছ-সাতটা গোরু এনে একেবারে পুরোদস্তুর গোশালা।'

সোপান দু-একটা গোয়াল কখনো সখনো দেখেছে বটে। তবে এটার চেহারা একেবারে আলাদা। ভেতরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু-তিনটি জায়গার উপর থেকে মশারি ঝোলানো। গোরুর সঙ্গে দু-তিনটা বাছুরও নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা গোয়ালে ঢুকেই বললেন, 'ওমা, বড়দা তোমার গোরুর দুধ তো বাছুরগুলোই নেচে নেচে খেয়ে নিচ্ছে। তোমার গোরু পুষে কী লাভ হচ্ছে!'

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'না, একেবারেই নয়। আমার গোরু অ্যাভারেজের থেকে বেশি দুধ দেয়। সকালে ওদের নিজেদের বাচ্চাদের খাওয়াতে পারলে ওরা সারাদিন খুশি খুশি থাকে, তাই দুধও বেশি দেয়।'

ঋজিক লাফাতে লাফাতে এসে বলল, 'দেখবে পিসিমণি, সোনালী গৌ আমাকে কেমন ভালোবাসে!'

বলেই ঘিয়ে রংয়ের গোরুটার কাছে এসে ওর গলকম্বলে হাত দিল। ঋজিকের সোনালি গৌ ঘাস আর বিচালির জাবনা খাচ্ছিল, ঋজিকের স্পর্শ পেয়ে খাওয়া ছেড়ে ফিরে তাকালো। তারপর জিভ দিয়ে ঋজিকের হাত, কান, গলা চেটে চেটে আদর করতে লাগল।

সোনালি গৌ আর ঋজিকের এই কাণ্ড দেখে সবাই হেসে উঠল, বড়মামা বাইরের থেকে ডেকে বললেন, 'একটা জিনিস দেখে যা।'

গোশালার পেছনে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল। গোয়ালের ধোয়ানো জল, যেখান থেকে গোবর, গোমূত্র জলের সঙ্গে আসে এই জমিটাতে, সেখানে একটা বড় জায়গাতে একেবারে হরেকরকম সবজির চাষ হয়েছে। ঢ্যাঁড়স, ঝিঙে, পটোল, কুমড়ো, পুঁই শাক আর নটে শাক— এক একটা চারকোণা জায়গায় এক এক সবজির। লঙ্কার দু-তিন রকম প্রজাতির গাছ সারি সারি হয়ে আছে। ছোট্ট ছোট্ট বেগুনগাছগুলোকে বাঁশের কঞ্চি কেটে বেড়া দেওয়া আছে। ছোটমামাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল। বলল, 'এখানে কোনও কীটনাশক দেওয়া হয় না। বড়দা গোমূত্র আর নিমপাতা ফুটিয়ে একটা পাচন বানিয়েছিল। প্রথমে আমরা খুব হেসেছিলাম। কিন্তু অদ্ভুতভাবে ওটা গাছে দেওয়ার পরে গত কয়েকমাস ধরে মাজরা পোকা বা ল্যাদা পোকা হয়নি। সত্যি মিরাকেল।'

বড়মামা খুব উৎসাহ নিয়ে বোঝাতে থাকেন, 'আরে আমি তো পোকাদের দিয়েও খাটিয়ে নি।'

'সেটা কিরকম ভাবে মামা?' সোপানও ধীরে ধীরে আকর্ষণ অনুভব করছে।

'দেখ আমরা গোবরটা জল দিয়ে গুলে যখন মাটিতে দিই, তার আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কেঁচোরা সেই খাবার খেয়ে এক অপূর্ব সার-ভার্মি কম্পোট তৈরি করে।'

মামা তৈরি কম্পোস্ট পিট আর বীজতলা দেখাতে লাগলেন। ভীম নামে একজন দাদা ওই ভার্মি কম্পোস্ট নিয়ে বেগুনক্ষেতে দিতে যাচ্ছে।

'তুমি কী একটা প্ল্যান্ট বসাবে বলছিলে দাদা, সেই প্ল্যান কি আছে এখনও?' ছোট মামা পিছনে থেকে বলে।

'আলবত আছে। আমি ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে চিঠিও লিখেছি। ছোট একটা প্ল্যান্টের কত দাম তার কোটেশন দিতে বলেছি।'

'ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার মানে পরমাণু শক্তি দপ্তরের? ওরা গোবর দিয়ে কী বানায়? এ বাবা! কী বলছ গো!'

ছোটমামা উত্তরটা দিলেন, 'এখন বড় বড় গবেষণা সংস্থা বিজ্ঞানকে মানুষের প্রয়োজনের জন্য পৌছানোর চেষ্টা করছে। ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনও এমন অনেক টেকনোলজি ট্রান্সফারের প্রকল্প করছে।'

'ঠিকই বলেছিস। বি এ আর সি বা বার্কের একটা ইউনিট আছে 'আকৃতি' বলে। ওরা অত্যাধুনিক প্রযুক্তির একটা বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট বানিয়েছে। আমাদের যা গোধন আছে, তার থেকে যে গোবর গ্যাস পাওয়া যাবে, তাতে আমাদের বাড়ির রান্না হয়ে যাবে। আর ওই গ্যাস বের করার পর তার থেকে গোবর সার ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি হবে।'

মা খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, 'সেকি গো, এতসব কিছু আছে? আচ্ছা দাদা, তুমি ওই বড় গোরু তো একটাও রাখোনি। কী জার্সি কাউ না কী বলে! ওর তো শুনেছি অনেক দুধ হয় গো।'

'আরে না, না। ওগুলো তো গোরুই নয়। গোরু তো ভারতীয় প্রজাতির, যার পিঠে কুজ থাকে। সেটাই গোরু। বাকি জার্সি কাউ অন্য এক সংকর প্রজাতির জানোয়ার।'

'তাতে কী? দুধ তো অনেক দেয়'।

'হুঁ হুঁ, বাবা অনেক পার্থক্য আছে। জিজ্ঞাসা করো না ডাক্তারবাবুকে। কী রে বল না।'

ছোটমামা একটু দূরে ছিল। কী কথা হচ্ছে ভালো করে শোনেনি। বলে উঠল, 'কি হলো? কিছু হলেই ডাক্তারদের গালি দাও কেন তোমরা?'

বড়মামা যেন একটু পটানোর ভঙ্গিতেই বললেন, 'না, না ছোট, আমরা তো ডাক্তারের সম্মান সবসময় করি। বলছিলাম, ভারতীয় গোরুর দুধের ব্যাপারে তোদের মেডিক্যাল সায়েন্সে কী যেন আছে বলছিলি।'

'হ্যাঁ, বি-টু ক্যাটাগরির দুধ বলে এটাকে। এটা পুষ্টিগুণে সব দিক থেকে ভালো।' বলেই ছোটমামা সোপানের দিকে ফিরে বলল, 'কি রে তুই এখনও গোরুর দুধের মহিমা শুনছিস? ওদিকে পুকুর পাড়ে তো যুদ্ধি হচ্ছে।'

মামাবাড়িটা ক্রমশ রহস্যের রোমাঞ্চের জায়গা হয়ে উঠছে সোপানের কাছে। সোপান নতুন উত্তেজনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'কেন? কী হচ্ছে পুকুরের ধারে?'

'জামোৎসব! সব তরুণের পাগলামি। জাম পাড়ার জন্য রামপুরহাট থেকে একটা ছেলেকে নিয়ে এসেছে। সেই ছোঁড়া মগডালে উঠে জাম পাড়ছে। আর নীচে চাদর পেতে সব জাম ধরছে।'

সোপান এসে দেখে সত্যিই উৎসবের চেহারা নিয়েছে পুকুরঘাট। এমনকী দাদুও এসে দাঁড়িয়েছেন গাছতলায়। যে ছেলেটি গাছে উঠেছে তার নাম দশরথ। বাচ্চারা নীচের থেকে চিৎকার করছে, 'দশরথদা বাঁদিকে, আরও বাঁদিকে। একটু একটু উপরে।'

দেখতে দেখতে নীচে পেতে ধরা চাদরটা ভর্তি হয়ে উঠল রসালো কালো জামে।

তরুণদা চিৎকার করে বলল, 'দশরথ নেমে আয় বাবা। ওই মগডালে উঠেছিস, আমার ভয় করছে। আর এত জাম এরা করবেটা কী?'

দশরথ কয়েক মিনিটের মধ্যে তরতর করে নেমে এলো। পেটানো চেহারা, জামাটা খুলে ফুলপ্যান্ট পরেই গাছে উঠেছিল। তরুণদা একটা গামছা দিয়ে বলল, 'নে, ঘামটা মুছে নে। তারপর চল, কী লুচি আর হালুয়া বানিয়েছে বড় বৌদি।'

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai *KNITWEARS*

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

লুচির কথা শুনতেই সোপানের মনটাও নেচে উঠল। ও হাত-পা ধুয়ে লাল দালানে এলো। বড় গামলাতে ফুলকো ফুলকো লুচি, কালোজিরে দেওয়া সাদা সাদা আলুর তরকারি আর মোহনভোগ। ভাই-বোনেরা থালা নিয়ে বসে গেছে। হঠাৎ তরুণদা ভেতরে এসে বলল, 'তোমরা খাও, আমি চললাম। দশরথ ভেতরে খেতে আসতে চাইছে না।'

বোঝা গেল, দশরথ ভেতরে আসবে না। কারণ, ওরা লেট। দশরথ লেট। ওরা নীচু জাত। উঁচু জাতের লোকেরা বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। ও কিভাবে একসঙ্গে খেতে বসবে?

শুনেই ছোটমামা লাফিয়ে উঠল, 'কী বলছ কী তুমি? কোথায় আছে দশরথ?'

ছোটমামা, তরুণমামাকে নিয়ে বের হয়ে এলো। পেছনে পেছনে টিপ, সোপানও দেখতে এলো।

ছোটমামা দশরথ লেটকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি ভেতরে যাবে না কেন? কোন যুগে বাস করছি আমরা? শিগগিরি চলো ভেতরে।'

দশরথ তবু ইতস্তত করছে, 'তবে আমাকে বাইরে এখানেই এনে দিন। এখানেই খাব।'

'তাহলে আমরাও সবাই এখানে বসেই খাব। কারণ তোমার সঙ্গে একাসনে বসে না খেলেই আমাদের পাপ হবে।'

দশরথ লেট যখন লাল বারান্দাতে এলো তখন ওর চোখ ছলছল করছে। দাদু ওকে বলল 'বাবা বসে পড়, লুচি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে কি ভাল লাগবে? দে, দে দশরথকে লুচি দে।'

সবাইকে খেতে দেওয়ার পরে তরুণমামা বলে উঠলেন, 'এক মিনিট। আজ সকালের জলযোগের আগে একটা মন্ত্র পড়ে খাওয়া শুরু করব।'

সবাই একেবারে চুপ করে গেল। ঋক, ঋজিক, টিপ হাতজোড় করে বসল। তরুণমামা শ্লোক শুরু করল—

'হিন্দবঃ সোদরা সর্বে / ন হিন্দুঃ পতিত ভবেৎ
মম দীক্ষা হিন্দু রক্ষা / মম মন্ত্রঃ সমানতাঃ'।।

ঋক শ্লোক শেষ হতেই বলল, 'কাকু, আমি বলব অর্থটা?'

শ্লোকটার মানে— সব হিন্দুই সহোদর ভাই, কোনও হিন্দু পতিত হতে পারে না। হিন্দুকে রক্ষা করাই আমার ধর্ম, সমান ভাবাই আমার মন্ত্র।'

একটু পরেই দশরথ স্বাভাবিক হয়ে এলো। সবার সঙ্গে একটু একটু কথা বলা শুরু করল।

মেজমামি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দশরথ, তুমি কী করছ এখন?'

'আমি কলেজে পড়ি। রামপুরহাট কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে।'

'পাশ কোর্সে না অনার্স?'

'সংস্কৃতে অনার্স। উচ্চ মাধ্যমিকে আমার সংস্কৃতে ভালো নম্বর হয়েছিল।'

তরুণদা জানায়, 'ওর এইচ এসে সংস্কৃতে লেটার নম্বর ছিল।'

লুচি পর্ব শেষ হলে জাম মেখে নিয়ে এলো যশোদাদি। টুসটুসে পাকা কালো জাম। নুন আর একটু লঙ্কা কুচো— একেবারে ফাটাফাটি স্বাদ হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার। সবারই কাজে বের হতে হবে। বড়মামার দোকানের সময় হয়ে যাচ্ছে। মেজমামার স্কুলের, ছোটমামার চেম্বারের। স্কুল অবশ্য সকলেরই আরও কিছুদিন ছুটি। তরুণমামাও দশরথকে বাইকে চাপিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

মা আরও দুদিন থাকবেন। সোপান পনেরোদিন এখানে থেকে যাবে। ঋক আর ঋজিক পড়তে বসে গেল। উপরের জানালা দিয়ে এক এক করে তিন মামাকে বেরিয়ে যেতে দেখল সোপান। মা মামিদের সঙ্গে রান্নাঘরে। কিন্তু টিপ কোথায়? দেবাদ্রিতা তো এলো না পড়তে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে টিপের গলার অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল— 'খিয়া-হট-হট।'

সোপান ভাইয়ের চোখের দিকে তাকাল। চোখে প্রশ্ন, 'কী ব্যাপার রে? কী করছে দিদি?'

ঋক একটু মজার হাসি হেসে বলল, 'যাও না, গিয়েই দেখ না।'

একটু ইতস্তত করেও সোপান দেখতে গেল। আসলে ও কৌতূহল সামলাতে পারছিল না। পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল, দেবাদ্রিতা সাদা সালওয়ার কামিজে কোমরে কমলা ওড়নাটা বেঁধে পা দাবিয়ে হাতের মুঠো তৈরি করে মারছে। সোপান মিনিট দুয়েক বোনকে ক্যারাটের বিভিন্ন ভঙ্গিমাতে দেখল। এবার ওর দিকে চোখে চোখ পড়তে, টিপ হেসে বলল, 'যাচ্ছি।' সোপান পড়ার ঘরে ফিরে এলো।

আরও কিছুক্ষণ পরে এলো দেবাদ্রিতা। হাসি মুখে বসল বই খাতা নিয়ে। বলল, 'আমি একেবারে সকালে উঠেই এটা করে নিই। আজ মন্দিরে গিয়েছিলাম, তাই প্র্যাকটিস করা হয়নি।'

'তুই কি ক্যারাটে শিখছিস?'

'ক্যারাটে? প্রায় তাই। আমরা বলি নিযুদ্ধ।'

'কতদিন হলো শিখছিস?'

'চার মাস হলো। আমি রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির কিশোরী বিকাশ বর্গে গিয়েছিলাম। সেখানে কিশোরীদের কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হয় শিখিয়েছে।'

সোপানেরও একসময় ক্যারাটে শেখার খুব ইচ্ছে

হয়েছিল। কিন্তু ট্রেনিং সেন্টারটা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ছিল। সপ্তাহে দু-দিন করে কীভাবে যাবে, এইসব ভেবে বাবা আর নিয়ে যেতে পারেননি। তাই সোপান প্রশ্ন করল, 'চার মাসে একবার শিখলে হবে? রেগুলার কোনও ইন্সট্রাকশন লাগে না?'

'প্রতি সপ্তাহে একবার যাই তো। রামপুরহাটে সমিতির সাপ্তাহিক মিলন হয়। আমরা এখান থেকে পাঁচজন মেয়ে যাই। আমাদের গ্রামেও শুরু হবার কথা সমিতির শাখা।'

একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া কিশোরী বিকাশের ওই তিনদিনের ক্যাম্পে মার্শাল আর্ট ছাড়াও অনেক কিছু শেখানো হয়েছিল। যোগাসন ও বিপদের পরিস্থিতিতে কি করতে হবে সেসব শেখানো হয়েছিল। আমাদের খুব ভালো লেগেছিল।'

সোপান মন দিয়ে শুনছিল বোনের কথা। বলতে বলতে দেবাদ্রিতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। খুব আবেগের সঙ্গে বলল, 'একটা ধ্বনি আমার এত ভালো লেগেছিল যে আমি রোজ, দু-চার বার বলি, 'বেশ ভালো করে এটা নিঃশ্বাস নিয়ে স্লোগান দিল—

'ফুল ভি হ্যায় চিঙ্গারী ভি হ্যায়
হম ভারত কী নারী হ্যায়।'

ফুল হওয়া কোনও লজ্জার বিষয় নয়। ফুল জগতের অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজনে আগুনের ফুলকিও হতে পারি। আমরা ভারতের নারী ফুলের মতো সুন্দর কিন্তু আগুনের ফুলকির মতো তেজস্বী।

আজ দুপুরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল সোপান। জানালা দিয়ে আকাশের একটা ফালি দেখা যাচ্ছে। সাদা তুলোর মতো চকচকে মেঘ উড়ে চলেছে। অনেক দূরে প্রায় টিক চিহ্নের মতো কালো কী পাখি গোল গোল করে উড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরে ঘুরে আসছে। তরুণমামা বলছিল, 'নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি? দেশের জন্য, মানুষের জন্য বাঁচতে হয়।' গতকাল থেকে অদ্ভুত একটা জগতে যেন এসে পড়েছে সোপান। একদম অপরিচিত কিন্তু... যেন এমনটাই...

আজ বিকালে শাখায় আর এক অভিজ্ঞতা হলো। আজ শাখায় সেবা দিবস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিশলয়ের সেই দুটি লাইন—

'আজ মঙ্গলবার। পাড়ার জঙ্গল সাফ করার দিন।'

থেকেই হয়তো পশ্চিমবঙ্গে এই দিনটাকেই সাপ্তাহিক সেবা দিবস হিসাবে গণ্য করে এরা। সেবা দিবস মানে শাখার মধ্যে সেবার বিষয়ে গান, সেবাকাজের আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য আদান-প্রদান আর সেবা কাজে প্রথিতযশা কোনও মনীষীর জীবনী থেকে কেউ একটা সত্য কাহিনি বর্ণনা করেন। আজ ভগিনী নিবেদিতা কীভাবে কলকাতা শহরে প্লেগ রোগাক্রান্তদের সেবা করেছিলেন সেই কাহিনি শোনানো হলো। আয়ারল্যান্ডের মেয়ে মার্গারেট নোবেল বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতে এসে দেশটাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। তখন কলকাতায় প্লেগের ভীষণ প্রকোপ। নিবেদিতা তাঁর যুবক ভক্তদের নিয়ে নিজের হাতে শহর পরিষ্কার করার দায়িত্ব নেন। রোগীদের সেবা করেছিলেন নিজের প্রাণের চিন্তা না করে। অথচ তিনি যখন দার্জিলিং শহরে মারা যান তখন তাঁর দুবেলা পেট ভরে খাবার মতো সংস্থান ছিল না। শুনতে শুনতে সোপানের চোখে জল এসে গেল। এবছরটাই তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পূর্ণ হলো। এই দুদিনেই সোপান সঙ্ঘের শাখার নিয়ম-কানুন কিছুটা শিখে গেছে। শাখা থেকে বের হয়ে আজ ওরা গ্রামের মূল দুটো রাস্তা পরিষ্কার করার কাজে লাগল। সব প্লাস্টিক এক জায়গায় করে রাখা হলো। কাগজ আর অন্য পচনশীল নোংরা আলাদা করা হলো। তারপর কাজ শেষ হলে, ঝাটা, বালতি, কোদাল জলে ধুয়ে আবার শাখার মাঠে ফিরে এলো। আজও প্রার্থনা করে শাখা শেষ হলো।

ওরা শাখা শেষ করে ফিরছে, দেখল বাড়ি থেকে ছোটমামা বাইক নিয়ে বের হচ্ছে। ওদের দেখে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ালেন মামা। 'কী রে সোপান, তোর এখন কী প্রোগ্রাম?'

'না, মানে আমার আবার কী প্রোগ্রাম?'

সোপান আমতা আমতা করে বলে।

'তবে চল আমার সঙ্গে, এক জায়গায় যাব।' মামা ইঙ্গিতে বাইকে উঠতে বলে।

ছোটমামা ঋক আর ঋজিককে বলেন, 'তোরা তো পড়তে বসবি। আমি সোপান দাদাকে নিয়ে যাই, কাল তোদের ভালো জায়গায় নিয়ে যাব। আজ দাদাকে দিয়ে একটু কম্পাউন্ডারের কাজ করাই।'

বাইকের পেছনে একটা ছোট হেলমেট ছিল। সেটা সোপানের হাতে দিয়ে ছোটমামা বলল, ' নে হেলমেট পরে নে।'

'এখানে হেলমেট পরতে হবে? এই গ্রামে পুলিশ কোথায়

যে ধরবে?'

'হেলমেটটা তোর সেফটির জন্য, পুলিশের সেফটির জন্য নয়। মেলা কথা বাড়াস না। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বাইক স্টার্ট দিয়ে দিল ছোটমামা। ব্রাহ্মণী নদীর উপরের লোহার সেতুটাই গ্রামের সীমানা। গ্রাম ছেড়ে বের হয়ে এলো মামা-ভাগ্নে। দু-পাশে ধানের ক্ষেত। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে। আকাশে অনেক রঙের মেঘ। পাহাড়ের মতো থরে থরে সাজানো। আর সূর্যের লাল আভা। দুটো দিকেই দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। মাঠের মাঝখানে কেবল একটা দুটো বটগাছ, পিপুল গাছ, তেঁতুল গাছ, কোথাও বা সারি দিয়ে তালগাছ।

সোপান মুগ্ধ হয়ে দেখছিল অস্তরবির শোভা আর প্রকৃতির সুষমা।

'বল তো এখন কোথায় যাচ্ছি?' মামা মুখ একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল।

'ওই যে বললে তোমার চেম্বারে যেতে হবে। আমাকে নাকি কম্পাউন্ডার হতে হবে।' বলল সোপান।

মামা আবার মুখ ফিরিয়ে একটু হাসলেন, 'আজ আমার চেম্বার বন্ধ। আর আমার চেম্বারে তো ওষুধ দেওয়া হয় না। কম্পাউন্ডার লাগে না। শুধু নাম লেখার জন্য একজন আছেন। আজ অন্য এক জায়গায় যাব।'

আধঘণ্টা চলার পর একটা ছোট গ্রামের মধ্যে ঢুকল মামার এনফিল্ড বুলেট। একটা বাড়ির সামনে এসে থামল বাইক। বাড়ির বারান্দায় একটা টেবিল পাতা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে আলো যে খুব জোরালো তা নয়, সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে সারি সারি বেঞ্চে লোক বসে আছে। এবার মামা খুলে বললেন, 'আসলে আজ সেবা দিবস তো তাই প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আমি বিনা পয়সায় রোগী দেখি। এই তিনটে গ্রাম খুব গরিব।'

গ্রামের দুটি ছেলে ব্রজেশ আর রাজীব সব ব্যবস্থা করে। ওরা এই গ্রামেরই ছেলে। ওরা অন্য ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে স্পেসিমেন স্যাম্পেল জোগাড় করে আনে। তুষারদা নামে একজন মাস্টারমশাই ছোটমামার প্রেসক্রিপশন দেখে বিনা পয়সায় ওষুধের পাতা দেন। আজ উনি আসেননি। তাই সোপানকে ওই কাজ করতে বলা। সোপান শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। 'মামা, আমি কি পারব? আমি তো কখনও করিইনি এমন কাজ।'

'পারবি না কেন? ইংরেজিতেই তো লেখা থাকবে। আর তিনচারটে কথা বলে দিচ্ছি। ধর 'বিডি' মানে হল....' এমন দু-তিনটে জিনিস ভালো করে বুঝিয়ে দিল ছোটমামা।

আজ সত্যিই একটা অভিনব অভিজ্ঞতা হলো সোপানের। সব রোগী দেখা হয়ে গেল। সবার ওষুধ দেওয়া গেল না। অনেক ওষুধই জোগাড় করা ছিল না। তাদের বলা হলো একটু কষ্ট করে কিনে নেওয়ার জন্য। সব মিলিয়ে সোপানের মনে হলো, আজ নিজের ক্ষমতায় একটা সত্যিকারের কাজের মতো কাজ করেছে। একটা গভীর আত্মবিশ্বাস অনুভব করল নিজের মধ্যে।

শেষ রোগীটিকে দেখে ছোটমামা ব্রজেশের দিকে তাকালেন হাসি মুখে, 'কি গো আর কেউ নেই তো?'

ব্রজেশ এগিয়ে এসে বলল, 'না, ডাক্তারবাবু। তবে রহিম ফকির এসেছে। ওর ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। আপনাকে চা খাওয়াতে নিয়ে যাবে। আপনি কি যাবেন?'

বলতে বলতেই রহিম ফকির বারান্দায় উঠে এলেন। একেবারে কান এঁটো করা হাসি হেসে বললেন, 'ডাক্তারবাবু চলুন তাহলে।'

ছোটমামা হেসে বললেন, 'চলো একটু চা খেয়ে আসি। তুমি এগিয়ে যাও, আমরা যাচ্ছি।'

রহিমচাচা চলে যাওয়ার পরে মামা বললেন, 'চল একবার ঘুরে আসি। না গেলে দুঃখ পাবে। এমনিতেই ফকিরদের মুসলমান সমাজের মধ্যে নীচু জাতি বলে মনে করা হয়।'

সোপান আকাশ থেকে পড়ল, 'কি? মুসলমান সমাজের মধ্যেও জাতপাত আছে নাকি? জাতপাত তো হিন্দুদেরই হয়।'

'হ্যাঁ, হয়। এমনকী ফকির সম্প্রদায়ের মানুষ মারা গেলে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে তাদের কবরও দিতে দেওয়া হয় না।'

রাজীব সমর্থন করে বলল, 'ডাক্তারবাবু ঠিকই বলছেন। কবর দেওয়া নিয়ে কিছুদিন আগেও গণ্ডগোল হয়েছিল। ফকিররা নীচু জাত বলে তাদের আলাদা কবরখানা করতে হবে। এইসব নিয়েই গণ্ডগোল।'

কথায় কথায় রফিক চাচার বাড়িতে পৌঁছে গেল ওরা। ঘরে ঢুকতে যাবে হঠাৎ বাইকের শব্দ। আধো আঁধারি গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাইকের আলো উঠোনে এসে থামল। 'তরুণমামা।' প্রায় চিৎকার করে উঠল সোপান। অদ্ভুত ব্যাপার, তরুণমামাকে দেখলে মনের মধ্যে যেন একটা আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

তরুণদা বাইক রেখে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এটা কী হলো রহিমদা? ডাক্তারকে নেমতন্ন হলো আর আমরা কি বানের জলে ভেসে এলাম?'

রহিমচাচা লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলল, 'আরে তরুণদা, আপনি আসবেন এ তো আমাদের সৌভাগ্য। এই গরিবের ঘরে আপনার। এসেছেন, কী আনন্দের...'।

রহিমচাচার ছেলে ইসমাইল ক্লাস নাইনে পড়ে। ওরই

With Best Compliments from -

Damiyaas Enterprises

(Banwari Lal Watch Co.)

*** Watches - TISSOT, CASIO**

*** Gold and Diamond Jewellery**

*** Gems**

1, Ambedkar Road

Ghaziabad - 201 001 (U.P.)

Mobile : 9871835848, 9213789652

With Best Compliments from -

Redox Pharmachem Pvt. Ltd.

Office : C-46, Defence colony
New Delhi - 110 024
India

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters, Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans, Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

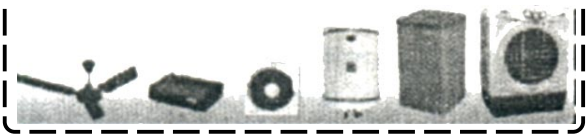

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

কঠিন অসুখ হয়েছিল। ওই থালায় করে করে খাবার নিয়ে আসছিল। ওদের ঘরের ভেতরে বসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নেই। সবাইকে খাটের উপরেই বসতে হয়েছিল। তরুণদা আসায় স্থান একটু কম হচ্ছিল। ইসমাইলরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। তরুণদা স্বাভাবিকভাবে বলল, 'সোপান আর রাজীব তোমরা খাটের উপরে উঠে যাও। আমরা খাটের সামনে বসছি।'

ওরা এটাকে বলে হাতঝাড়া পিঠে। গরম কড়াইতে সামান্য একটু তেল বেগুনের বোঁটা দিয়ে দিয়ে চালবাটার পাতলা গোলা হাত ঝেড়ে ঝেড়ে ছড়িয়ে দিতে হয়। ইসমাইলের মা অসাধারণ বানিয়েছেন পিঠেটা। সঙ্গে কষা কষা আলুর দম। পেঁয়াজ, রসুন দিয়ে এত সুন্দর হয়েছে, যেমন গন্ধ, তেমন স্বাদ। সোপান খেতে গিয়ে বলল, 'এ তো পুরো পেপার ধোসা, কী দারুণ বানিয়েছে চাচি।'

শুনে ভেতর থেকে চাচি বেরিয়ে এসে হাসাত হাসতে বললেন, 'এটাকে অনেকে সরুচাকলিও বলে, আরও দিচ্ছি।'

ওরা দুটো তিনটে করে পিঠে খেল। শেষের দিকে তালের গুড় দিয়ে। ইসমাইলদের চারটে তালগাছ। তালের রস থেকে বাড়িতেই তৈরি হয়েছে গুড়।

তরুণদা খেতে খেতে জানাল, 'ডাক্তার শনিবারের বর্গের জন্য সার্জারির ডাক্তারবাবু আর দুজন টেকনিশিয়ান রাজি হয়ে গেছেন।'

ছোটমামার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'গ্রেট। সার্জেন মানে ডা: উজ্জ্বল ভদ্র? উনিই কি আসছেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আজ চণ্ডীদা কলকাতায় গিয়ে কথা বলে এসেছেন।'

'বাঃ, দারুণ ব্যাপার। ডা: ভদ্র তো আমাদের মাস্টারমশাই ছিলেন। স্যারের সঙ্গে অনেকদিন পরে আবার দেখা হবে।'

'কাল ব্যবস্থা বৈঠক হবে সন্ধ্যায়। মোট পঁয়তাল্লিশ জন শিক্ষার্থী থাকবে। খাওয়া-দাওয়া থাকার ব্যবস্থা সব করতে হবে।'

রহিমচাচা, সুফিয়া চাচিদের থেকে বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। রাজীব আর ব্রজেশের টিউশন আছে, ওরাও বিদায় নিল।

তরুণমামা বাইকে উঠে বলল, 'ডাক্তার আজ তো চেম্বার বন্ধ। ভাগ্নে এসেছে কাল, আর আমার বাড়িতে একবার গেল না, এটা কেমন হবে? একবার চলো, আমার গরিবখানায়।'

ছোটমামা একটু ভেবে বলল, 'বেশ একবার নিবাসে যাওয়াই যায়।'

তরুণমামা বাড়িটা বেশ বড়সড়। দোতলায় অনেকগুলোই ঘর। কয়েকটা ঘরে ছেলেরা পড়াশুনাও করছে। কিন্তু কোনও মহিলা নেই। সোপানের কেমন যে একটু অদ্ভুতই লাগল। কিন্তু প্রতিটি জায়গা একেবারে পরিপাটি করে সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সোপানের কৌতূহল হলো, 'তরুণমামা বাড়িতে কে কে আছেন?'

তরুণদা একটু যেন রহস্য করে বলল, 'বাড়িতে? আমি আর আমার কয়েকজন ভাই থাকি।'

'আর মা-বাবা?'

'মা-বাবা কোচবিহারে থাকেন। ওখানে এক দাদা, বৌদি আর এক বোনও আছে।'

ছোটমামা এগিয়ে এসে বললেন, 'আরে তরুণদা তো প্রচারক। সংসার, বাড়ির সকলকে ছেড়ে দেশের কাজের জন্য বের হয়ে এসেছে। এটা সঙ্ঘের কার্যালয়, মানে অফিস। আমরা বাংলাতে এই বাড়িকে বলি 'নিবাস'। আর কয়েকজন এখানে থেকে পড়াশুনা করে। ওরাও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক।'

তরুণদা তখনও মিটিমিটি হাসছে, 'এই ছেলেরা সবাই কলেজে পড়াশুনা করে। এই নিবাস রামপুরহাট স্টেশনের খুব কাছে। তাই যাদের শহরে বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য নেই, গ্রামের সেই স্বয়ংসেবকরা এখানে থেকে পড়াশুনা করে।'

বাড়িটার পিছনে একটা সুন্দর চারকোণা মাঠ। মাঠটা ঘিরে কি যেন একই গাছ লাগানো। ইলেকট্রিক আলোতে ফুল গাছ কী অন্য কোনও গাছ ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তরুণমামা মাঠটা দেখিয়ে বলল, 'এই মাঠে সকালে একটা শাখা হয়, আর বিকালে আর একটা শাখা। যারা অফিসে কাজ করে, ব্যবসা করে, কলেজে পড়া তরুণ ছেলেরা সকালবেলার শাখায় আসে। আর স্কুল কলেজের ছাত্ররা আসে বিকেলের শাখায়।'

সোপান ঘুরে ঘুরে দেখছিল বাড়িটা। নীচে একটা বড় হলঘর। হলের একদিকের দেওয়ালে স্বামী বিবেকানন্দের ছবি। ধ্যানমুদ্রায় বসা বিশাল প্রতিকৃতি। তার নীচে একটা পিলসুজের উপর একটা প্রদীপ। কিন্তু দুদিকের দেওয়ালে দুজনের বড়ো ছবি। একজন গোঁফওয়ালা কালো টুপি করে, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো দাড়ি কিন্তু চোখে চশমা। ফটোর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সোপান। ছোটমামা কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, দাঁড়া তোকে এনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ওই যে কালো টুপি মাথায়, মোটা গোঁফ উনি হলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার। উনি কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন। সেই সময় কলকাতা ছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রাণকেন্দ্র। কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার আসলে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হতে

চেয়েছিলেন। ডাক্তারি পড়াটা আসলে ছিল ছুতো। কলকাতায় এসে উনি পুলিনবিহারী দাসের অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। ১৯১৯ সালে দামোদরের বন্যার সময় কেশব রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সেবাকাজে দিনরাত এক করে দিয়েছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন। তিলকের মৃত্যুর পর ১৯২৫ সালে একটি প্রচারবিমুখ নিঃস্বার্থ সংগঠন তৈরি করে, যা আজ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।'

তরুণদার সঙ্গে একটি ছেলে হলের মধ্যে ঢুকল। একটা প্লেটের মধ্যে দুটো গ্লাসে পুদিনার সরবত। সরবতের গ্লাস দুটো মামা আর ভাগ্নের হাতে দিয়ে বললেন, 'গরিবের ঘরে সামান্য একটু সরবত, বেশি কিছু দিতে পারলাম না।' সবাই হেসে উঠল।

সোপান সরবতের গ্লাস হাতে দ্বিতীয় ছবির সামনে দাঁড়াল। ঋষিদের মতো বড় দাড়ি, সাদা পাকা, চশমার ভেতরের চোখটা অতি গভীর,'আচ্ছা, উনি কে?'

'ইনি মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে সেখানেই অধ্যাপনা করতেন। সেখান থেকে বাংলায় আসেন। রামকৃষ্ণ মিশনের একটা আশ্রম আছে মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে। সেখানে বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে আশ্রমেই থাকতেন। অখণ্ডানন্দজী দেহ রাখার আগে মাধব গোলওয়ালকরকে মহারাষ্ট্রে ফিরে সামাজিক কাজ করতে বলেন। মাধব আগে থেকেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেনারসে অধ্যাপনা করার সুবাদে তাঁকে সবাই গুরুজী বলত। উনি সারগাছি থেকে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। উনি হয়েছিলেন দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক, মানে সংগঠনের প্রধান।'

সোপান এই মহাপুরুষদের নামই কখনও শোনেনি। ওর অবাক প্রশ্ন, 'আমরা ইতিহাসে তো এনাদের কথা পড়িনি।'

'হ্যাঁ, এনাদের জীবনীও আমাদের পাঠক্রমে পড়ানো উচিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দেশ ছেড়ে যাওয়ার আগে ডা: হেডগেওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন নাগপুরের রামভাউ রুইকর।' ছোট মামা বলতে বলতে কেমন আবেগপ্রবণ হয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। তরুণদা নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠল, 'আমাদের দেশের ইতিহাসটা কতটা ঠিকঠাক পড়নো হয় ডাক্তারবাবু? ক্ষুদিরাম বসু আজকের পাঠ্যপুস্তকে হয়ে গেছেন সন্ত্রাসবাদী। সেদিন এক শিক্ষিত মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে আমার একটু...'

তরুণমামা যে ঘটনা বলল শুনে সোপানের বুকের মধ্যে যেন রক্ত ছলকে উঠল। তারাপুরে এক রাজনৈতিক নেতার ছেলে শাখায় আসত। ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান ছিল, যোগ ব্যায়াম, সুভাষিত আবৃত্তি দারুণ করত। কিছুদিন পর থেকে ছেলেটি আসা বন্ধ করে দিল। কয়েকদিন দেখে তরুণমামা একদিন ছেলেটির বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেল। তরুণমামাকে দেখে ওই ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কেন আমার ছেলের সময় নষ্ট করাচ্ছেন। শাখার মাঠে গিয়ে কি ও চাকরি পাবে, না সার্টিফিকেট পাবে? আমার ছেলেটা কি ক্ষুদিরাম হবে?'

ক্ষুদিরামের নাম শোনার পরে তরুণমামা নাকি কিছুক্ষণ চুপ করে গিয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, 'দাদা ক্ষুদিরামকে আপনি বোধহয় ঠিকঠাক বোঝেননি, ক্ষুদিরামের মতো স্বার্থহীন দেশভক্ত প্রকৃত অর্থেই ক্ষণজন্মা। পরিবারে একজন ক্ষুদিরাম জন্মাবার জন্য কয়েক প্রজন্মের সাধনা প্রয়োজন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার বাড়িতে ক্ষুদিরাম জন্মাবে না!'

মা আজ সকালে তারাপীঠে যাবেন ঠিক করেছিলেন। কিন্তু সক্কাল সক্কাল একটা বিপত্তি শুরু হয়ে গেল। কাল রাত থেকে সোপান বায়না ধরেছে যে, শনিবারের ক্যাম্পে ও শিক্ষার্থী হয়ে যাবে। দুদিনের ওই শিবিরে ফাস্ট এইড অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিসের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। মাধ্যমিক পরীক্ষা হলো ন্যূনতম যোগ্যতা। তাই সোপান একেবারে কানের পাশ দিয়ে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে অংশ নিতে পারবে। কলকাতা থেকেও স্পেশালিস্ট ডাক্তারবাবুরা আসছেন। আর কাল সারাদিন সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজকর্ম দেখে সোপান তো একেবারে টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু মা একেবারে পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'না! কখনো না! তুই এই বাড়ির বাইরে কোথাও যাবি না। এসব করলে তোকে সঙ্গে করে আমি নিয়ে যাবো। এখানে থাকতেই হবে না।'

সোপানও নাছোড়বান্দা। 'না, যাবই আমি। একটা ভালো জিনিস, শেখার জিনিস....

মা চোখ বড় বড় করে ধমক দিলেন। 'একদমই না। তোমার বাবাকে আমি এসব বলতে পারব না। তাছাড়া এসব

আমাদের ওখানেও হবে, তখন...'। তারপর কী মনে হওয়ায় সোপানকে ছেড়ে দিয়ে ছোটমামাকে একহাত নিতে শুরু করলেন, 'এই শ্রীকান্ত, তুই একে এসবে নাচিয়েছিস কেন রে? তোর জামাইবাবু শুনলে খুব রাগ করবে।'

ছোটমামা যে এভাবে পাল্টি খেয়ে যাবে সোপান তা স্বপ্নেও ভাবেনি। ছোটমামা বলল, 'না, না। আমি তো যেতে বলিনি। ঠিকই তো এরকম ক্যাম্প তোমাদের ওখানেও নিশ্চয়ই হবে। তোর এই ক্যাম্প করতে হবে না।'

তারপর মাকে বলল, 'তুমি এসব নিয়ে বকাবকি করবে না। পুজো দিতে যাবে? হেমন্তদা গাড়ি রেডি করে অপেক্ষা করছে, তাড়াতাড়ি চলো।'

গাড়ি চলল তারাপীঠ মন্দিরের দিকে। রাস্তাতেও মা দু-তিন বার সোপানকে 'একদম ওইসব করবি না, বাবাকে বলে দেব, তোর এখানে থাকতেই হবে না— আমার সঙ্গে ফিরে চল কাল।' ইত্যাদি প্রভৃতি বলে শাসিয়েছেন।

আজ তারা মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে মা খুব খুশি হয়েছেন। অনেকেই ছোটমামার পরিচিত। একেবারে বড়ো রাস্তা থেকে পুজোর ডালার দোকান কী কেউ বলছে ডাক্তারবাবু, কেউ বা শ্রীকান্তদা। যেই শুনছে ডাক্তারবাবুর দিদি, তো একেবারে বিশেষ ট্রিটমেন্ট। মা পুজো দিয়ে খুশি খুশি মুখে বললেন, 'এই একটু কচুরি আর জিলিপি খাবি নাকি?'

বাড়িতে ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। দুপুরে খেতে খেতে দেড়টা। ভাই-বোন সবাই ঘুমোচ্ছে। সোপানের ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল না। ও উঠে পাশের ঘরে গেল। উপরের ঘরের জানালাগুলো খুব বড় বড়। প্রায় মেঝে পর্যন্ত জানালাগুলো।

ধ্যুস্ মা-টা না কিছু বোঝে না। নিজে তৈরি না হলে মানুষের সেবা করবে কী করে? দেশে কত মানুষের বিপদ, কত আর্ত মানুষ। নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি? চোখ ভরে জল এসে গেল। সামনের পুকুর, নারকেল গাছ, সুপারি গাছ... সব ঝাপসা হয়ে আসছে।

হঠাৎ কে যেন সোপানের কাঁধে হাত রাখল। চোখটা মুছে সোপান পিছন ফিরল, মা!

'মন খারাপ? ঠিক আছে ক্যাম্পে যাস। তবে খুব সাবধানে থাকবি। তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

সোপান, 'মাগো,' বলে জড়িয়ে ধরল। মা ওর মাথায় হাত দিয়ে আদর করতে লাগলেন। 'যা একটু শুয়ে নে। সেই সকালে উঠেছিস।'

আজ বিকেলে শাখায় গিয়ে দেখে শাখায় অনেক ছেলে এসেছে। আজ সোপান দেখল, সংখ্যা বেশি হলে শাখায় তিনটে আলাদা গণ হয়। যুবকদের ব্যায়াম, খেলা সব আলাদা আলাদা ভাবে হয়। আজ যুবকদের গণে প্রথমে কিছুক্ষণ লাঠি খেলা হলো, তারপর জোরদার কবাডি খেলাতে মেতে উঠল যুবকরা। একদিকের দল চিৎকার করে স্লোগান দিচ্ছে, 'জয় শিবাজী'। উল্টো দিকের দলও চিৎকার করে উত্তর দিচ্ছে, 'জয় ভবানী।' তারপরেই 'কবাডি কবাডি কবাডি' বলে এক একজন এগিয়ে আসছে। বালকদের গণে বেশিটাই খেলা হলো। সঙ্গে সামান্য যোগাসন। একটা খেলা ভীষণ মজার। খেলাটার নাম 'রাজা সাজা।' দুটো দলে দুজন রাজা সাজবে। মানে রাজা বলে ঠিক হবে। সৈন্যরা রাজাকে ঘিরে থাকবে। বিরোধী দলের সৈন্য এসে রাজাকে ছুঁতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন যদি রাজার সেনারা সেই ছেলেটিকে ধরে যদি রাজার কাছে নিয়ে আসতে পারে, আর রাজা যদি তার মাথায় হাত দিয়ে দেয় তো সে এই পক্ষের সৈন্য হয়ে যাবে। বিরোধী সেনা যখন আক্রমণে ব্যস্ত তখন প্রথম দলের তিনজন হাট্টাকাট্টা বালক চুপি চুপি বিপক্ষ দলের রাজাকে পাঁজাকোলা করে তুলে এপারে নিয়ে চলে এল। আর এই পক্ষের ছেলেরা জয়োল্লাস করে উঠল, 'জয় মা ভারতী, জয় জয় কালী।'

শিশুদের গণটাই সবচেয়ে মজার। দু-একজন তো একেবারে 'বর্ন লিডার।' ওরাই বন্ধুদের ঠিকঠাক করে লাইনে দাঁড় করাচ্ছে। একটা খেলা হচ্ছিল, তার নাম, 'ম্যায় শিবাজী'। ছোটছুটি খেলা আরও একটা হলো 'নমস্তে মহারাজ'। মনে রাখা আর রিফ্লেক্সের খেলা 'স্বামীজী আর নেতাজী' হয়ে গেল। খেলা শেষ হলে বাচ্চারা সেই প্রথম দিনের মতো 'হাতি-ঘোড়া-পাল কী / জয় কানাইয়া লাল কী।' বলতে বলতে গোল হয়ে দাঁড়াল। তারপর ওদের জন্য একজন দাদা একটা সুন্দর গল্প বলল। স্বামী বিবেকানন্দ যখন ছোট্ট ছেলে, সেই ছোট্ট নরেন কিভবে একজন আহত ফিরিঙ্গি বণিককে শুশ্রূষা করেছিলেন সেই কাহিনি শোনানো হলো।

তারপর যুবক বালক আর শিশুদের গণগুলো লাইন করে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আত্মপরিচয়' থেকে পাঠ করে অমৃতবচন শোনানো হলো। একটা সংস্কৃত শ্লোক আর তার মানে বলে 'সুভাষিত' শোনানো হলো। সবশেষে প্রার্থনা করে শাখা শেষ হলো।

আজকের সন্ধ্যাটা সোপানের বহুদিন মনে থাকবে। মা কাল সকালে চলে যাবেন, তাই মেজমামিমা উদ্যোগ নিয়েছেন এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। লাল মেঝের যে বারান্দাতে খাওয়া হয়, সেই জায়গাটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। সাজানো হয়েছে শুধু লতা, পাতা আর ফুল দিয়ে। সবই বাড়ির বাগান থেকে সংগ্রহ করা। কলাপাতায় সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন,

ARYA TOURIST LODGE

Just 5 Minute walk from N.D. Rly. Station

Only 1 km. from Connaught Place

Homely Atmosphare

Day & Night Taxi Facilities

8526, Ara Kashan Road

Ram Nagar, New Delhi - 110055

Phones : 23622767, 23623398, 23618232

STD : 23530775, 23533398,23618232 **Cont : 9811044543**

E-mail : arya_tourist_lodge@yahoo.co.in **Fax : 91-11-23636380**

Phone : 2573 0416
2572 4419

BIKANERVALA

10181-82, Chowk Gurdwara Road
Karolbagh
NEW DELHI-110005

Our Speciality

PISTA LAUJ & BADAM KATLI,
BENGALI SWEETS & NAMKEENS

আমপাতার ঝালর, লাল অশোক ফুল, বেগুনি রংয়ের জারুল, লাল কৃষ্ণচূড়া, গোলাপি রাধা চূড়া ফুল দিয়ে এত সুন্দর সাজানো হয়েছে যেন জায়গাটায় অপরূপ লাবণ্য ছড়িয়ে পড়েছে। আজও তিন মামা তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছিলেন। বড়মামা তো একেবারে কোঁচানো ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি পরে নেমে এসেছেন। মা আজ খোঁপাতে একটা ধবধবে সাদা ও বড় গন্ধরাজ ফুল দিয়েছেন। বড়মামি টিপকে নাচের জন্য সাজাচ্ছিলেন, তাই তৈরি হয়ে আসতে একটু দেরি হলো। মেজমামিই ঘোষিকা। একটা ছোট্ট ধ্বনিবর্ধক যন্ত্রও জোগাড় করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরু হলো সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। ঋক যে সংস্কৃত শ্লোক এত সুন্দর গাইতে পারে না শুনলে ধারণাই করতে পারত না সোপান। ঋজিক একটা নজরুল গীত গাইল এর পরেই। বড়মামি অবশ্য হারমোনিয়াম বাজিয়ে দিলেন। 'বল রে জবা বল / কোন সাধনায় পেলি রে তুই / শ্যামা মায়ের চরণতল।'

এটা দিদার খুব পছন্দের গান। অনুষ্ঠান জমে গেল। এরপর দেবাদ্রিতার নাচ। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে নাচল টিপ। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর।' বড়মামির গলায় গানটাও সুন্দর লাগল। সঙ্গে ছোটমামার তবলা সঙ্গত। মা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ আবৃত্তি করলেন। গান, কবিতা, ভাষ্য সবেতে মেজমামির অনুষ্ঠান হাততালি, হাসি, কোলাহলের মধ্যে এগিয়ে চলল।

মেজমামি বললেন, 'দিদি মেঘে ঢাকা তারা'র ওই গানটা একবার গাও না।'

বড়মামি গান ধরলেন, 'আম পাতা ঝালর ঝোলর কলা তলায় বিয়া।'

গানটা শেষ হবার পর সকলে লক্ষ্য করল দাদুর চোখে জল। সারা ঘরে কোলাহল একেবারে থেমে গেল। মেজমামা খুব নরম স্বরে বলল, 'বাবা'। দাদু এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। একটু সামলে নিয়ে বললেন, 'এই গানগুলি শুনলে দ্যাশের বাড়ির কথা মনে পইড়্যা যায়। আজও বুঝলাম না কী অপরাধে আমরা চোদ্দপুরুষের দ্যাশ ছাড়লাম।'

সকলে তখন বাংলাদেশ থেকে দাদু-দিদার এদেশে আসার কথা বলতে থাকলে। দাদুরা ওদেশ থেকে এসে ওড়িশার মালকানগিরিতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। সেখানে খুব কষ্ট। বড়মামার পরে এক মাসি ছিল। সেই মেয়েটা ওই উদ্বাস্তু শিবিরের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মারা গেছে। তাই মামাদের কোনও রাগ নেই। কখনও এক হলে অনেক কথার পরে এবাড়িতে অবধারিতভাবে এই আলোচনা আসবেই। সোপানের ভালো লাগছিল না। এত সুন্দর অনুষ্ঠানটা মাটি হয়ে যাচ্ছে।

সোপান একটু ইতস্তত করে বলেই দিল, 'তোমরা সবসময় ঘুরে ফিরে ওই কষ্টের দিনের কথা বলো কেন? সে তো কবেই শেষ হয়ে গেছে।'

মেজমামা খুব শান্ত স্বরে বললেন, 'কষ্টের দিনের কথা বারবার বলতে হয়। কষ্টের কারণ খুঁজতে হয়, না হলে কষ্ট আবার ফিরে আসে।'

তারপর বড়মামার দিকে ফিরে বললেন, 'জানো দাদা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদিদের উপর অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে জার্মানি, আমেরিকায় কম করে হাফ ডজন হলোকাস্ট মিউজিয়াম হয়েছে। সেখানে ইহুদি বাচ্চারা যায়, ইতিহাসকে জানে, দেশভাগের পর থেকে পূর্ববাংলায় যে কত নরসংহার হয়েছে তার তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ সংরক্ষণের জন্য আমাদের এখানেও হলোকাস্ট মিউজিয়াম হওয়া উচিত।'

বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি এলো। বড়মামী উঠে পড়ে বললেন, 'যাই রান্নার তো কিছু হয়নি। ও যশোদাদি একটু শোন...'

মা কোনও জায়গায় চলে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায় সোপানের। আজ সকালে মা কলকাতায় ফিরে গেলেন। ধন্যধান্য এক্সপ্রেস ছেড়ে দিলে তরুণমামা ছোটমামাকে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনি চেম্বারে চলে যান, সোপান নিবাসে থেকে যাক। দুপুরে খেয়েদেয়ে ফিরবেক্ষণ।'

'দিদি চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে হুজ্জুতি করতে দিলে আমাকে খেয়ে ফেলবে সকলে মিলে।'

'আরে না, না। ও এখন বাড়ি গেলে ভাই-বোনেদের লেখাপড়ার ডিসটার্ব করবে। বলতে হবে এর জন্য ওকে বাড়িতে পাঠানো হয়নি।'

ছোটমামা হেসে বলল, 'হুম্। বুঝেছি।'

সন্ধের নিবাসে এসে দেখল, সবাই রান্নার ব্যবস্থা করবে। নরেন, ব্রজেশ, দুর্লভ, পরিমল আর দশরথ এই ক'জন ছাত্রই এখানে থাকে। ঝটপট কেউ সবজি কাটছে, দুজন হাঁড়ি কড়াই মেজে দিচ্ছে, একজন বড় বালতিতে করে রান্নার জল তুলে আনল। এর মধ্যে রান্নার মাসি এসে গেলেন। রান্না বসে গেল। ছেলেরা রান্না আর খাওয়ার জায়গা পরিষ্কার করে স্নান করতে

চলে গেল। খানিকপরে স্নান করে পরিষ্কার জামা কাপড়ে ওরা খেতে বসল আসন পেতে। একজন পরিবেশনে মাসিকে সহযোগিতা করল। তারপর নিজেও খেতে বসে গেল। খাওয়ার পরে যে যার থালা বাসন ধুয়ে জায়গায় রেখে দিল জল ঝরিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যে খাওয়ার পর্ব শেষ। যে যার মতো কলেজে চলে গেল। এরমধ্যে দুর্লভদা মানে দুর্লভ টুডু নাকি খুব ভালো ছাত্র। রামপুরহাট কলেজে ফিজিক্সে অনার্স পড়ে। তরুণমামার কথামতো সোপানও একটু ভাত খেল। মুসুর ডাল, পাঁচমিশালি তরকারি আর দেশি আমড়ার চাটনি হয়েছে। ক্ষিদেও পেয়েছিল খুব। তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে নিল সে।

কলেজের ছেলেরা চলে যাওয়ার পর তরুণমামা এসে বসল। তরুণমামা আসতেই সোপানের প্রশ্ন, 'দুর্লভদা এখানে কতদিন ধরে আছে?'

'দেড় বছর হলো। গ্র্যাজুয়েশনে ভর্তি হওয়ার পর থেকে। খুব ভাল ছেলে। আশা আছে বিএসসিতে খুব ভালো করবে।'

'এত ভালো ছেলে, এখানে থাকে কেন?'

'ওর বাড়ি এমনিতে অনেক দূরে একটা বনের গ্রামে। তাছাড়া ও হলো ফাস্ট জেনারেশন লার্নেড। ওর পরিবারের কেউ কখনও পড়াশুনা করেনি। ওর বাবা আর মা দুজনেই কেন্দুপাতা কুড়িয়ে সংসার চালায়। দুর্লভ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের আবাসিক বিদ্যালয়ের ছাত্র।'

এই নামটাও কখনও শোনেনি সোপান।

'বনবাসী কল্যাণ আশ্রমটা কী মামা?'

তরুণমামা ধীরে ধীরে বোঝালেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে জঙ্গলে যে তপশিলি উপজাতির মানুষ থাকেন, তাদের বলা হয় বনবাসী। ইংরেজরা নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য আর্যদের ভারত আক্রমণের তত্ত্ব প্রচলন করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ আর্য আক্রমণের তত্ত্ব মানতেন না। আজকের বিজ্ঞানীরাও মনে করেন, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি। আর্যরা বাইরে থেকে এসে এদেশের উপজাতিদের তাড়িয়ে, মেরেকেটে নতুন সভ্যতা স্থাপন করেছে সেই তত্ত্বই যদি মিথ্যা হয়, তবে বনে থাকা জনজাতি আদিবাসী আর বাকি ভারতীয় বহিরাগত হবে কেন? বনে থাকা ভারতীয় আমার রক্ত, আমার ভাই। তারা বনবাসী। কিন্তু বনবাসীদের অবস্থা তো খুব খারাপ। না শিক্ষা, না স্বাস্থ্য, না খাদ্য— আমাদের ওই ভাইয়েরা কত কষ্টে আছে। তাদের সেবা করে, শিক্ষায় উপার্জনে স্বনির্ভর করাই এখন প্রয়োজন। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম স্কুল বানিয়ে, প্রায় নিঃশুল্ক হোস্টেল তৈরি, কোথাও বা একজন শিক্ষকের স্কুল চালিয়ে এই কাজ লাগাতার করে যাচ্ছে। যেখানে স্কুল নেই, সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা মতো শিক্ষা নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছে 'একল অভিযান'। মানে ওয়ান টিচার্স স্কুল। দুর্লভও ওই কল্যাণ আশ্রমের ছাত্র।

সোপান মন দিয়ে শুনছিল। সত্যি দেশের কত রকম মানুষ, মানুষের কত কষ্ট, কত মানুষের কত প্রয়োজন। কত সেবা করা যায়। মানুষের মতো মানুষ হওয়া...

'বাকি ছেলেরা কোথা থেকে এসেছে?'

'সকলেই প্রায় গরিব ঘরের ছেলে। একসঙ্গে ভাইয়ের মতো আছে। পড়াশুনা করছে, সমাজসেবা করছে।'

'তা এদের খাওয়া পড়ার খরচ কে দেয়? তোমাদের সংগঠন?'

'না। এরাই দেয়। মানে এদের দাদারা। এদের সকলেই জানে যে সব্বাইকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এমন ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যেন নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও একটু ভার বইতে পারে। তাই চাকরি পাওয়া বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ছাত্রের তিন বছরের পড়াশুনা, খাওয়া, পোষাক, পরীক্ষার খরচের দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা বলি এক প্রদীপ থেকে আর একটা প্রদীপ জ্বালানো।'

'কিন্তু মামা, কেউ যদি কথা না রাখে?'

তরুণমামা হেসে ওঠে, 'আজ পর্যন্ত তো সকলেই কথা রেখেছে। ভবিষ্যতে এমন কিছু হলে দেখা যাবে। হয়তো এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাবে।'

তারপর একটু ভেবে বলল, 'আসলে কী জানো, বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। মানুষের মধ্যেই তো সাক্ষাৎ দেবতা আছেন। তাই ভালো কিছু দেখলে মানুষের ভেতরের দেবতা প্রকাশিত হয়। তাই হয়তো কেউ কেউ ফাঁকি দেওয়ার কথা ভাবেই না।'

আজ সারাদিন ঠাই সঙ্ঘের নিবাসে কাটল। নিবাস মানে কার্যালয় বা অফিস। এখানে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি আছে। ছোটদের কমিক্স, বোধকথা, হিতোপদেশ, বড় কাহিনির বই যেমন আছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী আর দেশভক্তির অনেক বই। গুরুজী গোলওয়ালকরের লেখা 'চিন্তাচয়ন' বইটা সারা দুপুর ধরে পড়ল সোপান।

আজ বিকালে রামপুরহাট নগরের শারীরিক বর্গ ছিল। বিকেল ৩টে থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে স্বয়ংসেবকরা আসা শুরু করল। কেউ কেউ ড্রেস পরেই এসেছিল। অনেকে নিবাসে এসে নিজের বাড়ির মতো করে সাধারণ পোশাক ছেড়ে সঙ্ঘের পোষাক পরে নিল। তরুণমামাকে এই প্রথম সঙ্ঘের পোশাকে দেখল সোপান। সাদা জামা, খয়েরি রঙের ফুল প্যান্ট, বেল্ট, মাথায় কালো টুপি আর কালো বুট জুতো। তরুণমামার চোখে

একটা চশমাও আছে। প্রথমবার দেখে একদম নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কথা মনে এলো। যেন ঘোড়ার থেকে নেমে এসেছেন এইমাত্র। এই পোশাককে বলে সঙ্ঘের গণবেশ। এই গণবেশে প্রায় পঞ্চাশজন যুবক দেড় ঘণ্টা ধরে লাঠি খেলল, ব্যায়াম করল, যোগাসন অভ্যাস করল। তারপর সংস্কৃত সুভাষিত, আবৃত্তি হলো। তারপরে বুকে হাত রেখে প্রার্থনা।

'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে....'

শারীরিক বর্গের পর সবাই ধীরে ধীরে মাঠ ছেড়ে যেতে লাগল।

তরুণমামা চেঁচিয়ে বলল, 'দশরথ এদিকে একবার আসবে।'

দশরথ লেট সামনে আসার পর তরুণমামা হাসতে হাসতে বলল, 'কি দশরথ ভালো করে অভ্যাস করেছিস তো?'

দশরথ মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। তারপর কী একটু ভেবে বলল, 'দাদা, আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'

'ধ্যুত! ভয় আবার কী? এই কাজই তো আজ করতে হবে আর সাহসের সঙ্গে করতে হবে।

আজ ধুতি পরে যাবি। আমার আলমারির দ্বিতীয় তাকে আছে নিয়ে আয়। ঝকাস করে পরিয়ে দিচ্ছি।'

সোপানের খুব আগ্রহ হলো। কোথায় যাবে এরা? কী এমন সাহসের কাজ?'

একবার সাহস করে বলেই ফেলল, 'কী গো মামা? কোথায় যাবে তোমরা?'

তরুণমামা কী একটা ভাবলেন। তারপর বললেন, 'আজ আমরা সমাজের একটা অসুখের ট্রিটমেন্ট করতে যাচ্ছি। সেদিন তোমার মামার বাড়িতে দশরথের এক পংক্তিতে খাওয়া দেখে আমার মাথায় একটা আইডিয়া খেলে গেল।'

সোপানের অনুরোধের পরে তরুণমামা পরিকল্পনার কথা বলল। এখান থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে একটা গ্রাম চণ্ডিপুর। সেখানে একটি শিবমন্দির আছে। বহু পুরাতন মন্দির। নাম ভৈরবেশ্বর মন্দির। চণ্ডিপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির পারিবারিক মন্দির। কিন্তু খারাপ ব্যাপার হলো, ওই মন্দিরে আজও নীচু জাতির মানুষের প্রবেশ নেই।

এই পরিবারের দুই জমজ ভাই এখন প্রতিদিন সঙ্ঘের শাখায় আসে। দুজনে একসঙ্গে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রথমবর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে। এইসব

প্রশিক্ষণবর্গ একুশ দিনের হয়। সেখানে ব্যায়াম, লাঠি, ক্যারাটে এমন প্যারা মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সঙ্গে দেশভক্তির পাঠ দেওয়া হয়। ওরা ক্যাম্প থেকে ফিরেই নিজেদের পরিবারে এমন মধ্যযুগীয় কুপ্রথা বন্ধ করে দিতে চায়। ভৈরবেশ্বর মন্দিরে সবাই যেন ঢুকতে পারে। কিন্তু রাজি হচ্ছেন না ওদের জেঠু। জেঠু নিজে একটা স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষক ছিলেন। তরুণমামার পুরো নাম তরুণ মুখোপাধ্যায়, মানে ব্রাহ্মণ, তাই তরুণমামাকে খুব পছন্দ করেন জেঠু। তাই শেষ যেদিন গিয়েছিল তরুণদাকে সূত্রধরের কথা বলেছিলেন। সূত্রধর পুজোর সময় স্তোত্রপাঠ করেন।

সব শুনে সোপান বলল, 'আমিও যাব।'

'একদম নয়।' পরিষ্কার উত্তর দিল, 'তুমি যেতে পারবে না, তোমার ছোটমামা এখনই আসবে তোমাকে নিতে।'

কিন্তু সোপান নাছোড়বান্দা। 'আমি যাব। প্লিজ, দেখব গিয়ে ওখানে।'

শেষে কিছুটা বাধ্য হয়েই ছোটমামাকে ফোন করল তরুণমামা। 'এই যে ডাক্তার, তোমার ভাগ্নে কথা শুনছে না। আমাদের সঙ্গে চণ্ডিপুরে যাবে বলছে। কী করব?'

তারপর অনেকক্ষণ কথা হল। মাঝে একবার তরুণমামা বলে উঠল, 'আরে আমি তো বারণই করছি। ধ্যুত বাবা!' সবশেষে বোঝা গেল অনুমতি পাওয়া গেছে।

বুঝে সোপান একটু নেচে নিল, 'ইয়াহ্, যাবই যাব, যাবই যাব।'

চণ্ডিপুরের ভট্টাচার্য বাড়ির যে দুটি ছেলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক, বদ্রীপ্রসাদ ওদের নিতে এসেছিল। মোট দুটো বাইকে ওরা চারজন পৌঁছল সেই দ্বাদশ শিবমন্দিরে। একটা বিরাট ঝিলের ধারে ওই বারোটি শিবমন্দির। মাঝখানে একটি বড় মন্দির, তার দুই পাশে বাকি মন্দিরগুলি।

মন্দিরের পাশেই বাড়ি। পুরাতন দুই মহল্লার বাড়ি। বৈঠকখানা ঘরে বসেছিলেন রামরতন ভট্টাচার্য, বদ্রীপ্রসাদ আর কেদারপ্রসাদের জ্যাঠাবাবু। তরুণমামা ঘরে ঢুকতেই জেঠু বলে উঠলেন, 'আরে মুখুজ্জেবাবু যে, এসো এসো। আসতে আজ্ঞা হোক।'

তরুণমামা এগিয়ে জেঠ্যুকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। সোপান, দশরথও দেখাদেখি পায়ের ধুলো নিল।

'হ্যাঁরে বদ্রী, মুখুজ্জের জন্য চা বলেছিস? জেঠিমাকে জিজ্ঞাসা কর তো একটু সাবুর পাপড় আর শুকনো খোলায় বাদাম ভেজে দিতে পারবে কিনা?'

সকলে মিলে জেঠুর সামনে পুরাতন বড় বড় সোফাতে বসল।

'জেঠু এই আপনার সূত্রধর আনলাম। সামনের রুদ্রাভিষেকের দিন এ আপনার মন্দিরে স্তোত্রপাঠ করবে। ও এখনও ছাত্র, তবে আপনি বললে সময় সময় এসে যাবে।'

'বাঃ বাঃ! খুব ভালো। তা বাবা একটু শোনাও তো দু-একটা শ্লোক।'

'জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্যের শিবাষ্টক শ্লোক শোনাই?'

এই প্রথম কথা বলল দশরথ।

'খুব ভালো। আদি শঙ্করাচার্যের শিবমহিমা আর শিবাষ্টক শ্লোক তো অসাধারণ।'

দশরথ পরম ভক্তিভরে শুরু করল,

'প্রভুশীশ মনীশ মহেশ গুনম্...'

অসাধারণ আবৃত্তি করছে দশরথ। পুরো বৈঠকখানা ঘর গমগম করছে।

'অসাধারণ বাবা, অসাধারণ হয়েছে। আর কিছু শোনাও।'

দশরথ আবার শুরু করল।

'কা তব কান্তা কস্তি পুত্রাঃ / সংসারহম অতীব বিচিত্রম্...'।

এর মধ্যে যখন 'ভজ গোবিন্দম্ / ভজ গোবিন্দম্ গোবিন্দম্ ভজ মূঢ়মতে...' এই অংশটা এল তখন জেঠু একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। অস্ফুটে বলে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ!'

শ্লোক পাঠ শেষ হলে জেঠু তরুণমামাকে বলে উঠলেন, 'মুখুজ্জে, তুমি তো এক টুকরো রত্ন নিয়ে এসেছ। বড় ভালো লাগল হে শুনে।'

চা, পাপড় আরও কিছু খাবার নিয়ে এলো বদ্রীর ভাই কেদারপ্রসাদ। দুই ভাইও বসল আসরে।

একটা পাপড়ে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, 'তা বাবা কী নাম বললে তোমার?'

'দশরথ।'

'দশরথ? বাঃ ভগবান রামচন্দ্রের বাবার নাম। পুরো নামটা কি?'

'দশরথ লেট।' এই উত্তরটা তরুণমামা দিল।

'দশরথ লেট?' আঁতকে উঠে বলে উঠলেন জ্যাঠাবাবু। হাতের কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণ একদম চুপ। একটা পিন পড়লেও বোধহয় শোনা যাবে।

তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে রমরতন ভট্টাচার্য বললেন, 'এটা তোমরা কী করলে? ভৈরবেশ্বর মন্দিরে কোনও অন্ত্যজের প্রবেশ নেই। এ আমাদের ঐতিহ্য। বাবা ভৈরবেশ্বর এখনও কোনও নীচ জাতির স্পর্শ পাননি।'

বদ্রীপ্রসাদ বলে উঠল, 'জেঠু, এটা আমাদের ঐতিহ্য নয়, এটা আমাদের লজ্জা।'

'কী? কী বললে? আমাদের বাবা-জেঠার সামনে এমন কথা বললে, বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে হতো। যত অধার্মিক কুলাঙ্গার জন্মেছে এই বংশে!'

কেদারপ্রসাদ মিতভাষী। ও এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল, 'আমরা কেউ অধার্মিক নই। বাবা ভৈরবেশ্বরের উপর আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রতিবারই রুদ্রাভিষেকের সময় যখন অন্তজরা মন্দিরের দালানে পূজার সামগ্রী দিয়ে চলে যায়, আমার মনে হয় মন্দিরের দেবতাও যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গেই চলে গেলেন।'

'কী বলতে চাও তোমরা? আমি তো ভাবতেই পারছি না।'

বদ্রী আর কেদার দুজনে জেঠুর দুই হাত ধরে বলল, 'জ্যাঠামণি, এ বড় পাপ। এই পাপেই ভারতের কত বড় বড় মন্দির বিদেশী আক্রমণকারীরা লুণ্ঠন করে, অপবিত্র করে, ভেঙে দিয়েছে। হিন্দু সমাজ জাতিভেদ ভুলে এক হয়ে লড়তে পারেনি। আমাদের ইচ্ছা...।'

জেঠু কোনও কথা না বলে হাতদুটো ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'মুখার্জিবাবু, আপনারা চা পান করে নিন, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না।'

জেঠু কখনও আমাকে 'আপনি' বলেন না। তরুণমামার মুখটা একদম ছোট হয়ে গেছে। 'যাক চলো! চেষ্টা তো করা হলো। সফল হওয়া না হওয়া তো বাবা ভৈরবেশ্বরের হাতে।'

সকলেই মাথা নীচু করে বৈঠকখানা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটা মোটরবাইকে তিনজন যেতে পারবে না। তাই পৌঁছানোর জন্য কেদার বা বদ্রীকে কারোকে যেতেই হবে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মন্দিরে সন্ধ্যারতি শুরু হবে তার ব্যবস্থা চলছে। পুজোর বাসন নিয়ে, ফুল চন্দন প্রসাদ নিয়ে মায়েরা একে একে মন্দিরে ঢুকছেন।

ওইদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোপান বাইকের পেছনে বসল।

হঠাৎ পেছন থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সবার বুকে মধ্যে ড্রাম বেজে উঠল। 'এই যে ছেলে, কী নাম যেন তোমার? দশরথ? দশরথ এদিকে এসো।'

দশরথ ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেল। দাঁড়াল রামরতন

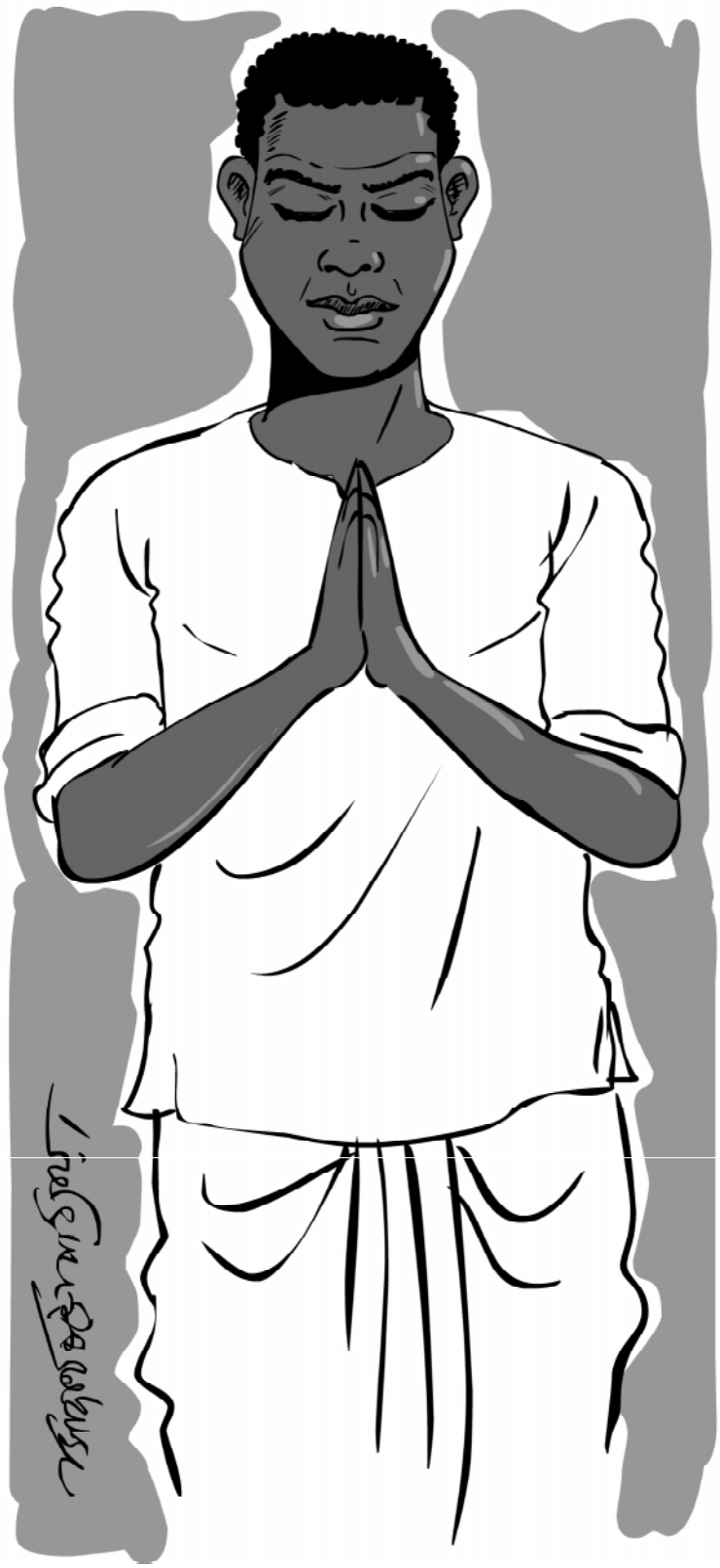

ভট্টাচার্যের সামনে। জেঠু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তুমি চলে যাচ্ছ যে বড়ো? এখুনি ভৈরবেশ্বরের আরতি শুরু হবে। তুমি এসো আমার সঙ্গে। মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র পাঠ করবে ১০৮ বার।'

সোপানদের দল নাচতে নাচতে মন্দিরে ঢুকল।

ভৈরবেশ্বর শিবলিঙ্গের সামনে বসে দশরথ। গাইছে—

'ওঁ ত্র্যম্বকম্ যজামহেৎ সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং
উর্বরুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃত্যাৎ।।'

এত সুন্দর উচ্চারণ, গলার এত গম্ভীর মধুর স্বর মন্দির যেন থরথর করে কাঁপছে।

স্তোত্রপাঠ শেষ হলে বদ্রীর জ্যাঠামণি উঠে এসে দশরথকে জড়িয়ে ধরলেন। জ্যাঠামণির দুচোখে জল। সোপান অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করল, দশরথও কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্না আর থামছেই না।

আজ থেকে ক্যাম্প শুরু। গত দুদিন ধরে সোপান উত্তেজনায় ফুটছে। পরশুদিন দিদির সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছিল। সোপান কোনও বিশেষ কথা দিদিকে না বললে মনটা ভরে না। প্রথম দুদিন এতকিছু ঘটেছে যে দিদিকে ফোনই করা হয়নি। প্রথমে দিদি অভিমানে কথাই বলছিল না। কেবল হ্যাঁ, হুঁ বলে উত্তর দিচ্ছিল। সোপান কিছুটা বুঝতে পেরে বলল, 'তোর কি শরীর অসুস্থ দিদিভাই?'

ওদিক দিয়ে উত্তর এল, 'দিদিভাই? ওঃ তোর একটা দিদি আছে, সেটা এখনও মনে আছে তাহলে?' তারপর সোপানকে দিদিকে জানানোর সব অস্ত্র প্রদান করতে হলো। সেই থেকে ঠিক করেছে, যত কিছুই হোক না কেন রোজ রাত্রে অন্তত একবার দিদিকে ফোন করবেই।

গতকাল রাতে একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলল সোপান। গতকাল সকালে তরুণমামার সঙ্গে রামপুরহাট রেল মাঠের এক শাখাতে গিয়েছিল। ওই সকালের শাখায় রোজ দুটো ছেলে আসে। অরুণ দাস আর বরুণ দাস। ওরা রেললাইনের ধারে একটা বস্তিতে থাকে। প্রায়ই শাখার শেষে ওরা বায়না করে তরুণমামাকে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। কালকে ও বলছিল, তরুণমামার কাল মেডিক্যাল ক্যাম্পের জন্য সকালে ব্যবস্থা বৈঠক ডেকেছিল। শিবিরে খাওয়া, জল, পাহারা, আলো, শোয়া-থাকার ব্যবস্থাতে যে সব স্বয়ংসেবক মানে স্বেচ্ছাসেবক থাকবে তাদের মিটিং। তাই অরুণ-বরুণকে তরুণমামা বলল, 'এখন নয়, দুপুরে তোদের বাড়িতে খাব। আমার সঙ্গে এই দাদাটাও থাকবে।'

কিন্তু শাখার মাঠ থেকে বেরিয়ে এসেই তরুণমামার মনটা খট্‌খট্ করছিল। বলল, 'কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না। অরুণের বাবা ট্রেনে টয়লেট সোপ বিক্রি করেন আর ওর মা লোকের বাড়িতে কাজ করেন। তাই একবার আগে গিয়ে দুপুরের খাওয়ার কথা বললে হোত। কিন্তু আর তো কিছু করার উপায় ছিল না। বৈঠক শেষ করার পর স্নান করে ওরা রেলপাড়ের বস্তিতে পৌঁছাল। ওদের বাড়ি খুঁজতে একটু সময়ও লাগল। বাড়ি মানে ছোট টালির ঝুপড়ি ঘর। সেখানে পৌঁছে দেখল দুই ভাই বাইরে মার্বেল খেলছে। তরুণমামাকে দেখে বড় ভাই অরুণ কেমন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ওর ছোট ভাই বরুণ কিন্তু চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। অরুণও একটু আমতা আমতা করতে করতে ওদের নিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে বসাল।

অরুণ বলল, ওর মা কারও বাড়িতে কাজে গেছেন। যাই হোক, একটু পরে মাটির মেঝেতে দুটো ছোট চাটাই পেতে ওদের খেতে দিল বড়ভাই অরুণ। দুটো থালায় ভাত, দুটো ছোট বাটিতে পাতলা ডাল আর সঙ্গে দুটো প্লেটের মধ্যে অর্ধেক করে কাটা ডিমের ঝোল।

ওদের দুজনকে খেতে দেওয়ার পর তরুণমামা বলল, 'তোদের খাবারটাও নিয়ে আয়। একসঙ্গে খাবো তো।'

অরুণ বলল, 'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

তরুণমামার কিরকম সন্দেহ হলো। মামা ছোট ভাই বরুণকে একটু ধমকের সুরেই বলল, 'কী রে কখন খেয়েছিস তোরা?'

বরুণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, 'খাইনি তো! এগুলোই তো আমাদের খাবার।'

তরুণমামা একটু সময় একেবারে চুপ হয়ে গেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হাড়িতে একটু জল চাপা, আমি এক্ষুনি আসছি।'

বাইক নিয়ে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ১ কেজি চাল, একটু আলু আর চারটে ডিম নিয়ে এল তরুণমামা। জল তো গরম হয়েই ছিল। ঝটফট চাল, আলু আর ডিম সেদ্ধ হয়ে গেল। তারপর সবার পাতেই একটু একটু ডাল আর অল্প অল্প অরুণের মায়ের রান্না করা ডিমের ঝোল। তারপর হাতজোড় করে মন্ত্র পাঠ হলো।

'ওঁ সহনাববতু, সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।'

আমরা পরস্পরকে রক্ষা করব, দেশে যেন কেউ অভুক্ত না থাকে। একসঙ্গে আমাদের শৌর্য প্রদর্শন করব। আমাদের অধ্যয়ন তেজস্বী হোক। কেউ যেন কারোর দোষ না দেখে। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

তখন অরুণ আর বরুণের আনন্দভরা মুখমণ্ডল দেখার মতো। আর সোপানের মনে হচ্ছিল এত সুস্বাদু খাবার ও জীবনে কখনও খায়নি।

কথাগুলো বলতে বলতে সোপানের মনে হল দিদি অন্যদিক থেকে কোনও উত্তর করছে না। লাইটা কি কেটে গেল?

'দিদি! শুনছিস?'

'হুম, বল।'

'তুই কাঁদছিস কেন?'

'না। তুই আর রাত জাগিস না। শুয়ে পড়।'

ধরা ধরা গলায় বলে দিদি ফোন রেখে দিল।

আজকের ক্যাম্প হবে তারাপুর সরস্বতী শিশুমন্দিরে। সকালে ছোটমামার সঙ্গেই চলে এসেছিল সোপান। বর্গ শুরু হবে সকাল ৯টায়। তার আগে যারা ট্রেনিং নেবে সবাই সকালের জলখাবার করে এক এক জন করে হলের মধ্যে ঢুকছে। সরস্বতী বন্দনা আর প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শুরু হলো অনুষ্ঠান। অবাক করার মতো বিষয় হলো এই সব ব্যবস্থায় আছে একদম অল্প বয়সের ছেলেরা। সকালে খেতে দিচ্ছিল দুজন কলেজের ছেলে। হলের ভেতরে ঘোষণা যে ছেলেটি করছে সে ইংরাজিতে অনার্স কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। অতিথি বরণ, গান— সবই করছে যুবক ছাত্ররা। একদম ঘড়ির কাঁটায় ন'টায় শুরু হলো অনুষ্ঠান।

ছোটমামা আর অধ্যাপক ডাক্তার ভদ্র যখন ড. শ্রীকান্ত গাঙ্গুলী নাম ডেকে একটা অপূর্ব সুন্দর উত্তরীয় দিয়ে বরণ করে নেওয়া হলো, তখন ছোটমামার জন্য সোপানের খুব গর্ব হচ্ছিল। প্রথম উদ্বোধনী কার্যক্রমে কেবল ড. ভদ্র সামান্য উৎসাহবর্ধক কথা বললেন। বোঝালেন, আজকের ব্যস্ত সমাজে এই আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার কত ভীষণ প্রয়োজন। স্বামী বিবেকানন্দকে আদর্শ করে নিজের জীবন গঠনের কথাও বললেন। তারপর পনের মিনিটের একটা ব্রেক। সঙ্গে চা। পরের সত্র আপদকালীন স্বাস্থ্য সেবার বিভিন্ন ভাগের কথা বলা হলো। এই সেশনটা নিল ছোটমামা। ছোটমামা ডাক্তারির গভীর বিষয়গুলো এত সহজে ছেলেদের সামনে রাখল যে ভীষণ গর্ব হতে লাগল সোপানের।

ছোটমামার বলার পরে দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা। এই সরস্বতী শিশু মন্দিরে একটা বড় রান্নাঘর আছে। স্কুলের মিড-ডে মিল রান্না হয়, সেই সঙ্গে সামান্য কয়েকজন অনাথ ছেলের ছাত্রাবাস আছে। তাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থা একেবারে অভিনব। রান্না হয় ধানের তুষের আগুনে। একদিক থেকে তুষের জ্বাল দিলে বিশেষ ভাবে তৈরি উনোনে একটা লম্বা অংশে দুটো বড় হাঁড়ি আর একটা ছোট পাত্র বসানো যায়। উনোনটার অন্যদিকে ইটের তৈরি এক লম্বা চিমনি রান্নাঘরের বাইরে বের হয়ে গেছে। এই এতবড় উনোনে একটুও ধোঁয়া নেই।

যারা পরিবেশন করবে তারা রান্নাঘরে চলে গেল। পাঁচজন করে দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। একজন ডাল, একজন আলুকুমড়ো ভাজা, একজন পাঁচমেশালি সবজি আর একজন চাটনি। আর সোপানের দায়িত্ব পড়ল সবাইকে জল আর নুন দেওয়ার। এই সবটাই করে ফেলল সোপানের থেকে একটু বড় দাদারা।

সবাই মাটিতে পঙতিতে বসে খেল। সবাইকে পরিবেশন শেষ হলে তবেই ভোজনমন্ত্র বলা হলো। তার আগে একজনও খেল না। মন্ত্রের পর সবাই একসঙ্গে খাওয়া শুরু করল। এই দৃশ্য দেখে ডা. উজ্জ্বল ভদ্র তো একেবারে মোহিত। বারবার বলতে লাগলেন, 'ওয়ান্ডারফুল, ওয়ান্ডারফুল। আন বিলিভেবল্!'

খাবার পরে সবাই ভেবেছিল, এবার হয়তো শিক্ষার্থীদের একটু তন্দ্রা আসবে। কিন্তু এর পরেই হাতে কলমে ব্যান্ডেজ করা শেখানো হলো। কতরকমের ব্যান্ডেজ। সেগুলো কখন কীভাবে ব্যবহার হয় সেসব আকর্ষণীয় ভাবে দেখানো হলো। ঘুম তো দূরের কথা, কারও চোখে পলক পড়ছিল না। শেখাচ্ছিলেন রবীনদা আর পরমানন্দজী। দুজনেই কলকাতা থেকে এসেছেন। সবশেষে দেখালেন যে দুটো জামা আর দুটো দণ্ড বা লম্বা লাঠি দিয়ে কিভাবে ঝটপট স্ট্রেচার বানানো যায়।

সারাদিন একটার পর একটা ট্রেনিং দেওয়া হলো। রাতে খাবার পরে শোয়ার সময় মেঝেতে ছোট ছোট তোষকের মতো ম্যাট পাতা। সবাইকে মশারি আর চাদর আনতে বলা হয়েছিল। নিজের নিজের বিছানা করে সব শিক্ষার্থী শুয়ে পড়ল। ঠিক রাত ১০টায় দীপ নির্বাপণ হয়ে গেল। এত জন শিক্ষার্থী ব্যবস্থার কাজে নিয়োজিত প্রবন্ধক এতজনের কলকোলাহল একেবারে শান্ত হয়ে গেল।

সকাল ৪টের সময় জাগরণ। এত সকালে ওঠার কথা ভাবতেই পারে না। কিন্তু সকলেই উঠে গেল। তাই সোপানও ধীরে ধীরে উঠে আস্তে আস্তে বিছানা গুছিয়ে রাখল। টয়লেটে গিয়ে দেখল আগে থেকেই অনেকে উপস্থিত আছে। তরুণমামা নিজে দাঁড়িয়ে ছিল, কারোর গরম জল বা কিছু লাগবে কিনা?

কিন্তু একটু পরেই চলে গেল। সবাই শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সকালের কাজ সেরে পরিষ্কার হয়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঝটপট প্রস্তুত হয়ে বের হলো। সব কাজ বড়দের মতো নিজে নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতে পারল সোপান। নিজের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস উপলব্ধি হচ্ছিল।

সকালে সবচেয়ে প্রথমে প্রাতঃস্মরণ করল। সেই প্রাচীন ঋষি থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু পর্যন্ত একের পর এক ক্ষণজন্মা মনীষীর নাম সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে আবৃত্তি করল সময়ে। এরপরে পাক্কা আধঘণ্টা যোগাসনের ক্লাস হলো। এর পরে সকালের খাওয়া, গরম গরম ইডলি আর ধোঁয়াওঠা সম্বর দেওয়া হলো। প্রাতঃরাশ খেয়ে সকলে প্রথম সত্রে বসল।

তারপর থেকে একটার পর একটা বিষয় বলে চললেন ডাক্তারবাবুরা। কালকের মতোই হলো দুপুরে ভোজন। আজ আরও জোরদার। আম আর মিষ্টি দইও দেওয়া হলো।

বিকেলের শেষ অনুষ্ঠানে বুদ্ধদেব মণ্ডল নামে আরোগ্য ভারতীর এক দাদা 'আরোগ্য মিত্র' নামে এক প্রকল্পের কথা জানালেন। যেসব গ্রামে চিকিৎসার সুবিধা এখনও পৌঁছায়নি, সেখানে কাজ করে আরোগ্য মিত্র। আমাদের দেশের অবস্থা, এই রাজ্যের অবস্থা আর লক্ষ লক্ষ গ্রামের মানুষ আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষের কাছে কি আশা করে, বুদ্ধদেবদার কথা একেবারে মনকে ছুঁয়ে গেল। বলার শেষে উপস্থিত ছেলেদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, এর মধ্যে কে কে গ্রামে গিয়ে ডাক্তারবাবুদের নির্দেশমতো স্বাস্থ্যসেবার কাজ করতে পারবে। মোট পাঁচজন হাত তুলল। উনি তাদের নাম, ফোন নম্বর নিয়ে নিলেন।

আজ শেষের অনুষ্ঠানের ঠিক আগে একটি ছেলে দারুণ একটা গান গাইল।

'ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিসনে সময় কাটিয়ে বৃথা
সময় বিচার করে,
ওরে নূতন যুগের ভোরে।'

পুরো শিবির শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও গানটা মনের মধ্যে অনুরণিত হতে থাকল। সোপান বারবারই আপনমনে গেয়ে উঠছে।

তারপর সরস্বতী শিশুমন্দির থেকে যখন মামা-ভাগ্নে বের হলো, তখন বিকেল ৪টে বাজে। বাইরে এসেই মামা বললেন, কাছেই একজন পেসেন্ট থাকেন। গতদিন খুব অসুস্থ ছিল। তাই একবার দেখতে যাবে। ভদ্রলোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অবসরের পরে নিজের গ্রামে ফিরে সুন্দর বাড়ি করেছেন, বাড়ির নাম তাই 'অবসর'।। অবসর সত্যিই খুব সুন্দর। দেবদারু আর ঝাউ গাছের মাঝে মোরামফেলা রাস্তা। সোপান বাইরের ঘরে বসল, ছোটমামা পেশেন্ট দেখতে গেলেন। একটু পরেই ছোটমামা বের হয়ে এসে মোবাইলটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'ধর, তোর দিদি ফোন করেছে।'

ফোনটা ধরে সোপান বলল, 'দিদি, বল!'

ওদিকে তুলি খুব উত্তেজিত, 'আমি সেবিকা সমিতিতে আজ জয়েন করলাম। অনলাইনেই করা গেল। আজ ওখান থেকে একটা মেয়ে এসেছিল। আমার কলেজের কাছেই ওদের একটা সাপ্তাহিক মিলন চলে। সেদিন অরুণ-বরুন দুই ভাইয়ের কথা তোর কাছে শুনে মনটা বড় ভারী হয়েছিল। সত্যি, নিজের জন্য বাঁচা আবার বাঁচা নাকি?'

অনেকক্ষণ কথা হলো ভাই বোনের। দিদি অভিমানের সুরে বলল, 'সেই কবে গেছিস? মা ফিরে এলো, তোর আসার নাম নেই। আসতে ইচ্ছে করে না, না? সাপের পাঁচপা দেখেছ, এখন আর তোমাকে কে পায়?'

'এই তো সবে এলাম। অমন হিংসুটেমি করিস কেন রে দিদি?'

বলতে বলতে ছোটমামা বের হয়ে এলেন। সোপন বলল, 'ঠিক আছে। মাকে বাবাকে বলে দিস। বিন্দাস...'

ওদিক থেকে আবার ধমক, 'কি? বিন্দাস! মুখের বুলিও পাল্টে গেছে। মা, ও মা! শুনছো তোমার ছেলের মুখের বাণী। ও মা...'

সোপান কথা না বাড়িয়ে ফোনটা কেটে দিল।

ছোটমামা বলল, 'চল্, আজ রথীনবাবু ভালো আছেন। বাড়ির দিকে এগোই।' বলতে বলতে রথীনবাবুর স্ত্রী ঘরে ঢুকলেন। 'সেকি! ডাক্তারবাবু আজ ভগ্নেকে নিয়ে এসেছেন। এক কাপ চা তো খেয়ে যান।'

ছোটমামা আগেই বলেছেন, বাঙালি রোগীদের একটা কুসংস্কার আছে যে, ডাক্তারবাবু পেশেন্টের বাড়িতে কিছু খেলে রোগ ভাল হয় না। তাই জেনেশুনেই ছোটমামা পেশেন্টের বাড়িতে কিছু খেতে চায় না।

'না, মাসিমা। একটু তাড়া আছে। আর একদিন নাহয়...'

'না, না। আজই। ভাগ্নেটিকে নিয়ে কি আর আপনি রোজ আসবেন? আর বঝেছি, আপনি কেন ইতস্তত করছেন। আমাদের ওসব কুসংস্কার নেই। তাছাড়া পেশেন্ট তো এখন সুস্থই।'

অগত্যা বসতে হলো। গোলাপখাস আম, সরভাজা আর বেসনের পাপড়া। তারপর চা।

ছোটমামার ফোন বাজছে। সোপান দেখতে পাচ্ছে, নাম

ভেসে আসছে 'তরুণদা প্রচারক।' সোপান ইঙ্গিত করল, মামাও ইশারাতে বোঝালো, 'দেখেছি।' চায়ের কাপ নামিয়ে নিজেই ফোন করল। ওদিক থেকে কিছু শোনার পর ছোটমামার চোয়াল কঠিন হয়ে গেল, 'আচ্ছা, এক্ষুনি আসছি।'

রথীনবাবুদের থেকে বিদায় নিয়ে বাইকে উঠতে উঠতে ছোটমামা বললেন, 'উঠে বস।'

বাইক স্টার্ট হলো। সোপান প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাচ্ছি?'

'সঙ্ঘের নিবাসে। আরজেন্ট কল এসেছে।'

রামপুরহাটের দিকে ছুটে চলল মামার মোটবাইক।

সঙ্ঘ নিবাসে এসে দেখে প্রায় তিরিশ-চল্লিশজন স্বয়ংসেবক এসে গেছে। তরুণমামা বলে উঠল, 'এইতো, ডাক্তারবাবুর জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।' তারপর সোপানের দিকে চোখ যেতেই বলল, 'এ বাবাঃ ভাগ্নেকে নিয়ে এলে কেন? তোমরা সেই বিকেল থেকে এখনও বাড়ি ফেরোনি?'

মামা বাড়িতে ফেরাতে দেরি হওয়ার কারণ বলল। তারপর বলল, 'কিন্তু কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে বিরাজ তোমায় যেতে যেতে বলবে। অধ্যাপক মণ্ডল আর অ্যাডভোকেট চণ্ডীদা এতক্ষণে থানায় পৌঁছে গেছেন। তোমরা অফিসারের সঙ্গে কথা বল গিয়ে। আমি ভাইপোকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি।'

ছোটমামাকে নিয়ে বিরাজদারা বের হয়ে গেল। একজন দুজন করে দলে দলে স্বয়ংসেবক নিবাসে আসছে। এখন সংখ্যাটা একশ ছাড়িয়ে গেছে। সোপান আস্তে আস্তে দশরথের কাছে গিয়ে বলল, 'কী হয়েছে গো দশরথদা?'

দশরথ যা বলল, তাতে ওর হাড় হিম হয়ে গেল। গণপুরের জঙ্গলে বেশ কিছুদিন থেকেই ডাকাতের উপদ্রব বেড়েছে। পুলিশকে অনেক বলার পরেও কোনও সুরাহা হয়নি। আজ তারাপুরের বনমালীদা বউদিকে ডাক্তার দেখিয়ে সন্ধ্যা সন্ধ্যা নাগাদ গণপুরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে আসছিলেন। ওদের হঠাৎ দাঁড় করিয়ে বউদির গলার হার আর দুল খুলে দিতে বলে। বনমালী আর বৌদি দুজনেই খুব সাহসী। ওরা কিছুতেই সোনাদানা দিতে চায়নি। তখন বনমালীদার হাতে ডাকাতরা ভোজালির কোপ মারে।

সেই অবস্থাতেও লড়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুজন দুষ্কৃতী ধরে বৌদির গলার হার খুলে নেয়। দুটো কানের লতি ছিঁড়ে দুল নিয়ে নেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যায় বৌদি। এর মধ্যে পেছন থেকে দুটো গাড়ি এসে পড়ে। তখন ওরা বৌদিদের টেনে হিঁচড়ে জঙ্গলে ঢুকিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। বৌদিকে টেনে নিচ্ছিল, বউদি ডাকাতের হাতে সজোরে কামড়ে দিয়েছিল। তাই তাড়াতাড়িতে রাস্তার ওপর ফেলে পালিয়ে যায়। ওই পেছনের গাড়ি বৌদিকে উঠিয়ে নিয়ে আসে। রামপুরহাটের নর্সিংহোমে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে থানা থেকে কী খবর আসে। তরুণমামার পরিকল্পনা মতোই একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা আধিকারিক, একজন অধ্যাপক আর একজন চিকিৎসক মানে ছোট মামাকে পাঠানো হয়েছে থানাতে কথা বলার জন্য। গণপুরের জঙ্গলে এই ক্রমবর্ধমান সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে সমাজের শিক্ষিত সমাজে সচেতনতা বোঝানোর জন্যই এই চিন্তা করা হয়েছে। এদিকে সঙ্ঘ নিবাসেও সমবেত হয়ে গেছে অনেক মানুষ। স্বয়ংসেবকরা তো এসেই ছিল, এখন জড়ো হয়েছেন কাতারে কাতারে সাধারণ মানুষ।

হঠাৎ তরুণমামার খেয়াল হলো, সোপানকে বাড়ি পাঠাতে হবে। তাই বলে উঠলেন, 'বীরেশ্বর ডাক্তারবাবুর ভাগ্নেকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। বাইক নিয়ে বেরিয়ে যা।'

সোপান মৃদু প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি এখন যাব না...'।

তরুণমামা প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, 'না, তুমি ফিরে যাবে আর এখুনি যাবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই আবার ফোন এলো। এবার থানাতে যারা গিয়েছিলেন, তারা খবর দিলেন যে, থানায় কোনও অফিসার এখন নেই। সেই কারণে পুলিশ এখনই কোনও ব্যবস্থা নিতে পারবে না।

আবার সকলে একটু আলোচনা করে নিল। এদিকে বনমালীদার ফোনে এতক্ষণ রিং হচ্ছিল, এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মল্লারপুর থেকেও স্বয়ংসেবকরা এগিয়ে আসছে গণপুরের দিকে। ঠিক হলো, বনমালীদাকে বাঁচাতে নিজেরাই এগিয়ে যাওয়া হবে।

নিবাসে জড়ো হওয়া সবাই বের হয়ে এলো। গন্তব্য গণপুরের জঙ্গল। সবাই এক এক করে মোটর বাইকে উঠে বসল। রবীন্দ্র আগরওয়ালজী আর বৈদ্যনাথবাবুর চারচাকার গাড়িও এসে গিয়েছিল। সোপান গুটিগুটি বীরেশ্বরদার বাইকে না উঠে বিরজদার পেছনে উঠে বসল।

বিরাজদা পেছনে একজন উঠেছে দেখেই মোটরবাইক ছেড়ে দিল। গাড়ি ছুটে চলল গণপুরের দিকে। একটু পুরে বিরাজের বোধহয় খেয়াল হলো সোপান বসে আছে পেছনে। 'এই সোপান, তোমার তো বাড়ি ফেরার কথা। তুমি যাওনি?'

'আমি তোমাদের সঙ্গে যাব।'

'কক্ষনো নয়। তরুণদা ভীষণ রাগ করবে।'

কিন্তু অন্য বাইকগুলো ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলেছে। বিরাজ একটু দাঁড়িয়ে গিয়েও আবার স্টার্ট দিয়ে দিল।

গণপুরের জঙ্গলের সামনে পৌঁছে দেখল, মল্লারপুরের লোকেরা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে। স্বয়ংসেবকরা হাতে বড় বড় মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী কিছু টর্চও এনেছে। কাছেই শিবপাহাড়ি। বহু পুরাতন এক শিবমন্দির আছে। ওই গ্রামে প্রচুর বনবাসী থাকেন। ওই গ্রামের মাঝি হারাম মানে গ্রামের মোড়ল নিজে এসেছেন।

বনবাসীরা তির ধনুক নিয়েও এসেছে। দিনের পর দিন চলতে থাকা এই অত্যাচারের বিহিত চায় সকলে। স্থানীয় ছেলেরাই বেশি সক্রিয়। এটা গণপুরের লজ্জা! কয়েকজন বলল, 'এনামুলের ডেরাটা বেশি দূরে নয়, এক কিলোমিটারের ভেতরেই।'

উদ্ধারকারী দল তিনটে ভাগ হয়ে জঙ্গলে ঢুকল। ঘাঘা, কুলপাহাড়ি, ধমরপুর, বনবাতাসপুরের ছেলেরাই সবচেয়ে বেশি চেনে গণপুরের জঙ্গল। তিনটে দলেই স্থানীয় ছেলেরা ভাগ হয়ে গেল। শাল আর সেগুনের বনের মধ্যে একটু একটু করে ঢুকল সন্ধানকারী দল। বিরাজদা সোপানকে বারকয়েক বকাবকি করেছে। কিন্তু এখন তো আর কিছু করারও নেই। রাজ্য সড়কের উপর কিছু লোক অপেক্ষা করছিল বটে, কিন্তু সোপান কিছুতেই ওদের সঙ্গে জঙ্গলের বাইরে থাকতে চাইল না।

সামনে একজন জোরালো টর্চ নিয়ে এগোচ্ছে। পেছনে একটা দল লাঠি হাতে। কেউ গনগনে মশাল নিয়ে। দূরে বাকি দুটো দলকেও দেখা যাচ্ছে। মশালের আলো ক্রমশ দুটো দিকে সরে যেতে যেতে ক্ষীণ হয়ে গেল।

সোপানদের দলটাতেই বনবাসী ছেলেরা বেশি আছে। হঠাৎ বনের পথে, শুকনো পাতার মধ্যে দিয়ে কী যেন সরসর করে চলে গেল। থমকে দাঁড়ালো ওদের দলটা। সাপ! কিন্তু দেখা গেল সরসর করে এগিয়ে জীবটা একবার পেছনে ফিরে তাকালো। জ্বলজ্বল করছে চোখ, সজারু।

একটি বনবাসী সাঁওতাল ছেলে তির বাগিয়ে এগিয়ে এলো সজারুটাকে তাক করে। মাঝি হারাম অর্জুন বাসকে ছেলেটিকে বারণ করলেন। ওরা সজারুকে ছেড়ে এগিয়ে চলল।

কিন্তু বনের মধ্যে যেখানে এনামুল হকের ডেরা ভাবা হয়েছিল, সেখানে কিছু পাওয়া গেল না। ওই পোড়ো বাড়িটা ছেড়ে এনামুলের দল অন্যত্র পালিয়ে গেছে। তবে ডাকাতরা খবর পেয়ে গেছে। বনমালীকেও এখানে প্রথমে এনেছিল খুব সম্ভব। চটা ওঠা মেঝেতে রক্তের দাগ আছে। খবরের কাগজে মুড়ি পেঁয়াজ খেয়েছে ডাকাতরা।

তবে কি বনমালীদাকে মেরে ফেলে দিল?

এর পরের ঘণ্টাগুলো শুধুই হতাশা। ব্যর্থ চেষ্টা। পোড়ো বাড়িটার থেকে বের হয়ে আবার সবাই ভাগ হয়ে গেল। যোগাযোগ ফোনেই হচ্ছিল।

সোপান আজ অনুভব করল যে, রাতের অন্ধকার আকাশেরও একটা আলো আছে। যখন মশালগুলো নিভে গেল এক এক করে, তখন প্রথমে মনে হলো নিরেট নিকষ কালো অন্ধকার। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার সয়ে এলো। বোঝা গেল, রাতের তারা আলোতেও অনেকটা দেখা যায়। এরমধ্যে একবার সোপান খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মাথার উপরে একটা 'হুম হুম' শব্দ শুনে হাতের টর্চটা একবার জ্বেলে ধরল। দেখে শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল। একটা ছোট মুখ ওর দিকে তাকিয়ে। আঁতকে ওঠে সোপান, 'বাবা গো!'

বিরাজ ওর হাত ধরেই ছিল। হাতটা আর একটু জোরে চেপে ধরে বলল, 'আরে প্যাঁচা। লক্ষ্মীপ্যাঁচা। বড় উপকারী প্রাণী।' বিরাজ আবার টর্চ জ্বালালো। আলোতে দুবার উপর নীচে মাথা নাড়ল প্যাঁচা বাবাজী। ভাবটা যেন, 'ঠিক। ঠিকই বলেছ।'

রাত দুটো। ওদের দলটা হতাশ হয়ে রনে ভঙ্গ দিয়ে দিয়েছে। একটা টিলার উপর বসে দু-একজন ঝিমোচ্ছে। হঠাৎ খবর এলো পূর্বের জঙ্গলের দিকে আলো আর ধোঁয়া দেখা গেছে। শোনামাত্রই আবার সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠে বসল। আবার এগোনো।

এবার কিন্তু সত্যিই আলো দেখা গেল। যে দলটা প্রথম দেখেছে তাতে ঋভুদা আছে। আই টি তে খুব ফান্ডা। ঋভু ঝটপট জায়গাটার জিপিএস সেট করে বাকি দুটো দলকে পাঠিয়ে দিল। খুব অল্প সময়েই তিনটে দল অকুস্থলে পৌঁছে গেল।

মাঝে একখানা বড় হ্যাজাক। সেই আলোর পাশেই মুখথুবড়ে পড়ে আছে একজন। সম্ভবত উনিই বনমালীদা। ডাকাতরা চারজন একটু দূরে বসে মদ খাচ্ছে। একটা বড় বোতল, গ্লাস আর সঙ্গে শাল পাতায় কিছু খাবারও আছে।

যদিও ওরা যথাসম্ভব নিঃশব্দেই আসছিল। কিন্তু এত লোকের আসার শব্দ ঝরা শুকনো পাতায় ঢাকা বনপথে লুকোনো সম্ভব হল না। এনামুলের দল লাফিয়ে উঠল। ওদের মধ্যে একজনের ঘন দাড়ি কিন্তু গোফ নেই। লম্বা চওড়া সবচেয়ে হাট্টাকাট্টা চেহারা। পরে জেনেছে ও হলো আবদুল বারি। এনামুলের দলের ওই সবচেয়ে নৃশংস।

আবদুলের হাতে একটা রিভলভার। ও লাফিয়ে উঠেই

একেবারে বনমালীদার কাছে পৌঁছল। চুলের মুঠি ধরে তুলল নেতিয়ে পড়া শরীরটাকে। বনমালীর কপালে বন্দুক রেখে হুমকি দেয় আবদুল, 'কেউ এক পা এগোলেই এই মুরগাটা কোতল হবে।'

সবাই থমকে যায়। শুধু দণ্ড হাতে দু-তিন জন স্বয়ংসেবক একটু আধটু নড়াচড়া করছিল। তারমধ্যে ছিল তারাপুর শাখার মুখ্য শিক্ষক প্রীতম। প্রীতম এবছরই তৃতীয়বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ করে এসেছে। লাঠি ওর দুহাতে যেন কথা বলে। প্রীতমের চোখের ইঙ্গিতেই দুটি ছেলে লাঠি নিয়ে অন্য দুদিকে পজিশন নিয়ে নিচ্ছিল। আবদুল সেটা লক্ষ্য করে চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, বেশি চালাকির চেষ্টা করো না। আমাদের যেতে দাও, সেফ প্যাসেজ না দিলে এ মরবে।'

কথা শেষ হতে না হতেই পেছনদিকের একজন দাদা একপদ পুরসের মতো করে পদবিন্যাস করাতে পাতার মচমচ শব্দ হলো সামান্য। আবদুলের সেদিকে মনোযোগ যেতেই প্রীতমদা বিদ্যুৎগতিতে ভ্রমণ স্থানান্তর করে আবদুলের একেবারে ঘাড়ে পড়ল। মাথার উপরে হেলিকপ্টারের মতো লাঠি ঘুরতে ঘুরতে আছড়ে পড়ল। চোখের পলক পড়ার আগেই খেল খতম। আবদুলের হাত থেকে ছিটকে গেল রিভলভার। প্রীতমদার লাঠি সপাটে নেমে এল দুষ্কৃতীর হাটুতে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল আবদুল।

এনামুল বেগতিক দেখে উপরে ফায়ার করল। বন্দুকের গুলির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার, 'কেউ এক পা এগোলেই গুলি চালাব। যে কটা মরবে মরবে।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই আবার গুলির শব্দ।

'হ্যান্ডস আপ, অনামুল। তোমার খেলা শেষ।' ইউনিফর্মে রিভলভার উঁচিয়ে এগিয়ে এলেন এক অফিসার। সঙ্গে আরও চার পাঁচ জন পুলিশ অফিসার ও সেপাই। কারও হাতে রিভলভার, কেউ বা রাইফেল তাক করে

আছে। সবার লক্ষ্যই এনামুল আর তার দুই সাগরেদের দিকে।

খবর পেয়ে এস পি সাহেব বড় পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেছেন। এই সবই ব্যবস্থা হয়েছে ছোটমামার ফোনাফোনিতে। অপরাধী চারজনকে গ্রেপ্তার করেই বেঁধে ফেলল পুলিশ। ক'দিন আগেই শেখানো কায়দায়, দুজন স্বয়ংসেবক নিজেদের দুটো জামা খুলে দুদিকে দণ্ড ঢুকিয়ে তৈরি করে নিল চটজলদি স্ট্রেচার। বনমালীদাকে কোনওমতে শোয়ানো হলো তাতে। বনমালীদার অল্প জ্ঞান আছে। তারমধ্যেই অস্ফুটে কী বলতে চাইছে।

তরুণমামা কাছে গিয়ে শুনতে চাইল, বনমালীদা কোনওমতে বলল, 'শোভনা কেমন আছে?'

তরুণমামা মাথায় হাত রেখে বললে, 'ভালো আছেন। আর বিপদ নেই।'

এতক্ষণ পরে সোপান একটু সাহস সঞ্চয় করে এলো ছোটমামার কাছে। জড়িয়ে ধরে বলল, 'মামা! মাই হিরো।'

ছোটমামা কী বলার আগেই এস পি সাহেব এসে হাত বাড়ালেন, 'আমরা চললাম ডক্টর গাঙ্গুলী। আপনাকে কি ড্রপ করব?'

ছোটমামা করমর্দন করে বলল, 'না, ধন্যবাদ। আমি সকলের সঙ্গেই যাবো। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ তো আপনাদের দেওয়া উচিত। আমি আজকের সম্পূর্ণ ঘটনা ডিপার্টমেন্টকে জানাব। সত্যিই নাগরিক সমাজের এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। অতুলনীয়। আপনি তরুণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একবার আসুন, একটু আলোচনা আছে।'

তরুণমামাও হাত মেলালো এস পি সাহেবের সঙ্গে। উনি চলে গেলে মামার দিকে ফিরে বললেন, 'চলি ডাক্তার, যার শেষ ভালো তার...'

'সব ভালো। যাও নিবাসে গিয়ে স্নান করে টানা ঘুম দাও। গত ক'দিন তো প্রায় ঘুমোওনি।' ছোটমামা যোগ করে।

তরুণমামা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'সে হবার নয়। এখুনি স্নান করে সিউড়ি যেতে হবে। ওদের মাসিক বর্গ বৈঠক আছে। একটা সত্র আমাকে নিতে হবে।

তরুণমামা বাইকে চেপে স্টার্ট দিল। জঙ্গলের উঁচু নীচু টিলা খানাখন্দের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোটমামা সেদিকে তাকিয়ে আপনমনে বলল, 'এরা সাধারণ পোশাকের সন্ন্যাসী। অসাধারণ।'

সোপান ঠিক ঠাওরে উঠতে পারে না। বলে, 'কী বলছ মামা?'

ছোটমামার যেন ঘোর ভাঙ্গল। 'নাঃ! কিছু নয়। তুমি বাড়ি চলো। তোমার বাবা আসছেন, তোমায় নিতে। দিদি আমাকে প্রতি ঘণ্টায় ফোন করেছে। তোমার কপালে দুঃখ আছে। আমার কপালেই বা কী আছে কে জানে?' ■

ANOOPAM

ANOOPAM METAL INDUSTRIES INDIA

ISO 9001-2000 Certified

METAL INDUSTRIES

<u>*Manufacters & Exporters*</u>

AIMEX BRAND ALLEN BOLTS, GRUB SCREWS, ALLEN SCREWS &CYCLE PARTS

B-6, Textile Colony, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, Fax : 91-161-5013390
e-mail : annopam_met@hotmail.com

ছোঁয়াছুঁয়ি

সিদ্ধার্থ সিংহ

না। একে তাকে ধরে, গেম টিচারের কাছে হাজার অনুনয়-বিনয় করেও স্কুলে ক্রিকেট টিমে জায়গা হলো না তিমিরের। হবেই বা কী করে? ক্রিকেট হচ্ছে রাজসিক খেলা। ও খেলা রাজাদেরই মানায় তার মতো চাষ করতে গিয়ে ঋণে জর্জরিত অতি সামান্য ভাগচাষির ছেলেকে কি ওই খেলা মানায়! যতই সে ভাল খেলুক। ছুটে আসা এক একটা আগুনের গোলাকে মেরে যতই তালগাছের উপর দিয়ে গ্রামের সীমানার ওপারে পাঠাক, চিলের চেয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে উড়ে গিয়ে বাতাসের কবল থেকে ছোঁ মেরে

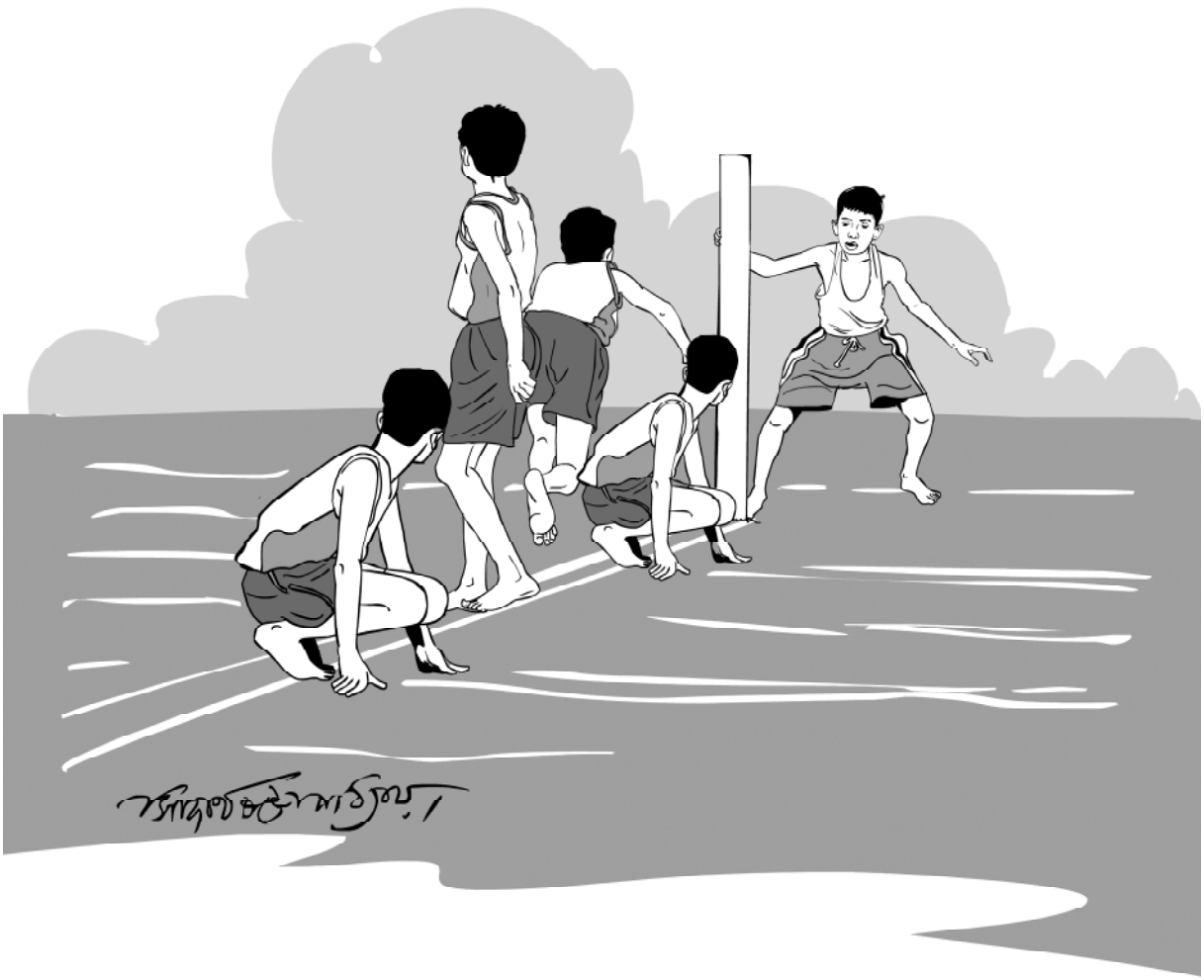

লুফে নিক এক একটা বল, ব্যাটে কোনওরকমে বল ছুঁইয়েই চিতাবাঘের মতো দৌড়ে এক রানের জায়গায় নিয়ে নিক তিন রান, তবু কোনও স্কুল টিমে চান্স পাওয়ার জন্য শুধু এগুলোই যথেষ্ট নয়। বিশেষ করে গ্রামের দিকে। আর সে তো থাকে হুগলি জেলার আরামবাগের অনেক ভিতরে। সালেপুরের রুইদাস পাড়ার মতো একটা এঁদো গ্রামে। টেনেটুনে কোনও রকমে ক্লাস সিক্সে উঠেছে। তার উপর তার না আছে কোনও চালচুলো, না আছে কোনও চেনাজানা। ফলে শুধু খেলায় কেন, কোনও ব্যাপারেই কেবল সুযোগ নয়, যোগ্যতা অনুযায়ী ন্যায্যটুকু পাওয়ারও কথা নয় তার। কারণ ওসবের পিছনে একটা অন্য খেলা চলে। চলে অন্য হিসাব। পঞ্চায়েত প্রধানের রেকমেন্ডেশন লাগে। লাগে স্কুল পরিচালন কমিটির সঙ্গে বাবা-কাকাদের দহরম মহরম সম্পর্ক। থাকতে হয় মাথার উপর বড় কোনও মানুষের হাত।

তা হলে কী হবে! তিমির জিজ্ঞেস করতেই, গেম টিচার বললেন, তুই একটা কাজ কর। তুই বরং খো-খো'য় নাম লেখা। ওখানে এখনও বেশ কয়েকটা খালি আছে। দেরি করলে কিন্তু ওটাও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত খো-খো! হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে সে খো-খো খেলেছে ঠিকই, কিন্তু তা বলে.... ক্রিকেট থেকে একেবারে খো-খো!

ওর বাবা বলেন, যে কাজই করবি, সেটা যদি জুতো সেলাইও হয়, সেটাও মন দিয়ে করবি। দেখবি, একদিন না একদিন ঠিক তার কদর পাবি।

ওকে নাক সিঁটকাতে দেখে গেম টিচার বললেন, শোন, যদি খেলতে পারিস... কোনও খেলাই ছোট নয়। এক সময় তো ফুটবলই একচ্ছত্র রাজত্ব করত এই দেশে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা হলে আমরা ছোটবেলায় দেখেছি, শুধু কমেন্ট্রি শোনার জন্যই বিক্রি হয়ে যেত লক্ষ লক্ষ পকেট ট্রানজিস্টর। সেই খেলা খেলতে জোশ লাগত। দম লাগত। মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হতো। সেই পরিশ্রম করার ক্ষমতা সবার থাকত না। তাই ফুটবল ছেড়ে অনেকেই অন্য খেলায় চলে যেত।

কে বলতে পারে, সুনীল গাভাসকর, সচিন তেণ্ডুলকর, এমনকী আমাদের সৌরভ গাঙ্গুলিও যে চৌখস ফুটবলারদের মতো অমন অমানুষিক পরিশ্রম করতে পারবেন না বলেই ক্রিকেট খেলায় আসেননি! যেদিন তাঁদের ক্রিকেট খেলায় নাম লেখাতে হয়েছিল, তখনও তো ওটা সেভাবে জাতে ওঠেনি। হয়তো তাঁরাও সেদিন তোর মতোই এই রকমই হতাশ হয়েছিলেন।

অথচ দেখ, তাঁরা তাঁদের ক্রিকেটে সব কিছু নিংড়ে উজাড় করে দিয়েছিলেন দেখেই আজকে শুধু তাঁরা নিজেরাই সফল হয়নি, সেই খেলাটাকে তুলে এনেছেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কে বলতে পারে, একদিন হয়তো তোর হাত ধরেই এই খো-খো খেলা এত বিপুল সাড়া ফেলবে যে ক্রিকেটকেও ম্লান করে দেবে। কী করবি বল?

গত বছর ওদের সালেপুর হাইস্কুলের ওর ক্লাসেরই এক বন্ধু খো-খো টিমে নাম লিখিয়েছিল। এত খেলা থাকতে ও কেন খো-খোয় নাম লেখাল, সেটা জিজ্ঞেস করতেই ও বলেছিল, দ্যাখ, ক্রিকেট খেলতে গেলে যা খরচা হয়, তা চালানো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তুই তো জানিস, বাবা পরের পুকুরে মাছ ধরে। তাতে আর ক'টা টাকাই বা পায় বল! অথচ ক্রিকেট খেলতে গেলে এই লাগে সেই লাগে। একটা কিটসেরই কত দাম! ওগুলো হচ্ছে বড়লোকদের খেলা। অথচ খো-খো খেলতে গেলে কোনও ইন্সট্রুমেন্ট তো নয়ই, প্রায় কিছুই লাগে না। দুদিকের দুটো খুঁটি আর খোপ কাটার জন্য একটু চুন লাগে। চুন না পেলে ছাই দিয়েও কাজ চালানো যায়। সেটাও জোগাড় না হলে কোদাল দিয়ে কেটেও লাইন বানিয়ে নেওয়া যায়। এছাড়া যেগুলো লাগে, তা আমাদের প্রায় সবারই আছে। আর সেগুলি হল— অফুরন্ত দম, গতি, কৌশল, শক্তি, ক্ষমতা, তৎপরতা, ক্ষিপ্রতা আর ভারসাম্য বজায় রাখা। ব্যাস। এগুলি হলেই হলো। আর যাদের এগুলি নেই, তাদের এগুলি রপ্ত করা আমাদের মতো প্রত্যেক দিন রোদে পুড়ে জলে ভিজে মাঠেঘাটে কাজ করা ছেলেদের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

ওর আর এক বন্ধু হরিশ। ওর থেকে দু'ক্লাস উপরে পড়ে। সে বলেছিল, ভারতবর্ষ জুড়ে এই মুহূর্তে কত লক্ষ লক্ষ ছেলে ক্রিকেট খেলছে জানিস! পাড়ায় পাড়ায়, অলিতে গলিতে কত ক্রিকেট কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে জানিস? সেখানে কোন ফ্যামিলির ছেলেরা খেলে জানিস? আমরা সেখানে পাত্তাই পাব না। প্রতিদিন সেখানে ভিড় বাড়ছে। এই মুহূর্তে যদি কুড়ি লক্ষ ছেলেও খেলে, তার মধ্যে থেকে চান্স পাবে ক'জন বল? খুব বেশি হলে কুড়ি জন। তার মানে দলে জায়গা পেতে গেলে আমাকে কত জনের সঙ্গে লড়তে হবে, বল? প্রায় উনিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার ন'শো আশিজন ছেলের সঙ্গে। তাই না? সেই তুলনায় খো-খোর জায়গা তো অনেক ছোট। ভিড় অনেক কম। আর তা ছাড়া এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় খেলা। আমরা আমাদের দেশের খেলা ছেড়ে কেন বিদেশের খেলা খেলতে যাব বল তো?

মনের মধ্যে খুঁতখুঁত করলেও ওই কথাগুলো মনে পড়তেই তিমির আর মুখে কিছু বলল না। শুধু মাথা কাত করল। সেটা দেখে গেম টিচার বললেন, তাহলে কাল সকালে মাঠে চলে আসিস। ক'দিন প্র্যাকটিস করাব। কারণ, সামনের সপ্তাহেই কলকাতা থেকে বলরাম হালদারের আসার কথা। তিনি শুধু খো-খোর প্রশিক্ষকই নন, রাজ্য খো-খো সংস্থার যুগ্ম সম্পাদকও।

এমনিতেই খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে ও। ক'দিন ধরে আরও ভোরে উঠছে। উঠেই কাঁচালঙ্কা আর নুন দিয়ে পান্তাভাত খেয়েই স্কুলের সামনের মাঠে চলে যাচ্ছে। গেম টিচারের দেখিয়ে দেওয়া কিছু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ অন্তত আধঘণ্টা ধরে করছে। এ মাথা থেকে ও মাথা দৌড়াচ্ছে। তার পর মাঠে নেমে এতদিন যেভাবে গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে যখন যে ক'জন এসেছে, সেভাবে দল ভাগ করে কখনও সখনও এক আধজন বেশি হয়ে গেলে, যে দল দুর্বল, সেই দলে তাকে দিয়ে দিয়েছে। তাতে কোনও দলে গুনতিতে বেশি ছেলে হলেও কেউ কোনও আপত্তি করেনি। বরং খুশিই হয়েছে।

কিন্তু এখন আর সেভাবে খেলছে না। খো-খো কোর্ট তৈরি হয়েছে একেবারে নিয়ম মেনে। চোদ্দ মিটার প্রস্থ। তেইশ মিটার দৈর্ঘ্য। সেই দৈর্ঘ্যের দুই প্রান্তে প্রস্থের ঠিক মাঝখানে দুটি খুঁটি পোঁতা। দুই খুঁটির মাঝ বরাবর একটা রেখা এমনভাবে টানা হয়েছে, যাতে প্রস্থের এদিকে সাত মিটার আর ওদিকে সাত মিটার থাকে। সেই রেখাটাকে আটটা সমান ভাগে ভাগ করে আরও আটটা রেখা টানা হয়েছে প্রস্থের দুই সীমানা পর্যন্ত।

গেম টিচার বললেন, তোরা আগে যেভাবে খো-খো খেলেছিস, সেটা ভুলে যা। মনে রাখবি এটা একটা দলগত খেলা। খেলা হয় দুটো দলে। এক দল চেজ করে অন্য দল ডিফেন্স। প্রতি দলে বারো জন করে খেলোয়াড় থাকলেও মাঠে নামে কিন্তু ন'জন করে। বাকি তিন জন রিজার্ভে থাকে। যদি কোনও ভুলচুকের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হয়, তা হলে তার পরিবর্তে যাতে ওখান থেকে খেলোয়াড় নামাতে পারে।

যারা চেজ করে, সেই দলের ন'জনের আট জন দুই খুঁটির মাঝ বরাবর রেখার মধ্যে সব দূরত্বের যে আটটি রেখা ভেদ করে, সেই আটটি সংযোগ স্থল গিয়ে বসে। পরস্পর বিপরীতমুখী হয়ে। আর নবম জন দু'প্রান্তের যে কোনও একটি খুঁটির কাছ থেকে চেজিং শুরু করে। চেজ মানে দৌড়ে গিয়ে ডিফেন্ডারকে ছোঁয়া। ছুঁলেই আউট। এই চেজারের মুখ যে দিকে থাকে তাকে সে দিকেই ছুটতে হয়। সে পিছন ফিরতে পারে না। পিছন থেকে যেতে গেলে সামনের খুঁটির ওপাশ থেকে ঘুরে আসতে হয়। এমনকী যে আট জন চেজার দুই খুঁটির মাঝ বরাবর খানিক দূর দূর বিপরীতমুখী হয়ে বসে থাকে, তাদের মাঝখান দিয়েও গলে যেতে পারে না।

আর যারা ডিফেন্স করে তাদেরও ন'জন খেলোয়াড় কিন্তু একসঙ্গে মাঠে নামে না। সেই ন'জনকে দক্ষতা আর যোগ্যতা অনুযায়ী তিনজন করে তিনটে উপদলে ভাগ করা হয়। প্রথমে একটি উপদল নামে। সেই উপদলের তিনজনই ম'র হয়ে গেলে, মানে আউট হয়ে গেলে মাঠে বাইরে অপেক্ষা করা পরের উপদলটি নামে। এবং চেজারদের যতই বিধিনিষেধ থাকুক না কেন, ডিফেন্ডাররা কিন্তু যে দিকে খুশি যেতে পারে। আগে-পিছেই শুধু নয়, দুই খুঁটির মাঝখানে যে আটজন চেজার বসে থাকে, তাদের যে কোনও ফাঁক থেকে যতবার খুশি গলে যেতে পারে। অর্থাৎ তাদের কাছে পুরো কোর্টটাই ফ্রি জোন। তবে হ্যাঁ, চক দিয়ে কোর্টের যে সীমানা কাটা থাকে, তার বাইরে যেতে পারে না। অন্তত একটা পা কোর্টের মধ্যে রাখতেই হয়।

খেলার আগে প্রতিদিনই টস হয়েছে। যারা টস জিতেছে তারা কখনও নিয়েছে চেজিং। কখনও ডিফেন্স।

না। ন'মিনিট করে নয়। ওটা বড়দের জন্য। তাদের বয়স যেহেতু আন্ডার টুয়েলভ, তাই সাত মিনিট করে এক একটি পর্ব। প্রতি পর্বের পর তিন মিনিট করে বিরতি। মোট চারটি পর্ব। দুটি পর্ব মিলিয়ে একটি পর্যায়। তবে পর্যায়ের শেষে আর তিন মিনিট নয়, তখন ছ'মিনিটের বিরতি। অর্থাৎ সাত প্লাস তিন প্লাস সাত প্লাস ছয় প্লাস সাত প্লাস তিন প্লাস সাত মিলিয়ে মোট চল্লিশ মিনিট করে খেলেছে ওরা।

প্রতিটি পর্বের পর পালাবদল হয়েছে। আগের পর্বে যারা চেজিং করেছে, তারা পরের পর্বে ডিফেন্স করতে নেমেছে। আর ডিফেন্সরা নেমেছে চেজিং করতে। চেজিং করার সময় বিপক্ষ দলের যত জনকে ছুঁয়ে ম'র করছে, তত পয়েন্ট পেয়েছে তারা। দুই পর্যায়ের সংগ্রহ করা পয়েন্টের ব্যবধানেই নির্ধারিত হয়েছে জয়-পরাজয়।

বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে চেজার আক্রমণ শুরু করেছে। যখন কোনও চেজার কোনও ডিফেন্ডারকে নাগালে পায়নি, তখন দুটি খুঁটির মাঝ বরাবর বসে থাকা চেজারের পিঠে হাত দিয়ে তাকে স্পর্শ করে 'খো' বলেছে। 'খো' পাওয়ার পর সেই চেজার সঙ্গে সঙ্গে একজন সক্রিয় চেজার হয়ে উঠেছে। আর তার জায়গায় যে তাকে 'খো' দিয়েছে, সে বসে পড়েছে।

কেউ ছোঁয়ার আগেই 'খো' বললে, আবার খো বলে স্পর্শ না করলেই বিধিভঙ্গ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে গেম টিচার তাকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর তার চেয়েও গুরুতর বা একই বিধি বারবার ভাঙলে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, তাকে আর সেদিন ওই খেলায় অংশই নিতে দেননি। তার পরিবর্তে রিজার্ভে থাকা তিনজন খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে যে কোনও একজনকে নামানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

তাদের গেম টিচার সারা মাঠ দৌড়ে দৌড়ে একাই দুজন আম্পায়ার, একজন রেফারি, একজন টাইম কিপার এবং একজন স্কোরার অর্থাৎ একাই পাঁচ জনের কাজ করে গেছেন।

এই ক'দিন প্র্যাকটিস করেই নতুন নতুন অনেক নিয়মকানুন আর এই খেলার বেশ কিছু খুঁটিনাটি খুব ভালো করে জেনে নিয়েছে তিমির। তাই ভেবেছিল, গতকাল রাতে কলকাতা থেকে আসা বলরামবাবু যখন এগারোটার সময় সবাইকে নিয়ে বসবেন, তখন ও আর সেখানে যাবে না। বরং বাবার হাতে হাতে চাষের কাজ করার জন্য মাঠে চলে যাবে। কিন্তু গেম টিচার যখন বললেন, তোদের সবাইকেই আসতে হবে। কারণ, পারফরমেন্স দেখে কালই উনি স্কুল টিম তৈরি করে দেবেন। যে আসবে না বা যে শেষ পর্যন্ত থাকবে না, সে যত ভালই খেলুক না কেন, তাকে তিনি স্কুল টিমে রাখবেন না।

তখন ও সিদ্ধান্ত বদল করল।

ওরা একটু আগেই পৌঁছে গিয়েছিল স্কুলে। স্কুল মানে তিনটে মাটির ঘর। তার একটার দেওয়াল আবার হেলে পড়েছে। যে কোনওদিন ভেঙে পড়তে পারে। এছাড়া দুটো টিনের আর দুটো পাকা ঘর। তারই একটায় থাকার ব্যবস্থা হয়েছে বলরামবাবুর। শোওয়ার জন্য নীচে পুরু করে পেতে দেওয়া হয়েছে বিচালি। তার উপরে চাদর। তাতেই উনি ঘুমিয়েছিলেন। তাঁর নাকি এসব অভ্যাস আছে। তাই শুধু গেম টিচারই নয়, স্কুল পরিচালন কমিটির একজন সদস্যও তাঁদের বাড়িতে তাঁকে রাতে থাকার কথা বললেও তিনি তা সবিনয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এমনকী এখানে সাপের উপদ্রপের কথা শুনেও উনি হো হো করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। উনি নাকি বলেছেন, সাপের সঙ্গে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার আছে।

সে যাই হোক, আজ সন্ধের মধ্যেই স্কুল টিম তৈরি করে দিয়ে কাল সকালেই ফিরে যাবেন। তাই অন্য যে পাকা ঘর আছে, এখনও প্লাস্টার হয়নি সেটা। ইটের ফাঁকফোকর থেকে শুকিয়ে যাওয়া সিমেন্ট-বালির চাঙড় উঁকি মারছে। সেই ঘরেই এসে জড়ো হয়েছে ওরা।

গেম টিচার ওদের আগেই বলে দিয়েছিলেন, কারও যদি কোনও কিছু জানার থাকে, মন খুলে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিস। উনি খুব ভালো মানুষ।

খানিক বাদেই গেম টিচারের সঙ্গে যে বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারার লোকটা ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে দেখেই ওরা বুঝতে পারল, ইনিই সেই লোক। উনি ঘরে ঢুকে কোনও ভনিতা না করেই বললেন, তোমাদের একটা কথা বলি। তোমরা খো-খো খেলতে এসেছ। খুব ভালো কথা। কিন্তু যেটা খেলতে এসেছ, সেই খেলার ইতিহাস কি তোমরা জানো? জানলে হাত তোলো।

না। একজনও হাত তুলল না।

সারা ঘরে উনি একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, যদিও কবাডি, মালখাম্বা, দাড়িয়াবান্দা, আটিয়া পাটিয়া, শিড়গিজ-এর মতো এই খো-খোটাও আমাদের দেশের আদি খেলা। কিন্তু এই খেলা উনিশশো চোদ্দ সালে সরকারি ভাবে প্রথম শুরু হয় মহারাষ্ট্রের ডেকান জিমখানা ক্লাবে। উনিশশো চব্বিশ সালে গুজরাতেরই বিজয়হিন্দ জিমখানা ক্লাবে এই খেলার প্রাথমিক নিয়মকানুন তৈরি হয়। এবং ওই রাজ্যেরই ড. বাইনরুলকার ও কে.জি. অ্যালায়েন এগিয়ে আসেন এর প্রচার ও প্রসারে। উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে ভারতীয় এবং উনিশশো সাতাশি সালে এশিয়ান খো-খো ফেডারেশন গঠিত হাওয়ার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এটা ছড়িয়ে পড়ে।

এখন তো ভুটান, জাপান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা এমনকী মায়ানমারেও এই খেলা হচ্ছে। এই খেলায় সবচেয়ে সুবিধা হলো, এতে খেলোয়াড় খাটো হলে ডিফেন্সের সময় যেমন ভড়কি দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সুবিধা পায়, তেমনি লম্বা হলেও চেজিংয়ের সময় বড় বড় পা ফেলে ছুটে গিয়ে লম্বা লম্বা হাত দিয়ে অনেক দূর থেকেই বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ছুঁয়ে ম'র করে দিতে পারে। তাই আমরা দু'ধরনের খেলোয়াড়কেই দু'রকম ভাবে তালিম দিই।

তবে একটা কথা, এটা যেহেতু গ্রাম, ইনডোর ম্যাট্রেসের উপরে ম্যাটের জুতো পরে খেলা হচ্ছে না, এমনকী কেম্বিসের জুতো পরেও না। তোমরা খালি পায়ে খেলছ, তাই খো-খো খেলার জন্য যেখানে কোর্ট কাটা হবে, সেই মাঠটা আগে ভালো করে দেখে নিও। যাতে সেখানে কোনও ইটের টুকরো বা ভাঁড় ভাঙা মাথা তুলে না থাকে। কাঁচের টুকরো পড়ে না থাকে। পুজো, বিয়ে বা অন্নপ্রাশনের প্যান্ডেল যে মাঠে হয়, সে মাঠে হলে ভাল করে দেখে নিতে হবে, যাতে পেরেক পড়ে না থাকে এবং গর্তও

যেন না থাকে। এতে ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গর্তে পা পড়ে অ্যাঙ্কেল সরে যেতে পারে। বেকায়দায় পড়ে মালাইচাকি ঘুরে যেতে পারে। উঠে থাকা ইটের কোণায় লেগে পায়ের নখ উঠে যেতে পারে। তাই মাঠ পরিষ্কার থাকলেও খেলার সময় হাতের কাছে সব সময় একটা ফার্স্ট এইড বক্স রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্তত একটু ডেটল আর তুলো। নিদেনপক্ষে কয়েকটা ব্যান্ড এড।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও জেনে রাখো, আমরা কিন্তু এতদিন সেরকম ভাবে কোনও সুযোগ সুবিধা পাইনি। না রাজ্য সরকারের কাছ থেকে, না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে। স্পনসরও জোটেনি। জুটবেই বা কী করে? মিডিয়ারা তো অন্য খেলা নিয়ে ব্যস্ত। খো-খোর দিকে তাকাবার ফুরসতই নেই তাদের। অঅর আমাদের দেশ? আমেরিকা যেমন বাসকেট বলকে, জাপান যেমন জুড়োকে, সুইজারল্যান্ড যেমন চকলকে, চিন যেমন মার্শার আর্টকে প্রমোট করে, আমাদের দেশ কিন্তু তাদের এই দেশীয় খেলাকে এতদিন প্রমোট তো নয়ই, এমনকী এই খেলাটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা পয়সাও খরচা করেনি। একেবারে অস্পৃশ্য করে রেখে দিয়েছিল। এখন অবশ্য অতটা খারাপ অবস্থা নয়। তবু...

এই তো কিছুদিন আগে পঁয়তিরিশতম জাতীয় গেমসে ফুটবল দলকে যেখানে বিমানে করে কেরলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে আমাদের যেতে হয়েছে স্লিপার কোচে। অথচ এই গেমসে ওরা নয়, দলীয় খেলায় একমাত্র পদক ছিনিয়ে এনেছে এই খো-খো। না। শুধু পুরুষরাই নয়, মহিলারাও।

আর এই জন্য এখন এই সরকারের ক্রীড়া বিভাগ, ক্রীড়া পর্ষদ এবং সাইয়ের মাধ্যমে রাজ্য এবং জাতীয় স্তরেও আমরা

কেবল প্রশিক্ষণই পাচ্ছি না, নানারকম সাহায্য ও সহযোগিতাও পাচ্ছি।

এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলার খেতাব 'অর্জুন পুরস্কার' ছিনিয়ে নিয়েছে খো-খো-র মোট বারো জন খেলোয়াড়। দ্রোণাচার্য প্রশিক্ষকের খেতাবও হাতে চলে এসেছে একজনের।

আর এর জন্যই টনক নড়েছে বহু সংস্থারও। তাই ফুটবলার, ক্রিকেটারদের মতো এত দিন বাদে খো-খো খেলোয়াড়দেরও চাকরি হচ্ছে পুলিশে, ইনকাম ট্যাক্সে, ব্যাঙ্কে, এমনকী রেলেও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমরাও শুধু মনপ্রাণ দিয়ে খেলে যাও। তোমাদের দায়িত্ব আমার।

ক্লাশরুম থেকে বেরিয়ে যাবার আগে বলরামবাবু বলেছিলেন, তবে তোমরা কারা কারা শেষ পর্যন্ত এই স্কুল টিমে থাকবে, তা তোমাদের দৌড়, টার্নিং, ব্যালান্স এবং খেলার কৌশল দেখার

পরেই আমি ঠিক করব। তোমরা তিনটে নাগাদ চলে এসো। ঠিক আছে?

প্রত্যেকেই ঘাড় কাত করেছিল।

যাবার আগে গেম টিচারের হাতে উনি তুলে দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ খো-খো অ্যাসোসিয়েশন থেকে দু'হাজার দশ সালে প্রকাশিত তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক শ্রী দীপঙ্কর বাগচীর লেখা 'খো-খো খেলার নিয়মাবলী'। তার সঙ্গে দিয়েছিলেন জেরক্স করা একটা পাতাও। যাতে লেখা ছিল, ওই বই প্রকাশের পরেই দু'হাজার তেরো সালে যে নিয়মকানুনগুলি অদল-বদল হয়েছিল তার সংশোধনী।

স্কুল টিমে কে কে চান্স পাবে আজই তার তালিকা তৈরি হয়ে যাবে। তাই তিনটের আগেই সবাই মাঠে চলে এসেছে। এসেছেন বলরামবাবুও। তখন খুঁটি পোঁতা হয়ে গেছে। চকের গুঁড়ো দিয়ে খোপ কাটা হচ্ছে। যে খোপ কাটছে, তার হাতে কাগজের ঠোঙায় চকের পরিমাণ দেখে উনি বললেন, অত খোপ কাটতে হবে না। সেন্টার লাইনেও কম হলে চলবে। চুনটা আউট লাইনে বেশি করে দাও। যাতে চেজারের কাছ থেকে পালাবার সময় কোর্টের আউট লাইনটা ডিফেন্ডারদের চোখে পড়ে।

কিন্তু খেলা শুরু হতে না হতেই উনি খেলা থামিয়ে দিলেন। তারপর চেজারের উদ্দেশে বললেন, একী! শুধু ছুটছ কেন? ডিফেন্ডারের গতি খেয়াল করো। ও কোন দিকে যাচ্ছে। কোন দিকে যেতে পারে। বুঝেছ? ডিফেন্ডার সব সময় চাইবে তুমি যেই তাড়া করবে টুক করে দুই খুঁটির মাঝ বরাবর বসা চেজারদের মাঝখান থেকে গলে ওদিকে চলে যাবার। কারণ, তুমি তো ওখান থেকে গলে গিয়ে ওকে ছুঁতে পারবে না। ওদিকে যেতে গেলে তোমাকে ওই খুঁটির ও পাশ থেকে ঘুরে তারপর যেতে হবে। তখন তুমি কী করবে? খেয়াল করবে ডিফেন্ডার যেখানে আছে, তার সবচেয়ে কাছে ওদিকে মুখ করে কোন চেজার বসে আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খো দেবে। তা হলে সে উঠেই তাকে ছুঁতে পারবে।

সেই চেজার বলেছিল, তাতে কী হবে? ও তো আবার সেন্টার লাইন টপকে এ পাশে চলে আসবে।

বলরামবাবু বলেছিলেন, সে তো আসবেই। ও তো চাইবেই নিজেরে রক্ষা করতে।

— তা হলে?

— যেই ও এদিকে আসবে সঙ্গে সঙ্গে ওই চেজার এ দিকে মুখ করে বসা চেজারকে খো দেবে। এবং এটা যে যত দ্রুত করতে পারবে, জানবে সেই তত চৌখস হয়ে উঠছে।

— তা হলে খুঁটির ও পার থেকে ঘুরে গিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করব না?

— কেন করবে না? সেটা বুঝে করতে হবে। এটাই তো খেলা। আর তোমাদের বলছি বলেই ডিফেন্ডারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, চেজাদের গতিবিধির দিকে খেয়াল রাখো। ওদের কাছ থেকে নিজেদের এমন দূরত্বে রাখো যাতে সহজে আউট না হও। এবং চেজাররা যাতে তোমাদের গতিবিধি আন্দাজ করতে না পারে, সেদিকে নজর দাও। দরকার হলে টুক করে সেন্টার লাইন ক্রস করে ওপারে চলে যাও। তবে খেয়াল রাখবে, সেন্টার লাইন থেকে কখনোই এত দূরে সরে যাবে না, যাতে তাড়া খেয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ভুল করে কোর্টের বাইরে চলে যাও।

আর আপনাকে বলছি, বলে, গেম টিচারকে বলেছিলেন, খুঁটি দুটোতে এত গাঁট কেন? ভাল করে চেঁছে একদম মসৃণ করে নেবেন। কারণ, চেজাররা যখন দৌড়ে গিয়ে ওটা ধরে বাঁক নেয়, তখন এই গাঁটে লেগে হাতের তালু ইনজুরি হতে পারে। আর এমন ভাবে পোলটা পুঁতবেন, যাতে মাটির উপরে একশো কুড়ি সেন্টিমিটার দাঁড়িয়ে থাকে। এটাই নিয়ম। তাতে লম্বা হলেও কোনও খেলোয়াড়ের কোনও অসুবিধা হবে না।

ফের খেলা শুরু হলো। খানিকক্ষণ পরেই উনি আবার খেলা থামিয়ে দিলেন। চেজারকে বললেন, নিজের গতি কন্ট্রোলে রাখার চেষ্টা করো। ডিফেন্ডার ঝট করে সেন্টার লাইনের ও পরে চলে গেল, আর তুমি নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে অতটা চলে গেলে! অতটা গিয়ে তুমি যাকে খো দিলে, সে যখন উঠে দাঁড়াল, সেই সময়ের মধ্যে ও সেই চেজারের থেকে কতটা দূরত্ব তৈরি করে নিল বলো তো? তোমার যা গতি ছিল, তুমি তো ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতে। বুদ্ধি আর হিসেবে করে হাত বাড়িয়ে যদি নিজেকে ওর দিকে ছুঁড়ে দিতে, ও তাহলে ঠিকই আউট হয়ে যেত। সেটা করলে না। সব সময় লক্ষ্য রাখো, লক্ষ্য।

তোমাকে কী করতে হবে? ছুঁতে হবে। ছোঁয় মানে তুমি ছোঁও বা তোমার দলের যে আট জন দুই খুঁটির মাঝ বরাবর বসে আছে, তাদের কেউ ছুঁক। ব্যাপারটা একই। ফুটবল খেলার সময় যেমন বল বেশিক্ষণ পায়ে ধরে রাখতে নেই, তাতে প্রতিপক্ষে খেলোয়াড় এসে বল কেড়ে নিতে পারে, এখানেও তেমনি। পাস করো, পাস। যে সামনে আছে, তাকে খো দিয়ে পাঠিয়ে দাও ডিফেন্ডারকে ছোঁয়ার জন্য। আর যে সব চেজার বসে আছ, তারা একদম রেডি থাকো। যাতে খো পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো, বুঝেছো?

তিমিরের হঠাৎ মনে হল, এটা আসলে একটা ছোঁয়াছুঁয়ির খেলা। ডিফেন্ডারকে আউট করতে হলে ছুঁতে হবে। আর এই খেলায় টিকে থাকতে হলে চেজারের ছোঁয়া থেকে নিজেকে

বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানে, সবটাই ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার। আহা, এটা যদি.... ভাবতে ভাবতে একটু অন্য মনস্ক হয়ে গিয়েছিল তিমির। ঠিক তখনই—

তোমাকে আর একটা কথা বলি। বলেই, উনি তিমিরকে বললেন, তুমি ওই পোলটাকে ধরে বাঁক নেওয়ার সময় নিজের ভারসাম্যটাকে ধরে রাখতে পারলে না কেন? শরীরটা ওদিকে এতটা ঝুঁকিয়ে দিলে যে আর একটু হলেই পোলটা ভেঙে যেত। তা হলে কী হতো জানো? তোমরা যে এই পর্বে এর মধ্যে পাঁচজনকে ম'র করেছ, সেটা বিফলে যেত। কারণ, পোল ভেঙে যাওয়ার জন্য এই পর্বটা বাতিল হয়ে যেত। নাও শুরু করো।

আবার বাঁশি বেজে উঠল।

তিমির পোলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার সে চেজ করার জন্য এগোবে। ও এখন অনূর্ধ্ব বারোয় খেলছে। এর পর অনুর্ধ চোদ্দয় খেলবে। তারপর অনূর্ধ্ব উনিশে। স্কুল লেবেলে ঠিক মতো খেলতে পারলে এখান থেকেই সোজা জেলার টিমে। জেলা থেকে রাজ্য। রাজ্য থেকে জাতীয় দলে।

না, জাতীয় টিমে নয়, গতবছর রাজ্য স্তরে চান্স পেয়েছিল তাদের গ্রামেরই এক ছেলে— নবাকু। নবাকু তাকে ক'দিন আগে বলেছিল, তাদের খেলা পড়েছিল কলকাতায়। রেড রোডের পাশে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মূর্তির কাছে। রাজ্য স্তরের খেলা বলে কথা। চাট্টিখানি ব্যাপার! আগের দিন সারা রাত দুচোখের পাতা ও এক করতে পারেনি। শুধু স্বপ্ন দেখেছে। এমনই, পাড়ায় ফুটবল কিংবা ক্রিকেটের সামান্য ম্যাচ হলেও কী ভিড় হয়ে যায়। সেখানে এটা তো রাজ্য স্তরের খেলা। সবক'টা রাজ্য একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যাবে। গ্যালারি উপচে ভিড় নেমে আসবে মাঠ পর্যন্ত। এক-একজন আউট হলেই উল্লাসে ফেটে পড়বে গোটা মাঠ। যে দলই জিতুক, তাদের সাপোর্টাররা বাজি ফাটিয়ে কান ঝালাপালা করে দেবে। আকাশ ভরে যাবে রঙে রঙে।

যে হোক। তবু নাকি ও ঠিক করেই রেখেছিল, যাই ঘটুক ও নিজে শান্ত থাকবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে শুধু খেলে যাবে। এ সব অনেক কিছুই ভেবেছিল সে। কিন্তু ও যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছল, সে তো

প্রথমে ভেবেছিল, সে বুঝি ভুল করে অন্য জায়গায় চলে এসেছে। কিন্তু যখন জানতে পারল, না। এটাই সেই মাঠ, তখন শুধু অবাকই নয়, একেবারে চূড়ান্ত হতাশ হয়ে গিয়েছিল ও।

মাঠ কোথায়! এটা তো মাত্র কয়েক হাত জমি। গ্যালারি তো অনেক দূরের কথা, সত্যি সত্যিই একজন দর্শকও নেই। শুধু দর্শক কেন, কোনও খেলোয়াড়ের সঙ্গেও কেউ আসেনি। যারা খেলবে শুধু তারাই এসেছে। আর যারা এসেছে, তাদের চেহারাই বলে দিচ্ছে, তারা প্রায় সবাই হাঁ-ঘরের ছেলে। এছাড়া এসেছেন শুধু জনাচারেক উদ্যোক্তা। যাঁরা একাধারে রেফরি এবং টাইমকিপার। রাজ্য স্তরের কোনও খেলার চেহারা যে এত হতদরিদ্র হতে পারে, তা নাকি নবাকুর ধারণাই ছিল না। সম্ভব হলে হৈ খেলা ছেড়ে সে তক্ষুনি অন্য খেলায় চলে যেত। নবাকু সে কথা খুব দুঃখ করেই তিমিরকে বলেছিল। বলেছিল, রাজ্য স্তরের খেলার কথা। কিন্তু রাজ্য স্তরে অমনটা হলেও তিমিরের দৃঢ় বিশ্বাস, জাতীয় স্তরে নিশ্চয়ই অতটা খারাপ অবস্থা হবে না। তাই মাঠে দাঁড়িয়ে তিমিরের মনে হল, স্কুল টিমে জায়গা পাওয়ার জন্য নয়, সে খেলতে নেমেছে জাতীয় দলে। সামনেই কোর্টের মধ্যে তিনজন ডিফেন্ডার। কে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ভাল করে দেখে নিচ্ছে সে। একজনকে টার্গেটও করে ফেলেছে। নিজে না পারলেও তার যে আটজন সঙ্গী সেন্টার লাইনে বিপরীতমুখী হয়ে পরপর বসে আছে, তাদের কাউকে না কাউকে ও ঠিক খো দিয়ে দেবে তাকে আউট করার জন্য।

খুঁটির কাছে দাঁড়িয় শেষবারের মতো ও যখন দেখে নিচ্ছে ডিফেন্ডাররা কে কোথায়, ঠিক তখনই কান বিদীর্ণ করা একটা চিৎকার ভেসে এল বহু দূর থেকে। ওর চোখ চলে গেল সেদিকে। ও দেখল, ওর ছোট ভাই ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। ওইভাবে একটা ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে বলরামবাবুও থমকে গেলেন। গেম টিচারও বাঁশি বাজাতে ভুলে গেলেন। তিমিরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছেলেটা সামনে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে তিমিরকে বলল, দাদা, এক্ষুনি বাড়ি চল। বাবাকে সাপে কেটেছে।

সেটা শুনে তিমির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে ছুট লাগাল।

গেম টিচার চেঁচিয়ে উঠলেন, কীরে, কোথায় যাচ্ছিস? দাঁড়া দাঁড়া। এভাবে চলে গেলে তোর নাম কিন্তু স্কুল টিম থেকে বাদ পড়ে যাবে। ফিরে আয়, ফিরে আয় বলছি। এইভাবে চলে যাস না।

কিন্তু ফেরা তো দূরের কথা, তিমির পিছন ফিরেও তাকাল না। সোজা ছুটতে লাগল বাড়ির দিকে। সোজা। ■

দুষ্টু-মিষ্টি প্রাণী লিমার

তাপস অধিকারী

আফ্রিকার উপকূলবর্তী ভারত মহাসাগরের বুকে বিশাল একটি দ্বীপ। পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা এরা। দ্বীপটির নাম মাদাগাস্কার। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রতীর থেকে আড়াইশো মাইল দূরে এর অবস্থান। মাদাগাস্কার বনভূমি, তৃণভূমি, প্রবাল প্রাচীর ঘেরা এক অত্যাশ্চর্য দ্বীপ। এখানে আছে বেশ কিছু প্রাণী ও উদ্ভিদ, যারা কেবলমাত্র এই দ্বীপেই আছে। বিশ্বের আর কোথাও নেই। এই দ্বীপের আদি বাসিন্দা লিমার বা লেমুর। পৃথিবীর আর কোথাও এদের দেখা মেলে না। কিছু কিছু লিমার থাকে আফ্রিকার কোমোরো ও নোসি দ্বীপগুলিতে। জার্মান ভাষায় লিমারকে বলে— 'হাব-আফেন', অর্থাৎ অর্ধবানর। দ্বীপে পাওয়া ফসিল বা জীবাশ্ম পরীক্ষা করে জানা গেছে, এরা মূল আফ্রিকা মহাদেশ থেকে মাদাগাস্কার দ্বীপে এসেছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, হয়তো এই দ্বীপটি কখনও আফ্রিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রায় ছ'কোটি বছর আগে এরা এসেছিল। লিমার বা লেমুর নিশাচর। দিনের বেলা ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয়। সাধারণত গাছেই বসবাস করে। শুধুমাত্র জলপান করার জন্য নীচে নামে। সতেরো প্রজাতির লিমার এখনও দেখা পাওয়া যায়। লিমার বা লেমুর শব্দটির অর্থ হলো — ভূত বা প্রেত। গভীর রাতে চুপিসারে শিকার ধরে, হয়তো এই কারণে এমন নাম। স্থানীয় লোকেরা আবার 'বেজি' বলে এদের। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— লিমার বা লেমুর ক্যাটা (Limar or Lemur catta)।

চিড়িয়াখানায় এদের দেখা মেলে। রীতিমতো নজর কাড়ে এদের রকমসকম। বানরদের নিকট আত্মীয় বলা হয় এদের। এদের সম্পূর্ণ চেহারাটা অদ্ভুত। সমস্ত প্রজাতির লিমারের লেজ অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয়। লেজ তো নয় যেন ঝাড়ন। একই দেহে কত রূপের খেলা। মুখের গড়ন খানিকটা শেয়ালের মতো, আবার কুকুরের মতো বলা যায়। ঠোঁটের দিকটা কাঠবেড়ালির মতো। সমগ্র আদলটা বানরের মতো। কানদুটো বেশ বড়। শরীর জুড়ে ঘন লোম। জীববৈচিত্র্য সততই আমাদের প্রেরণা দেয়। বিস্মিত করে। সমৃদ্ধ করে। লিমারের সমগ্র চেহারাটাই খুব মজার। এদের প্রধান আকর্ষণ হলো এদের চোখ। চোখ দুটো বেশ বড়। অন্ধকারে ঠিক যেন টুনিলাইট। দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। এদের ঘ্রাণশক্তিও প্রবল। আকারে মাঝারি ইঁদুর থেকে ছোট কুকুরের আকার পর্যন্ত হয়। লম্বায় ১২০ থেকে ৪৬০ মিমি হয়ে থাকে। এদের লেজ লম্বায় ১২০ থেকে ৫১০ মিমি হয়ে থাকে। দেখবার মতো এই লেজের কথা একটু পরে বলছি। পুরো লেজটাই আংটির মতো গোল গোল চিহ্নে ভরা থাকে। মাথা, ঘাড়, নরম রোমে ঢাকা। লিমারের হাতপায়ের আঙুল ঠিক সরু বাঁশের কঞ্চির মতো।

অত্যন্ত সক্রিয়, প্রাণচঞ্চল, মিষ্টি স্বভাবের লিমারদের মাদাগাস্কারের বহু মানুষ পোষেন। এরা সহজেই পোষ মানে। বন্দি অবস্থায় কিছুটা শান্ত প্রকৃতির হয়। বন্য জীবনে অসম্ভব চঞ্চল ও চটপটে। প্রচণ্ড দ্রুতগামী। এক গাছ থেকে আরেক গাছে চোখের পলকে লাফিয়ে যেতে

পারে। এমনকি মা-লিমার কোলে বাচ্চা নিয়েও দারুণ লাফ দিতে পারে। নিমেষে দৌড়ে গাছের একেবারে মগডালে উঠে যেতে পারে। লাফানো আর দৌড়ানোতে লিমারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে একমাত্র বানরই বোধহয়। এরা চলাফেরা করে জোড়ায় অথবা তিন-চারজনের দলে। বাচ্চা দেয় একটি অথবা দুটি। কয়েকমাস ধরে মা লিমার বাচ্চাকে দেখাশোনা করে। একটু বড় হলে তারপর কাছ ছাড়া করে। শিশু লিমাররাও হয় মা-অন্ত প্রাণ। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে প্রায় পাঁচ মাস। মা যা-যা করে ওরাও তাই তাই অনুকরণ করে। মা ছাড়া ওরা যে তখন কিছুই জানে না। এমনিতে এরা স্বভাবে খুব নিরীহ। পোষ মানালে মানুষের পরিবারে এক সদস্য হয়ে যায়। সবার মনপ্রাণ জয় করার মতো ক্ষমতা এদের আছে।

দুষ্টুমিতে লিমারের জুড়ি মেলা ভার। আনন্দ পেলে তীক্ষ্ণ শিস দেয়। এরা কিন্তু নিরামিষের সাথে আমিষও খায়। কেউ কেউ মধু খায়। তবে ফল খেতেই পছন্দ করে বেশি। আর লড়াইতে? ভীষণ পটু। লড়াই করে দাঁত ও হাত দিয়ে। লিমাররা সাধারণত কচি পাতা, কুড়ি, ফুল, ফল, ছোট পাখি, পাখির ডিম, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি খায়। সমস্ত লিমারই পছন্দ করে সাধারণত জংলি জায়গা। বৃক্ষবাসী, তাই ঘন গাছপালাই পছন্দ। যত না বড় শরীর, তার চেয়েও লম্বা লেজ। এরা কেমন করে ঘুমোয় জানা যাক। নিজের শরীরটাকে নিজেরই লম্বা লেজে ভালো করে পেঁচিয়ে তারপর বিশ্রাম। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কে এদের তুলনা মেলা ভার। পরস্পরের লেজ দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ও করে। নিজেদের মধ্যে পরস্পরের গা খুঁটে দিচ্ছে, আদর-যত্ন করছে এমন দৃশ্যের দেখা মেলে চিড়িয়াখানায়।

এবার জেনে নেওয়া যাক কয়েকটি প্রজাতির লিমার-এর রকমসকম—

শান্ত লিমার : এরা বাঁশ ও নলখাগড়ার জঙ্গলে বসবাস করে। গোলাকার মাথা। নাক চওড়া। দেহের লম্বা আর লেজের লম্বা প্রায় সমান। গলার নিচটা সাদা, হলদেটে লাল আর বাকি শরীরের রঙ পাটকিলে ধূসর। নিশাচর। এদের প্রিয় খাদ্য ঘাস, ফড়িং। শিকার ধরতে দারুণ ওস্তাদ।

ভোঁদড় লিমার : দেখা মেলে দক্ষিণ ও পশ্চিম মাদাগাস্কারে। আকারে কিছুটা ভোঁদড় সদৃশ্য। এদের প্রিয় খাদ্য ফল। লিমার পরিবারে এরাই একমাত্র দিবাচর।

ইঁদুরে লিমার : শরীরের রঙ ধূসর ও সাদা। ইঁদুরের মতো ছোট্ট। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— মাইক্রোসিবাস মিউরিনাস। এরা অত্যন্ত লাজুক। এদের পোষ মানানো বেশ শক্ত ব্যাপার। ওজন মাত্র চল্লিশ থেকে আশি গ্রাম। গাছের গায়ে গর্ত করে বাসা বানায়। তীক্ষ্ণ শিস দেয়। লম্বায় চার-পাঁচ ইঞ্চি। লেজ সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি। এদের খাদ্য নানারকম ফল, পোকামাকড় ইত্যাদি।

আংটি লেজ লিমার : গোলাকার সাদা কালো আংটির মতো দাগ থাকে গোটা লেজ জুড়ে। লেজের সাহায্যে একে অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করে। এরা লিমার পরিবারে অত্যন্ত সামাজিক বলে চিহ্নিত। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— লেমুর বা লিমার ক্যাটা। এরা ফল, ফুল, পোকামাকড় প্রভৃতি খায়।

বামন লিমার : গভীর জঙ্গলে থাকে। শরীরের থেকে লেজ বড়। গায়ের রঙ বাদামি। অন্য নাম— বাদামি লিমার। মুখটা কালো। চোখ বড় ও উজ্জ্বল। এদের প্রিয় খাদ্য ফল, পাতা, মধু ও ছোট পাখি। এরা ভালো পোষ মানে। গায়ের লোম খুব নরম আর দেখতে খুবই সুন্দর।

কাঠবেড়ালি লিমার : দেহের রঙ লালচে ধূসর। ঘন লোমে ঘেরা। চোখের ঠিক ওপর দিয়ে একটা কালো টানা দাগ পিঠ বরাবর দেখতে পাওয়া যায়। গলার দিকে ফিকে হলদে রঙ। পা বাদামি। অসম্ভব দ্রুত ছুটতে পারে। ফল খেতে পছন্দ করে। এরা কা-কা শব্দে ডাকে। সুবজ পাতা, মধু খেতেও পছন্দ করে এরা।

সোনালি ভ্রূ লিমার : কমলা রঙের গোঁফ। সোনালি ভ্রূ। এক কথায় রাজকীয় চেহারা। এদের প্রিয় খাদ্য বাঁশের ভেতরের নরম বস্তুটি।

হল্লাবাজ লিমার : এদের খাদ্য ক্যাকটাস জাতীয় গাছের ফুল ও পাতা। লম্বায় বাইশ ইঞ্চি। এরা সত্যিই হল্লাবাজ। অশান্ত। এরা চেঁচামেচি করে নিজ নিজ এলাকা সুরক্ষিত রাখে। এরা হয় কিছুটা দেমাকি ও রংবাজ প্রকৃতির।

গলায় প্রচুর লোমওয়ালা Ruffed limer মাদাগাস্কার দ্বীপে দেখা মেলে। বিজ্ঞান পরিভাষায় বলে— ভেরিয়াগাটাস (Variagatus), এরাও দেখতে খুব সুন্দর। প্রিয় খাদ্য পোকামাকড়, ফুল ও ফল। লিমারের চেহারাটাই খুব মিষ্টি। আকর্ষণীয়। লিমারের কথা শেষ করার আগে এদের বাচ্চা অবস্থাটা একবার দেখা যাক। জন্মানোর সময় এদের মাথা থাকে বেশ বড়। চোখ থাকে খোলা। গায়ে থাকে ছোট ছোট লোম। লেজে থাকে অল্প লোম। পরিশেষে বলি, আফ্রিকার ওই দ্বীপে যাঁরা চাষ-আবাদ করেন, তাঁদের শস্য ক্ষেতে মাঝেমধ্যেই হানা দেয় এই ক্ষুদে লিমারের ছোট ছোট দল। চাষিভাইরা কিন্তু একটুও রাগ করেন না, বরং খুশিই হন। ▮

অঙ্কের ধাঁধা

শৌনক রায়চৌধুরী

১। নীচের ধাঁধাটিতে প্রতিটি ইংরাজি বর্ণ ০ থেকে ৯-এর মধ্যে একটি করে অঙ্ককে প্রকাশ করে। দুটি আলাদা বর্ণ দুটি আলাদা অঙ্ককে প্রকাশ করে। তাহলে একটি ODD সংখ্যা, আবার EVEN-ও একটি সংখ্যা। তোমরা কি বলতে পারবে, তাহলে ODD + EVEN এই সমীকরণের উত্তর কি হবে?

২। আগের মতোই আরও একটি অঙ্কের ধাঁধা। SEND + MORE = MONEY। এর সমাধান কি হবে বের করো।

৩। এক কিশোরী সবে গাড়ি চালাতে শিখেছে। সে একদিন একটি একমুখী রাস্তা দিয়ে উল্টো দিকে যাচ্ছিল। পুলিশ তাকে দেখলেও কিছু বলল না। তোমরা কি বলতে পারবে কেন?

৪। চীনদেশের কোনও মানুষের পক্ষে কি তার বিধবা স্ত্রীর পরের বোনকে বিয়ে করা উচিত হবে?

৫। তুমি কি কোনও ফুটবল খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে তার ফলাফল বলতে পারো?

হিতোরি

জাপানি সংখ্যার খেলা

হিতোরি খেলাটি জাপানে উদ্ভাবিত হয়। এই খেলায় ৮ X ৮ ঘর থাকে। প্রতিটা ঘরে ১ থেকে ৮-এর মধ্যে কোনও একটি সংখ্যা থাকে। অনুভমিক বা উল্লম্ব ভাবে কোনও সারিতে একই সংখ্যার পুনরাবৃত্তিগুলো বেছে নিয়ে বাদ দিতে হয়, যাতে খেলার শেষে প্রতিটি সারিতে প্রতিটি সংখ্যা সর্বোচ্চ একবার মাত্র থাকে। এই বাদ দেওয়ার জন্য যে চৌকোণা ঘরের সংখ্যাটিকে বাদ দেওয়া হবে, সেই ঘরে ০ বসানো হয়। নিয়ম হলো যে, পাশাপাশি দুটি ঘরে ০ থাকতে পারবে না। আর যে কোনও ঘর (০ বাদে) অন্য ঘরের (যাতে ০ নেই) সঙ্গে অনুভূমিক বা উল্লম্ব ভাবে জুড়ে থাকবে। তোমাদের জন্য একটি হিতোরি ধাঁধা দেওয়া হলো নীচে।

৩	৫	৩	৪	৩	৮	৫	১
৩	৪	১	৮	৭	২	৩	৫
১	৬	২	৬	৮	৬	৪	৫
৮	৭	১	৩	২	৪	২	৬
৫	৫	৪	৪	৩	৬	৭	২
৩	৩	৭	১	৪	১	২	৫
৪	৮	৩	১	৫	১	৭	৭
৭	৬	৫	২	৭	৩	৮	৪

অঙ্কের ধাঁধার উত্তর

১। এই ধাঁধাটির দুটি উত্তর হয়— (ক) ৬৫৫ + ৬৫৫ = ১৩১০ ও (খ) ৮৫৫ + ৮৫৫ =১৭১০। অর্থাৎ D = ৫, E =১, N = ০, O = ৬ বা ৮ এবং V = ৩ বা ৭।

২। এই ধাঁধাটির একটি মাত্র উত্তর হয়। ৯৫৬৭ + ১০৮৫ = ১০৬৫২। অর্থাৎ D = ৭, E = ৫, M = ১, N = ৬, O = ০, R = ৮, S = ৯, ও Y =২।

৩। কিশোরীটি হেঁটে উল্টোদিকে যাচ্ছিল, গাড়ি চালিয়ে নয়। তাই পুলিশ তাকে কিছু বলেনি।

৪। মানুষটি মারা যাওয়াতে তবেই তার স্ত্রী বিধবা হয়েছে। তো মানুষটি এ জন্মে আর কী করে স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করবে?

৫। নিশ্চয় পারো। খেলা আরম্ভের আগে ফলাফল ০-০।

হিতোরি ধাঁধার উত্তর

৩	৫	০	৪	০	৮	০	১
০	৪	১	৮	৭	২	৩	৫
১	৬	২	০	৮	০	৪	০
৮	৭	০	৩	২	৪	০	৬
৫	০	৪	০	৩	৬	৭	২
০	৩	৭	১	৪	০	২	০
৪	৮	৩	০	৫	১	০	৭
৭	০	৫	২	০	৩	৮	৪

SOCKS FOR STYLE DOWN TO YOUR FEET

Quality Products

B. K. International (P) Ltd.

Badli Gaon
DELHI-110 052

Phone : 2785-7039, 27857067 I Fax No.: 2785 7066

G. B. Auto Industries (Regd.)

C-84, Focal Point, Phase-V
Dhandari Kalan
Ludhiana - 141 010
Office : 0161-2677500, 2671600, 2671700
Fax : 161-2671500,
Resi. : 0161-2608700
M : 94172-71500, 96460-61700
E-mail : gbskg@yahoo.in
gbautoind@yahoo.co.in
Web : www.gbautoindustries.com

With Best Compliments from :-

A Well Wisher

With Best Compliments from :-

R K Global

NSE | BSE | MCX | NCDEX | MCX-SX | NSDL

R K Global

With Best

Compliments:-

Anderson Wright International

মঞ্জুভাস প্রকাশিত

গুরু বিশ্বাস-এর উপন্যাস

সাড়ে চারশ পাতা জুড়ে বইটি কেবল অরণ্যের কথা, অসহায় আরণ্য প্রাণীদের কথা, মানুষ নামের অসংখ্য পোকার কথা এবং একটি লোকের মনুষ্যত্বে আরোহনের কথা

পোকা

একটি ব্যতিক্রমী উপন্যাস, ৫ম মুদ্রণ ২৫০্

বাংলা সাহিত্যে যে বিষয় নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়নি তেমনই এক দরদী কথা

স্বপ্নলোকের চাবি ২৫০্

কেউ ভেবেছেন কলকাতা নগরীকে তিনশো বছর ধরে যারা পরিষ্কার রাখছে তাদের জীবন নিয়ে গ্রন্থ লেখা যায়? সেই কথা

ঝোপড়পট্টি ২৫০্

বিশ্বের প্রাচীনতম পেশা পণ্য নারীদেহ বিক্রয়ের বৃহত্তম বাজার নিয়ে উপখ্যান

পরীতলা

(১ম) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্
(২য়) খণ্ড তৃতীয় মুদ্রণ ২৫০্

বীজ ৩৫০্

আর সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস

অরিষ্ট ১৭০্

প্রশান্ত প্রমাণিক-এর
ভারতবর্ষের প্রাচীন বিজ্ঞান-এর কথা

কপিল থেকে চন্দ্রশেখর ৬০০্

ও

সদ্য দেখে আসা

বিস্মরণে বাঙালি বিজ্ঞানী ২৪০্

মানসের তীরে মহিমান্বিত কৈলাস ১২০্

প্রিটোনিয়া
১৪ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯
☎২২৪১-২১০৯/৯০৬২৪৭৪৭৪০
publishers.pritonia2015@gmail.com

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা,
বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে
আন্তরিক অভিনন্দন—

A Well Wisher

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাকের
অত্যাধুনিক গয়নার
ডিজাইনের ক্যাটালগ

সুপার

যে কোন স্বর্ণকারকে দেখাতে বলুন

ক্যাটালগের জন্য যোগাযোগ করুন
9830950831

ALWAYS EXCLUSIVE

Vandana®

SAREES • SUITS

Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees

Contact No. : 033-22188744 / 1386

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই—

Geeta SAREES

Golden Collection

M/s. Sharda Textiles

With Best
Compliments from :-

A
Well
Wisher

MUNJAL SHOWA

Munjal Showa Ltd. is the largest manufacturer of Shock Absorbers, Front Forks, Struts (Gas Charged and Conventional) and Gas Springs for all the leading OEM's in 2 Wheeler/4 Wheeler Industry in the Country. Manufactured Products conform to strict its standard for Quality and Safety. Company's Products enjoy reputation for Smooth, Comfortable, Long-Lasting, Reliable and Safe Ride. The Company is QS 9000, TS – 16949, ISO 14001, OHSAS 18001 and TPM Certified Company. MSL has technical and financial Collaboration with Showa Corporation Japan.

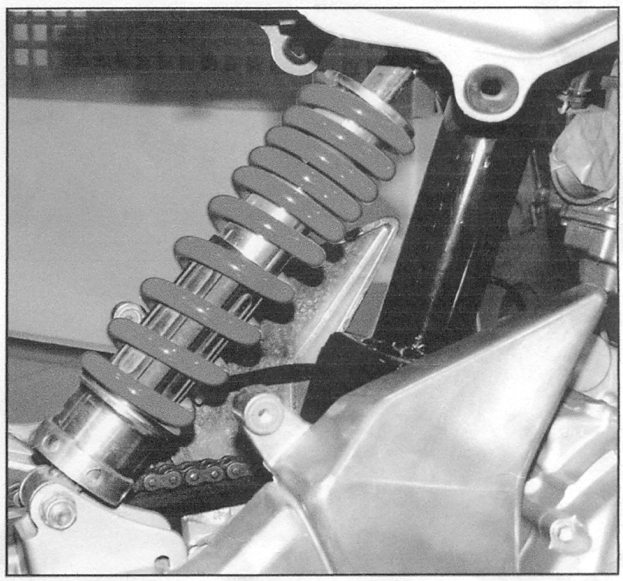

TPM Certified Company

ISO / TS - 16949 – 2002 Certified

ISO - 14001 & OHSAS – 18001 Certified

Our prestigious Client List :

- Hero MotoCorp Ltd.
- Maruti Suzuki India Ltd.
- Honda Cars India Ltd.
- Honda Motorcycle & Scooter India (P) Ltd.
- India Yamaha Motor Pvt. Ltd.

Our Products

- **Struts/Gas Struts**
- **Shock Absorbers**
- **Front Forks; and**
- **Gas Springs**

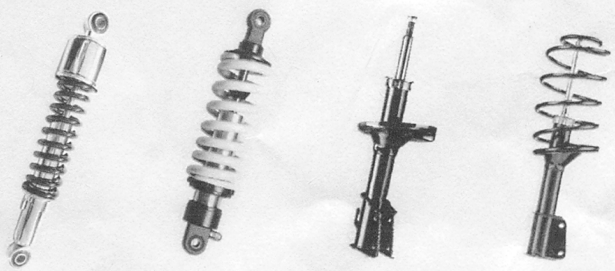

MUNJAL SHOWA LTD.

• Plot No. 9 – 11, Maruti Industrial Area, Gurgaon. Tel. No. : 0124 – 2341001, 4783000, 4783100
• Plot. No. 26 E & F, Sector – 3, Manesar, Gurgaon Tel. No. : 0124 – 4783000, 4783100
• Plot No.1, Industrial Park – II, Village Salempur, Mehdood – Haridwar, Uttarakhand Tel. No. : 0124–4783000, 4783100